রবীন্দ্রনাথের রূপক নাট্য

ডঃ শান্তিকুমার দাশগুপ্ত

Thesis approved by the University of Calcutta for the Degree of Doctor of Philosophy (D.Phil.)

রবীন্দ্রনাথের রূপক নাট্য

(Symbolic plays of Rabindranath Tagore)

শান্তিকুমার দাশগুপ্ত
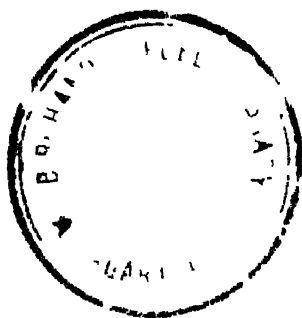
বুকল্যাণ্ড প্রাইভেট লিমিটেড্
১, শঙ্কর ঘোষ লেন
কলিকাতা – ৬

ভূমিকা

আমার আলোচ্য বিষয় রবীন্দ্রনাথের রূপক নাট্য। আলোচনার সুবিধার জন্য, বিশেষ করিয়া রবীন্দ্রনাথের রূপক নাটকগুলির তত্ত্ব আলোচনার পূর্বে তাহার ভিত্তিভূমি রচনা করা প্রয়োজন বোধ করিয়াছি। সেই উদ্দেশ্যে আলোচনাকে তিনটি খণ্ডে বিভক্ত করিয়া লইয়াছি। প্রথম খণ্ডে তিনটি পরিচ্ছেদ আছে। রূপক বা প্রতীক কাহাকে বলে, প্রতিরূপক এবং চিহ্নের সহিত তাহার পার্থক্য কোথায় প্রথম পরিচ্ছেদে সেই আলোচনা আছে। রূপকের প্রয়োগ যে বহু শতাব্দী পূর্ব হইতেই বিভিন্ন ক্ষেত্রে চলিয়া আসিতেছে তাহারই আভাস দেওয়া হইযাছে দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে। প্রতীকবাদী আন্দোলন ইউরোপে উনবিংশ শতাব্দীতে কয়েকজন কবি-শিল্পীর প্রেরণায় সাহিত্যে আরম্ভ হয় এবং বেশ একটা বড স্থান অধিকার করিযা বসে। তৃতীয় পরিচ্ছেদে তাহারই ইঙ্গিত দিয়া রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে ইঁহাদের মধ্যে যাঁহারা প্রধান তাঁহাদের মূলগত পার্থক্য কোথায় তাহা বুঝিবার চেষ্টা করিয়াছি।

এই ভিত্তি ভূমির উপর দ্বিতীয় খণ্ডটিকে স্থাপন করা হইয়াছে। দ্বিতীয় খণ্ডে তাঁহার রূপক নাটকগুলির তত্ত্ব ব্যাখ্যার চেষ্টা করিয়াছি। প্রতীক-নাটকের তত্ত্ব উদ্‌ঘাটন করা যায় না—ইহার ব্যাখ্যা নানা ভাবেই হইতে পারে। বিভিন্ন ব্যক্তি নিজ নিজ দৃষ্টিকোণ হইতে এক এক প্রকার ব্যাখ্যা করিতে পারেন, আমিও আমার দৃষ্টিকোণ হইতে নাটকগুলিকে দেখিয়াছি। শ্রদ্ধেয় শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, ডাঃ শ্রীসুকুমার সেন, অধ্যাপক শ্রীপ্রমথনাথ বিশী এবং আরও কেহ কেহ রবীন্দ্রনাথের প্রতীক নাটক লইয়া আলোচনা করিয়াছেন। তাঁহাদেব আলোচনার উল্লেখ বা কিছু কিছু উদ্ধৃতি আমার দ্বিতীয় খণ্ডের আলোচনায় আছে। তথাপি সম্পূর্ণ আমার দৃষ্টিকোণ হইতেই রবীন্দ্রনাথকে তাঁহার রূপক নাটকে আমি বুঝিবার চেষ্টা করিয়াছি।

রবীন্দ্রনাথের কয়েকটি প্রতীক নাটকের ব্যাখ্যা করা সত্ত্বেও আমার মনে হয় প্রতীক নাটকগুলিতে সামগ্রিকভাবে রবীন্দ্রমানসের যে পরিচয় আছে

তাহা বুঝিয়া লওয়া প্রয়োজন। তৃতীয় খণ্ডের প্রথম পরিচ্ছেদে বিভিন্ন প্রতীকী নাটকে রবীন্দ্র মানসের কোন্ দিকগুলি প্রকাশ পাইয়াছে তাহাই ধরিবার চেষ্টা করিয়াছি। দ্বিতীয় পরিচ্ছেদটিতে আলোচনা করা হইয়াছে প্রতীক নাটক রচনার এবং অভিনয়ের শিল্প কৌশল লইয়া—এই সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের অভিমত কি এবং তাহার প্রয়োগ তিনি নিজ-নাটকে কি ভাবে করিয়াছেন তাহাও এই পরিচ্ছেদে আলোচনা করা হইয়াছে।

মানুষের প্রকাশ তাহার কর্মে। মহৎ মানুষ নিজেকে নানা দিকের কর্মে যখন প্রকাশ করেন তখন কর্মের বৈচিত্র্য সত্ত্বেও তাঁহার জীবনের মূল সুরটি সর্বত্রই প্রকাশিত হয়। রবীন্দ্রনাথের যে মনের পরিচয় পাওয়া যায় শান্তিনিকেতনে বিশ্বভারতী প্রতিষ্ঠায়, যে মনের পরিচয় আছে শ্রীনিকেতনে পল্লীকেন্দ্র স্থাপনে—তাহারই বিস্তৃত প্রকাশ তাঁহার কাব্যে, নাটকে এবং জীবন-চর্যায়। তাঁহার জীবনের সর্বপ্রধান সাধনা ছিল 'মানুষের ভিতরকার মানুষটা'কে উদ্ধার করিবার চেষ্টা। বিভিন্ন রূপক নাটকে সেই সাধনারই পরিচয় পাইয়াছি।

'কবির দীক্ষা'-কে এই আলোচনা হইতে বাদ দিয়াছি—'রথের রশি'-কে আলোচনার মধ্যে গ্রহণ করিলেও 'কবির দীক্ষা'-কে গ্রহণ করিলাম না। 'গৃহপ্রবেশ'-এর মধ্যেও রূপক-এর সন্ধান পাওয়া যায়—"এই গৃহ কেবল বাহিরের একটি গৃহই নয়, আত্মার গৃহ"—তথাপি এই নাটকটিকে তত্ত্ব নাট্য না বলিলেও চলে বলিয়া এই আলোচনায় উহাকেও গ্রহণ করি নাই।

এখানে আর একটি কথা বলা প্রয়োজন। আমি ইংরাজী 'সিম্বল' কথাটির বাংলা করিয়াছি 'রূপক' এবং 'প্রতীক'। প্রতীক কথাটিই সাধারণতঃ সিম্বল অর্থে ব্যবহৃত হয় এবং 'এলিগরি' অর্থেই রূপক কথাটি সাধারণতঃ চলে। এই অর্থ স্বীকার করিয়া লওয়ার ব্যাপারে কোন যুক্তি কেহ দেখান নাই। রবীন্দ্রনাথ নিজেই একস্থানে প্রতিরূপক কথাটি 'সিম্বল' অর্থে ব্যবহার করিয়াছেন। সুতরাং সিম্বল-এর কোন নির্দিষ্ট পরিভাষা হয় নাই।

'রূপক' কথাটির 'ক' প্রত্যয় ক্ষুদ্র রূপের অর্থ দ্যোতনা করে। যাহা পরিপূর্ণ রূপ না পাইয়া ক্ষুদ্র রূপ পাইয়াছে তাহাই রূপক। সুতরাং সিম্বল, এলিগরি—সবই রূপক। কিন্তু এলিগরি কথাটির মধ্যে রহস্যময়তা নাই: একটি ছদ্ম অর্থেরই ভাব তাহাতে প্রকাশিত হয়।

সেইজন্য 'প্রতি' উপসর্গটির প্রয়োগ করিয়া কিছুটা নির্দিষ্ট করিবার চেষ্টায় আমি এলিগরি অর্থে প্রতিরূপক ব্যবহার করিয়াছি। সুতরাং রূপক কথাটির আর সিম্বল অর্থে প্রয়োগের কোন অসুবিধা রহিল না।

তবে স্বীকার করিতেই হইবে যে সিম্বল অর্থ রূপক স্থির করিয়াও আমি দুই চারিটি ক্ষেত্রে মাত্র রূপক কথাটি প্রয়োগ করিয়াছি। অধিকাংশ স্থলেই আমি প্রতীক কথাটি ব্যবহার করিয়াছি—কারণ এই কথাটিই সিম্বল অর্থে সাধারণতঃ প্রচলিত। হঠাৎ পাঠকচিত্ত বিভ্রান্ত হইতে পারে মনে করিয়াই আমি রূপক কথাটি বেশী প্রয়োগ করি নাই যদিও আমার আলোচনার বিষয় রবীন্দ্রনাথের রূপক নাট্য।

এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করিয়া রাখি যে রবীন্দ্রনাথের গ্রন্থ হইতে উদ্ধৃতি দিবার কালে অধিকাংশ সময়েই রবীন্দ্রনাথের নাম দিবার প্রয়োজন বোধ করি নাই, কেবল গ্রন্থের উল্লেখই করিয়াছি। দ্বিতীয় খণ্ডে নাটকগুলির আলোচনা কালে নাটক হইতে যে উদ্ধৃতি দিয়াছি তাহাতে নাটকের নাম বা রবীন্দ্র রচনাবলী সংখ্যা উল্লেখ না করিয়া কেবল পৃষ্ঠা সংখ্যা দিয়াছি।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের নিকট উপস্থাপিত আমার গবেষণা গ্রন্থটির পরিচ্ছেদগুলি একটু অন্যভাবে বিন্যস্ত করিয়া এই গ্রন্থটি প্রকাশ করা হইল— বিভিন্ন বিষয়ে কয়েকজন সমালোচক এবং সাহিত্যিকের মত যুক্ত করিয়া গ্রন্থখানিকে সামান্য পরিবর্দ্ধনও করা হইয়াছে।

শ্রদ্ধেয় ডাঃ সুকুমার সেন মহাশয়ের অধীনে আমি গবেষণা করি। তাঁহারই আন্তরিক উৎসাহে আমি এই কার্যে ব্রতী হইতে পারিয়াছি। নানা কর্মে জড়িত থাকিয়াও তিনি আমাকে প্রেরণা দিয়াছেন। তাঁহাকে আমার আন্তরিক শ্রদ্ধা জানাই। তিনি আমার গবেষণার পরীক্ষকও ছিলেন। অপর দুইজন পরীক্ষকের একজন বর্তমানে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরাজী ভাষা ও সাহিত্যের প্রধান অধ্যাপক ডাঃ অমলেন্দু বসু এবং অন্যজন আমেরিকার বোস্টন বিশ্ববিদ্যালয়ের তুলনামূলক প্রাচ্য ধর্ম ও সাহিত্যের অধ্যাপক ডাঃ অমিয়কুমার চক্রবর্তী। এই গবেষণার জন্য কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় আমাকে ডক্টর অব ফিলজফি উপাধি দেওয়ায় আমি সম্মানিত বোধ করিয়াছি।

গবেষণা গ্রন্থের টাইপের ভ্রম সংশোধন, এই গ্রন্থেব প্রুফ দেখা প্রভৃতি কাজে সাহায্য করিয়া অধ্যাপক পৃথ্বীন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, অধ্যাপক সোমেন্দ্রনাথ বসু, অধ্যাপক শিবপ্রসাদ সিংহ, অধ্যাপক সৌবীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য, শ্রীবাণী দাশগুপ্ত ও শ্রীপুষ্প দত্ত আমার অন্তরিক কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন। গ্রন্থের নির্ঘণ্ট বচনা কবিয়া দিযা বন্ধুবব শ্রীনন্দদুলাল মুখোপাধ্যায় আমাব যথেষ্ট সাহায্য কবিযাছেন। শ্রীজানকীনাথ বসু এই গ্রন্থখানি প্রকাশেব দায়িত্ব গ্রহণ করিয়া আমাকে প্রীতিব বন্ধনে আবদ্ধ করিয়াছেন।

২৭নং দেবী নিবাস রোড
কলিকাতা-২৮

শান্তিকুমার দাশগুপ্ত

পরিভাষা

Allegory	প্রতিরূপক
Censor	মনের প্রহরী
Conscious Mind	সংজ্ঞান
Decadent	অবক্ষয়ী
Impressionism	ইম্‌প্রেসনিজ্‌ম্
Intuition	স্বজ্ঞা
Mystic	মরমী
Repressed	অবদমন
Sign	চিহ্ন
Sublime	সুমহৎ
Sub-conscious	অবচেতন
Symbol	রূপক, প্রতীক
Unconcious	নির্জ্ঞান

সূচী

প্রথম খণ্ড

দ্বিতীয় খণ্ড

তৃতীয় খণ্ড

স্বর্গতঃ পিতা

যোগেশ চন্দ্র দাশগুপ্তের

স্মরণে—

প্রথম খণ্ড

প্রথম পরিচ্ছেদ

প্রতীকবাদ ঃ মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ

(প্রতীক ঃ প্রতিরূপক ঃ চিহ্ন)

টমার্স কার্লাইল (১৭৯৫-১৮৮১) বলিয়াছেন, জ্ঞাতসারেই হউক অথবা অজ্ঞাতসারেই হউক মানুষ প্রতীকের সাহায্য লইয়াই বাঁচিয়া থাকে, কাজ করে এবং তাহার সমস্ত সত্তার অস্তিত্ব রক্ষা করে ঃ যে যুগ প্রতীককে মর্যাদা এবং উচ্চ মূল্য দেয় সেই যুগই শ্রেষ্ঠ (Symons : The Symbolist Movement in Literature, p—1 : Carlyle : Sartor Resartus, ch. on Symbolism).

যে প্রতীক জীবনের সহিত এমন গভীর ভাবে জড়িত সেই প্রতীক কথাটির উৎপত্তি গ্রীক্ 'সিম্‌বোলোন' (অর্থাৎ চিহ্ন) কথাটি হইতে। প্রতীকবাদের বিশেষজ্ঞরা বলেন, প্রাচীন মিশরীয় চিত্রলিপি হইতে প্রতীকের উৎপত্তি হইয়াছে, পরবর্তীকালে ইহুদীরা পৃথিবীর বিভিন্ন অংশে ইহা বিস্তৃত করে।[১]

ভাষা আবিষ্কারের পূর্বেও নিশ্চয়ই মানুষ নিজ মনোভাব প্রকাশ করিত। পশুপক্ষীরাও বিভিন্ন প্রকার শব্দ করিয়া নিজ নিজ মনোভাব প্রকাশ করে। আভাসে ইঙ্গিতে মনের ভাবই প্রকাশিত হয়। মনের বিভিন্ন ভাব শব্দ রূপ প্রতীকের সাহায্যে আত্মপ্রকাশ করে। নানা উপায়েই মনোভাব প্রকাশিত হইতে পারে। মনের ভাব প্রকাশ করাই কথা বলার উদ্দেশ্য। সেই হিসাবে বর্ণগুলিও প্রতীক—সামাজিক জীবরা ইহা প্রত্যহ ব্যবহার করিয়া থাকে। সংখ্যাগুলিও প্রতীক—রসায়ন এবং অঙ্কশাস্ত্রে উহাদের প্রয়োগ হয়। ভাষা আবিষ্কারের ফলেই মানুষ ভাবকে স্পষ্ট করিয়া তুলিবার অবকাশ পাইল। ভাষা মূলতঃ এবং প্রধানতঃ চিহ্ন এবং প্রতীক। উহার সাহায্যে মানুষ আপন কামনা-বাসনা, ভাব-কল্পনা ও আবেগ প্রকাশ করিয়া থাকে। চিন্তার চিহ্ন অথবা প্রতীক ব্যতিরেকে ভাষার নিজস্ব কোন মূল্যই নাই। বাক্যদ্বারা মনের পূর্ণ ভাবেরই সঙ্কেত করি। কিন্তু মনের কোন্ ভাবকে

১। The Encyclopedia Americana : Vol. 26 : under Symbolism : p-159.

আমরা কোন্ কথার দ্বারা প্রকাশ করিব তাহা পূর্বেই নির্ধারিত থাকে বলিয়া বাক্যের দ্বারা যে সঙ্কেত করি তাহা অত্যন্ত স্পষ্ট। সঙ্কেত স্পষ্ট হইলে আর তাহা প্রতীক বলিয়া গ্রাহ্য হইতে পারে না। সেইগুলিকে তখন চিহ্ন বলিয়া চিহ্নিত করাই সঙ্গত। সুশান ল্যাংগার বলিয়াছেন—"The logical relation between a sign and its object is a very simple one: they are associated, somehow, to form a *pair*; that is to say, they stand in a one-to-one correlation. To each sign there corresponds one definite item which is its object, the thing (or event, or condition) signified." [Susanne Langer: Philosophy in a New Key: p 58]. প্রতীকের ভাব স্পষ্ট হইয়াও স্পষ্ট হইবে না—ইহাতে একটা আলো-আঁধারী ভাব থাকা চাই। প্রতীকে গোপনতা এবং প্রকাশের সমন্বয় হয়। ক্যাজিরার বলিয়াছেন, "Symbols—in the proper sense of this term—cannot be reduced to mere signals. Signals and symbols belong to two different universes of discourse; a signal is a part of the physical world of being; a symbol is a part of the human world of meaning Signals are "operators"; symbols are "designators." [Cassirer: An Essay on Man: p-32]. ল্যাংগারও মনে করেন, "The fundamental difference between signs and symbols is this difference of association, and consequently of their *use* by the third party to the meaning function, the subject; signs *announce* their object to him, whereas symbols *lead him to conceive* their objects." [Langer: Philosophy in a New Key: p-58].

ল্যাংগার প্রধানত দুই প্রকার চিহ্নের কথা বলিয়াছেন—(১) প্রাকৃতিক: প্রাকৃতিক যে বিষয়গুলি অঙ্গাঙ্গীভাবে যুক্ত তাহাদের প্রাকৃতিক চিহ্ন বলা যাইতে পারে; ভিজা রাস্তাকে বৃষ্টির, ধোঁয়াকে অগ্নির চিহ্ন বলিয়া থাকি—"A natural sign is a part of a greater event, or of a complex condition, and to an experienced observer it signifies the rest of that situation of which it is a notable feature" (তদেব: পৃ-৫৮)। (২) কৃত্রিম বা মানুষের সৃষ্ট, কাজের সুবিধার জন্য গঠিত—"...just as

in nature certain events are correlated, so that the less important may also *produce* arbitrary events purposely correlated with important ones that are to be their meanings." (তদেব)

চিহ্ন কোন একটি নির্দিষ্ট 'কিছু'র দিকেই আমাদের দৃষ্টি নিবদ্ধ করায়। কথাগুলি নির্দিষ্ট অর্থেরই দ্যোতনা করে সুতরাং উহারা সেই বিশেষ অর্থের চিহ্ন মাত্র। কোন পরিচিত জিনিসকে বোঝান বা সংক্ষিপ্ত করণকে চিহ্ন বলে। গণিতে এইরূপ চিহ্নের প্রচুর প্রযোগ আছে। চিহ্নটি যাহাকে বোঝায় তাহার সহিত অঙ্গাঙ্গীভাবে যুক্ত হইয়া থাকে—চিহ্নটি দেখিলে সেই উদ্দিষ্ট বিষয়টি ব্যতীত অন্য কোন কিছু মনে জাগে না। এইরূপ ঘনিষ্ঠ যোগ থাকিলে একটিকে অপরটির চিহ্নরূপে ব্যবহার করা যাইতে পারে। কার্য-কারণ সম্বন্ধে যুক্ত প্রাকৃতিক বিষয়গুলিকে চিহ্নরূপে অভিহিত করা যায়। মেঘকে বৃষ্টির চিহ্নরূপে প্রযোগ করা চলে, কারণ মেঘ হইতে কেবলমাত্র বৃষ্টিপাতেরই সম্ভাবনা আছে। কিন্তু ওই মেঘই আবার ভয়ঙ্করতা বা বিষাদের প্রতীক। মেঘের সহিত ভয়ঙ্করতা অথবা অন্ধকারময় বিষাদের যোগ স্থাপন করা যায়—বিভিন্ন অবস্থায় মেঘের প্রতীক বিচিত্র তাৎপর্য মণ্ডিত হইয়া ওঠে। মেঘ প্রতীকরূপে একটি মাত্র অর্থ দ্যোতনা করে না বলিয়াই অনেকখানি অস্পষ্ট। যোগাযোগটি স্পষ্ট হইলে বলিব চিহ্ন, অস্পষ্ট থাকিয়া গেলে বলে প্রতীক। রাজমুকুট বা রাজদণ্ড রাজার চিহ্ন কিন্তু উহারাই আবার রাজশক্তির, মর্যাদার প্রতীক। মৃতদেহের কবরের উপর যে স্তম্ভ স্থাপন করা হয় তাহা মৃতদেহের অস্তিত্বের চিহ্ন হইলেও স্মৃতি ও প্রীতির প্রতীক। নারীর সিঁথির সিন্দুর বিবাহের চিহ্ন, কিন্তু উহাই আবার সতীত্ব, পবিত্রতা, নারীত্বের মহিমার প্রতীক। শ্বেত বস্ত্র পরিচ্ছন্নতার চিহ্ন হইতে পারে কিন্তু তাহা পবিত্রতার প্রতীক। সুতরাং প্রতীক এবং চিহ্ন এক নহে। আমাদের জ্ঞানের অতীত কোন কিছুকে ইঙ্গিত করিবার জন্যই বিশেষ করিয়া প্রতীকের প্রয়োগ হয়। সমস্ত প্রতীকই একদিক দিয়া চিহ্ন, কারণ প্রতীকে অস্পষ্টতা থাকিলেও তাহা কোন কিছুকে উদ্দেশ করে। কিন্তু চিহ্ন মাত্রেই প্রতীক নহে, কারণ চিহ্ন অত্যন্ত স্পষ্ট—প্রতীকের দুর্জ্ঞেয়তা তাহাতে নাই। এই উভয়ের মূল পার্থক্য ওই স্পষ্টতা এবং অস্পষ্টতায়। কি বলা হইল তাহা বুঝিয়াও যেন বোঝা গেল না—প্রতীকে এইরূপটি হওয়া চাই। পুনরায় ক্যাজিরারের কথা স্মরণ করা যাইতে পারে,

"A symbol is not only universal but extremely variable. I can express the same meaning in various languages; and even within the limits of a single language a certain thought or idea may be expressed in quite different terms. A sign or signal is related to the thing to which it refers in a fixed and unique way. Any one concrete and individual sign refers to a certain individual thing......A genuine human symbol is characterized not by its uniformity but by its versatility. It is not rigid or inflexible but mobile." [An Essay on Man : p-36].

বাক্যও একদিন হয়তো আধা স্পষ্টরূপে অর্থাৎ প্রতীকরূপেই ব্যবহৃত হইত। যুগযুগের ব্যবহারের ফলে উহাদের অর্থ ক্রমেই স্পষ্ট হইয়া ওঠায় উহারা চিহ্নে পরিণত হইয়াছে। মানুষের ভাব-কল্পনা কখনও সীমার মধ্যে বিধৃত হইবার নয়। অসীমের রহস্য তাহার মনের মধ্যে বাসা বাঁধিয়াছে। তাই তাহার ব্যবহৃত প্রতীক যখন স্পষ্ট হইয়া ওঠে তখন সে পুরাতন প্রতীককে হয় নূতন অর্থের দ্যোতক করিয়া তুলিতে চায় অথবা নব নব প্রতীকের সন্ধান করে। বাক্যহারা বলিয়া মূকেরা হাত মুখ নাড়িয়া মনের ভাব প্রকাশের একটা অদম্য চেষ্টা করে। মনে ভাব জাগ্রত হইলে তাহাকে রোধ করা যায় না। সোপেনহাওয়ার (১৭৮৮-১৮৬০) বলিয়াছেন যে, মনে যথার্থ ভাব উপস্থিত হইলে তাহা প্রকাশ লাভের জন্য আকুল হইয়া উঠিবেই।[২] মূকেদের মনের ভাবও সেইজন্য নানা সঙ্কেতের রূপে আত্মপ্রকাশ করে। এই সঙ্কেতগুলি সকলের নিকট স্পষ্ট নয়, অথচ সেইগুলি বুঝিবার জন্যও মানুষের চেষ্টার ত্রুটি নাই। সূক্ষ্মদৃষ্টিসম্পন্ন মানুষ দেখিয়াছে যে বিশেষ বিশেষ অঙ্গভঙ্গী দ্বারা তাহারা বিশেষ বিশেষ মনোভাব প্রকাশের চেষ্টা করে—অঙ্গভঙ্গী তাহাদের মনোভাবের চিহ্ন ব্যতীত আর কিছুই নয়। তাই যেমন চলিয়াছে একদিকে নব নব সঙ্কেত সৃষ্টি তেমনি অপরদিকে চলিয়াছে এই সঙ্কেতকে স্পষ্ট করিয়া তুলিবার চেষ্টা। পতাকা আন্দোলিত করিয়া নাবিকেরা কি জানায়? রেলপথের লাল-নীল আলোতেই বা কি কথা? কণ্ঠস্বরের বিভিন্নতায় একই কথা কত প্রকার

২। Schopenhauer: The Art of Literature: Under the chapter on style.

অর্থই না প্রকাশ করে! মানুষের প্রচেষ্টায় সঙ্কেত সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্মতর হইয়া উঠিতেছে—সম্পূর্ণ নবকলেবরও ধারণ করিতেছে। প্রতীকের অর্থ সেইজন্যই অনেক সময় পরিবর্তিত হয়। তবে ইহা সত্য যে প্রতীক যাহারই সঙ্কেত করুক না কেন তাহার সহিত একেবারে সম্পর্ক রহিত হইতে পারে না। নূতন স্রষ্টা সেই দিকটির সন্ধান করেন যাহা পূর্বে কেহ লক্ষ্য করে নাই। বৃষ্টিপাতের মধ্যে একটা বিরক্তি, একঘেঁয়েমি বা শোকের ভাব আছে। কিন্তু ইহার মধ্যে নৃত্যরতা চঞ্চলা বালিকার উদ্দামতার সন্ধানও পাওয়া যায়। বৃষ্টি বিরক্তিও আনিতে পারে আবার উন্মাদনা বা আবেগের সঞ্চারও করিতে পারে। লেখকের নিজস্ব রুচি এবং মনোভাবের উপর তাহা নির্ভর করে। সুতরাং লেখকের উপরই নির্ভর করে বৃষ্টি কিসের প্রতীক রূপে প্রযুক্ত হইবে। মননশীল লেখক নূতনের সন্ধানী বলিয়াই একই প্রতীককে বিভিন্ন ভাবের দ্যোতক রূপে প্রয়োগ করেন। ভীলে-গ্রীফীন-এর (Viele'-Griffin : ১৮৬৪-১৯৩৭) সাহিত্যেই সর্বপ্রথম বৃষ্টি আবেগ এবং উন্মাদনার প্রতীক রূপে প্রযুক্ত হয়।[৩] তাঁহার পূর্বে বোদলেয়ার (Baudelaire : ১৮২১-১৮৬৭), পল ভেরলেইন (Paul Verlaine : ১৮৪৪-১৮৯৬), ও জুল্‌স্ লাফর্গ (Jules Laforgue ১৮৬০-১৮৮৭) এবং তাঁহাদের ভাবশিষ্যরা কেহই বৃষ্টিকে এইরূপ ভাবকল্পনার প্রতীকরূপে প্রয়োগ করেন নাই।[৪] সুতরাং প্রতীকের ইঙ্গিত বুঝিতে হইলে কেবল জ্ঞানের পরিধি বৃদ্ধি করিলেই চলে না, গতানুগতিকতা অতিক্রম করিয়া সংস্কার মুক্ত দৃষ্টি লইয়া সজাগ হইয়াই থাকিতে হয়।

৩। J'ai pris de la pluie dans mes mains tendues
—De la pluie chande comme des larmes—
Je l'ai bue comme un philtre, de'fendu
A cause d'un charme ;
Afin que mon âme en tou âme dorme
(Francis Viele'-Griffin : Poems et poe'sies ; p—177).

অনুবাদ— I have taken some rain drops in my outstretched hands
—Rain drops warm like drops of tears
I have drunk them like a love-potion, protected
On account of a charm ;
So that my soul in your soul may sleep.

Kenneth Cornell : The Symbolist Movement : p-85,

প্রতীকধর্মিতা আজ সাহিত্যে এক বিশেষ স্থান অধিকার করিয়াছে। কেবল এক বিশেষ প্রকার রীতি সৃষ্টি করিয়া কাব্য কলা প্রদর্শনই ইহার উদ্দেশ্য নয়। সাহিত্যিকরা নানাভাবে সঙ্কেত করেন। পাঠক যেমন চাহেন যে লেখক সুন্দর করিয়া লিখিবেন, লেখকরাও সেইরূপ আশা করেন যে পাঠক যত্নের সঙ্গে পড়িয়া ভাবের গভীরতায় অবগাহন করিবেন। সেই কারণে ইহা সুস্পষ্ট রূপেই প্রতীয়মান হইতেছে যে বর্তমানের অনেক লেখকই অল্প দুই চারিটা কথায় অনেক কিছু ইঙ্গিত করিবার চেষ্টা করিতেছেন। দুই চারিটা তুলির টানে রূপদক্ষ যে চিত্রটি ফুটাইয়া তোলেন তাহাতে সেই রং-এর খেলাকে অতিক্রম করিয়াও কতনা ভাব ব্যঞ্জিত হইয়া ওঠে! যে কথা বলা হইল সেই কথা গেল কোথায় হারাইয়া, তাহার মধ্যে ফুটিয়া উঠিল কত শত সহস্র কথা। সাহিত্যে প্রযুক্ত এই ব্যঞ্জনার ন্যায় প্রতীকও নানা ভাব প্রকাশ করে—অস্পষ্ট ভাব-ব্যঞ্জনার জন্য প্রতীকের প্রয়োগ হয়। সাহিত্যের ব্যঞ্জনা চিত্রকে এক বিশেষ ভাব মণ্ডিত করিয়া তোলে—প্রতীক কল্পনাকে অসীমের দিকে ঠেলিয়া দেয়, মন সেই অবস্থায় কোন কিছুকে স্পর্শ করিবার চেষ্টা করে। স্পর্শ লাভ করিবার চেষ্টায় সম্পূর্ণ সাফল্য লাভ না করিলেও মন কিন্তু হতাশায় নিমজ্জিত হয় না। এইরূপ রচনায় দুই প্রকার অর্থের সন্ধান পাওয়া যায়: একটি বাহিরের অর্থাৎ আপাতদৃষ্টিতে যে অর্থ ধরা পড়ে; অপরটি গভীর তাৎপর্যপূর্ণ যাহা বুঝিয়াও যথার্থ বোধগম্য হয় না।

মনোভাব প্রকাশের জন্য প্রতীকের প্রয়োগকে প্রতীকবাদ বলে। ইহাতে মানুষটির অন্তরের দ্বন্দ্ব পরিস্ফুট হয়। কোথাও বা তিনি ইচ্ছা করিয়াই মনোভাব লুকাইয়া রাখিতে চাহেন; কোথাও বা তিনি যাহাকে রূপদান করিতে চাহেন তাহাকে নিজেই বুঝিয়া উঠিতে পারেন না। লেখকের সমস্ত কথাই সাঙ্কেতিকতার অন্তরালে এমন করিয়া আত্মগোপন করে যাহাতে তাঁহার সমস্ত বক্তব্যই না-বলা কথায় পর্যবসিত হইয়া যায়। কেবল যে পাঠকের পক্ষেই কবির সঙ্কেতটি বুঝিয়া লওয়া দুঃসাধ্য হইয়া ওঠে তাহাই নয়, অনেক সময় কবি নিজেও তাহার রহস্য সন্ধান করিতে পারেন না। কবি হয়ত কোন এক মহান আদর্শপূর্ণ জগৎ কল্পনা করিয়াছেন, হয়ত কোন এক পরম শক্তিমান ঈশ্বরের অস্তিত্বে তিনি বিশ্বাসী—কিন্তু এই আদর্শ জগৎ অথবা ঈশ্বরকে তিনি সম্পূর্ণরূপে উপলব্ধি করিতে পারেন নাই। অথচ ইহাই

তাঁহার অন্তর্জগৎ আলোড়িত করিয়া প্রকাশ হইতে চাহে। এইরূপ ভাব কল্পনার প্রকাশ কখনও স্পষ্ট হইয়া উঠিতে পারে না। অপরদিকে যাহা তিনি স্বেচ্ছায় গোপন করিতে চাহেন তাহাও স্পষ্ট হইবার নহে। এই উভয়ই আলো-আঁধারের অন্তরালে পড়িয়া রহস্যময় হইয়া উঠিতে বাধ্য। বেনদেতো ক্রোচে (১৮৬৬-১৯) অবশ্য বলেন যে, ভাবটি যেমন ভাবে মনের মধ্যে রূপ পায় সেইরূপেই প্রকাশিত হয়। ধোঁয়াটে ভাবই অস্পষ্ট-রূপে প্রকাশ পায়। সুতরাং তাঁহার মতে প্রতীকধর্মিতা লেখকের অক্ষমতার পরিচায়ক। কবির ভাব—কল্পনার সঙ্গে তাঁহার প্রকাশের কোন পার্থক্য করা সম্ভব নয়। ভাবকল্পনা যত সূক্ষ্ম হইবে তাহার প্রকাশও তত সূক্ষ্ম হইবে। তখনই তিনি রহস্যময় হইয়া ওঠেন যখন তাঁহার ভাবনা সঙ্গতি হারাইয়া ফেলে।[৫] কিন্তু এই কথা কোন প্রকারেই স্বীকার করা যায় না যে প্রতীকের সৃষ্টি হয় লেখকের অক্ষমতার জন্য। যাহা নিজেই অস্পষ্ট, যাহাকে ধরিয়াও ধরা যায় না তাহাকে কি কখনও স্পষ্ট করিয়া তোলা সম্ভব? ইবসেনও (Ibsen, H ১৮২৮-১৯০৬) তাই বলিযাছেন, আমি কি বলিয়াছি তাহা যদি কেহ আমাকে বলিয়া দিত![৬] রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরও বলিয়াছেন :

একী কৌতুক নিত্য-নূতন
ওগো কৌতুকময়ী
আমি যাহা কিছু চাহি বলিবারে
বলিতে দিতেছ কই।
অন্তর মাঝে বসি অহরহ
মুখ হতে তুমি ভাষা কেড়ে লহ,
মোর কথা লয়ে তুমি কথা কহ
মিশায়ে আপন সুরে। (চিত্রা : অন্তর্যামী)

এবং, সে মায়ামুরতি কী কহিছে বাণী।
কোথাকার ভাব কোথা নিলে টানি,
আমি চেয়ে আছি বিস্ময় মানি
রহস্যে নিমগন। (তদেব)

৫। Benedetto Croce : Aesthetic.

৬। D. C. Stuart : The Development of Dramatic Art : Ch on Symbolism : Expressionism.

সাহিত্যে সমস্ত কথা বলিয়া দেওয়াও চলে না, একটা আবরণ টানিতেই হয়। শিল্প আবরণের অন্তরালে একজোড়া সুন্দর চক্ষু। প্রতীকও সেইরূপ একপ্রকার আবরণ। প্রতীকের সাহায্যে অনেক শিল্পীই আত্মগোপন করিয়া সঙ্কেত করিয়াছেন। মানুষের ভাবকল্পনা যতই সূক্ষ্ম হইয়া উঠিতেছে ততই সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্মতর ইঙ্গিত সাহিত্যিক রীতি বলিয়া গৃহীত হইতেছে। কবির ইঙ্গিত কখনই সম্পূর্ণরূপে বোধগম্য হইতে পারে না। হয়ত সেই ইঙ্গিত বিভিন্ন ব্যক্তি বিভিন্নরূপে বোঝে, এমন কি একই ব্যক্তি বিভিন্ন সময়ে তাহার বিভিন্ন প্রকার অর্থও করিতে পারে। রবীন্দ্রনাথের কথায়—

যে কথা ভাবিনি বলি সেই কথা
যে ব্যথা বুঝিনা জাগে সেই ব্যথা,
জানিনা এসেছি কাহার বারতা
কারে শুনাবার তরে।
কে কেমন বোঝে অর্থ তাহার,
কেহ এক বলে কেহ বলে আর,
আমারে শুধায় বৃথা বার বার—
দেখে তুমি হাস বুঝি। (তদেব)

গূঢ় কিছুর প্রকাশ হয় প্রতীকের মাধ্যমে। নিজেকে অতিক্রম করিয়া কোন উচ্চতর, মহিমাপূর্ণ 'কিছু'কে ইঙ্গিত করাই প্রধানতঃ প্রতীকের কাজ। এই 'কিছু'টা প্রকৃতির কোন বিশেষ বিষয় বা চিত্রও হইতে পারে। সর্বপ্রকার প্রতীকেই প্রতীকটি এবং যাহাকে উহা সঙ্কেত করে এই দুইয়ের মধ্যে একটা বিশেষ যোগ থাকে। এই যোগ বৈজ্ঞানিক, ধর্মীয় এবং নৈতিক ক্ষেত্রে বিভিন্ন ধরণের হইতে পারে—কিন্তু সম্পর্কহীন হইলে আর প্রতীক থাকে না। শিল্পের এবং বিজ্ঞানের প্রতীকের মধ্যে পার্থক্য এই যে বিজ্ঞানের প্রতীক তাহার উদ্দিষ্ট বিষয়টির সহিত বাহিরের সম্পর্কে আবদ্ধ (এই অবস্থায় প্রতীক চিহ্ন হইয়া উঠে) আর শিল্পে প্রতীক যাহাকে সঙ্কেত করে তাহার সহিত অন্তরের যোগে যুক্ত।

শিল্পে প্রতীকের প্রয়োগের ন্যায় প্রতিরূপকের প্রয়োগও আছে। প্রতিরূপকের সাহায্যে প্রধানতঃ শিক্ষা দেওয়াই হয়। জনসাধারণের শিক্ষা ও মনোরঞ্জনের জন্য পুরাণ রচিত হইয়াছিল। সেই জন্য পুরাণে প্রতিরূপকের বাহুল্য দেখা যায়। পুরাকালে রাজ্যকে দেহের সহিত তুলনা করা হইত।

রাজসৈন্য রাজার বাহু, প্রজাগণকে বলা হইত রাজার উরু, কারণ তাহাদের সাহায্যেই রাজ্য প্রতিষ্ঠিত থাকিত। এইখানে উরু, দেহ প্রভৃতি প্রতিরূপক মাত্র। সিঁথির সিন্দুরের সহিত বিবাহের যেরূপ যোগ দেহের সহিত রাজ্যের সেইরূপ অঙ্গাঙ্গী যোগ নাই। আবার দেহের সহিত রাজ্যের সম্পর্কে কোন অস্পষ্টতা বা আলো-আঁধারী ভাবের সৃষ্টিও হয় না। প্রতিরূপক ও প্রতীকের পার্থক্য নির্ণয় করিতে গিয়া কোলরিজ বলিয়াছেন—

"......an allegory is but a translation of abstract notions into a picture-language, which is itself nothing but an abstraction from objects of the senses; ··· On the other hand a symbol is characterized by a transluence of the special in the individual, or of the general in the special, or of the universal in the general. Above all by the transluence of the eternal through and in the temporal. It always partakes of the reality which it renders intelligible; and while it enunciates the whole, abides itself as a living part in that unity, of which it is the representativo." [Coleridge's Work : Biographia Literaria : Lay Sermons : p – 322]

মনস্তত্ত্ববিদ ডাঃ ইয়ুং (Dr. C. G. Jung) বলিয়াছেন, যে-ধারণাটা অপেক্ষাকৃত অজানা, যাহাকে স্পষ্ট করিয়া প্রকাশ করা সম্ভব নয় তাহাই প্রতীকধর্মী হইয়া ওঠে। পরিচিত বিষয়কে যখন স্বেচ্ছায় ছদ্মবেশ দেওয়া হয় তখন তাহাকে প্রতিরূপক[৭] বলে। প্রতিরূপক বুদ্ধির দ্বারা সৃষ্ট, উহার সাহায্যে একটি সত্যকে ব্যাখ্যা করা হয় : প্রতীক কিন্তু ব্যাখ্যা করে না, ধরিয়াও ধরা যায় না এমন কিছুকে সঙ্কেত করে। প্রতিরূপক গতিহীন, ইহার যোগ বুদ্ধির সহিত—প্রতীক গতিশীল, ইহার যোগ আবেগের সহিত। প্রথমটিকে বুদ্ধির দ্বারা বুঝি, দ্বিতীয়টিকে আমাদের সমগ্র সত্তা দ্বারা উপলব্ধি করি। সত্যের ধারণাকে প্রতিরূপক অনেক সময়েই সঙ্কীর্ণ করিয়া আনে—প্রতীক তাহাকে ব্যাপকতর এবং গভীরতর করে।

৭। Complete works of C. G. Jung: Vol. 5: Symbols of Transformation.

প্রতিরূপক ব্যাখ্যা করে বলিয়া ইহার মধ্যে কোন দুর্বোধ্যতা থাকে না। বাহিরের অর্থের অন্তরালে আর একটি অর্থ সংগুপ্ত থাকে। এই গুপ্ত অর্থকে প্রকাশের উদ্দেশ্যেই প্রতিরূপকের সৃষ্টি। ইহা সম্পূর্ণ সচেতন মনের অভিব্যক্তি। প্রতীকে সচেতন মনের কাজ একেবারেই নাই তাহা নহে কিন্তু ইহাতে অবচেতন মনের লীলাও চলে: ইহার প্রাণবস্তু সহজ স্বতস্ফূর্ত অনুভূতি। যুক্তিকে এড়াইয়া মনের মণিকোঠায় লুক্কায়িত বিশ্বাসের দিকেই ইহা ঝুঁকিয়া থাকে। প্রতিরূপকের বাহিরের অর্থের মতই অতি সহজে অভ্যন্তরীণ অর্থ আবিষ্কার করা যায়—যেন দুইটি অর্থ সমান্তরালে রহিয়া গিয়াছে। প্রতীক ধর্মী রচনাকে এইরূপে বুঝিয়া লওয়া একেবারেই অসম্ভব। এমন কোন চাবি নাই যাহার সাহায্যে প্রতীকরূপী দ্বার উন্মুক্ত করিয়া কক্ষের অভ্যন্তর ভাগ স্পষ্ট করিয়া দেখা সম্ভব। এমন কি ঘটনাগুলিকে একসূত্রে গ্রথিত করিয়া তাহাদের তাৎপর্য বুঝিয়া ওঠাও সহজসাধ্য নহে। নিজেদের সৃষ্ট প্রতীকের সঙ্কেত কবিরা নিজেরাও অনেক সময় বুঝিয়া উঠিতে পারেন না। ইবসেনের বক্তব্য পূর্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে। রবীন্দ্রনাথ নিজেও অনেক স্থলে নিজের ব্যবহৃত প্রতীকের ব্যাখ্যা করিবার চেষ্টা করিয়াছেন কিন্তু তাহার ফলে জটিলতা কমিয়াছে বলিয়া মনে হয় না।

গিরীন্দ্রশেখর বসু দৃষ্টান্ত দ্বারা প্রতিরূপক[৮] এবং প্রতীকের পার্থক্য বুঝাইয়াছেন। তাঁহার মতে, দেহতত্ত্বের গানে যখন আত্মাকে পাখি বা দেহকে পিঞ্জর বলিয়া বর্ণনা করা হয়, তখন তাহা প্রতিরূপক মাত্র। এই প্রতিরূপকের অর্থ আমাদের নিকট অজ্ঞাত নহে। যদি কেহ সাপের উপাসনা করেন, অথচ কেন যে সাপকে দেবতা ভাবিতেছেন, তাহা যদি তাঁহার জানা না থাকে, তবেই সাপকে প্রতীক বলা চলে। অবশ্য সকল প্রতীকেরই আমরা একটা মনগড়া ব্যাখ্যা করিয়া থাকি।[৯]

মনস্তত্ত্ববিদেরা মানুষের মনকে বিশ্লেষণ করিয়া দেখাইয়াছেন যে মানুষ কেবল চেতন-মন সর্বস্ব নয়, তাহাদের মনের একটা বড় অংশই অবচেতন। এই অবচেতন মনের প্রকাশ প্রতীক ধর্মী। কোলরিজ মনে করেন—

৮। শ্রীযুক্ত বসু প্রতিরূপক কথাটি ব্যবহার করেন নাই। তিনি Allegory অর্থে রূপক বলিয়াছেন। রূপক কথাটিই Allegory অর্থে সাধারণতঃ প্রযুক্ত হয়।

৯ গিরীন্দ্রশেখর বসু: স্বপ্ন: অনুচ্ছেদ—১২১।

"......the latter (allegory cannot be other than spoken conscicusly ;—whereas in the former (symbol) it is very possible that the general truth represented may be working unconsciously in the writer's mind during the construction of the symbol ;" [Coleridge's Work : Miscellaneous : Theory of Life : p—107]

ডাঃ ইয়ুং মনে করেন অবচেতন মনের স্বাভাবিক প্রকাশই হয় প্রতীকের সাহায্যে। সর্বকালে সকল কিছুই রূপ অথবা প্রতীকের সাহায্যেই উপলব্ধি করা হয়। তিনি বলেন, প্রতীক কেবল কোন কিছুর পরিবর্তে বসে তাহাই নয়—ইহার এক গভীর তাৎপর্য থাকে। তিনি দেখাইয়াছেন যে প্রতীকের সৃষ্টিতত্ত্ব খুবই জটিল - চেতন ও অবচেতন মনের সহযোগিতায় ইহা রূপ পরিগ্রহ করে।[১০] এই দ্বৈত সত্তা সমস্ত প্রতীকের মধ্যেই বিদ্যমান—ইহাতে অবচেতন মনের ছাপ থাকে তাই অর্থ অস্পষ্ট বলিয়া মনে হয় : সেই সঙ্গে চেতন মনেরও যোগ থাকে বলিয়া যাহাকে ইহা সঙ্কেত করে তাহার সহিত প্রতীকের একটা গূঢ় যোগের সন্ধানও পাওয়া যায়। এই অবচেতন অংশটাই সর্বপ্রকার প্রতীক সৃষ্টির প্রাথমিক কাজ করে। সুতরাং প্রতীকের দুইটি দিক আছে—একটি স্পষ্ট অর্থাৎ চেতন মনকে ভিত্তি করিয়া, অপরটি অস্পষ্ট অর্থাৎ অবচেতন মনকে ভিত্তি করিয়া।

ডাঃ ফ্রয়েডের (Dr. Sigmund Freud : ১৮৫৬-১৯৩৯) মতে মানুষের কার্য এবং সর্বপ্রকার ভাব প্রকাশই তাহার অবদমিত আকাঙ্ক্ষার প্রতীক ব্যতীত আর কিছুই নয়। অবদমিত আকাঙ্ক্ষা ছদ্মবেশ ধারণ করিয়া অর্থাৎ প্রতীকের মাধ্যমে প্রকাশ পাইয়া চরিতার্থ হয়। তাঁহার মতে প্রতীক কোন অনির্দিষ্ট আদর্শকে প্রকাশ করে না, ইহা এক নির্দিষ্ট

১০। Symbolism : A psychological study : By Dr. Padma Agrawal, M.A., Ph. D. Benaras Hindu University : Introduction : ch on Symbolism in Dream and Symbolism in Art

Psychology of the Unconscious : C. G. Jung.

The collected works of C. G. Jung ; Vol. 5 (Symbols of Transformation.)

আকাঙ্ক্ষাকেই সঙ্কেত করে। তিনি মনে করেন, সর্বপ্রকার শিল্প, চিত্র, ভাস্কর্য, সাহিত্য অবদমিত আকাঙ্ক্ষারই সুমহৎ রূপ [১১]। যদিও একথা অস্বীকার করা চলে না যে অবদমিত প্রেম সাহিত্যে প্রেমের চিত্র অঙ্কনে প্রেরণা দেয় তথাপি ইহাও স্বীকার করার কোন কারণ নাই যে অবদমিত যৌন আকাঙ্ক্ষাই প্রতীকের মাধ্যমে সাহিত্যে আত্মপ্রকাশ করে। ভিতরের আবেগ নানা ভাবেই আত্মপ্রকাশ করিতে পারে। ব্যক্তির মনের গড়নের উপরই তাঁহার প্রকাশভঙ্গী নির্ভর করে। যিনি একান্তভাবে বাস্তববাদী তাঁহার রচনায় প্রতীকের স্থান বড় একটা থাকে না। আবার যাঁহার মন সুদূরের বাঁশরীর ধ্বনিতে ঝঙ্কৃত হয় তাঁহার প্রকাশে সঙ্কেত একটা বড় স্থান জুড়িয়া বসে।

সিলবেরার (Silberer) অবচেতন মনে প্রতীকের জন্ম বলিয়া মনে করেন না। অবচেতন মনের দ্বন্দ্ব প্রতীক রূপে প্রকাশিত হয় বলিয়া তিনি স্বীকার করেন না। তাঁহার মতে স্পষ্ট করিয়া কোন কিছু উপলব্ধি করিতে না পারার ফলেই প্রতীকের প্রযোগ হয়। পুরাতন ভাব-কল্পনার সহিত নূতন অনুভূতির পার্থক্য বুঝিবার অক্ষমতার জন্যই স্পষ্ট করিয়া উপলব্ধি করা সম্ভব নয়।[১২] ক্রোচের বক্তব্যের সহিত এই অভিমতের অনেকটা সাদৃশ্য আছে। আরনেস্ট জোন্‌স-এর (Ernest Jones) বক্তব্যটি এই খানে প্রণিধানযোগ্য। প্রতীক সৃষ্টির জন্য তিনি চেতন মনের উপরও জোর দিয়াছেন। চেতন মনই পরিবর্তিত করিয়া প্রকাশের শক্তি রাখে। অবচেতন মনের আকাঙ্ক্ষাগুলিকে চেতন মন যে রূপান্তর ঘটাইতে পারে তাহার প্রমাণ পুরাণ, শিল্প, ধর্ম প্রভৃতি। প্রতীক সৃষ্টিতে চেতন মনের শক্তি সীমাহীন বলিয়া অবশ্য তিনি মনে করেন না—

"The individual has not an unlimited range of choice in the creation of a given symbol, but on the contrary a very restricted one, more important determining factors being those that are common to large classes of men or more often to mankind as a whole...while the individual can not choose what idea shall be

১১। Sigmund Freud : Interpretation of Dreams.

১২। Agrawal : Symbolism : p-33

represented by a given symbol, he can choose what symbol out of the many possible ones shall be used to represent a given idea ; more than this, he can sometimes, for individual reasons, represent a given idea by a symbol that no one else has used as a symbol. (Papers on Psychoanalysis : p-98). মন অনেক সময়েই স্বেচ্ছায় প্রতীকের ব্যবহার করে, সন্দেহ নাই। শিল্প-সাহিত্যে এইরূপ সচেতন ভাবে ব্যবহৃত প্রতীকের সন্ধানও পাওয়া যায়। কিন্তু মনে রাখিতে হইবে যে সচেতন ভাবে প্রযোগ করার অর্থই নির্দিষ্ট করিয়া ফেলা নয়। তাহার মধ্যেও অনির্বচনীয়তা থাকিতে পারে। যেখানে সেই অনির্বচনীয়তা না থাকে সেখানে উহা অনেকটাই প্রতিরূপক ধর্মী হইয়া ওঠে। কিন্তু এমন অনেক গভীর তাৎপর্যপূর্ণ প্রতীক আছে যেগুলিকে সচেতন ভাবে সৃষ্টি করা সম্ভবই নয়। সত্যকার প্রতীক স্বজ্ঞা দ্বারা উপলব্ধ সত্যেরই প্রকাশ। ইহা অধিকতর ভালো ভাবে বোধগম্য হয় না, অন্য কোনরূপে প্রকাশ করাও যায না।

প্রতীক ধর্মী প্রকাশের অর্থ-ই সৃষ্টি করা এবং রূপ দেওয়া। যাহা অন্তরের গভীরতায় সংগুপ্ত, যাহা অজানা তাহাকে প্রতীকের মাধ্যমে সঙ্কেত করা ব্যতীত অন্য উপায় নাই। কিন্তু ইহা বড়ই বিস্ময়কর যে মন সৃষ্টি করিবার এবং রূপ দিবার ক্ষমতা রাখিলেও প্রতীককে কোন নির্দিষ্ট অর্থ দিতে পারে না। একই প্রতীক বিভিন্ন ব্যক্তির নিকট অথবা বিভিন্ন সময়ে একই ব্যক্তির নিকট বিভিন্ন অর্থের সঙ্কেত করিতে পারে। হয়ত বা একই সময়ে একই ব্যক্তির নিকট বিভিন্ন ভাব একই প্রতীকের ভিতর আভাসিত হইতে পারে। ইহাও সত্য যে নির্দিষ্ট অর্থলাভ করিলে উহাকে আর প্রতীক বলাও চলিত না। কোন্ প্রতীক কোন্ ধরণের অর্থ আভাসিত করিতে চাহে তাহা বুঝিতে হইলে লেখকের অন্তরের গভীরে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে হইবে। মানুষ হিসাবে অনেক বিষয়ে আমাদের ঐক্য থাকিলেও ভাব-কল্পনার ক্ষেত্রে এবং তাহার প্রকাশ ভঙ্গীতে প্রচুর তারতম্য থাকাই স্বাভাবিক। তাই প্রতীক কখনও নিষ্ক্রিয থাকিয়া একই রূপ ভাবের ইঙ্গিত করে না—ব্যক্তির বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গীর উপর তাহারা নির্ভর করে। লেখকের ব্যক্তি সত্তার এবং তাঁহার ধ্যান-সাধনার পরিচয় ব্যতীত তাঁহার ব্যবহৃত প্রতীকের সঙ্কেত উপলব্ধি করা সম্ভব নয়।

প্রতীক ধর্মী শিল্পে ফ্রয়েড ব্যক্তির আকাঙ্ক্ষা ও কল্পনার প্রক্ষেপ দেখিয়াছেন—সমস্ত শিল্প সম্বন্ধেই তাঁহার এই মত। অপরদিকে ইয়ুং-এর মতে প্রতীক ধর্মী শিল্প জাতীয় এবং সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্যকে যথাযথরূপে প্রতিফলিত করে। পূর্বপুরুষদের নিকট হইতে প্রাপ্ত বিশেষ আবেগ সমষ্টি এবং আকাঙ্ক্ষা সমূহই জাতীয় বৈশিষ্ট্য—সেইগুলি সমস্ত জাতির জীবনের সঙ্গে জড়িত। রূপ বা প্রতীকগুলিও অজানা নয়; শিল্পীর বিশেষ অভিজ্ঞতার স্পর্শে সেইগুলি সঞ্জীবিত হইয়া উঠে, তাঁহার রুদ্ধ আবেগগুলি এক বিশেষ রূপ গ্রহণ করিয়া প্রাণবন্ত হয়। সুতরাং প্রতীক সৃষ্টিতে জাতীয় বৈশিষ্ট্য এবং শিল্পীর দৃষ্টিকোণ এই দুইয়ের মিশ্রণ অবশ্যম্ভাবী।

যদি শিল্পী নিছক কল্পলোকবাসী না হন তবে তিনি শিল্প সৃষ্টিকালে বাস্তব পৃথিবীকে ভুলিয়া যাইতে পারেন না। তাঁহাকে তখন বাস্তব জগৎ ও কল্পনার জগৎ এই উভয় স্থানেই বিচরণ করিতে হয়। তাহারই ফলে শিল্পীর প্রতীকগুলি বিশ্লেষণ করা দুরূহ হইয়া উঠে। কোন্ বস্তুর সহিত তিনি তাঁহার চেতন-অবচেতন মনের কোন্ কল্পনাকে যে মিশাইয়া দেন তাহা ধরিয়া ওঠা সম্ভবই হয় না।

শিল্পকলা কতকটা স্বপ্নের মত। প্রথমটায় অবচেতন মনের আকাঙ্ক্ষা মহৎ রূপ লাভ করিয়া সামাজিক দিক দিয়া শ্রেয় এবং সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে প্রেয় হইয়া ওঠে। স্বাভাবিক ইচ্ছা শিল্প বা স্বপ্ন এই দুই ধারার যেভাবেই প্রকাশ পাক না কেন—প্রকাশিত হইবার পর ব্যক্তি যেন আরাম পায়। যিনি নিজের স্বাভাবিক আবেগকে সাফল্যজনক ভাবে প্রকাশ করিতে পারেন তিনি শিল্প কর্মে ব্রতী হন। যিনি তাহা পারেন না তিনি স্বপ্ন দেখিয়া থাকেন। এই উভয় ক্ষেত্রেই প্রচুর প্রতীকের প্রয়োগ হয়। অবচেতন মনের আকাঙ্ক্ষাগুলি শিল্পে এবং স্বপ্নে এমন পরিবর্তিত রূপ পরিগ্রহ করে যে তাহাদের স্বরূপ নির্ণয় করা কঠিন হয়, উহাদের তখন রহস্যময় বলিয়া বোধ হয়।

শিল্পকর্ম সেই ধরণের ধ্যান যাহা বস্তুর মাধ্যমে প্রকাশ পায়। শিল্পীর অঙ্কিত চিত্রটি তাঁহার অন্তরের ভাবকল্পনারই একটা প্রতিচ্ছায়া এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। শিল্পীর মনের সন্ধান পাইলে তাঁহার অঙ্কিত চিত্রগুলির এমন কি তাঁহার ব্যবহৃত প্রতীকগুলিরও বিশ্লেষণের কিছুটা সুযোগ হয়—যদিও সম্পূর্ণরূপে বিশ্লেষণ কখনও সম্ভব নয়। শিল্পীর মনেরও আবার নানা

পরিচয় আছে। তাই বিশ্লেষণ কালে একে যে-দিকটায় জোর দেন, অন্যে সে-দিকটায় জোর নাও দিতে পারেন। ফলে শিল্পীর প্রতীকের বিশ্লেষণের ক্ষেত্রেও পার্থক্য ঘটিতে পারে। জাতির সর্বজনীন চিন্তাধারা ব্যক্তির ভাব-কল্পনায় রূপ পাইয়া প্রতীকধর্মী হইয়া উঠিতে পারে : জাতির চর্যা ব্যক্তির মধ্যে বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ হইয়া উঠিয়া প্রতীক অবলম্বনে প্রকাশের পথ সন্ধানও করিতে পারে। যাহারা সেই জাতির জীবনচর্যা জানে না তাহারা শত চেষ্টায়ও সেই প্রতীকের কোন ইঙ্গিতই ধরিতে পারে না। হিন্দু-মন্দির গাত্রের যৌনজীবনের ভাস্কর্যগুলি অথবা মন্দিরের অভ্যন্তরের গঙ্গা-যমুনার মূর্তির তাৎপর্য অন্য দেশীয়দের পক্ষে বুঝিয়া ওঠা কঠিন। ভারতীয় অধ্যাত্ম সাধনার সিদ্ধান্ত রবীন্দ্রনাথের নাটকে প্রতীকের মাধ্যমে প্রকাশ পাইয়াছে। বড় শিল্পীকে বুঝিতে হইলে তাই জাতির জীবন সাধনা বুঝিতে হয়।

শিল্পী যখন ধ্যান সমাহিত চিত্তে সৃষ্টি কার্যে লিপ্ত হন তখন তিনি সম্পূর্ণ ভিন্ন ব্যক্তি হইয়া ওঠেন ; এইরূপে অঙ্কিত চিত্র দেখিয়া পরবর্তী কালে তিনি নিজেও বিস্মিত হইতে পারেন। ধ্যানমগ্ন শিল্পী তাঁহার সাংসারিক সত্তা হইতে পৃথক—'কবিরে পাবে না তাহার জীবন চরিতে' [রবীন্দ্রনাথ : উৎসর্গ : ২১]। জাতির যুগ যুগের আচরণ এবং তাঁহার নিজের জীবন বোধ তখন তাঁহাকে আচ্ছন্ন করিয়া রাখে। প্রতীক সেই জন্যই কেবল পাঠকের নিকটই নয় লেখকের নিকটও এত বেশী অস্পষ্ট হইয়া থাকে।

প্রতীকধর্মী শিল্পীদের অনুভূতি অত্যন্ত সূক্ষ্ম। প্রতীকগুলি স্বাভাবিক ভাবেই আসিয়া যায়, সেগুলিকে বাছিয়া লওয়া হয় না। এইগুলিকে বিশ্লেষণ করিলে বিভিন্ন পর্যায়ে মানুষের চিন্তাধারা যে ভাবে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে নিশ্চয়ই সেই ইতিহাসের সন্ধান পাওয়া যাইবে। মেঘকে ভয়ঙ্করতা বা বিষাদের প্রতীক করার কারণ বিশ্লেষণ করিলে মেঘ ও বিদ্যুতের কার্যের কথা স্মরণ হইবেই। মেঘ ও বিদ্যুৎ কি অতীতের মানুষকে ভয় দেখায় নাই ? আজও কি আমরা তাহা দেখিয়া ভয় পাই না ? মেঘের মধ্যে যে বর্ষণের দিকটা রহিয়াছে তাহা ক্রন্দনের ন্যায় : উহাই বিষাদের ছায়া। তাই যে কোন জিনিসের জন্য যে কোন প্রতীক সৃষ্টির উপায় নাই। যুগ যুগের মানুষের চিন্তাধারা যেগুলিকে আপন অজ্ঞাতসারেই নানা ভাব-কল্পনার সঙ্গে জড়িত করিয়া ফেলিয়াছে সেইগুলিকেই কেবল প্রতীকরূপে ব্যবহার করা হয়। শিল্পী তাঁহার ধ্যান-কল্পনার সঙ্গে বাস্তব জগৎটাকে

জড়াইয়া রাখেন ; তাই তাঁহার ধ্যান প্রকাশ পাইবার সময় বাস্তব জগতের সহজ অথচ অজ্ঞাতসারে স্বীকৃত প্রতীকগুলিকে ব্যবহার না করিয়া পারে না।

মরমী বিষয়গুলিকে যখন শিল্পী প্রকাশ করিতে চাহেন তখন তাঁহাকে প্রতীক অবলম্বন করিতেই হয়। প্রতীক স্বভাবতঃই অস্পষ্ট—মরমী বিষয়ের সঙ্কেত করিতে যে প্রতীকের প্রযোগ হয় তাহার অর্থ আবিষ্কারের চেষ্টা একপ্রকার দুঃসাধ্য। সর্বদেশের সাহিত্যেই এই ধরণের প্রতীকের প্রয়োগ দেখা যায়। ইহা অত্যন্ত স্বাভাবিকও বটে। বস্তু জগৎকে অতিক্রম করিয়া অধ্যাত্ম জগৎকে মূর্ত করিবার চেষ্টাতেই এইরূপ হইয়াছে। মরমীরা তিন প্রকার প্রধান প্রতীকের কথা বলিয়াছেন—আত্মার আকাঙ্ক্ষার নিকটই এই সব প্রতীকের আবেদন। সত্যকে জানিবার জন্য মানুষের অন্তরের আকূতিরই বহিঃপ্রকাশ এই সকল প্রতীক। মানুষের একটি আকাঙ্ক্ষা তাহাকে অভিযাত্রী করিয়া তোলে—বাস্তব জগৎ হইতে বাহির হইয়া অভিযাত্রী মানুষ যেন তাহার হারানো গৃহের সন্ধানে বাহির হইতে চায়। এই সত্যের সন্ধানে যাত্রা, পরম সত্তার সহিত মিলিত হইবার আকূতিই প্রথম শ্রেণীর প্রতীকের দ্বারা আভাসিত হয়। অপর একটি আত্মার সহিত মিলিত হইবার আকাঙ্ক্ষা, আত্মার আত্মীয়ের সন্ধান করিবার আবেগকে রূপায়িত করে দ্বিতীয় শ্রেণীর প্রতীক। এইখানে মানুষের প্রেমিক রূপের পরিচয় পাওয়া যায়। তৃতীয় শ্রেণীর প্রতীক সঙ্কেত করে আত্মার পবিত্র এবং শুদ্ধ হইবার আকুলতাকে। এইরূপ মানুষকে সন্ন্যাসীরূপে দেখি। বদ্ধ আত্মা যেন মুক্ত হইতে চায়[১৩]। তাই বলিয়া মরমী অনুভূতিকে প্রতীকবাদের অবিচ্ছেদ্য লক্ষণ বলিয়া মনে করিলে ভুল হইবে। অস্পষ্টতা থাকিলেই মরমী অনুভূতি থাকিবে এমন কথা বলা চলে না। প্রতীক যত অধিক সঙ্কেত করিতে পারিবে পাঠক চিত্তে তত অধিক ভাব উদ্রেক করিবে। মানুষের মস্তিষ্কের নিকট ইহার আবেদন নয়, ইহার আবেদন আবেগপূর্ণ হৃদয়ের নিকট। সুতরাং সার্থক প্রতীকের সঙ্কেত করিবার শক্তিও অধিক ; রহস্যপূর্ণ মোহময় যাদুস্পর্শে পাঠক চিত্তকে আলোড়িত করিয়া ভাবনিবিষ্ট করিবার ক্ষমতাও অনেকখানি।

এতক্ষণের আলোচনার পর স্থূলভাবে এই কথা বলা চলে যে প্রতীক তিন শ্রেণীর হইতে পারে (১) যেগুলির যোগটা বাহিরের অর্থাৎ যেগুলি

১৩। Evelyn Underhill : Mysticisum : ch. on Mysticisum & Simbolism.

স্বেচ্ছায় সৃষ্ট, (২) যেগুলির যোগ অভ্যন্তরীণ এবং (৩) যেগুলি সূক্ষ্ম অন্তর্দৃষ্টি বা মরমী অনুভূতি হইতে উদ্ভূত।

কার্যকারণ সম্বন্ধে অথবা বাহিরের দিক দিয়া একটা সম্পর্কে বিধৃত বলিয়া অনেক সময় আমরা যেগুলিকে প্রতীকরূপে প্রয়োগ করি সেগুলি প্রথম শ্রেণীতে পড়ে। ইহা শাড়ীকে নারীর প্রতীক করিয়া তোলার ন্যায়ই। এইগুলিকে যে যথার্থ প্রতীক বলা চলে না তাহা পূর্বের আলোচনাতেই প্রমাণিত হইয়াছে—ইহাদের চিহ্ন বলা হইয়াছে। দ্বিতীয় শ্রেণীর প্রতীক সেইগুলি যেগুলি কোন না কোন উপায়ে যাহাদের সঙ্কেত করা হয় তাহাদের সহিত অন্তর্নিহিত যোগসূত্রে আবদ্ধ। এই শ্রেণীর যে সকল প্রতীক অত্যধিক ব্যবহারের ফলে তাহাদের অস্পষ্টতা হারাইয়া ফেলিয়াছে তাহাদেরও প্রথম শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত করা চলে। মূকদের অঙ্গভঙ্গীর অর্থ আর অস্পষ্ট নয়, বিজ্ঞানের কল্যাণে উহারা সহজবোধ্য হইয়া পড়িয়াছে। তাহাদের অঙ্গভঙ্গীকেও সেই কারণে চিহ্নই বলিতে হয়। এই শ্রেণীর মধ্যে সবগুলির অর্থই স্পষ্ট হইয়া ওঠে তাহা নয়। দ্বিতীয় শ্রেণীর প্রতীক যখন আরও সূক্ষ্ম এবং সুগভীর অর্থের সঙ্কেত করে তখন তৃতীয় শ্রেণীর প্রতীকে পরিণত হয়। এইরূপ প্রতীকই কেবল মরমী অনুভূতির সঙ্কেত করিবার যোগ্য। এই প্রতীকগুলির বিশেষত্ব এই যে ইহারা কোন কিছুকে নির্দেশ করে না, কিন্তু অর্থের গভীরে টানিয়া লইয়া যায়। ইহারা কেবল যোগসূত্রটুকুর প্রতিনিধিত্বই করে তাহা নহে—অন্তর্দৃষ্টির মাধ্যমের কাজ করে এবং আমাদের দৃষ্টি খুলিয়া দেয়। এই প্রতীকগুলি বিশ্লেষণ করিয়া বিষয়কে স্পষ্ট করিবার চেষ্টা করে না—ইহারা নিজেদের ছাড়াইয়া মনকে এক উচ্চতর রাজ্যে লইয়া যায়, অন্তত পক্ষে এক উচ্চতর রাজ্যের দ্বার উদ্ঘাটন করে। ইহারা আদর্শ বা আত্মিক জগতের সন্ধান দেয়। এই প্রতীকগুলি যেন কিছু বলিতে চায় আর সেই বক্তব্য যে কেবল বাস্তব হইতে অধিক মূল্যবান তাহাই নহে, সেগুলি বাস্তব সত্য হইতেও অধিকতর সত্য। কাব্য এবং ধর্মের ক্ষেত্রে এইরূপ প্রতীকের প্রচুর প্রয়োগ আছে। রবীন্দ্রনাথের কাব্য ও নাটক ইহার অন্যতম প্রধান দৃষ্টান্ত।

উপসংহারে সকল সূত্র একত্র গ্রথিত করিয়া বলা চলে যে, প্রতীক মাত্রেই কোন কিছুর পরিবর্তে বসে। কিন্তু যাহাকে ইহা সঙ্কেত করে

তাহার সহিত ইহাকে এক করিয়া ফেলা চলে না। কারণ, "Symbols are not proxy for their objects, but are *vehicles for the conception of objects,*······and it is the conceptions, not the things, that symbols directly "mean"." [Philosophy in a New Key : p. 60-61] যথার্থ প্রতীক নিজেকে অতিক্রম করিয়া অপর কিছুর সঙ্কেত করিবেই : তাহা অস্পষ্ট নিশ্চয়ই, এমন কি সম্পূর্ণ ধরা ছোঁয়ার বাহিরেও হইতে পারে। প্রতীক যদি কেবল একটি বিষয়কে সঙ্কেত করিবার জন্যই ব্যবহৃত হয় তাহা হইলে উহা প্রতীকত্বই হারাইয়া ফেলে। প্রতীক মাত্রই বাস্তব সত্য ও কল্পনার সংমিশ্রণে সৃষ্ট, ইহাতে চেতন ও অবচেতন মনের লীলা চলে। কেবল চেতন মনের সৃষ্ট হইলে সাধারণতঃ উহা প্রতিরূপকে পরিণত হয়; কেবল অবচেতন মনের সৃষ্ট হইলে পাগলামীতে পরিণত হইত। চেতন ও অবচেতন মনের যোগে সৃষ্ট বলিয়াই প্রতীকে ভারসাম্য রক্ষিত হয়।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

প্রতীকের প্রয়োগ

(ধর্ম-পুরাণ, ভাস্কর্য-স্থাপত্য-চিত্র এবং স্বপ্ন)

সাহিত্যে প্রতীক কথাটি যে সময়েই প্রথম প্রযুক্ত[১] হউক না কেন মানুষ ইহার ব্যবহার করিতেছে তাহার জ্ঞান উন্মেষের কাল হইতেই। প্রকৃতির এক একটি ঘটনা বা বিষয়ের পশ্চাতে উহাদের নিয়ন্ত্রণকারী এক একটি দেবতা সেই কারণেই তাহারা কল্পনা করিয়াছিল। মানুষের সীমিত শক্তি মূর্তির মাধ্যম ব্যতীত চিন্তা করিতেই পারে না। নিরাকারে বিশ্বাসী ক্রিশ্চিয়ানরা যীশুর ক্রুশবিদ্ধ মূর্তিকে ঈশ্বরের পর্যায়ে তুলিয়া লইয়াছেন : বুদ্ধ মূর্তিও প্রতীকরূপে বৌদ্ধদের প্রেরণা যোগাইয়াছে।

প্রাচীন মিশরের দেবমূর্তি পশু ও মানুষের সমন্বয়ে গঠিত : শক্তি ও বুদ্ধির প্রতীকরূপেই সেগুলি কল্পিত হইয়াছিল। হিন্দুদের দেবতারা মানুষের রূপধারী। সেই আদি যুগেই হিন্দু সাধনা অনেক উচ্চ পর্যায়ে পৌছিয়াছিল। বুদ্ধিই যে শক্তি হিন্দুরা তাহা বুঝিয়াছিলেন বলিয়া দেবতার শক্তি বুঝাইতে তাঁহাদের অর্ধপশু অর্ধমানব মূর্তির প্রয়োজন হয় নাই।

ঈশ্বরের এই মূর্তি কল্পনাকে কুসংস্কারগ্রস্ত মনের পরিচায়ক মনে করা নিতান্তই ভুল। বুদ্ধিজীবী, ঘোরতর বাস্তববাদীরাও কুশপুত্তলিকা দাহ করিয়া থাকেন। বর্তমান কালের তথাকথিত সংস্কারমুক্ত মানুষেরা কুশপুত্তলিকা দাহ করিয়া শত্রুর বিরুদ্ধাচরণের এবং অত্যন্ত ক্ষুব্ধ মনের পরিচয়ই দেন।

দেব মূর্তিকে যে মাঝে মাঝে স্নান করান হয় তাহার উদ্দেশ্য পবিচ্ছন্নতা নয়। নৃতত্ত্ববিদ্‌দের কেহ কেহ মনে করেন যে ইহার সহিত বৃষ্টিপাতের আকাঙ্ক্ষার যোগ আছে[২]। চৈত্র সংক্রান্তির দিনে হিন্দুরা ভাঁড়ে ভাঁড়ে জল তাহাদের অন্যতম প্রধান দেবতা শিবের মাথায় ঢালিয়া থাকেন :

*১। ১৮৯০ খ্রীষ্টাব্দের পর ''প্রতীকবাদ' সাহিত্যের প্রধান সুর হইয়া ওঠে। মরাস (Moreàs, Jean. 1856—1910) সাহিত্যে এই কথাটি প্রথম প্রয়োগ করেন (Arnold Hauseur : The Social History of Art : (Vol : II p-896)

২। Bevan, E. : Holy Images : P-29

ইহার সহিত বৈশাখের বৃষ্টিপাতের আকাঙ্ক্ষা জড়িত থাকা কিছুমাত্র অসম্ভব নয়। এথেন্স-এর লোকেরা সেই একই আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করিতেন দেবতাকে স্নান করাইবার পরিবর্তে মূর্তিতে ধূলা লেপন করিয়া[৩]। সুতরাং এই কথা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে মানুষ তাহার আদি কাল হইতেই প্রতীকের সাহায্য লইয়াছে। অর্বাচীনেরা হয়ত দেবতাকে মানুষের ন্যায় মনে করিয়া স্থূলতার পরিচয় দিয়াছে: জ্ঞানীরা ওই মূর্তির ভিতর দিয়া এক অনাদি শক্তির নিকটে মস্তক নত করিয়া (সূক্ষ্ম উপলব্ধির পরিচয় দিয়া) মূর্তিকে সেই অনাদি কল্পনাতীত শক্তির প্রতীক রূপেই ব্যবহার করিয়াছেন।

মূর্তিকে যে প্রতীকরূপে ব্যবহার করা হয় তাহার বিশেষ পরিচয় আছে এক তাৎপর্যপূর্ণ অনুষ্ঠানের মধ্যে। পূজার পূর্বে মন্ত্র উচ্চারণ প্রভৃতি রহস্যময় কার্য দ্বারা মূর্তির প্রাণ প্রতিষ্ঠা করিয়া লওয়া হয়: এই প্রাণ প্রতিষ্ঠা না হইলে মূর্তি দৈব শক্তিতে উজ্জীবিত হইয়া ওঠে না। প্রাণ প্রতিষ্ঠার পূর্বে সেই মূর্তি দেবতা হয় না—আবার বিসর্জনের সময়ও উহা মাটির মূর্তি ব্যতীত আর কিছুই নয়। ওয়েস্ট কোস্ট-এর নিগ্রোদের দেশে দোকানে দেবমূর্তি বিক্রয় হয়—ক্রেতা তাহার পছন্দ মত মূর্তি গ্রহণ করিলে যাদুকর দোকানদার দৈব শক্তিকে আহ্বান করিয়া সেই মূর্তিতে তাহা প্রতিষ্ঠিত করে। নিউজিল্যাণ্ডের পুরোহিত মূর্তির মধ্যে মৃত আত্মাকে মন্ত্র দ্বারা আনয়ন করেন এবং মূর্তিটিকে নাড়িয়া চাড়িয়া যেন ঘুমন্ত মানুষকে জাগ্রত করিয়া তোলেন[৪]।

অজ্ঞ মানুষের সহজ বিশ্বাস এই মূর্তিগুলিকে দেবতা অথবা পিতৃপুরুষের প্রতীক বলিয়া গ্রহণ করিতে শিখাইয়াছে।

যুক্তিবাদী গ্রীক্‌দেশেও মূর্তিকে জাগ্রত করিয়া তুলিবার ব্যবস্থা ছিল। অর্থাৎ মূর্তি উপাসকদের দেশে এই বিশ্বাসই ছিল যে মূর্তি তৈয়ারী করিলেই তাহা আপনা হইতেই দেবতা হইয়া ওঠে না; রহস্যময় অনুষ্ঠানের ভিতর দিয়াই তাহাকে রহস্যময় দেবতার প্রতীক করিয়া তোলা হয়। সুতরাং দেবমূর্তির নিকট মস্তক অবনত করার অর্থ কাষ্ঠ বা প্রস্তরের নিকট মস্তক

৩। Ibid : P-29
৪। J Hastings' Encyclopaedia of Religion and Ethics : Vol. vii : p-113. (Images & Idol)

অবনত করা নয়—অজানা শক্তির আধারের নিকট অবনত হওয়া : ক্ষুদ্র বৃহৎ সমস্ত প্রকার দেবমূর্তিই প্রতীক মাত্র।

তৃতীয় শতাব্দীতে পরফিরী (Porphyry : Porphyrius : ২৩৩-৩০১) লিখিয়াছেন, মূর্তি কখনই দেবতা ছিল না, মূর্তিকে দেবতার প্রতীকরূপে গ্রহণ করিতে হইবে। মূর্তি তৈয়ারীর বস্তু, রং প্রভৃতিও তাৎপর্যপূর্ণ। শ্বেত প্রস্তর দেবতার আলোক দিবার শক্তির সঙ্কেত করে—দেবতার পক্ষেই 'তমসো মা জ্যোতির্গময়'[৫] করা সম্ভব। সুবর্ণের দ্বারা গঠিত মূর্তি দেবতার অপাপবিদ্ধ গুণেরই প্রকাশ করে। জিউস্‌কে মনুষ্যের আকৃতি দেওয়া হইয়াছে তাঁহার বুদ্ধি বৃত্তিকে বুঝাইবার জন্য : মানুষ বুদ্ধি দ্বারা কার্য করে, জিউস্‌ও নিজ বুদ্ধি দ্বারা জগৎ সৃষ্টি করিয়াছেন। তাঁহার শক্তির দার্ঢ্য বুঝাইবার জন্যই তাঁহার মূর্তিটি উপবিষ্টরূপে দেখান হইয়াছে। মূর্তির উর্ধাঙ্গ উন্মুক্ত, নিম্নাঙ্গ পরিচ্ছদে আবৃত—ইহার তাৎপর্য এই যে মহৎ এবং জ্ঞানী ব্যক্তিদের নিকট তাঁহার স্বরূপ প্রকাশিত এবং অজ্ঞতার অন্ধকারে যাহারা নিমজ্জিত তাহাদের নিকট তিনি সংগুপ্ত। মূর্তির বাম হস্তের রাজদণ্ড হৃদয়ের দ্বারা শাসনের সঙ্কেত করে কারণ বক্ষের বাম অংশেই হৃদয় অবস্থিত। তাঁহার দক্ষিণ হস্তে ঈগল পক্ষী অথবা বিজয়ের চিহ্ন—উহা তাঁহার শক্তিকে আভাসিত করে, বুঝাইয়া দেয় যে তিনি সকলের উর্ধ্বে[৬]।

খ্রীষ্টীয় যুগের প্রথম কয়েক শতাব্দী পর্যন্ত ক্রুশকে প্রতীক রূপে ব্যবহার করা হইত না। কন্‌স্টানটাইনের[৭] (Constantine the Great-৩০৬-৩৩৭ পর্যন্ত রোমের সম্রাট ছিলেন) সময় হইতেই সম্ভবতঃ খ্রীষ্টীয় জগতে ক্রুশের প্রতীকের ব্যবহার আরম্ভ হয় এবং উহাকে ভক্তি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করা হয়। যতদূর জানা যায় ক্রুশবিদ্ধ, যীশুর মূর্তি পঞ্চম খ্রীষ্টাব্দের কোন সময়ে প্রথম প্রচলিত হয়। ক্রুশ খ্রীষ্ট ধর্মের চিহ্ন মাত্র কিন্তু উহাই আবার পরার্থে আত্ম-ত্যাগের ন্যায় এক ঐশ্বরিক মাহাত্ম্যের প্রতীক[৮]। বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীরাও

৫। বৃহদারণ্যকোপনিষৎ : ১ম অধ্যায়

৬। Porphyry : About Images. (Bevan : Holy Images : p-74)

৭। কথিত আছে যে, যে-যুদ্ধে (৩১২ খ্রী:) তিনি তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বী ম্যাক্সেনটিয়াসকে (Maxentius) পরাজিত করেন তাহার পূর্বে আকাশে একটি জ্বলন্ত ক্রুশের চিহ্ন দেখিয়া তিনি খ্রীষ্টধর্ম গ্রহণ করেন। (The Oxford Companion to English Literature : p-184)

৮। Bevan, E : Holy Images : p : 98-99.

প্রথম দিকে বুদ্ধমূর্তি গড়েন নাই—দুইটি পদচিহ্ন বা শূন্য সিংহাসন, ছত্র প্রভৃতি স্থাপন করিয়া প্রতীকের মাধ্যমে বুদ্ধের মহিমার পরিচয় দিযাছেন।[৯]

প্রাচীন কাল হইতে হিন্দুরা জলকে পবিত্র বলিয়া মনে করিযা আসিতেছেন। খ্রীষ্টানগণও বিশ্বাস করেন যে জর্ডনের জল আধ্যাত্মিক জগৎকে জাগ্রত করিযা তুলিতে পারে। জল যাঁহার আশ্রয তিনিই নারাযণ: ঘট পূজার অর্থ নারাযণের পূজা। বিষ্ণুর মায়া উপলব্ধি করা কাহারও পক্ষে সম্ভব নয। নারদ যখন তাঁহার মাযা শক্তি বুঝিতে চাহিলেন তখন বিষ্ণু তাঁহাকে নিকটস্থ সমুদ্রে ঝাঁপাইযা পড়িতে বলিযাছিলেন[১০]। সুতরাং হিন্দুদের নিকট জলের এক বিশেষ তাৎপর্য আছে। জলরূপ তরল পদার্থটি বৃষ্টি, রস, রক্তরূপে পৃথিবীর প্রাণ দান করে।

চতুরাশ্রমের বিধি ছিল প্রাচীন ভারতবর্ষে—ব্রহ্মচর্য, গার্হস্থ্য, বানপ্রস্থ ও সন্ন্যাস। সংসারের এই বিধিকেও আধ্যাত্মিক জগতে উন্নীত হওযার প্রতীক বলিযা মনে করা যাইতে পারে। হিন্দু আদর্শ যেন চতুরাশ্রমের ব্যবস্থা করিয়া এই কথাটাই বলিতে চাহিযাছে যে মানুষকে সর্বপ্রথম জ্ঞান অর্জন করিতে হইবে (ব্রহ্মচর্য আশ্রমে গুরুর নিকট শিক্ষালাভ হয), পরে তাহাকে সংসারের কর্তব্য সমাপন করিতে হইবে (গার্হস্থ্য আশ্রম)। সংসারের কর্তব্য পালনের ভিতর দিযাই মানুষের ত্যাগের শিক্ষা হইবে এবং তখনই সে বানপ্রস্থ অবলম্বন করিতে পারিবে। এইরূপে এই ত্রয়ী আশ্রমের কর্মের ভিতর দিযা আকাঙ্ক্ষা ত্যাগের মন্ত্রে দীক্ষিত হইতে পারিলেই বন্ধন মুক্তির সম্ভাবনা, সন্ন্যাস গ্রহণ—জীবন্মুক্ত অবস্থা প্রাপ্তি।

হিন্দু পুরাণে দেবতাদের বাহনের কথাও উল্লিখিত হইযাছে। ব্রহ্মার বাহন বুনো হাঁস বা রাজহংস। হংস জলের মধ্যে স্বচ্ছন্দে বিচরণ করে কিন্তু তাহার গায়ে জলের দাগও লাগে না—শূন্য পথেও সে উড়িযা যাইতে পারে: ইহাই মুক্ত আত্মার লক্ষণ। সেই জন্যই মুক্ত পুরুষদের হিন্দুরা পরমহংস বলেন। হংসের কার্য ও আচরণের জন্যই তাহাতে স্বর্গীয় সত্তা আরোপ করা হইয়াছে। জগৎ সৃষ্টি করিয়াও ব্রহ্মা জগৎকে অতিক্রম করিয়া আছেন—হংসও যেন কতকটা সেইরূপ। সেই জন্যই ব্রহ্মার বাহন

৯। Ananda K. Coomaraswamy: History of Indian and Indonesian Art: p-31.

১০। পুরাণ

হংস। প্রতীক রূপেও এইখানেই তাহার সার্থকতা। আর এক দিক দিয়াও এই প্রতীকটির বিশেষ তাৎপর্য আছে। যোগীরা প্রাণায়াম করিয়া যখন সমাধিস্থ হন তখন নিশ্বাস-প্রশ্বাসের মধ্যে এক অপূর্ব সঙ্গীত শ্রবণ করেন। ইহা যেন মানবাত্মার অভ্যন্তরীণ হংস-এর আত্মপ্রকাশ। নিশ্বাস গ্রহণের শব্দ 'হম্' এবং ফেলিবার শব্দ 'স'। সুতরাং সমাহিত যোগী, যিনি মুক্ত আত্মা—পরম হংস, নিজের ভিতরকার মুক্ত আত্মারূপ 'হম্ স' (হংস)-কে যেন উপলব্ধি করেন। কেবল তাহাই নয়, 'হম্-স হম-স' 'স-হম্ স-হম্'ও বটে। অর্থাৎ 'স-হম্ হম্-স', আমিই সেই হংস: আমি মুক্ত জীব। আত্মার সত্যকার পরিচয়ের প্রতীক নিশ্বাস[১১]।

পালনকর্তা বিষ্ণুর দুই স্ত্রী—লক্ষ্মী ও সরস্বতী। লক্ষ্মী বহির্জগতের সৌন্দর্যের প্রতীক, সরস্বতী অন্তরের সৌন্দর্যের প্রতীক। বহির্জগৎ ও অন্তর্জগৎ লইয়াই সৃষ্টি এবং তাহাই পালনের ভার বিষ্ণুর উপর।

গণেশ—গণ+ঈশ, জনগণের দেবতা। তাঁহার স্ত্রীর নাম পুষ্টি। জনগণের পুষ্টি হইলেই বোধ হয় দেশে শান্তি বজায় থাকে। গণেশ-এর অপর নাম বিজ্ঞানেশ্বর: জ্ঞানের দ্বারা তিনি সমস্ত বাধাকে জয় করেন। কিন্তু দেবতাটির গজমুণ্ড এবং বিরাট উদর সত্ত্বেও মূষিক বাহন—দেখিয়া বিশেষ বুদ্ধিসম্পন্ন মনে হয় না। কিন্তু গজমুণ্ড ও মূষিককে প্রতীকরূপে দেখিলে আর সমস্যা থাকে না। গজ জল স্থলের সমস্ত বাধাকে পদদলিত করিয়া চলে, শুণ্ডের সাহায্যে বৃক্ষ শাখার বাধাকে তুচ্ছ করিয়া পথ করিয়া লয়। মূষিকও স্থল পথে সর্বত্র সুড়ঙ্গ কাটিয়া অগ্রসর হইতে পারে। শুণ্ড এবং মূষিক রূপ আপাত বিরোধী প্রতীক দুইটি বিজ্ঞানেশ্বর-এর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য সুন্দর রূপেই ফুটাইয়া তুলিয়াছে[১২]।

বহুদেশেই সর্পকে প্রতীকরূপে প্রয়োগ করা হইয়াছে। সর্প পূজক দেশেরও অভাব নাই। মায়াছন্ন বিষ্ণু অনন্ত বা শেষ নাগের উপর শয়ন করিয়া সমুদ্রে ভাসমান থাকেন। বরাহ অবতার সমুদ্রের মধ্যে ঝাঁপাইয়া পড়িয়া সর্পের হস্ত হইতে পৃথিবীকে উদ্ধার করেন। শ্রীকৃষ্ণরূপী বিষ্ণু কালীয়নাগকে দমন করিয়াছিলেন; বলরামের মুখ দিয়া একটি অজগর

১১। পুরাণ:
S. Kramrisch : The Hindu Temple : (vol II : p-344)

১২। Zimmer, H. : Myths & Symbols in Indian Art & Civilization. : p-70.

বাহির হইয়া যাওয়ার পরই তাঁহার মৃত্যু হয় : জনমেজয় সর্প যজ্ঞ করিয়াও তাহাদের ধ্বংস করিতে পারেন নাই। হইতে পারে যে নাগ জাতিকে পরাভূত করিয়া আর্যজাতির বিজয় অভিযানের ইঙ্গিত ইহাতে আছে। কিন্তু মিশরে গ্রীসে সর্বত্রই এই সর্প প্রতীকের প্রয়োগ পরিদৃষ্ট হয়। সুতরাং প্রতীকটি ভারতবর্ষে কেবল আর্য ও নাগজাতির সংঘাতের সঙ্কেতই করিয়াছে মনে না করিয়া আরও গভীরতর তাৎপর্যমণ্ডিত মনে করিলে ভ্রান্তি না হইবার সম্ভাবনাই অধিক।

'সর্প' সৃষ্টির মূল পদার্থও হইতে পারে। হিন্দুরা অধ্যাত্ম জগৎ ও বস্তু জগৎ এই উভয়কেই মর্যাদা দিয়াছেন। সেই আদর্শই পরিলক্ষিত হয় পুরাণে, গীতায়, উপনিষদে[১৩]। শ্রীকৃষ্ণ অথবা বরাহ অবতার সর্পকে পরাভূত করিলেও নিহত করেন নাই। ইলোরার কৈলাস নামে খ্যাত ১৬নং গুহায় কালীয় দমনের যে মূর্তি আছে তাহাতে শ্রীকৃষ্ণের মুখে অতি প্রশান্ত ভাবই লক্ষিত হয়—সেই মুখে যুদ্ধের কোন ভাব ফুটিয়া ওঠে নাই। সর্প নিধন যজ্ঞের পরও সর্পকুল রক্ষা পাইল। সৃষ্টির প্রয়োজনেই বস্তু চাই—সর্পকে সেই বস্তুর প্রতীক মনে করা যাইতে পারে। বিষ্ণু যে নাগের উপর শুইয়া নিদ্রায় অভিভূত থাকেন তাহার নাম অনন্ত (যাহা কখনও বিনষ্ট হইবে না) অথবা শেষ (অবশিষ্ট)[১৪]। প্রলয়ের পরও বিশ্বের মূল পদার্থ অবশিষ্ট থাকিবেই, তাহা অনন্ত। মূল পদার্থ বিশ্বের রূপ ধ্বংসের পরও থাকিয়া না গেলে পরবর্তী সৃষ্টিই যে অসম্ভব হইবে। কেবল আত্মিক শক্তির দ্বারাই সৃষ্টি করা যায় না। তবে আত্মিক শক্তি চেতন বলিয়া বস্তু হইতে তাহার শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার্য। তাই বস্তু যখন প্রাধান্য পাইতে আরম্ভ করে তখন কালীয় দমন করিতেই হয়। বস্তুর মর্যাদা আত্মিক শক্তিকে অতিক্রম করিলে মঙ্গল নাই। বর্তমান যুগের বিজ্ঞানীদের সিদ্ধান্ত হিন্দুর ধারণাকে সঠিক বলিয়াই প্রমাণ করিয়াছে। বিজ্ঞান বলে শক্তির ক্ষয় নাই, বস্তুরও ক্ষয় নাই : উহাদের রূপান্তর হয় মাত্র। প্রলয়ের পর নারায়ণ শেষ নাগের উপর নিদ্রিত থাকেন—শক্তি এবং বস্তু অবিনশ্বর : প্রলয় রূপান্তর ঘটায় মাত্র।

১৩। অন্ধং তমঃ প্রবিশন্তি যে অবিদ্যামুপাসতে।
ততোভূয়ইব তে তমো য উ বিদ্যায়াং রতাঃ॥ (ঈশোপনিষদ)

১৪। ইলোরার কৈলাস নামক বিখ্যাত ১৬নং গুহায় এই মূর্তি আছে।

বিষ্ণু একদিকে নাগশয্যায় শয়ান থাকেন অপর দিকে দেখি পক্ষিরাজ গরুড় তাঁহার বাহন। মহাশূন্য দিয়া পক্ষিরাজ উড়িয়া যান; ইনি অমৃত উদ্ধারকারী, আধ্যাত্মিকতার প্রতীক। পরমপুরুষ বিষ্ণু যেন সমন্বয়কারী—একদিকে সর্পশত্রু গরুড়রূপী আধ্যাত্মিকতা, অপরদিকে সর্পরূপ মূল পদার্থ। শ্রেষ্ঠতম দেবতাকে বুঝাইতে হিন্দুরা অপূর্ব দুইটি প্রতীকের ব্যবহার করিয়াছেন।

মুচলিন্দ বুদ্ধ মূর্তিকেও প্রতীক মনে করা যাইতে পারে। নাগরাজ মুচলিন্দের অধিকৃত বৃক্ষতলে বুদ্ধ ধ্যান সমাধিস্থ হইলেন। অকস্মাৎ ঝড় বৃষ্টি আরম্ভ হইল। সাতদিন ধরিয়া দুর্যোগ চলিল। বৃক্ষের অভ্যন্তর হইতে বাহির হইয়া আসিয়া সর্পরাজ ধ্যান সমাহিত বুদ্ধদেবকে সাতপাকে জড়াইয়া ফণার দ্বারা তাঁহার মস্তক আচ্ছাদিত করিয়া রাখিল। সাতদিন পরে দুর্যোগের অবসানে মুচলিন্দ মানুষের মূর্তি ধরিয়া বুদ্ধের নিকট করজোড়ে দাঁড়াইল।[১৫] দুইটি পরস্পর বিরোধী ভাবকে ইহার ভিতর প্রতীকের দ্বারা আভাসিত করা হইয়াছে। বার বার জন্মগ্রহণের জীবনী শক্তির প্রতীক এই নাগ, অপরদিকে বুদ্ধ এই অন্ধ শক্তিকে জয় করার, জন্মের বন্ধন হইতে মুক্তি দানের ইঙ্গিত করেন। নানা দুঃখ বরণের ভিতর দিয়া (দুর্যোগ) অবশেষে বুদ্ধ জয়ী হইলেন। তিন, সাত, নয় প্রভৃতি সংখ্যা রহস্যময়। সাত দিন, সাত পাক প্রভৃতি বিষয়টিকে রহস্যময় করিয়া তুলিয়াছে।

অন্যান্য প্রাচ্য দেশীয়দের ন্যায় ইহুদীরাও যথেষ্ট প্রতীকের প্রয়োগ করিয়াছেন। সলোমনের মন্দিরে[১৬] প্রচুর প্রতীক আছে। মনীষী আহিজা যে জেরোবোয়ামের পরিচ্ছদ ছিন্ন করিয়াছিলেন তাহা যুদা হইতে ইস্রেলের পৃথকী করণের সঙ্কেত করে। ......যোশেফাস্ লিখিয়াছেন যে প্রধান পুরোহিতের পরিচ্ছদটি সম্পূর্ণরূপেই প্রতীক: কোটটি পৃথিবীর প্রতীক;

১৫। Zimmer, H : Myths & Symbols in Indian Art & Civilization.

১৬। সলোমনের মন্দির—সলোমন ছিলেন ইসরেলের রাজা—খ্রীষ্ট পূর্ব ৯৩৭ সনে তিনি মারা যান। তিনি ছিলেন অতীব জ্ঞানী। পিতা ডেভিডের আকাঙ্ক্ষা ছিল একটি মন্দির তৈয়ারী করা। পিতার আকাঙ্ক্ষা অপূর্ণ ছিল, পুত্র মৃত পিতার সেই আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করেন। এই মন্দির তৈয়ারী করিতে সাত বৎসর লাগিয়াছিল—ইহা জেহোভার নামে অর্পিত হয়।

উপরিতম পরিচ্ছদটি স্বর্গের এবং উহার মধ্যে গ্রথিত স্বর্ণ ঈশ্বরের মহিমার সঙ্কেত করে।[১৭]

মেক্সিকোর জাতীয় সংগ্রহশালায় আজ্‌টেক্‌দের (Aztec—মেক্সিকোর একটি আদিম জাতি) ধরিত্রী দেবীর মূর্তি রক্ষিত আছে। ধরিত্রী দেবীকে খুসী না রাখিতে পারিলে মানুষের শান্তি নাই। সেই জন্যই আজ্‌টেকদের ধরিত্রীদেবীর মূর্তিতে নরকপাল ও হৃৎপিণ্ড গ্রথিত করা হইয়াছে বলিয়া মনে হয়।[১৮] মৃত্যুর পর নরদেহ মাটিতেই মিশিয়া যায় ধরিত্রী দেবীর অঙ্গে গ্রথিত নরকপাল তাহারই সঙ্কেত করে: নরকপাল মৃত্যুর প্রতীক। হৃৎপিণ্ডই পুষ্টি দান করে—ধরিত্রী দেবীর অঙ্গে মানুষের হৃৎপিণ্ড গ্রথিত করিয়া হয়ত তাঁহার পুষ্টি সাধনের ইঙ্গিতই করিতে চাহিয়াছিল মেক্সিকোর এই আদিম জাতি।

শিবলিঙ্গ সৃষ্টি শক্তির প্রতীক ব্যতীত আর কিছুই নয়।

নটরাজের নৃত্য সৃষ্টি ও ধ্বংসের প্রতীক। তাঁহার দক্ষিণ হস্তে ডম্বরু এবং বাম হস্তে অগ্নিশিখা। ডম্বরু একদিকে নৃত্যের তাল রক্ষা করে আবার স্মরণ করাইয়া দেয় যে শব্দই ব্রহ্ম—ইহা সৃষ্টির প্রতীক। অগ্নি ধ্বংসের প্রতীক। দ্বিতীয় দক্ষিণ হস্তে অভয় মুদ্রা: উহা অভয় বাণী ও শান্তির দ্যোতক। দ্বিতীয় বাম হস্তটি উচ্চে উত্থিত বাম পদের দিকে লক্ষ্য করিতে বলিতেছে। শূন্যে উত্থিত পদ মুক্তির সঙ্কেত করে, উহা ভক্তের আশ্রয় এবং মুক্তি দানকারী। এই হস্তে গজ-হস্ত-মুদ্রা লক্ষ্য করা যায়: গজ গণেশকে স্মরণ করাইতেছে, উহা সমস্ত বাধা অপসারণের প্রতীক। এই হস্তটি যেন বলিতে চায় যে, যে-ভক্ত আশ্রয় চায় তাহার সমস্ত বাধা দূর হইয়া যাইবে। বামন আকারের একটি দৈত্যের দেহের উপর নটরাজ নৃত্যরত—ইহার নাম অপস্মার পুরুষ: ইহা জীবনের অন্ধতা, অজ্ঞানতার প্রতীক। এই দৈত্যকে পরাভূত করার অর্থ অজ্ঞানতা দূর করিয়া সত্যকার জ্ঞানের আলোক লাভ: অজ্ঞানতার অন্ধকার হইতে জ্ঞানের আলোকে না পৌঁছাইলে তো মুক্তি নাই! একটি অগ্নিশিখার চক্র, প্রভামণ্ডল, মূর্তিটিকে

১৭। The Encyclopedia Americana : Vol. 26. under Symbolism.

১৮। Erwin, Christensen : Primitive Art : p-164

ঘিরিয়া রহিয়াছে ; ইহাকে ব্রহ্মাণ্ডের জীবনদায়ী শক্তি বলা যাইতে পারে, অথবা ইহাকে পরমাত্মার স্বর্গীয় সত্যের আলোকও মনে করা চলে।[১৯]

খাজুরাহর মহাদেব মন্দিরের শার্দুল মূর্তিটি[২০] একটি বিস্ময়। শার্দুলের মুখের সম্মুখে একটি আধা উপবিষ্ট নারী। শার্দুল সম্মুখের থাবা দ্বারা নারীর হাত দুইটি ধরিয়া আছে—উভয়ের দৃষ্টি উভয়ের প্রতি নিবদ্ধ। মূর্তিটি কিসের প্রতীক তাহা বলা দুরূহ। ইহার তাৎপর্য পশুশক্তি সৌন্দর্যকে বিনষ্ট করে ইহাও হইতে পারে—অথবা সৌন্দর্য দেখিয়া পশুশক্তিও স্তম্ভিত হইয়া যায় তাহাও হইতে পারে। ভারতবর্ষের ভাব-কল্পনার আদর্শ স্মরণ করিলে দ্বিতীয় অর্থটিই অধিকতর গ্রহণযোগ্য বলিয়া মনে হয়। বিশেষ শার্দুলের মুখের ভঙ্গীতে ভয়ঙ্করতার ছাপ নাই, এবং নারীর মুখেও কোন ভীতি বিহ্বল ভাব নাই।

ভারতীয় শিল্প কোন কিছুকে স্পষ্ট করিয়া প্রকাশ করার পরিবর্তে যেন এক গভীরতর তাৎপর্যপূর্ণ অভিজ্ঞতার দিকে লইয়া যায়। এই শিল্পকলার উদ্দেশ্য বিশ্বজনীন অবিনশ্বর, অনন্ত সত্তাকে উপলব্ধি করা। স্বর্গীয় সুষমাকে মর্তে প্রকাশ করার চেষ্টা প্রতিনিয়তই ইহাতে প্রকাশিত হয়—"Indian art is essentially idealistic, mystic symbolic and transcendental" (Havell : Indian Sculpture & Painting : p-25).

ভারতের প্রধান শিল্প ভাস্কর্য, ইহাতে মানুষের মূর্তিই প্রধানতঃ রূপ পাইয়াছে। কিন্তু মানুষটির অঙ্গ প্রত্যঙ্গের নিখুঁত রেখা ফুটাইয়া তুলিবার আকাঙ্ক্ষা যেন কোন শিল্পীরই ছিল না। মূর্তিগুলি ধ্যানের মাধ্যম হইয়া উঠিয়াছে। দেহ সৌষ্ঠব প্রকাশ করা অপেক্ষা অনির্বচনীয়তার সঙ্কেতেই তাহারা অধিকতর উপযোগী।

ভারতীয় শিল্পকলায় প্রতীকেরই প্রাধান্য। এই প্রতীকে ভারতীয় দর্শনতত্ত্বের বিশেষ পরিচয় আছে, "......all Indian symbolism had a double meaning. One appeals to the popular mind, and the other, more obtruse to the teacher and the philosopher." (Perviz N. Peerozshaw Dubash : Hindoo Art in its social setting :

১৯। Zimmer, H : Myths & Symbols in Indian Art & Civilization : p : 152-153.

২০। Plate VII : Khajuraho : B. L. Dhama & S. C. Chandra (2nd Ch.) : Department of Archaeology : India.

Forwarded by S. Radhakrishnan p-142). ভারতীয় দর্শনতত্ত্ব না জানিলে তাহার প্রতীক উপলব্ধি করা সম্ভব নয়। এই বিষয়ে অজ্ঞ ব্যক্তিরা সেই জন্যই ভারতীয় শিল্পের তাৎপর্য সম্পূর্ণ বুঝিতে পারে না। অনেক ক্ষেত্রে উহাকে বিকৃত রুচির পরিচায়ক বলিয়া হেয় জ্ঞানও করে।[২১]

ইলোরার ১৪ সংখ্যক এবং কৈলাস নামক বিখ্যাত ১৬ সংখ্যক গুহায় মহিষমর্দিনীর মূর্তি আছে।[২২] দেবীর মুখে চোখে এক অপূর্ব ভাব ফুটিয়া উঠিয়াছে—অসুরের বিরাট দেহের কোথাও ভয়ংকরতার চিহ্ন নাই; বরং একটা প্রীতির ভাবই লক্ষ্য করা যায়। মহিষের মূর্তি হইতে নির্গত এই অসুরের মুখ নারীর ন্যায় কোমল এবং কমনীয়। সে যেন দেবীর নিকট নিয়তির বিধান মাথা পাতিয়া লইবার জন্য আত্মসমর্পণ করিয়াছে। দেবী অসুরের কেশ ধারণ করিয়া শেষ আঘাত হানিবার জন্য উদ্যত হইয়াছেন; কিন্তু তাঁহার মুখেও কোন ক্রোধের চিহ্ন নাই—তিনি যেন এক পরম প্রশান্তিতে সমাচ্ছন্ন। দেব ও মানবকে উদ্ধারের জন্য তিনি আবির্ভূত হইয়াছেন সত্য কিন্তু তাহা তো নিতান্তই মায়া। এই লীলা তাঁহারই মধ্যে—অসুর তো পূর্ব হইতেই বধ হইয়া আছে: সবই প্রপঞ্চ। মহিষমর্দিনী যে প্রতীক মাত্র তাহাই ভাস্কর বুঝাইয়াছেন।

বোধিসত্ত্বের সৃষ্টিকারী সত্তার প্রতিভূ মঞ্জুশ্রী। তাঁহার হস্তের উদ্যত তলোযার জ্ঞানের প্রতীক। জ্ঞানরূপ তলোযারের দ্বারা তিনি অজ্ঞানতা দূর করেন[২৩]। বৌদ্ধযুগের পূর্বেকার সমাধির আকার (স্তূপ) বুদ্ধের শেষ জীবনের অর্থাৎ পরিনির্বাণের প্রতীক হইযা উঠিয়াছে। কোন কোন স্তুপের অভ্যন্তরে বুদ্ধেব প্রধান প্রধান শিষ্যের দেহাবশেষ (অস্থি) পাওয়া গিয়াছে[২৪]।

২১। মন্দির গাত্রের মিথুনের চিত্রগুলিই বিশেষ ভাবে স্মরণীয়। এইগুলির তাৎপর্য কে কেবল বিদেশীরাই উপলব্ধি করেন নাই তাহা নহে; বর্তমানের শিক্ষায় শিক্ষিত ভারতীয়দের নিকটও এইগুলি সেই যুগের রুচিহীনতার পরিচায়ক হইয়াই রহিয়াছে। ভারতীয় আদর্শ এবং জাতির জীবন-চর্যা হইতে বিচ্যুত হওয়ার ফলেই এইরূপ ঘটিয়াছে।

২২। যাভা ভারতীয় শিল্প কৌশল আয়ত্ত করিয়াছিল বহু প্রাচীনকালে। সেখানেও এইরূপ একটি মূর্তি পাওয়া গিয়াছে।

২৩। Havell, E. B.: Indian Sculpture & Painting: Ch. IV. picture given in plate XVIII.

২৪। Ananda K. Coomaraswamy: History of Indian & Indonesian Art: P—30.

যে স্থাপত্য শিল্পের পরিচয় মন্দির গীর্জা প্রভৃতিতে রহিয়াছে তাহাও প্রতীক ধর্মী। বিভিন্ন প্রকার স্থাপত্য গঠনরীতি বিভিন্ন প্রকার প্রতীকের কাজ করিয়াছে। প্রতীক সন্ধানীরা গ্রীক্ মন্দিরে নৈতিক ও আধ্যাত্মিক সত্যের প্রতিফলন দেখিয়াছেন; আর সেই সঙ্গে গ্রীক্ জাতির চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যেরও সন্ধান পাইয়াছেন। মন্দিরের ভিত্তিভূমির দৃঢ়তা, ছাদের গাম্ভীর্য যেন আবেগকে সংযত রাখিতে চায়। প্রাচীন গ্রীক্ মন্দিরগুলির মোটা মোটা স্তম্ভগুলির শীর্ষদেশ চৌকা আচ্ছাদনের দ্বারা আবৃত। মনে হয় স্তম্ভগুলি আবেগের ফেণায়িত উর্ধগতির পরিচায়ক, আচ্ছাদনগুলি যুক্তির বন্ধন। আবেগকে যুক্তির শৃঙ্খলায় আবদ্ধ করাই ছিল যুক্তিবাদী গ্রীক্দের লক্ষ্য। স্তম্ভ ও আচ্ছাদন নিয়তির দ্বারা খর্বীকৃত মানুষের আকাঙ্ক্ষার প্রতীকও হইতে পারে[২৫]।

খ্রীষ্টানদের গীর্জায় বহু সংখ্যক চুড়া ছাদ ছাড়াইয়া উপরের দিকে মাথা বাড়াইয়া আছে। এইগুলি ভগবানের উদ্দেশ্যে ভক্তদের হস্ত প্রসারণের প্রতীক। মধ্যযুগের গীর্জাগুলি সহরের অন্যান্য গৃহ অপেক্ষা উচ্চ হইত—ঈশ্বরের শ্রেষ্ঠত্ব ইহাতে সূচিত হইত। গীর্জার মধ্যভাগের গঠন নৌকার ন্যায়—নোয়ার নৌকায় যেমন বিশ্বাসীরা স্থান পাইয়াছিল সেইরূপ গীর্জায় যাঁহারা একান্তভাবে আশ্রয় লইবে সেই সব বিশ্বাসীদের স্বর্গের শান্তিময় লোকে লইয়া যাওয়া হইবে[২৬]।

গীর্জার নক্সার মধ্যেও একটা প্রতীকের সন্ধান পাওয়া যায়। ইহার প্রধান দিকটি পশ্চিমমুখী করিয়া প্রস্তুত—পশ্চিমে সূর্যাস্ত হয়, দিনের শেষ আলোটুকুও যেন গীর্জা পাইতে চায়। পুরোহিত পূর্বদিকে মুখ করিয়া দাঁড়ান—সেই দিকেই বেথ্‌লেহেম ও জেরুজালেম[২৭]: উহা সূর্য উদয়ের দিকও বটে। পূর্বদিক হইতেই অর্থাৎ জেরুজালেম বা বেথ্‌লেহেম হইতেই খ্রীষ্টীয়-সূর্যের, জগৎ-সূর্যের আবির্ভাব হইয়াছিল। উত্তর ও দক্ষিণের বারান্দা

২৫। Sheldon Cheney : World History of Art. p : 182-183

২৬। Ibid. Under Religious Symbolism in Ch. XIV.

২৭। বেথ্‌লেহেম ও জেরুজালেম সহর দুইটিই প্যালেষ্টাইনে অবস্থিত। প্রথম ক্ষুদ্র সহরটিতে যীশু জন্মিয়াছিলেন বলিয়া মনে করা হয় এবং নিকটস্থ জেরুজালেম-এ তাঁহাকে ক্রুশবিদ্ধ করা হয় এবং সেইখানেই তাঁহার কবর আছে এইরূপ অনুমিত হয়।

প্রাচীন ও নূতন টেস্টামেণ্ট[২৮]-এর প্রতীক। দক্ষিণের বারান্দায় যীশুর আবির্ভাবের চিত্র অঙ্কিত থাকে—যীশুর প্রচারিত ধর্মকে লইয়াই নূতন টেস্টামেণ্ট[২৯]।

জাপানীদের দেবমন্দির প্যাগোডা (জাপানী ভাষায় গোজুনোতো: Gojūnotō—অর্থাৎ পাঁচতলা চূড়া বা গম্বুজ)। বুদ্ধ স্তূপ হইতেই প্যাগোডার গঠন-রূপ কল্পিত হইয়াছে। পাঁচ, সাত এমন কি তের তলা প্যাগোডাও জাপানে আছে। সাত তলা প্যাগোডা হওয়াই যুক্তি সংগত কারণ ঈশ্বরের আবাস স্থল হিমালয় (মেরু) সাতটি স্তরে বিভক্ত। তবে জাপানে পাঁচতলা প্যাগোডাকেই অধিক পবিত্র বলিয়া মনে করা হয়। উহা উত্তর-দক্ষিণ, পূর্ব-পশ্চিম এবং কেন্দ্র এই পাঁচটির প্রতীক হইতে পারে অথবা ক্ষিতি, অপ, তেজ, মরুৎ ও ব্যোম এই পাঁচটি মূল পদার্থের সঙ্কেতও করিতে পারে[৩০]। ইহা সকল দিক এবং বস্তু বিশ্বের উপর বুদ্ধের আধিপত্যের দ্যোতনা করে।

প্যাগোডা ব্রহ্মাণ্ডের প্রতীক; ইহার ভিত্তিভূমি পৃথিবী, ইহার মধ্যস্থল দিয়া যে প্রধান স্তম্ভটি গিয়াছে তাহা পৃথিবীর অক্ষদণ্ডস্বরূপ—পৃথিবীর সহিত ইহাই যেন স্বর্গের যোগসূত্র স্থাপন করিয়াছে। স্তম্ভের শীর্ষদেশের চতুষ্কোণ রূপটি ঈশ্বরের প্রাসাদ, ছত্র বুদ্ধের ঐশ্বরিক রাজকীয় মর্যাদার প্রতীক। সর্বোচ্চ চূড়াটি কারুকার্যে সমৃদ্ধ, হীরকের দ্যুতির ন্যায় আলোক বিচ্ছুরিত করে—ইহা বুদ্ধের উপলব্ধ সত্যের মহত্ত্ব ও পবিত্রতার প্রতীক, সকল কিছুর উপর উহা প্রদীপ্ত। সমগ্র প্যাগোডাটাই বুদ্ধের শ্রেষ্ঠত্ব ঘোষণা করে[৩১]।

প্রাচীন ভারতবর্ষীয় হিন্দু মন্দিরে, এমনকি অনেক অট্টালিকার স্থাপত্য শিল্পে এক বিশেষ উদ্দেশ্যের সন্ধান পাওয়া যায়—স্তম্ভ এবং স্তম্ভ শীর্ষের পদ্ম সৃষ্টিতত্ত্বের ইঙ্গিত করে। লক্ষ্মীর আসন পদ্ম, বিষ্ণুর নাভিদেশ হইতেও পদ্ম বাহির হইয়া তাহার উপর ব্রহ্মার জন্ম দিয়াছে। পদ্মকে হিন্দুরা নারীর প্রতীক বলিয়া মনে করেন।

২৮। টেষ্টামেণ্ট অর্থ ঈশ্বর মানবের পারস্পরিক বোধগম্যতা। প্রাচীন টেষ্টামেণ্ট-এ ইহুদীদের ধর্মের কথা লিপিবদ্ধ আছে। নূতন টেষ্টামেণ্ট যীশুর জীবন ও শিক্ষা এবং তাঁহার শিষ্যদের কার্যাবলীর পরিচয় দেয়। এই দুইটিকে একত্রে বাইবেল বলে।

২৯। Sheldon, C: World History of Art. Ch. XIV. (as in 26)

৩০। Hugo Munsterberg: The Arts of Japan. Ch. 2.

৩১। Ibid.

হিন্দু মন্দিরের চুড়া পর্বত শিখরের প্রতীক। মন্দিরগুলি যেন ঈশ্বরের আবাস স্থল হিমালয় পর্বত (মেরু পর্বত); মন্দিরে যাওয়ার অর্থ দেবতার আবাস স্থলে উপস্থিত হওয়া। স্বাভাবিক জলাশয় যেমন নদী, সমুদ্র ইত্যাদি অথবা খনন করা জলাশয়, পুষ্করিণী ইত্যাদির তীরে মন্দির নির্মাণই প্রশস্ত। যদি কোন প্রকার জলাশয় না পাওয়া যায় তবে মন্দির অথবা মূর্তি প্রতিষ্ঠা কালে প্রতীক রূপেও জল রাখিতে হয়। পবিত্র স্থানটির কেন্দ্রে জলাশয়ের প্রতীক রূপে তিনটি কলস রাখিতে হইবে।[৩২] কারণ হিন্দুদের নিকট জলের মর্যাদা অত্যন্ত বেশী—জল ব্যতীত পবিত্রতা সাধন হয় না। হিন্দু মুসলমান খ্রীষ্টান সকলেই জলকে শুদ্ধি করণের প্রতীক বলিয়া মনে করেন।[৩৩]

মন্দির প্রতিষ্ঠার স্থানটি অনুষ্ঠানাদির দ্বারা সমতল করা হয়, ইহাও প্রতীক ভিন্ন আর কিছুই নয়। এই সমতা বুদ্ধির সমতার দ্যোতক। মানুষের জ্ঞান যখন এক বিশেষ স্তরে গিয়া পৌঁছায় তখনই তাহার ঈশ্বরকে উপলব্ধি করিবার যোগ্যতা জন্মে। জ্ঞানের সেই স্তরটিকেই সমতল ভূমির প্রতীকের দ্বারা বোঝান হইয়াছে।[৩৪]

ভগবানের সন্নিকটে পৌঁছাইতে হইলে মানুষের আধ্যাত্মিক পরিবর্তন প্রয়োজন, দেবতার স্তরে তাহাকে পৌঁছাইতে হইবে। প্রতীকের দ্বারা তাহাও সাধন করা হয়। মন্দিরের গর্ভগৃহের দরজার খিলানে এবং দুই পার্শ্বে বহু দেবমূর্তি খোদাই করা বা অঙ্কিত থাকে। ভূপালে উদয় গিরিতে, দেওঘর মন্দিরে, ভুবনেশ্বরের ব্যোমকেশ্বরের মন্দিরে, খাজুরাহর কাণ্ডারিয়ার মন্দিরে গঙ্গা-যমুনার মূর্তি আছে। গঙ্গা-যমুনার মূর্তি বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। গুপ্ত যুগে গঙ্গা-যমুনার মূর্তি মন্দিরের গর্ভগৃহের দরজার দুই পার্শ্বে খোদাই করা থাকিত। এই নদী দুইটির উৎপত্তি স্বর্গে। গর্ভগৃহে মূল বিগ্রহের নিকট উপস্থিত হইবার পূর্বেই ইহাদের দিকে দৃষ্টি পড়ে, অমনি গঙ্গা-যমুনায় স্নানের

৩২। Stella Kramrisch. The Hindu Temple, P-5-6 (vol. I)

৩৩। ব্যাপটিজম্ কথাটা গ্রীক শব্দ ব্যাপটিজাইন (baptizein) হইতে আসিয়াছে—কথাটার অর্থ জলে ডুব দেওয়া। নৈতিক এবং আধ্যাত্মিক পরিশুদ্ধির জন্য দেহকে ধৌত করার রীতি বহু বিস্তৃত ছিল। খ্রীষ্টানরা ইহুদীদের নিকট হইতে এই রীতি গ্রহণ করেন। মুসলমানদের মধ্যেও নামাজের পূর্বে হাত পা ধৌত করিবার রীতি আছে।

৩৪। Stella Kramrisch: The Hindu Temple, P-7

ফল পাওয়া যায়ঃ সুতরাং মন্দির অভ্যন্তরের এই মূর্তিগুলি অকারণে অঙ্কিত হয় নাই—রূপকচ্ছলে ইহারা দর্শনার্থীর আধ্যাত্মিক পরিবর্তন সাধন করে।[৩৫]

মন্দিরের বাহিরেও নানা প্রকার মূর্তি দেখা যায়। উড়িষ্যার কোণারকের মন্দিরে গজ-সিংহের মূর্তি পাওয়া গিয়াছে। অদ্ভুত কিছু সৃষ্টির উদ্দেশ্যেই যে এইরূপ করা হইয়াছে তাহা মনে করিবার কোন কারণ নাই। ইহা প্রতীকের ছলে বৃষ্টির (গজ-প্রতীক) উপরে সূর্যের (সিংহ-প্রতীক) জয় ঘোষণার কথা স্মরণ করাইতে পারে। অথবা সংসারের জীবের রূপ হইতে রূপান্তর গ্রহণের প্রতীকও হইতে পারে।

দেব মন্দিরের গাত্রে নর-নারীর যৌন মিলনের যে মূর্তিগুলি বিকৃত রুচির পরিচায়ক বলিয়া আজ নিন্দিত সেগুলি একান্তই বিকৃত রুচির ফল বলিয়া মনে করিবার কারণ নাই। দেবমন্দিরেব গাত্রে এই সব মূর্তি খোদিত হইলেও সেই সব স্থানের রাজপ্রাসাদে বা অন্যত্র এইরূপ মূর্তি পাওয়া যায় নাই। রাজাদের বা জনসাধারণের' বিকৃত রুচি একমাত্র মন্দির গাত্রেই প্রতিফলিত হইল একথা মনে করিবার মত যুক্তি খুঁজিয়া পাওযা যায না।

এই মিলনের চিত্রগুলি (মিথুন মূর্তি) পরমাত্মার সহিত মানবাত্মার মিলনের প্রতীক। আলিঙ্গনাবদ্ধ নর-নারী অন্য সব কিছু ভুলিয়া যায় ঠিক সেইরূপ পরমাত্মার সহিত মিলিত মানবাত্মা জগৎ ব্যাপারকে ভুলিয়া যায়। পরমাত্মার সহিত মিলনে আত্মার সমস্ত আকাঙ্ক্ষা দূর হয়[৩৬]। সুতরাং মন্দির গাত্রের নরনারীর মিলিত রূপটি যৌন বিকৃতির পরিচায়ক নয়, ইহা

৩৫। Stella Kramrisch: The Hindu Temple, pp-314-315. (vol. II)

৩৬। Stella Kramrisch: The Hindu Temple, p-346. (vol. II)

তদ্বা অস্যৈতদতিচ্ছন্দা অপহতপাপ্মাভয়ং রূপম্। তদ্ যথা প্রিয়য়া স্ত্রিয়া সম্পরিষ্বক্তো ন বাহ্যং কিঞ্চন বেদ নান্তরমেবমেবায়ং পুরুষঃ প্রাজ্ঞেনাত্মনা সম্পরিষ্বক্তো ন বাহ্যং কিঞ্চন বেদ নান্তরং তদ্বা অস্যৈতদাপ্তকামমাত্মকামমকামং রূপং শোকান্তরম্॥ (বৃহদারণ্যকোপনিষৎ: ৪।৩।২১)

ঐ যে অবস্থা, উহাই ইঁহার কামাতীত, ধর্মাধর্মবর্জিত, ও অভয় রূপ। ঐ বিষয়ে দৃষ্টান্ত এই—প্রিয়া পত্নীর দ্বারা আলিঙ্গিত ব্যক্তি যেমন বাহিরের বা ভিতরের কিছুই জানে না ঠিক তেমনি এই প্রত্যগাত্মা পরমাত্মার সহিত একীভূত হইয়া বাহিরের বা ভিতরের কিছুই জানেন না। এই যে রূপটি, ইহাই ইঁহার আপ্তকাম (পূর্ণকাম), আত্মকাম (আত্মার সেই স্বরূপ যাহা হইতে সমস্ত কাম্যবস্তু অভিন্ন) ও শোকহীন রূপ [স্বামী গম্ভীরানন্দ সম্পাদিত উপনিষৎ গ্রন্থাবলী, ৩য় ভাগ: উদ্বোধন কার্যালয়, ২য় সং]।

মোক্ষের প্রতীক : প্রকৃতি পুরুষের মিলন—পরমাত্মার সহিত আত্মার সাযুজ্য—

"Gods and ascetics therefore should be represented in their love sport (krida, līlā) on the walls of temples but ascetics practising the game of love should not figure on the habitations of men for their game is none of the three purposes of life [Kāma, Lust, with the discipline of its satisfaction, is the third of the 4 purposes of life which are lawfulness (dharma), the acquisition of wealth (artha), the satisfaction of lust (kāma) and the attainment of final release (moksa)]. It is a symbol of final release, its fourth and ultimate purpose." (S. Kramrisch : The Hindu Temple : vol. II, p-347)

ভাস্কর্যে ও চিত্রে প্রতীক ব্যবহারের সুযোগ আরও অনেক বেশী। একটি গৃহের গঠনভঙ্গী-দ্বারা যাহা ইঙ্গিত করা যায় স্বভাবতই তাহা অপেক্ষা অনেক সূক্ষ্ম ইঙ্গিত করিবার সুযোগ রহিয়াছে ভাস্কর্যে ও চিত্রে বস্তু এবং রং-এর প্রয়োগের দ্বারা। প্রস্তরখণ্ড, কাষ্ঠ, মাটি বা রং কোন কিছুই বুঝায় না—শিল্পীর কৌশলেই কেবল উহারা তাৎপর্য মণ্ডিত হইয়া ওঠে।

প্রথম যুগে বুদ্ধের কোন মূর্তি গঠন করা হইত না। বোধিদ্রুম, পিপ্পল বৃক্ষ, পদচিহ্ন, সিংহাসন, ধর্মচক্র, ছত্র প্রভৃতি অঙ্কিত বা খোদিত করিয়া বুদ্ধের উপস্থিতি বুঝান হইত : ওইগুলিই ছিল বুদ্ধের প্রতীক। গ্রীক্‌দের সহিত যোগাযোগের পরই বুদ্ধমূর্তি অঙ্কন বা খোদিত করা আরম্ভ হইয়াছে বলিয়া অনুমিত হয়।

বুদ্ধ অমিতাভ-র চিত্রটি পদ্মের আসনে উপবিষ্ট। তাঁহার দক্ষিণে ও বামে লামা ও ঋষিগণ রহিয়াছেন। পদতলে একটি দৈত্য। বুদ্ধের দক্ষিণ হস্ত মাটির দিকে নিবদ্ধ—ইহা মারের লোভ জন্মাইবার প্রচেষ্টাকে স্মরণ করাইয়া দিতেছে ; মারের বিরুদ্ধে ধরিত্রী মাতা সাক্ষ্য দিতে আসিয়া তাহাকে ভাসাইয়া লইয়া গিয়াছিলেন সেই কথাও ইহা স্মরণ করাইতেছে। অমিতাভের মস্তকের চারিপাশে এক সবুজ রং-এর চক্র। তিনি ছিলেন পশুজগতের ত্রাণকর্তা—সবুজ চক্র তাহার প্রতীক হইতে পারে অথবা ইহা

তাঁহার পশুরূপ ধারণ করিয়া একাধিকবার জন্মগ্রহণের কথাও স্মরণ করাইয়া দিতে পারে।[৩৭]

ভারতবর্ষের শিল্পে প্রধান মূর্তিটি পার্শ্বস্থ মূর্তিগুলি অপেক্ষা আকারে অনেক বড় করিয়া দেখান হয়। অজন্তার বিখ্যাত বোধিসত্ত্ব মূর্তি তাহার সাক্ষ্য[৩৮] (১ সংখ্যক গুহা)—অন্যান্য মূর্তি অপেক্ষা ইহার আকার অনেকগুণ বড়। তাঁহার পার্শ্বে রহিয়াছেন তাঁহার সুন্দরী পত্নী। কিন্তু বোধিসত্ত্বের মুখ দেখিয়া মনে হয় যে তিনি জগৎ ব্যাপারের অনেক ঊর্ধ্বে উঠিয়া গিয়াছেন। তিনিই পৃথিবীতে শ্রেষ্ঠ এবং তিনি পার্থিব জগৎকে অতিক্রম করিয়া রহিয়াছেন ইহাই প্রতীকচ্ছলে দেখান হইয়াছে তাঁহার বিরাট মূর্তি অঙ্কিত করিয়া।

আদর্শবোধ বিভিন্ন শিল্পীর মনে বিভিন্ন প্রকার চিত্র জাগাইয়া তোলে। কখনও কখনও এই মানসিক রূপটি এমন হইয়া ওঠে যে তাহার মধ্যে সমগ্র জাতির অভিজ্ঞতার সন্ধান পাওয়া যায়। শিল্পী যখন কোন প্রতীক অবলম্বনে সেইরূপ ভাবকে রূপদান করেন তখন সমগ্র জাতিই যেন তাহা অনেকটা উপলব্ধি করিতে পারে। ভারতীয় শিল্পে এত অধিক প্রতীকের প্রয়োগ নিশ্চয়ই বিষয়কে সম্পূর্ণ দুর্বোধ্য করিয়া রাখার উদ্দেশ্যে করা হয় নাই। জাতির অধ্যাত্ম সাধনার সহিত জনচিত্তের ঘনিষ্ঠ যোগ ছিল ঃ তাই সাধারণ মানুষও শিল্পীদের প্রতীক উপলব্ধি করিতে পারিত। তাহাদের উপলব্ধির ক্ষমতার অতীত হইলে শিল্পীরা প্রতীকের এত অধিক প্রয়োগ করিতে পারিতেন না। জাতির সাধনা হইতে আজ জনচিত্ত অনেকখানি সরিয়া গিয়াছে বলিয়া শিল্পের প্রতীকগুলি প্রায় দুর্বোধ্য হইয়া উঠিয়াছে।

বর্ণকেও প্রতীকরূপে প্রয়োগ করা হইয়াছে। কৃষ্ণবর্ণ মৃত্যুর এবং রক্তবর্ণ জীবনের প্রতীক হইতে পারে।[৩৯] হিন্দু এবং বৌদ্ধরা শ্বেত বর্ণকে স্বর্গীয় পবিত্রতা এবং আনন্দের প্রতীক বলিয়া মনে করিতেন। ইহা

৩৭। E. B. Havell: Indian Sculpture & Painting Part II. Ch. I. Picture between p-176 & p-177.

৩৮। অজন্তা ইলোরার বহু গুহার ভাস্কর্যে, বোধিসত্ত্বের নানা চিত্রে ইহার পরিচয় আছে। অজন্তার ২৬ সংখ্যক গুহার পরিনির্বাণের শায়িত মূর্তিটিও সেইরূপ।

৩৯। Erwin Christensen. Primitive Art: p-316.

বরফাবৃত কৈলাস এবং হর-পার্বতীকে স্মরণ করায়: জলের প্রতীকও শ্বেত বর্ণ—জলও পবিত্র।[৪০]

সূর্য, মুক্ত আত্মার আবাসস্থল সূর্যমণ্ডল এবং সৃষ্টিকর্তা ব্রহ্মার দেহ রক্তবর্ণ: সুতরাং জীবনদায়িনী শক্তির প্রতীক রক্তবর্ণ। আকাশ পৃথিবী আবৃত করিয়া আছে, যেন অঙ্কে ধারণ করিয়া আছে। সেই পৃথিবী ধারণকারী আকাশের বর্ণ নীল: অতএব পালনকর্তা বিষ্ণুর বর্ণও নীল—তাঁহার দুইটি অবতার শ্রীকৃষ্ণ এবং রামচন্দ্রের গাত্রবর্ণও নীল।[৪১] যজ্ঞে অনেক সময় রক্ত, নীল এবং শ্বেত এই তিন বর্ণের সামগ্রী ব্যবহৃত হয়—অনেক সময় এই তিন রঙের দ্বারা আলপনা দেওয়া হয়। যজ্ঞস্থানে বা উৎসবে এই তিন রং-এর সম্মিলন ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বরের উপস্থিতির প্রতীক।

পীত সন্ন্যাসীদের পরিধেয় বস্ত্রের বর্ণ এবং উহা তাঁহাদের উদ্দেশ্যের স্মারক। সন্ন্যাসীদের লক্ষ্য মানব সমাজের মঙ্গল সাধন, সুতরাং বৌদ্ধরা পীতকে মানবতার প্রতীক বলিযা মনে করিতেন।[৪২] এই জন্যই মৈত্রেয, মঞ্জুশ্রী এবং অনেক বুদ্ধমূর্তি পীতবর্ণের করা হয়। শ্রীকৃষ্ণের বসনও পীত। ধরিত্রীর প্রতীকও পীতবর্ণ। শ্রীকৃষ্ণের বসনের বর্ণ মানবের মঙ্গল সাধনের সঙ্কেতও করিতে পারে—অথবা তিনি ধরিত্রীর পালনকর্তা ইহাও বুঝাইতে পারে।

সবুজ পশু জগতের প্রতীক।[৪৩]

মহাশূন্যতার প্রতীক কৃষ্ণবর্ণ।[৪৪] সমস্ত বর্ণের অনুপস্থিতির ফলেই কৃষ্ণত্ব—এইখানে আলোকের অভাব। তাই ইহা রূপহীনতার প্রতীক। সৃষ্টির আদিতে যে রূপহীন মহাশূন্যতা ছিল এবং প্রলয়ের পরও যে রূপহীন মহাশূন্যতা দেখা দেয় ইহা তাহারই প্রতীক বলিয়া বিশ্বমাতা এবং ধ্বংসকারিনী দেবী কালিকা করালবদনা, নগ্নিকা এবং কৃষ্ণবর্ণা—"বিদ্যুৎ যেমন মেঘ হইতে জন্ম লইয়া মেঘের মধ্যেই মিলাইযা যায, ঠিক সেইরূপ ব্রহ্মা এবং অন্যান্য দেবতা কালিকা হইতে জন্মে এবং তাঁহারই মধ্যে মিশিয়া যায়" (নির্বাণ তন্ত্রম্: সত্যলোককথনং নাম দশমঃ পটলঃ—শঙ্করের উক্তি)। তিব্বতীয় বৌদ্ধরা কৃষ্ণবর্ণকে নরকের প্রতীক বলিয়া মনে করেন।[৪৫]

৪০। E. B. Havell. Indian Sculpture & Painting. p-173.

৪১; ৪২; ৪৩; ৪৪। E. B. Havell: Indian Sculpture & Painting: p-173—174.

৪৫। E. B. Havell: Indian Sculpture & Painting: p-173—174.

গুণত্রয়ের প্রতীকরূপেও বর্ণের প্রচলন ছিল : সত্ত্ব—শ্বেত : রজ—পীত অথবা রক্ত ; তম—নীল অথবা কৃষ্ণ।[৪৬]

'বিষ্ণু ধর্মোত্তরম্'[৪৭]-এ আট প্রকার স্থায়ী রসের কথা বলা হইয়াছে এবং সেই আটটি রসের প্রতীকরূপে বিভিন্ন বর্ণের এবং দেবতার উল্লেখও করা হইয়াছে :

	রস		বর্ণ		দেবতা
১।	শৃঙ্গার	...	গাঢ় নীল	...	বিষ্ণু
২।	হাস্য	...	শ্বেত	...	রাম
৩।	রৌদ্র	...	রক্ত	...	ইন্দ্র
৪।	বীর	...	পীতাভ শ্বেত	...	রুদ্র
৫।	করুণ	...	ধূসর	...	বরুণ
৬।	ভয়ানক	...	কৃষ্ণ	...	যম
৭।	বীভৎস	...	নীল	...	শিব
৮।	অদ্ভুত	...	পীত	...	ব্রহ্মা

ভরতের নাট্যশাস্ত্রেও এইরূপ বলা হইয়াছে—

	রস		বর্ণ		দেবতা
১।	শৃঙ্গার	...	শ্যাম	...	বিষ্ণু
২।	হাস্য	...	শ্বেত	...	প্রমথ
৩।	করুণ	...	কপোত	...	যম
৪।	রৌদ্র	...	রক্ত	...	রুদ্র
৫।	বীর	...	গৌর	...	মহেন্দ্র
৬।	ভয়ানক	...	কৃষ্ণ	...	কাল
৭।	বীভৎস	...	নীল	...	মহাকাল
৮।	অদ্ভুত	...	পীত	...	ব্রহ্মা

শ্যামো ভবতি শৃঙ্গারঃ সিতো হাস্যঃ প্রকীর্তিতঃ।
কপোতঃ করুণশ্চৈব রক্তো রৌদ্রঃ প্রকীর্তিতঃ॥ ৪২
গৌরো বীরস্তু বিজ্ঞেয়ঃ কৃষ্ণশ্চৈব ভয়ানকঃ।
নীলবর্ণস্তু বীভৎসঃ পীতশ্চৈব বাদ্ভুতঃ স্মৃতঃ॥ ৪৩

৪৬। Apurva Prakash : The Foundation of Indi^n Art & Archaeology : p—75.

৪৭। Ibid.

শৃঙ্গারো বিষ্ণুদেবত্যো হাস্য প্রমথ দৈবতঃ।
রৌদ্রো রুদ্রাধিদৈবত্যঃ করুণো যমদৈবতঃ॥ ৪৪
বীভৎসস্থ মহাকালঃ কালদেবো ভয়ানকঃ।
বারো মহেন্দ্রদেবঃ স্যাদদ্ভুতো ব্রহ্মদৈবতঃ॥ ৪৫

(নাট্যশাস্ত্রম্ : শ্রীমদভিনবগুপ্তাচার্য বিরচিত বিবৃতি সমেতম্ : ষষ্ঠোধ্যায়)

কেন বিশেষ বিশেষ দেবতা এইরূপ এক একটি রসের প্রতীকরূপে কল্পিত হইয়াছিলেন তাহার কারণ দর্শাইয়া অভিনব গুপ্ত বলিয়াছেন—

বর্ণাভিধানং পূজাদৌ ধ্যান উপযোগি। মুখরাগে পীত্যন্থে। স্বচ্ছপীতৌ শমাদ্ভুতাবিতি শান্তবাদিনাং পাঠঃ। তত্তদ্র সসিদ্ধৌ সা সা দেবতা পূজ্যোতি দেবতা নিরূপণম্। বিষ্ণু কামদেবঃ। প্রমথা ভগবতো গণাঃ ক্রীড়াপরাঃ। রুদ্র স্ত্রৈলোক্য সংহারকর্তা। অতএব চোদয়তীতি নিয় (চ যময়তীতি য) মেন বধাদিকে সম্পাদিতে করুণঃ। মহাকালো ধিদৈবতামিতি শেষঃ। স হি তদ্বিভাবং কঙ্কালং শ্মশানাদি সেবতে। মহেন্দ্র স্ত্রৈলোক্যরাজঃ। ব্রহ্মা অচিন্ত্যাদ্ভুত স্রষ্টা।

স্বপ্নরাজ্যেও প্রচুর প্রতীকের প্রয়োগ হয় বলিয়া মনস্তত্ত্ববিদেরা মনে করেন। ফ্রয়েড মনে করেন যেখানে কোন কারণে আকাঙ্ক্ষাকে জোর করিয়া দমন করা হয় সেখানেই স্বপ্ন ছদ্মবেশ ধারণ করিয়া আত্মপ্রকাশ করে। প্রকাশের অনিচ্ছা (অর্থাৎ অবদমন) প্রতীক সৃষ্টির কারণ। রাষ্ট্রের ক্ষমতাশীল ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে কিছু বলিতে হইলে যেমন বক্তব্যকে স্পষ্ট করিয়া না বলিয়া নানা ইঙ্গিতের সাহায্য লইতে হয় ঠিক সেইরূপ অবদমিত ইচ্ছা প্রতীকের সাহায্যে মনের প্রহরীকে এড়াইয়া আত্মপ্রকাশ করে।[৪৮] মনের যে আকাঙ্ক্ষা স্বপ্নের উৎস তাহাকে গোপন করিবার জন্যই স্বপ্ন প্রতীকধর্মী হয়।[৪৯]

অবদমিত ইচ্ছার প্রকাশ সুস্থ স্বাভাবিক জাগ্রদবস্থায় সম্ভব নহে, কিন্তু চোর যেমন ছদ্মবেশে ভদ্রলোক সাজিয়া পুলিসের দৃষ্টি এড়াইয়া নিজ কার্য-সিদ্ধির চেষ্টা করে, সেইরূপে অনেক সময় অবদমিত ইচ্ছাও ছদ্মবেশে বা পরিবর্তিত আকারে মনের প্রহরীকে এড়াইয়া আত্মপ্রকাশ করে—মনের প্রহরী সামাজিক, নৈতিক প্রভৃতি কারণে স্বাভাবিকরূপে এই আকাঙ্ক্ষাকে

৪৮। The complete Psychological Works of Sigmund Freud, Vol. IV p: 141—142.

৪৯। C. G. Jung : Psychology of the Unconscious : p—12.

প্রকাশিত হইতে দিবে না জানিয়াই সেই অবদমিত ইচ্ছা ছদ্মবেশ ধারণ করিতে বাধ্য হয়। এইরূপ অবস্থায় অবদমিত ইচ্ছা প্রতীক রূপ ধারণ করিয়া সংজ্ঞানে দেখা দেয়।

এই অবদমিত ইচ্ছার কার্য বুঝাইতে গিরীন্দ্রশেখর বসু বলিয়াছেন, "আদিম জাতিদের মধ্যে নানা বিষয়ে নানা বাধানিষেধ বা বিশেষ বিশেষ বস্তুতে অত্যধিক ভয় ভক্তি আরোপিত হইতে দেখা যায়। এ সমস্ত মনোভাবের সহিত প্রতীক কল্পনা জড়িত। অনেক সময় আমরা দেখিতে পাই যে, কোন কোন স্ত্রীলোক ইঁদুর বা আরসোলা দেখিলে অত্যন্ত ভয় পান; অথচ প্রকৃতপক্ষে এসকল প্রাণী হইতে ভয়ের কোন কারণ নাই। এই ভয় অশিক্ষিতা সরলা গ্রাম্য বঙ্গবালা হইতে আরম্ভ করিয়া উচ্চশিক্ষিতা, ব্যাপিকা, ব্রিটিশ রমণী পর্যন্ত সকল শ্রেণীর স্ত্রীলোকের মধ্যে সমভাবে দেখা দিতে পারে। নিষিদ্ধ বস্তু সম্বন্ধীয় নির্জ্ঞানস্থিত মনোভাব নিরীহ কোন প্রাণীকে প্রতীকরূপে আশ্রয় করিয়া সংজ্ঞানে দেখা দিলে সেই প্রাণীকে আর নিরীহ বলিয়া মনে হয় না, তৎপ্রতি দৃষ্টি মাত্রেই মন অহেতুক ভয়ে অভিভূত হয়। যখনই কোন নির্জীব বস্তু বা প্রাণী সম্বন্ধে, আমাদের মনে অযথা ভয়, প্রীতি, ঘৃণা বা অপর কোন মনোভাব উৎপন্ন হয়, তখনই বুঝিতে হইবে যে, তাহার পশ্চাতে প্রতীক কল্পনা রহিয়াছে। প্রত্যেক প্রতীকের সহিত কোন না কোন অবদমিত ইচ্ছা জড়িত থাকে। (স্বপ্ন: অনুচ্ছেদ—১৭, পৃঃ ২৭—২৮)।

শিশুদের চিন্তাতেও রূপকের প্রভাব বেশী। স্বপ্ন দেখার সময় আমাদের মনের অবস্থা অনেক বিষয়েই শিশুদের মত হইয়া পড়ে। এই জন্য শিশুর চিন্তাধারার বিশেষত্বগুলি আমাদের স্বপ্নের মধ্যে প্রকাশ পায়। স্বপ্নে প্রতীকের বহু আবির্ভাবের ইহাও এক কারণ।[৫০]

পশুর প্রতীক সর্বসময়েই কামনার অবচেতন প্রকাশ।[৫১]

নগর মাতৃপ্রতীক। প্রাচীন টেস্টামেণ্ট জেরুজালেম, বেবিলন প্রভৃতি নগরকে নারীরূপেই কল্পনা করিয়াছে।··· প্রাগৈতিহাসিক মিশরের রাজা ওগিজেস্ (Ogyges)-এর পুরাণে এইরূপ প্রতীকের কথা আছে। ইনি থেবিসে

৫০। গিরীন্দ্রশেখর বসু: স্বপ্ন: অনু—১২০: পৃ—১৫৫।

৫১। The Collected Works of C. G. Jung, Vol. 5: Symbols of Transformation: p—180.

রাজত্ব করিতেন। তাঁহার রাণীর নাম থেবি। নগর ও রাণীর একই নাম নারী ও নগরের মধ্যে একটা সম্বন্ধের সঙ্কেত করে। হিন্দু পুরাণেও এইরূপ ইঙ্গিত আছে। ইন্দ্রকে উর্বর-এর স্বামীরূপে কল্পনা করা হইয়াছে—উর্বর কথার অর্থ সহজে উৎপাদনক্ষম ভূমি। ইউরোপেও এইরূপ ধারণা নিশ্চয়ই ছিল। সিংহাসনে আরোহণের কালে রাজাদের ভাল শস্য উৎপাদনের দায়িত্ব গ্রহণের অঙ্গীকার করিতে হইত; ভাল শস্য উৎপাদন না হওয়ায় সুইডেনের রাজা দোমাল্‌দিকে (Domaldi) হত্যা করা হইয়াছিল। রামায়ণে রাম সীতাকে বিবাহ করেন (সীতার অর্থ লাঙ্গলের দ্বারা কর্ষণের চিহ্ন অথবা লাঙ্গল)। চীন দেশের সম্রাটদের সিংহাসনে আরোহণের সময় লাঙ্গল দ্বারা চাষ করিতে হইত।[৫২]

সুতরাং এই কথা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে প্রতীক কথাটি সাহিত্যে যে দিন হইতেই প্রথম প্রযুক্ত হউক না কেন প্রাগৈতিহাসিক যুগ হইতেই নানা ভাবে ইহাকে ব্যবহার করা হইয়াছে। অচেনা-অজানাকে ধরিবার আকাঙ্ক্ষা মানুষের জন্মকাল হইতেই। আর তাহারই ফলে সে পাইয়াছে শিল্প, সাহিত্য, বিজ্ঞান। বিজ্ঞানে মানুষ যুক্তি দ্বারা অগ্রসর হইয়াছে বলিয়া চিহ্নের প্রয়োগ করিয়াই ক্ষান্ত হইয়াছে। শিল্প-সাহিত্য স্বজ্ঞার রাজ্য, তাই এখানে স্পষ্টতা অপেক্ষা অস্পষ্টতারই প্রাধান্য। সেই জন্যই এই ক্ষেত্রে প্রতীকের প্রাচুর্য লক্ষিত হয়।

সাহিত্যে সূক্ষ্মতম রূপে প্রতীকের প্রয়োগ সম্ভব। দৃশ্যমান প্রকৃতি এবং অন্তর্দৃষ্টি দিয়া দেখা মানুষের মনোজগৎ কবির মনে আবেগ সঞ্চার করে এবং সেই আবেগই ভাষার মাধ্যমে নানা চিত্ররূপ গ্রহণ করিয়া পাঠক চিত্তকে উদ্বুদ্ধ করে। বিভোর কবির মনের চিত্রণ কখন যে তাঁহার অজ্ঞাতসারে কোন্ রূপ লইয়া আত্মপ্রকাশ করে তাহার তো কোন স্থিরতা নাই! এই রূপেই প্রতীকের উদ্ভব। পাঠক সেই প্রতীকের নানা ব্যাখ্যা দিতে পারেন—আবার কখনও কখনও হয়ত তাহা তাঁহাদের বোধগম্য না হইতেও পারে। অবশ্য সকল প্রতীকেরই আমরা একটা মনগড়া ব্যাখ্যা করিয়া থাকি। কিন্তু প্রতীকের বিশেষত্ব এই যে তাহার অর্থ বলিয়া দিলেও মন তাহা মানিতে চায় না। অস্পষ্টতাই প্রতীকের প্রাণ।

৫২। The Collected Works of C. G Jung. Vol. 5. Symbols of Transformation p : 208—209.

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

প্রতীকবাদী আন্দোলন ও রবীন্দ্রনাথ

আধ্যাত্মিকতা যে দেশের জীবন-চর্যা ছিল সেখানেই নানা ভাবে প্রতীক ব্যবহৃত হইয়াছে। প্রাচীন ভারতই কেবল নয়, চীন-জাপান, গ্রীস্-রোম এবং পাশ্চাত্যের অন্যান্য দেশের স্থাপত্যে-ভাস্কর্যে-সাহিত্যে প্রতীকের যে অত্যধিক প্রয়োগ হইয়াছে তাহার পরিচয় আমরা পাইয়াছি। তারপর বিজ্ঞান তাহার প্রভাব ছড়াইল সমস্ত পাশ্চাত্য দেশে। ধীরে ধীরে কমিয়া আসিল রহস্যময়তা এবং প্রতীকের ব্যবহার। বস্তু এবং বস্তুনিষ্ঠ যুক্তি প্রাধান্য পাইল। কিন্তু কোন একটি অবস্থায় দেশ বা জাতি চিরকাল থাকিতে পারে না। অত্যধিক বস্তুবাদও একদিন প্রতিঘাত পাইল।

অষ্টাদশ এবং উনবিংশ শতাব্দীর ইউরোপের পরিবেশ সেই প্রতিঘাত করিয়াছে। এই পরিবেশের মধ্যেই প্রতীকবাদী আন্দোলনের বীজ নিহিত ছিল। বৈজ্ঞানিক উন্নতির ফলে সমগ্র ইউরোপে বস্তুতন্ত্র মাথা চাড়া দিয়া ওঠে। কবি ওয়ার্ডস্ওয়ার্থ (Wordsworth, William : ১৭৭০-১৮৫০) তাঁহার দি এক্স্কারসন্[১] কাব্যে মানুষকে যন্ত্রে পরিণত করা হইয়াছে এই অভিযোগ করিয়া তীব্র প্রতিবাদ করিয়াছেন।

এই সময়কার অধিকাংশ[২] বৈজ্ঞানিকই ঈশ্বরের অস্তিত্বও অস্বীকার করিয়াছেন: যাহা পরীক্ষা দ্বারা স্বীকৃত নহে তাহার সত্যতা তাঁহারা অগ্রাহ্য করিয়াছেন। তাঁহাদের মতে সকল কিছুই প্রাকৃতিক নিয়মে চলিতেছে। মানুষ কীট-পতঙ্গের ন্যায় জীব মাত্র, তাহার আচরণের মূলেও মন বা আত্মার নিয়ন্ত্রণ বলিয়া কিছু নাই।[৩]

অষ্টাদশ এবং উনবিংশ শতাব্দীতে ফরাসীদেশের এক বিশেষ তাৎপর্যময়

১। man is made—
An offering, or a sacrifice, a tool
Or implement, a passive thing employed
As a brute mean, without acknowledgment
Of common right or interest in the end.
[Wordsworth : The Excursion]

২। নিউটন ঈশ্বরে বিশ্বাসী ছিলেন বলিয়া মনে হয়।

৩। Bertrand Russel : The Impact of Science on Society : p-97.

প্রভাব সমগ্র ইউরোপে ছড়াইয়া পড়ে। ফরাসী বিপ্লব সংঘটিত হয় ১৭৮৯ সালে। এই সময় হইতে প্রায় এক শত বৎসর[৪] ধরিয়া ফরাসী দেশ অন্তঃকলহে লিপ্ত ছিল। সেখানে নিয়ত পরিবর্তন সাধিত হইয়াছে। বিজ্ঞান এবং অন্তঃকলহ একদিকে বস্তুবাদ এবং অপরদিকে জীবনবোধে গতিশীলতা আনয়ন করিল এবং সেই সঙ্গে মানুষের মর্যাদাও স্বীকৃত হইল।

গতিশীলতা অথবা নিয়ত পরিবর্তনের দিকে সাহিত্যিকদের দৃষ্টি পড়িল : বস্তুবিশ্বের কিছুই যেন চিরস্থায়ী নয়, ধ্বংসের ভিতর দিয়া সকল কিছুই যেন নূতনের পথে চলিয়াছে। একদিকে এই বোধ অপরদিকে আত্মিক চিন্তাকে খাটো করিয়া বস্তুকেই প্রাধান্য দেওয়ায় নিষ্পেষিত অন্তরাত্মার ক্ষোভ সাহিত্যিকদের ভাব-কল্পনায় একটা বড রকমের পরিবর্তন সাধন করিল এবং তাহার ফলে সাহিত্যের আঙ্গিকেও রূপ পরিবর্তন ঘটিয়া গেল। এই সাহিত্যে বস্তুবিশ্ব সত্যের মর্যাদা হারাইল এবং অজ্ঞাত জগৎও আর নিছক মায়া হইয়াই থাকিল না।[৫] নিয়ত পরিবর্তন সাহিত্যে ইম্‌প্রেসনিজম্ (Impressionism)-এর জন্মদাতা ; আবার বস্তুবিশ্বের নশ্বরতা নিষ্পেষিত কবি চিত্তকে গভীর সত্যের সন্ধানে ব্যাপৃত করিয়া দুর্বোধ্যতা সৃষ্টিকারী অবক্ষয়ী (Decadent)-দের বা প্রতীকধর্মী লেখকদের অভ্যুদয় ঘটাইল।

ইউরোপের ১৮৯০ খ্রীঃ-এর পরবর্তীকালের কাব্যের সহিত তাহার পূর্বেকার কাব্যের তুলনা করিলে এক বিরাট পরিবর্তন লক্ষিত হইবে। নূতন কবি গোষ্ঠীর কোথাও একটা সমগোত্রীয়তা আছে তাহাও দৃষ্টি এডাইবে না। পুরাতন ধারার কবির অভাব ছিল তাহা নয় : তথাপি ইহারই সঙ্গে নূতন ভাবধারার আগমনও লক্ষ্য করা গেল। এই ভাবধারা স্পষ্ট নয়—দুর্বোধ্য। নূতন সৃষ্ট দুর্বোধ্য ভাব-কল্পনার এই আন্দোলনকে প্রতীকবাদী আন্দোলন বলা হইয়াছে।

মরাস (More'as) প্রতীক কথাটি প্রথম প্রযোগ করেন এবং ইহার সংজ্ঞা স্বরূপ বলেন যে প্রতীকে আভাসিত সত্য এক ভাবময় জগতের প্রতিভাস মাত্র।[৬] তিনি মনে করেন নিম্নরুচির সাধারণ সাহিত্য যাহা

৪। ১৮৭১ খ্রীঃ প্যারিসের কমিউন গঠিত হয়। এই সময়ে অন্তঃকলহে প্রায় ২০,০০০ ফরাসী মৃত্যু বরণ করে। এই রক্তের ভিতর দিয়াই তৃতীয় রিপাবলিক প্রতিষ্ঠিত হয়।

৫। Arthur Symons : The Symbolist Movement in Literature. p : 3-4.

৬। A. Hauser : The Social History of Art. Vol II : p-895—896 (from Le Figaro, 18th September, 1886).

ইন্দ্রিয়কে উদ্বুদ্ধ করিবার জন্য আত্মা এবং আদর্শকে অগ্রাহ্য করিয়াছিল তাহারই প্রতিবাদ স্বরূপ প্রতীকবাদী আন্দোলন আরম্ভ হইয়াছে।[৭] প্রতীকবাদী কবিদের প্রধান বোদলেয়ার, ভেরলেন এবং মলার্মে (Ste'phane Mallarme': ১৮৪২-১৮৯৮)। তত্ত্বে এবং প্রয়োগে মলার্মে ছিলেন প্রতীকবাদীদের মধ্যে প্রধান।[৮]

উনবিংশ শতাব্দীর ফরাসী দেশের প্রতীকবাদী আন্দোলন মূলতঃ মরমী। সেই যুগের বিজ্ঞান ভিত্তিক শিল্প চিরাচরিত ধর্মের প্রতি বিশ্বাস হারাইয়া এক নূতন সত্য আবিষ্কারের আশায় উন্মুখ হইয়া উঠিয়াছিল। প্রতীকবাদ তাহার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাইয়াছে। সেই সময়কার প্রতীকধর্মী লেখকরা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগৎ অপেক্ষা এক অধিকতর সত্য আদর্শ জগতে আস্থা স্থাপন করিতেন বলিয়াই মরমী হইয়া উঠিয়াছিলেন। এই আদর্শ জগৎ এক আদর্শ সৌন্দর্যের জগৎ ব্যতীত আর কিছুই নয়। বোদলেয়ারের বেদনাক্ষিন্ন মনে এই সৌন্দর্যের আদর্শ এক মহৎ উদ্দেশ্য এবং প্রেরণা দান করিয়াছিল; ভেরলেনকে এক নিষিদ্ধ আনন্দ লাভে উদ্দীপিত করিয়াছিল। মলার্মের জীবনে সেই সৌন্দর্যই ছিল সর্বস্ব। তাঁহারা নিজেদের বিশ্বাসকে একান্ত ভাবে আঁকড়াইয়া ধরিয়াছিলেন বলিয়া যুক্তিবাদকে অস্বীকার করিয়াছিলেন —ইন্দ্রিয়াতীত জগতের প্রতি তাঁহাদের বিশেষ আগ্রহ এবং তীব্র বিশ্বাসই তাঁহাদের মরমী করিয়া তুলিয়াছিল।[৯]

ধর্মের ক্ষেত্রে যেমন বিশ্বাস আছে যে সাধক ধ্যান সমাহিত অবস্থায় এক অপূর্ব আনন্দ উপলব্ধি করেন, প্রতীকবাদীরাও ঠিক সেইরূপ মনে করেন যে তাঁহাদের শিল্পের মাধ্যমে তাঁহারাও ঠিক ওই একই প্রকার পরম আনন্দ উপলব্ধি করেন। ধর্মের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত প্রতীক যুগ যুগ ধরিয়া ব্যবহারের ফলে আজ অনেকটাই পরিচিত অর্থ বহন করে। কিন্তু প্রতীকধর্মী শিল্পীকে নিজ মনের অতীন্দ্রিয় অনুভূতিকে প্রকাশ করিবার চেষ্টায় অনেক সময় নিজ প্রতীক সন্ধান করিয়া লইতে হয়। সেই জন্যই তাহা অধিকতর অস্পষ্ট হইয়া পড়ে। বিশেষ রীতিতে শিক্ষিতরাই কেবল তাঁহাদের কাব্য উপলব্ধি করিতে পারেন।

৭। Kenneth Kernell : The Symbolist Movement : p-78.
৮। C. M. Bowra : The Heritage of Symbolism. : p-1.
৯। Ibid : p-3,

প্রতীকধর্মী লেখকেরা সাধারণতঃ রাজনীতি প্রভৃতি বিষয় যাহা পরস্পরের মধ্যে সংঘর্ষ সৃষ্টি করে তাহা এড়াইয়া চলেন। বিরুদ্ধ মতের সংঘর্ষ তাঁহাদের প্রশান্ত চিন্তায় বিক্ষোভ সৃষ্টি করে এবং তাঁহাদের ধ্যানের চিত্রকে ছিন্নবিচ্ছিন্ন করিয়া ফেলে। রবীন্দ্রনাথ যেখানে রাজনীতির কথা বলিয়াছেন সেখানে তাঁহার দৃষ্টি মানবতার দিকেই নিবদ্ধ ছিল। স্বদেশী আন্দোলনে তিনি নামিয়াছিলেন কিন্তু অধিকদিন টিঁকিয়া থাকিতে পারেন নাই। ১৯৩৪ সালে "চার অধ্যায়"-এ একটা ব্যতিক্রম ঘটে: ওই একটি মাত্র ব্যতিক্রম; তবে তখন তিনি প্রতীকধর্মী সাহিত্য সৃষ্টি একরকম বন্ধই করিয়া দিয়াছেন। ফরাসী প্রতীকবাদীদেরও আচরণ এইরূপই ছিল। প্রতীকধর্মী কাব্যে কবিদের ব্যক্তিত্ব প্রাধান্য পায়। ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগৎ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া আত্মভাবে বিভোর হওয়ায় স্বভাবতই প্রতীকবাদীরা জীবনের একটা বড় অংশ হইতে বিচ্যুত থাকেন। সমাজনীতিক এবং রাজনীতিক দৃষ্টিকোণ হইতে ইহাকে গণতান্ত্রিক মতবাদের বিরুদ্ধে 'সম্ভ্রান্ত মনে'র প্রতিক্রিয়া বলিয়া ব্যাখ্যা করা যাইতে পারে। এই ব্যাখ্যা সম্পূর্ণ অস্বীকার করিবারও উপায় নাই, কারণ ইহা একান্তই সত্য যে প্রতীকবাদীরা জনসাধারণকে এড়াইয়া চলিতেন। কিন্তু এই 'সম্ভ্রান্ত মন' অর্থ বিত্তশালী মানুষের মন নয়—যাঁহারা বিশ্বাসী, যাঁহারা কোলাহল মুখর জীবনকে ভালবাসেন না তাঁহাদের মনকেই 'সম্ভ্রান্ত মন' বলা হইয়াছে। রবীন্দ্রনাথ পৃথিবীকে স্বর্গ হইতে অধিক প্রিয় বলিয়া মনে করিয়াছন—

> স্বর্গে তব বহুক অমৃত,
> মর্তে থাক্ সুখে-দুঃখে-অনন্ত-মিশ্রিত
> প্রেমধারা অশ্রুজলে চিরশ্যাম করি
> ভূতলের স্বর্গখণ্ডগুলি॥ (চিত্রা: স্বর্গ হইতে বিদায়)

সাধারণ মানুষের জন্য দরদে তাঁহার হৃদয় উদ্বেলিত হইয়াছে; তাহাদের উদ্বুদ্ধ করিতেও তিনি চাহিয়াছেন—

> এই-সব মূঢ় ম্লান মূক মুখে
> দিতে হবে ভাষা, এই সব শ্রান্ত শুষ্ক ভগ্ন বুকে
> ধ্বনিয়া তুলিতে হবে আশা; ডাকিয়া বলিতে হবে—
> 'মুহূর্ত তুলিয়া শির একত্র দাঁড়াও দেখি সবে;

যার ভয়ে তুমি ভীত সে অন্যায় ভীরু তোমা চেয়ে,
যখনি জাগিবে তুমি তখনি সে পলাইবে ধেয়ে'।

(তদেব : এবার ফিরাও মোরে)

বিত্তশালী অহঙ্কারী মানুষের বাণী ইহা কিছুতেই নহে। কিন্তু তাই বলিয়া কোলাহল মুখর জাবনও তিনি চাহেন নাই। শির তুলিয়া একত্র দাঁড়াইতে বলিয়াও তিনি সংযম হারান নাই : তথাগতকে স্মরণ করিয়া তিনি শান্তি বাণী উচ্চারণ করিয়াছেন—

হয়তো ঘুচিবে দুঃখনিশা,
তৃপ্ত হবে এক প্রেমে জীবনের সর্বপ্রেমতৃষা॥ (তদেব)

রবীন্দ্রকাব্যে এই সুর বহুবার ধ্বনিত হইয়াছে। প্রতীকধর্মীরা কোলাহলের বাহিরে থাকিতেই অভ্যস্ত। অত্যন্ত রুচি এবং শালীনতা বোধই মনকে এইরূপ 'সম্ভ্রান্ত' করিয়া তোলে—জনতার কলকোলাহল হইতে বিমুখ করে। অতীন্দ্রিয় অনুভূতি এবং গভীর আদর্শনিষ্ঠা যে একাগ্রতা দাবী করে তাহা মাথা পাতিয়া লওয়া অধিকাংশ মানুষের পক্ষেই অসম্ভব। গভীর সৌন্দর্য উপলব্ধির প্রেরণাই প্রতীকবাদীদের জগৎ বিমুখ করিয়াছে—অধিকাংশ মানুষ হইতে তাহাদের পৃথক করিয়া ফেলিয়াছে। মলার্মে বলিয়াছেন—

"Let man be democratic; the artist must separate and remain an aristocrat."

(Selected Prose, Poems, Essays & Letters : p—12)

জনসাধারণকে অগ্রাহ্য করিয়াই সেই জন্য তিনি দৃঢ়তার সঙ্গেই বলিয়াছেন—

"Whatever is sacred, whatever is to remain sacred, must be clothed in mystery. All religions take shelter behind arcana which they unveil only to the predestined. Art has its own mysteries": (Ibid : p—9)

এই রহস্যময় আবরণ বা দুর্বোধ্যতা প্রতীককে শুচিশুদ্ধ রাখিয়াছে—

"The remote antiquity of this mode of conveying knowledge by symbols, and its long established appropriation to religious subjects, had given it a character of sanctity unknown to any other mode of writing; and it seems to have been a very generally received opinion, among the more discret Heathens, that divine truth was better adopted to the weakness of human

intellect, when veiled under symbols." (Knignt, R. P. : The Symbolical language of Ancient Art and Mythology : Vol. II : p–6).

যে সাহিত্যে দুর্বোধ্যতা ও আদর্শবাদ বিঘোষিত এবং যাহাতে বিজ্ঞান ও বস্তুবাদ প্রত্যাখ্যাত তাহাতে যে মরমী অনুভূতি স্থান লাভ করিবে ইহা সহজেই বোধগম্য হয়। তথাপি মরমী অনুভূতিকে প্রতীকবাদের অবিচ্ছেদ্য লক্ষণ বলা চলে না। প্রতীকবাদের যুগে অনেক প্রতীক ধর্মী লেখকই[১০] প্রাচ্যের গুহ্যতত্ত্বে আগ্রহ সম্পন্ন ছিলেন। প্রতীকে মরমী অনুভূতির প্রকাশ সোয়েডেনবার্গ-এর (Swedenberg : ১৬৮৮-১৭৭২)[১১] সময় হইতেই আরম্ভ হইয়াছে মনে হয়।[১২]

মানুষের মন বরাবরই প্রতীকের দ্বারা বিশেষরূপে প্রভাবিত ছিল। স্থাপত্য, শিল্প, উৎসবাদি ছিল প্রতীকধর্মী। সাহিত্যেও প্রতীকের অস্তিত্ব চিরকালই ছিল। দান্তের (Dante, Alighieri : ১২৬৫-১৩২১) 'ডিভাইন কমেডি'তেও তাহার পরিচয় আছে। তিনি স্বর্গ নরকের প্রতীকের সাহায্যে আত্মিক যাত্রার চিত্র অঙ্কনের চেষ্টা করিয়াছেন। কালিদাসের[১৩] কাব্যেও প্রতীকের সন্ধান পাওয়া যায়। রবীন্দ্রনাথ 'মেঘদূত'কেও প্রতীকধর্মী বলিয়া মনে করেন। এই বিরহ তো কেবল যক্ষের বিরহই নয়—প্রত্যেক মানুষেরই : "কিন্তু কেবল অতীত বর্তমান নহে, প্রত্যেক মানুষের মধ্যে অতল স্পর্শ বিরহ। আমরা যাহার সহিত মিলিত হইতে চাহি সে আপনার মানসসরোবরের অগম তীরে বাস করিতেছে ; সেখানে কেবল কল্পনাকে পাঠানো যায়, সেখানে সশরীরে উপনীত হইবার কোন পথ নাই। আমিই বা কোথায়, আর তুমিই বা কোথায়। মাঝখানে একেবারে অনন্ত, কে তাহা উত্তীর্ণ হইবে। অনন্তের কেন্দ্রবর্তী সেই প্রিয়তম অবিনশ্বর মানুষটির সাক্ষাৎ কে লাভ করিবে!" (রবীন্দ্রনাথ : প্রাচীন সাহিত্য—মেঘদূত)।

প্রাচীন এবং মধ্যযুগের সাহিত্যে প্রতীক আসিয়াছে সহজ স্বাভাবিক ভাবে। কিন্তু উনবিংশ শতাব্দীতে ইহা আসিয়াছিল বস্তুবাদের প্রতিবাদ

১০। বোদলেয়ার প্রভৃতি
১১। সোয়েডেনবার্গ : সুইডেনের দার্শনিক, বিজ্ঞানী ও মরমী, মধ্যবয়সের পর তিনি আধ্যাত্মিক আলোচনায় লিপ্ত হন।
১২। Kenneth Cornell : The Symbolist Movement : p-80.
১৩। কালিদাস তৃতীয় চতুর্থ শতাব্দীর সংস্কৃত সাহিত্যের কবি ও নাট্যকার

স্বরূপ। উচ্চদরের সাহিত্য সৃষ্টি করিতে হইলে দুইটি বিষয়ের সম্মেলন প্রয়োজন—শক্তিশালী লোক থাকা চাই এবং চাই বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ পরিবেশ। উনবিংশ শতাব্দীতে ফরাসী দেশে শক্তিশালী মানুষ নিশ্চয়ই ছিলেন, কিন্তু অন্তঃকলহে পর্যুদস্ত দেশের পরিবেশ সাহিত্য সৃষ্টির বিশেষ উপযোগী ছিল না। সাহিত্যিকদের কাব্য রচনার অবস্থাটি সৃষ্টি করিয়া লইতে হইয়াছিল। তাঁহারা যে কেবল সৃষ্টিশক্তি পুষ্টি সাধনের উপযোগী ভাব-প্রবাহ সৃষ্টি করিয়াছিলেন তাহাই নহে—যে সকল ভাবপ্রবাহ সৃষ্টি কার্যের পরিপন্থী সেগুলিকে তাঁহাদের ধ্বংস করিতেও হইয়াছিল। সুতরাং ইহা অবশ্য স্বীকার্য যে ফরাসী প্রতীকধর্মী লেখকদের দুরূহ কার্য সাধন করিতে হইয়াছিল। জেরার্দ দ্য নের্‌ভাল্ (Gerard De Nerval : ১৮০৮-১৮৫৫) হইতেই প্রকৃত পক্ষে প্রতীকী আন্দোলনের সূত্রপাত। বড় সাহিত্যিক তিনি ছিলেন না, তবে বিদ্যুৎ চমকের ন্যায় প্রতীক তাঁহার রচনা স্পর্শ করিয়া গিয়াছে। বোদলেয়ারকেই প্রতীকিতার উৎসস্থল বলা চলে। তিনি মিল, প্রতীক, সাদৃশ্য, প্রতিরূপক প্রভৃতি কথাগুলি একই অর্থে প্রয়োগ করিয়াছেন।[১৫] তাঁহার 'লে ভয়েজ' কাব্যে প্রতীকচ্ছলে এক অনির্দেশ অজ্ঞাত জগতে যাত্রার চিত্র অঙ্কন করা হইয়াছে। জন্ম হইতে মৃত্যু পর্যন্ত মানুষের যে জীবন তাহারই প্রতীক 'লে ভয়েজ'।

ভিলিয়ার্স ডি ল' আইল-আডাম (Count Philippe Auguste Mathias De Villiers De L'Isle-Adam : ১৮৩৮-১৮৮২) এর বিশ্বাস প্রাচ্য মরমীদের সমগোত্রীয়। তাঁহার মতে পার্থিব সৌন্দর্য আত্মিক সৌন্দর্যের প্রতিভাস মাত্র। তিনি সাহিত্যের এক নূতন আঙ্গিক গঠন করেন: উহা প্রতীক নাটক ও উপন্যাসের শিল্প।[১৬] তাঁহার সৃষ্ট চরিত্রগুলি জৈব আবেগের পরিবর্তে আত্মিক প্রেরণার দ্বারা পরিচালিত। মেটারলিংক (Maurice Maeterlink : ১৮৬২-১৯৪৯) তাঁহার দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবিত হইয়াছিলেন।[১৭]

মলার্মে (Stephane Mallarme : ১৮৪২-১৮৯৮) নানাপ্রকার প্রতীকের

১৫। Martin Turnell: Baudelaire: A study of his poetry: p-28.
১৬। Arthur Symons: The Symbolist Movement in Literature: p-57.
১৭। A History of Modern Drama: Edited by Barreth H. Clark and George Freedley: p-247

ব্যবহার করিয়াছেন। তিনি এক ইন্দ্রিয়াতীত অভিজ্ঞতাকে দৃশ্যমান জগতের ভাষায় ব্যক্ত করিবার সাধনা করিয়াছিলেন[১৮]। তিনি উপলব্ধি করিয়াছিলেন যে আত্মার মুক্ত নিশ্বাসের সঙ্কেতরূপেই ভাষার একমাত্র মূল্য। প্রত্যেক আত্মাই সঙ্গীতময়—ভাষা তাহার বাঁশী মাত্র।[১৯]

কিন্তু ইহাও সত্য যে আত্মিক জগতে অতি বিশ্বাস সত্বেও অধিকাংশ প্রতীক-ধর্মী কবি-সাহিত্যিকই যে অপার আনন্দে নিমগ্ন থাকিতে পারেন নাই তাহা তাঁহাদের মধ্যে অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি মলার্মের ক্ষুব্ধ বক্তব্যে প্রকাশিত—

"La chair est triste, hélas : et j'ai lu tous les livres"[২০]

(Emery Neff : A Revolution in European poetry : p-249)

ফাউষ্টে[২১] শুনিয়াছি অধ্যাত্ম জগতের জন্য ক্রন্দন :

Der Gaister Welt ist nicht Verschlossen,
Dein Sinn ist zu, dein Herz ist tot : (Ibid : p-204)

গ্যেটের ক্ষোভ অপেক্ষাও মলার্মের ক্রন্দন অধিকতর মর্মভেদী। বস্তুবাদের নিষ্পেষণ এবং রাষ্ট্রজীবনের কলহের প্রতিক্রিয়া স্বরূপ ইঁহারা কল্পলোকের সন্ধানী হইলেও জাতির জীবনে নূতন আলোকপাতের ভরসা মনের মধ্যে পান নাই। মনে হয় সেই জন্যই কোন কোন প্রতীক ধর্মী কবি[২২] নিজেদের জীবনকে উচ্ছৃঙ্খলতায় ডুবাইযা রাখিতে চাহিতেন—যাহা ইচ্ছা করেন অথচ যাহার সম্বন্ধে সম্পূর্ণ ভরসা নাই, বিশেষ করিয়া যখন পরিবেশ আতঙ্ক সৃষ্টিই করে তখন এইরূপেই নিজেদের অবলুপ্ত করিয়া দিতেই হয়ত তাঁহারা চাহিয়াছিলেন। কোন কিছুর প্রতিক্রিয়াই কাহাকেও বড় বেশী দূর লইয়া যাইতে পারে না : তাহাতে প্রতিঘাত দিবার শক্তি জন্মিতে পারে কিন্তু

১৮। C. M. Bowra : The Heritage of Symbolism ; Introduction.

১৯। Arthur Symons ; The Symbolist Movement in Literature : pp 126-127.

২০। The flesh is dull, alas ! and I have read all the books.

২১। গ্যেটের (Goethe, Johann Wolfgang ; ১৭৪৯-১৮৩২) লিখিত নাট্য কাব্য। ১৭৭৯ খ্রীঃ ইহা তিনি রচনা করিতে আরম্ভ করেন এবং মৃত্যুর কিছু পূর্বে ১৮৩২ খ্রীঃ শেষ করেন।

The world of spirits is not closed,
Your mind is shut, your heart is dead.

২২। পল ভেরলেইন : আর্থার র‍্যাবো।

বিশ্বাসে সমুজ্জ্বল হইয়া উঠিবার মত মানসিক প্রশান্তি আসে না। এইখানে রবীন্দ্রনাথকে একেবারে ভিন্নরূপে দেখা যায়। নিছক পরিবেশের প্রতিক্রিয়া স্বরূপই তাঁহার জীবন গঠিত হয় নাই। মূল ভাবকল্পনায় সমগ্র পরিবারের জীবন-চর্যায় ছিল প্রশান্তি। তাই রবীন্দ্রনাথের জীবনও ছিল গভীর বিশ্বাসে সমুজ্জ্বল : পরিবেশ তাঁহার বিশ্বাসে কোন দ্বন্দ্ব সৃষ্টি করিতেও পারে নাই। তাঁহার মনের গভীর বিশ্বাসের পরিচয় সর্বত্র : 'ঠাকুরদা'র কথায় সেই গভীর বিশ্বাসের প্রতিধ্বনি শোনা যায়—"আমাদের দেশে রাজা এক জায়গায় দেখা দেয় না বলেই তো সমস্ত রাজ্যটা একেবারে রাজায় ঠাসা হয়ে রয়েছে—তাকে বল ফাঁকা! সে যে আমাদের সবাইকেই রাজা করে দিয়েছে। এই যে অন্য রাজাগুলো তারা তো উৎসবটাকে দলে মলে ছারখার করে দিলে—তাদের হাতিঘোড়া লোকলশকরের তাড়ায় দক্ষিণ-হাওয়ার দাক্ষিণ্য আর রইল না, বসন্তর যেন দম আটকাবার জো হয়েছে। কিন্তু আমাদের রাজা নিজে জাযগা জোড়ে না, সবাইকে জায়গা ছেড়ে দেয়। কবিকেশরীর সেই গানটা তো জানিস :

আমরা সবাই রাজা আমাদের এই রাজার রাজত্বে
নইলে মোদের রাজাব সনে মিলব কী স্বত্বে
(আমরা সবাই রাজা)
আমরা যা খুশি তাই করি
তবু তাঁর খুশিতেই চরি।
আমরা নই বাঁধা নই দাসের রাজার ত্রাসের দাসত্বে
নইলে মোদের রাজার সনে মিলব কী স্বত্বে।"

(রবীন্দ্রনাথ : রাজা : পৃঃ ২৭-২৮)

সুতরাং রাজার সহিত মিলিবার ব্যবস্থা তো রাজা নিজেই করিয়া রাখিয়াছেন : যেখানে আমাদের প্রকৃত আনন্দ সেখানে আমরা তাঁহারই আনন্দের সহিত যুক্ত।

সুইডেনের প্রতীক ধর্মী সাহিত্যিকদের নেতা ইবসেন (Henrik Ibsen : ১৮২৮-১৯০৬) স্ট্রীন্ড্‌বার্গ (August Strindberg : ১৮৪৯-১৯১২)। ইবসেনের 'দি ওয়াইল্ড্‌ ডাক' (The Wild Duck : ১৮৮৪) 'রোসমারসোল্‌ম্‌' (Rosmersholm : ১৮৮৬) প্রতীকী লক্ষণে পূর্ণ। তাঁহার অঙ্কিত চরিত্রগুলি কোনটাই ছাঁচে ঢালিয়া তৈয়ারী নহে—কোন একটি ধারণা বা আদর্শের

প্রতিনিধি মাত্র নয়। তাহারা প্রত্যেকেই রক্ত-মাংসে গড়া ও স্বকীয়তায় উজ্জ্বল।

'ওয়াইল্ড ডাক' হইতে আরম্ভ করিয়া ইবসেনের প্রতীকধর্মী রচনায় বস্তুকে অবলম্বন করিয়া আধ্যাত্মিক জগতে প্রয়াণের চেষ্টা দেখিতে পাই। তাঁহার 'পিয়ার গিণ্ট' (Peer Gynt : 1867)-এর পেঁয়াজের প্রতীক বো. হয় অন্যতম শ্রেষ্ঠ উদাহরণ। পিয়ার ছিল অহংবাদী, তাহার জীবনের লক্ষ্য ছিল, 'পিয়ার কেবল তুমিই সব'। কিন্তু এইরূপে জীবন কাটাইয়া শেষ পর্যন্ত ভগ্ন হৃদয়ে হতাশ অন্তরে সে দেশে ফিরিল। অত্যন্ত ক্ষুধায় কাতর হইয়া সে পেঁয়াজের খোসার পর খোসা ছাড়াইয়া তাহার সার অংশটুকুর সন্ধান করিতে বসিল। প্রতিটি খোসা সামাজিক সম্বন্ধের প্রতীক মাত্র; শেষ খোসাটি ছাড়াইয়া দেখা গেল কিছুই অবশিষ্ট নাই। ইহাই তো অহং-এর পরিচয়। পেঁয়াজের খোসার ন্যায় কতকগুলি সামাজিক সম্বন্ধের সমন্বয় ব্যতীত মানব সত্তার আর কোন অস্তিত্ব নাই। পেঁয়াজের প্রতীকের দ্বারা যে গভীরতায় লইয়া যাওয়া হইয়াছে তাহা কোন প্রকার বিশ্লেষণের দ্বারা সম্ভব ছিল না। "পিয়ার গিণ্টে" তিনি এই বলিয়া উপসংহার টানিয়াছেন যে 'প্রভু'র ইচ্ছার সহিত সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়াই আত্ম উপলব্ধি সম্ভব। 'প্রভু'র ইচ্ছা কি তাহা আমাদের উপলব্ধি করিতে হইবে—যদি তাহা না পারি তবে আমাদের ব্যক্তি সত্তা অহংবোধের পঙ্কে পতিত হইবে। এই নাটকে প্রেমের মর্যাদা দেওয়া হইলেও 'প্রভু'র ইচ্ছা উপলব্ধি করিবার উপায় কি তাহার সম্বন্ধে কোন ইঙ্গিত করা হয় নাই—আর উপলব্ধি না করিতে পারিলে দোষই বা কাহার তাহাও বলা হয় নাই। পিয়ারের মানসিক দ্বন্দ্ব আমাদেরই দ্বন্দ্ব। তাহার জীবনের ট্র্যাজেডি আমাদেরই ট্র্যাজেডি। প্রাণপাত চেষ্টা করিয়াও 'প্রভু'র উদ্দেশ্য যে বুঝিতে পারিব তাহারই বা নিশ্চয়তা কি?

ইবসেন দেখাইয়াছেন অহং থাকিলে চলিবে না এবং অহং-এর প্রকৃত-পক্ষে কোন অস্তিত্বই নাই—ইহা কতকগুলি সামাজিক সম্বন্ধ ব্যতীত আব কিছুই নয়। কিন্তু অহং-কে নির্বাপিত করিয়া সত্য চেতনায় উদ্বুদ্ধ হইবার উপায় কি? ইহাকে নির্বাপিত করা দুরূহ। তাই রবীন্দ্রনাথ অন্য ব্যবস্থা দিয়াছেন—ইহাতে অহং-এরও তৃপ্তি, সত্য চেতনা লাভেও কোন বাধা নাই। তিনি বলিয়াছেন, "দানের সামগ্রীটিকে প্রথমে একবার 'আমার' করে নেবার জন্যে এই অহং-এর দরকার" (শান্তিনিকেতন : ১ম খণ্ড : অহং)। দিবার

আনন্দ লাভের জন্যই এই 'আমার' বলিয়া চিহ্নিত করা—"নদীর জল যখন নদীতে আছে তখন সে সকলেরই জল ; যখন আমার ঘড়ায় তুলে আনি তখন সে আমার জল, তখন সেই জল আমার ঘড়ার বিশেষত্ব দ্বারা সীমাবদ্ধ হয়ে যায়। কোনো তৃষ্ণাতুরকে যদি বলি 'নদীতে গিয়ে জল খাওগে,' তা হলে জল দান করা হল না—যদিচ সে জল প্রচুর বটে, এবং নদীও হয় তো অত্যন্ত কাছে। কিন্তু, আমার পাত্র থেকে সেই নদীরই জল এক গণ্ডূষ দিলেও সেটা জলদান করা হল।

"বনের ফুল তো দেবতার সম্মুখেই ফুটেছে। কিন্তু, তাকে আমার ডালিতে সাজিয়ে একবার আমার করে নিলে তবে তার দ্বারা দেবতার পূজা হয়। দেবতাও তখন হেসে বলেন, 'হাঁ, তোমার ফুল পেলুম।' সেই হাসিতেই আমার ফুল তোলা সার্থক হয়ে যায়।

"অহং আমাদের সেই ঘট, সেই ডালি।" (শান্তিনিকেতন : ১ম খণ্ড : অহং)।

সীমিত মানুষ রবীন্দ্রনাথের এই ব্যবস্থাতেই শান্ত হয়। অহংকে সামঞ্জস্য দান করিয়াই লুপ্ত করা চলে।

ইবসেন প্রেমের মর্যাদা দিয়াও ঈশ্বরের ইচ্ছাকে উপলব্ধি করিতে বলিয়াছেন—তিনি ইহা বোঝেন নাই যে প্রেমে উদ্বুদ্ধ হইলেই ঈশ্বরের ইচ্ছা বোধগম্য হয়। যাঁহার হৃদয়ে প্রেম জাগিযাছে ঈশ্বর তাঁহার নিকট স্পষ্ট। রবীন্দ্রনাথ এই কথাটা কিছুমাত্র অস্পষ্ট করিয়া বলেন নাই।—উদয়াদিত্যের প্রেমিক হৃদয় সিংহাসনের গণ্ডীতে বাঁধা পড়ে নাই : তিনি ঈশ্বরের বিচিত্র সৃষ্টির পথে আসিয়া দাঁড়াইলেন। ধনঞ্জয় বৈরাগী তাই বলেন, "যেখানে দীনদরিদ্র সবাই এসে মেলে সেই দরাজ জায়গাটাতে এসে দাঁড়িয়েছ, আজ আর কিছু ভাবনা নেই" (রবীন্দ্রনাথ : প্রায়শ্চিত্ত : পৃ-১০৫)।—দুঃখকে বরণ করিয়া যে প্রেমের সঞ্জীবনী মন্ত্র লাভ করে ভগবান নিজেই তাহার পথ ঠিক করিয়া রাখেন—

উদয়াদিত্য। ঠাকুর, শেষকালে বিভাকেও আমাদের পথ নিতে হল!

ধনঞ্জয়। সে তো বেশ কথা! দয়াময় হরি! কী আনন্দ! তোমার এ কী আনন্দ! ছাড় না, কিছুতেই ছাড় না। শ্বশুরবাড়ির রাস্তার ধারেও ডাকাতের মতো বসে আছ। দিদি, এই মাঝ রাস্তায় আমাদের পাগল প্রভুর তলব পড়েছে! একেবারে

জোর তলব। চল্ চল্! চল্ চল্! পা ফেলে চল্! খুশি হয়ে চল্! হাসতে হাসতে চল্! রাস্তা এমন করে পরিষ্কার করে দিয়েছে—আর ভয় কিসের! (প্রায়শ্চিত্ত : পৃ-১১৬)

নৈতিক চেতনা থাকিলেও ধর্মবোধে প্রোজ্জল ছিলেন না বলিয়াই[২৩] হয়ত ইবসেন রবীন্দ্রনাথের ন্যায় এত সহজে সমস্যার সমাধান করিতে পারেন নাই।

উনবিংশ শতাব্দীর রুশ সাহিত্যে ইউরোপের রহস্যময় সাহিত্যের প্রভাব পড়িয়াছিল। যে মনোভাব এবং আদর্শ মস্কো এবং সেণ্ট পিটারস্‌বার্গের শিল্পীরা দেশে আনিতে চাহিয়াছিলেন তাহার জন্য সমর্থন ও প্রেরণা লাভ করিতে তাঁহারা ইউরোপের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়াছিলেন[২৪]। এই শতাব্দীর শেষের দিকে অবক্ষয়ী এবং প্রতীক ধর্মীরা দ্রুত কাব্যে অধিকার বিস্তার করিতেছিলেন এবং নাট্যশালাও তাঁহাদের চাপ বিশেষ ভাবে অনুভব করিতেছিল। শেহভের (Chehov, Anton Pavlovich : ১৮৬০-১৯০৪) পরেই মঞ্চে সম্মান লাভ করিয়াছিলেন ইবসেন, মেটারলিঙ্ক প্রভৃতি কয়েকজন নাট্যকার[২৫]।

শেহভের 'দি সি-গাল' (১৮৯৫) নিষ্ঠুর ভাগ্যের আঘাতে বিপর্যস্ত নায়িকা বালিকা নীনার প্রতীক। বিশেষ বিশেষ বৈশিষ্ট্য সম্পন্ন পক্ষীকে প্রতীক রূপে প্রয়োগ প্রতীক ধর্মী লেখকদের নিকট একান্ত চলন হইয়া উঠিয়াছিল। রাশিয়ার জমিদার শ্রেণীর ক্ষয়গ্রস্ত শক্তির প্রতীক রূপে তিনি 'দি চেরী অরচার্ড' (১৯০৩)-এ বৃক্ষকে প্রয়োগ করিয়াছেন। তবে শেহভের বাস্তব বোধ এবং রহস্যপ্রিয়তা খুব সামান্য ক্ষেত্রেই তাঁহাকে প্রতীকের ব্যবহার করিতে দিয়াছে[২৬]।

রুশ প্রতীকবাদে এক বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ জটিল পরিবর্তন সাধিত হইয়াছিল। ইহার মরমী অনুভূতি সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সমস্যার সহিত অধিকতর বিজড়িত হইয়া পড়িতেছিল। ১৯০৫ খ্রীঃ বিপ্লবের যুগে প্রতীকবাদী

২৩। Janko Lavr.n : Ibsen & his Creation : p—108.

২৪। Marc Stonim : Modern Russian Literature (From Chekhov to the Present) : p—83.

২৫। Ibid : p—167.

২৬। A History of Modern Drama : Edited by Barrett H. Clark & George Freedly : p—110.

এবং মরমীদের সহিত বিপ্লবী এবং সমাজতান্ত্রিকদের যোগ স্থাপিত হয়। ১৯০৫ সালের পূর্বেকার আদর্শবাদীরা সামাজিক ও রাজনীতিক সমস্যা এড়াইয়া চলিতেন কিন্তু ১৯০৫ সালের পরবর্তীকালের প্রতীকধর্মী লেখকরা মত পরিবর্তন করেন। প্রতীকী আন্দোলন এক নূতন রূপ গ্রহণ করে। আইভানভ (Viacheslav Ivanov : ১৮৬৬-১৯৪৯), বেলী (Andrei Bely : প্রকৃতনাম Boris Bugaev : ১৮৮০-১৯৩৪) এই দলের নেতৃত্ব করেন। বেলী মরমী হইতে রাশিয়ার সমস্যাবলীর রাজনীতিক ব্যাখ্যাতায় পরিবর্তিত হইয়াছিলেন। রাশিয়ার অন্তর্বিপ্লবের বিপদজনক দিনগুলির মধ্যে তিনি ভবিষ্যতের সূর্যোদয় দেখিয়াছিলেন। তাঁহার কাব্য 'ক্রাইস্ট ইজ্ রিসেন'-এ (১৯১৮) তিনি বলিয়াছেন যে নব ক্রুশবিদ্ধ ক্রাইস্টের রাশিয়ায় অভ্যুদয় হইবে। প্রতীকচ্ছলে তিনি দেখাইযাছেন যে ক্রাইস্টের ন্যায় রাশিয়াও ক্রুশবিদ্ধ হইয়াছে জনগণের মঙ্গলের জন্য[২৭]।

বিপ্লবের পদক্ষেপে ইঁহাদের মনে এক আশা এবং বিশ্বাস জাগ্রত হইয়াছিল: রবীন্দ্রনাথের মনের বিশ্বাসের সহিত ইঁহাদের বিশ্বাসের অনেকটা মিল আছে। তবে রুশ লেখকরা সামাজিক উন্নতি এবং মানুষের পার্থিব বিপদ হইতে ত্রাণের কথাই বলিযাছেন। রবীন্দ্রনাথের অধ্যাত্মবোধ কেবল পার্থিব বিপদের কথাই চিন্তা করে নাই। আত্মার মুক্তির কথাও তিনি বলিতে চাহিয়াছেন: সমস্ত ক্ষুদ্রতা হইতে মুক্তির স্বপ্ন তিনি দেখিয়াছেন। পার্থিব বিপদ হইতে ত্রাণকে তিনি তুচ্ছ করিয়াছেন— আত্মার দৃঢ়তা চাহিয়াছেন। পার্থিব বিপদ দূর হইলেই অন্তরও পরিত্রাণ পাইবে বেলী প্রভৃতির এইরূপই বিশ্বাস ছিল: রবীন্দ্রনাথ বিপরীত দিক হইতে সমস্যাটিকে দেখিয়াছেন। আত্মা যদি মুক্তি পায় তবে কোন বাধাই, কোন বিপদই বড় হইয়া ওঠে না। মানুষের দুঃখ যে কেবল সমাজই সৃষ্টি করে তাহাই নয়, তাহার নিজের সৃষ্ট দুঃখেরও সীমা নাই: মৃত্যুরূপে প্রকৃতিও দুঃখ সৃষ্টির কার্য করিয়া থাকে। বেলী প্রভৃতি এই দুঃখ দূর করিবার কথা চিন্তা করিলেও 'ক্রুশবিদ্ধ রাশিয়া' সেখানে কোন সাহায্যই করিতে পারে না। রবীন্দ্রনাথের অধ্যাত্ম সাধনা-লব্ধ চেতনা অধিকতর মানব কল্যাণ সাধনের সঙ্কেত করিয়াছে।

২৭। Marc Slonim: Modern Russian Literature (From Chekhov to the Present) pp. 192-193.

জার্মানীর প্রতীকবাদী আন্দোলনের নেতা ছিলেন গেরহার্ট হাউপ্‌ট্‌ম্যান (Gerhart Hauptmann : ১৮৬২-১৯৪৯)। রবীন্দ্রনাথের আশাবাদী মনের সহিত ইঁহারও মূলগত পার্থক্য ছিল। তাঁহার বিখ্যাত নাটক 'সান্‌কেন বেল' (১৮৯৬)। ইহার মধ্যে একটা রূপকথার স্পর্শও আছে। যে ঘণ্টাটি নায়ক হাইনরিখ তৈয়ারী করিয়াছিল সমস্ত পৃথিবীকে আনন্দ সংবাদ শুনাইবার জন্য তাহা ডুবিয়া গেল। ঘণ্টাধ্বনি আর কোন উপায়েই মানুষকে শোনান গেল না। তাঁহার রূপকথা জাতীয় কাব্য 'উনট্‌ পিপ্পা টানট্‌জ্‌ট্‌' (And Pippa Dances : ১৯০৬)—প্রতীকধর্মী। যে সৌন্দর্য সকলেই অন্বেষণ করে পিপ্পা তাহার প্রতীক। কিন্তু হুন্‌(Huhn)-এর পশুশক্তি তাহাকে জয় করে। সে তাহার কর্কশ হস্তের দ্বারা কাঁচের ন্যায় পিপ্পাকে চূর্ণ করিয়া ফেলিল। এই উভয় গ্রন্থেই কবির মনের হতাশার পরিচয় রহিয়াছে। সমকালীন অশুভ বুদ্ধির ভয়ঙ্করতা কবিকে হয়ত শঙ্কিত করিয়া রাখিয়াছিল। কিন্তু যাহা অশুভ তাহা যে চিরকাল জয়ী হয় না এই বিশ্বাসে তিনি প্রদীপ্ত হইতে পারেন নাই। রবীন্দ্রনাথের 'রক্তকরবী'তে রঞ্জনের মৃত্যুর পরেও রাজার মোহ নিদ্রা দূর হইয়া যায়। ভ্রান্তি কখনও চিরস্থায়ী হয় না, অন্যায় দেখিয়া আতঙ্কিত হইবার কারণ নাই। তাহা হাউইয়ের ন্যায় শূন্যে উঠিয়া গেলেও ভস্মে পরিণত হইতে বিলম্ব হইবে না। ধর্ম বিশ্বাসে মন নির্দ্বন্দ্ব না হইলে কখনই পরিপূর্ণ আশাবাদী হওয়া যায় না।

এমিলি ভারহারেন (Emile Verhaeren : ১৮৫৫-১৯১৬) সামাজিক সমস্যার প্রতি বিশেষ দৃষ্টি দেন এবং বিশ্বভ্রাতৃত্ব বোধের দ্বারা সঞ্জীবিত ভবিষ্যৎ সুন্দর জগতের আশায় উদ্বুদ্ধ হইয়াছিলেন। কিন্তু প্রথম বিশ্বযুদ্ধ (১৯১৪-১৯১৮) এবং বিশেষ করিয়া নিরপেক্ষ বেলজিয়মে জার্মান আক্রমণ তাঁহার বিশ্বাস ধ্বংস[২৮] করে। রবীন্দ্রনাথের বিশ্বভ্রাতৃত্ববোধ আরও গভীর। বিশ্বযুদ্ধ তাঁহার বিশ্বাসকে বিচলিত করিতে পারে নাই। তিনি ক্ষুব্ধ হইয়া হিংসায় উন্মত্ত পৃথিবীতে শান্তির ললিত বাণী ব্যর্থ পরিহাসের ন্যায় শুনাইবে তাহা বলিয়াছেন। এই ক্ষোভ যাঁহারা ঘরে বসিয়া শান্তির কথা বলেন তাঁহাদের বিরুদ্ধে। শান্তির জন্য দুঃখ বরণ চাই—সংগ্রাম চাই। তিনি বহু পূর্বেই উপলব্ধি করিয়াছিলেন, "দুঃখের আঘাত থেকে আমাদের মনকে ভয়ে ভয়ে কেবলই বাঁচিয়ে রাখবার চেষ্টা করলে জগতে আমাদের অসম্পূর্ণ-

২৮। The Oxford Companion to French Literature.

ভাবে বাস করা হয়, সুতরাং তাতে কখনোই আমাদের স্বাস্থ্যরক্ষা ও শক্তির পরিণতি হয় না। পৃথিবীতে এসে যে ব্যক্তি দুঃখ পেলে না সে লোক ঈশ্বরের কাছ থেকে তার সব পাওনা পেলে না—তার পাথেয় কম পড়ে গেল (শান্তিনিকেতন, ১ম খণ্ড: দুঃখ)। বিশ্বযুদ্ধ তাই রবীন্দ্রনাথের মনে বিশেষ গতি সঞ্চার করিয়াছিল।

ইংরাজ লেখক উইলিয়ম ব্লেক (William Blake: ১৭৫৭-১৮২৭) ছিলেন প্রধানতঃ মরমী। তিনি প্রথম হইতেই বস্তুবাদের প্রতি বিদ্বিষ্ট ছিলেন—১৭৯৪ খ্রীঃ-এর কাছাকাছি সময় হইতেই তিনি প্রায় পরিপূর্ণরূপে মরমী হইয়া ওঠেন। অনেকদিন পর্যন্ত জগতের পাপ এবং অন্যায় তাঁহার মনকে হতাশার ভাবে আচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছিল: রবীন্দ্রনাথের আশাবাদী মনে নৈরাশ্যের সঞ্চার প্রায় কখনই হয় নাই। পরে 'দি ফোর জোয়াস' (The Four Zoas: ১৭৯৬-১৮০৪), মিল্টন (Milton: ১৮০৪-১৮০৮) এবং জেরুজালেম (Jerusalem: ১৮০৪-১৮২০) এই তিনটি মহাকাব্য লিখিবার কালে তাঁহার অন্তরের হতাশা কাটিয়া যায়। প্রতীকের সাহায্যে তিনি এই সময় বলিয়াছেন যে পাপকে ক্ষমা করিয়া প্রেমের দ্বারা মুক্তিলাভ সম্ভব—এইখানে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁহার মতের নৈকট্য বিশেষ ভাবে অনুভূত হয়। রবীন্দ্রনাথের সহিত ব্লেকের এক বিশেষ মিল লক্ষ্য করা যায় পাপ-পুণ্যের ব্যাখ্যায়। ব্লেক মনে করেন যে অগ্রগতির জন্য এই উভয়েরই প্রয়োজন আছে—"Swedenborg adopts the normal view that evil is to be eliminated in the interest of good, whereas Blake regards them as the 'contraries' that are necessary to 'progression'. The moralist sees Heaven and Hell divided by an impassable gulf; to Blake they are complementary; 'Hell is opened to Heaven". (William Blake's Prophetic Writing: p-9) রবীন্দ্রনাথও সাধনায় বলিয়াছেন, "......the world in its essence is a reconciliation of pairs of opposing forces; ......these opposites do not bring confusion in the Universe, but harmony." (Sādhanā: p-96). রবীন্দ্রনাথের সহিত তাঁহার একটি বিষয়ে আবার বড় রকমের পার্থক্যও চোখে পড়ে। নারীকে তিনি জগতের মোহ সঞ্চারী সৌন্দর্যের প্রতীক বলিয়া মনে করিতেন এবং জগতের সাধারণ

মানুষের উপর তাহার মোহময়ী প্রভাব দেখিয়া তিনি ভীত-চিন্তিত ছিলেন। রবীন্দ্রনাথ নারীকে সেই সৌন্দর্যের প্রতীক বলিয়া মনে করিয়াছেন যাহা মানুষের ভ্রান্তি দূর করে—যাহা তাহাকে মুক্তি দেয়।

১৯১৫ খ্রীঃ কবি-নাট্যকার ইয়েট্‌স্ (William Butler Yeats : ১৮৬৫-১৯৩৯) নাট্যরীতির জন্য চতুর্দশ-পঞ্চদশ শতাব্দী হইতে প্রচলিত জাপানী 'নোহ' (No অথবা Noh) নাটকের প্রতি দৃষ্টি দেন : এই নাটকের বৈশিষ্ট্য ও প্রতীকিতা তাঁহাকে আকৃষ্ট করে—"It was to the No that the poet Yeats turned about 1915 for a form of drama "distinguished, indirect and symbolic", as he put it" (Donald Keene : Japanese Literature : p-47)। ইয়েট্‌স্-এর সহিত রবীন্দ্রনাথের ঘনিষ্ঠতার কথা সুবিদিত। ইয়েট্‌স্-এর মনও রবীন্দ্রনাথের ন্যায় আশাবাদে সমুজ্জ্বল ছিল—'এ ফুল মুন ইন মার্চ' (১৯৩৫) প্রভৃতিতে তাহার পরিচয় আছে। তবে 'নোহ' নাটক হইতে প্রেরণা গ্রহণের ফলে তাঁহার নাটকগুলি রূপকথা হইয়া উঠিয়াছে—রবীন্দ্রনাথের নাটকে রাজারা আসিয়া অনির্দেশময়তা সৃষ্টি করিলেও উহারা রূপকথা হইয়া ওঠে নাই। ইয়েট্‌স্ পাপীকে শাস্তি দিয়াছেন—রবীন্দ্রনাথ তাহাকে শোধন করিয়াছেন।

মরিস মেটারলিঙ্ক (Maurice Maeterlinck : ১৮৬২-১৯৪৯) প্রতীকী নাট্যকারদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। জেসুইটদের দ্বারা[২৯] প্রতিষ্ঠিত কলেজে তিনি শিক্ষা লাভ করেন। শিক্ষকেরা যে বীজ তাঁহার মধ্যে বপন করিয়াছিলেন পরে তাহাই আধ্যাত্মিক ফুলে পরিণত হইয়াছিল, কিন্তু প্রথম হইতেই তাহা বিশ্বাসের ফল দান করে নাই। ১৮৮৬ খ্রীঃ প্যারিসের প্রতীকীদের দলে যোগ দিয়া তিনি ভিলিয়ার্সের আদর্শবাদের দ্বারা প্রভাবিত হন। শিল্পে এবং জীবনে রহস্যময়তার তাৎপর্য মেটারলিঙ্ক সকলের অপেক্ষা ভাল করিয়া উপলব্ধি করিতে পারিয়াছিলেন। যে অন্ধকার হইতে আমরা বাহির হইয়া আসিয়াছি এবং যে অন্ধকারের রাজ্যে প্রবেশ করিবার জন্য আমাদের যাত্রা, তাহার স্বরূপ সন্ধান করা যে সম্ভব নয় তাহা তিনি অনুভব করিয়াছিলেন। তিনি ইহাও উপলব্ধি করিয়াছিলেন যে এই দুই প্রান্তের অন্ধকার আমাদের ক্ষণস্থায়ী আলোকের রাজ্যে অনুপ্রবেশ করিয়াছে। অনেক

২৯। ১৫৩৪ খ্রীঃ প্রতিষ্ঠিত খ্রীষ্টীয় সম্প্রদায়ের লোক : ইঁহারা সর্বত্র ঈশ্বরের সেবা করেন এবং সৎকার্য করিবার চেষ্টা করেন।

স্থলেই তিনি সঙ্কেত করিয়াছেন যে এই রহস্যময় অন্ধকার ভীতিজনক। এই অন্ধকারের আকর্ষণ আছে কিন্তু ইহার মুখোমুখী দাঁড়ানও সম্ভব নয়। তাঁহার বিশ্বাস রহস্যময় শক্তি মানুষকে ধ্বংস এবং মৃত্যুর দিকে টানিয়া লইয়া যাইতেছে। এই শক্তি তাঁহার নাটকের এক অদৃশ্য চরিত্র। তাঁহার L'Intruse (The Intruder : ১৮৯০)-এ দেখি যে অন্ধ ঠাকুরদা, যাঁহার বাহিরের দৃষ্টি নাই, তিনিই কেবল মৃত্যুর আগমন দেখিতে এবং অনুভব করিতে পারেন, কারণ রহস্যময় জগৎকে তিনি তাঁহার আত্মার দৃষ্টি দ্বারা ভেদ করিতে পারেন। Le Areugles (The Sightless : ১৮৯১)-এর অন্ধব্যক্তিরা সাধারণ মানুষের ন্যায় বহির্জগৎ ও অন্তর্জগৎ এই উভয় দিকেই অন্ধ বলিয়া বনের মধ্যে পথ হারাইয়া ফেলে এবং তাহাদের পথপ্রদর্শক স্বরূপ গীর্জা, তাহাদের পায়ের নিকট মৃত পড়িয়া থাকে।[৩০] যাহারা অন্তর্জগৎকে উপলব্ধি করে নাই তাহাদের কেহই উদ্ধার করিতে পারে না এই সঙ্কেতই তিনি করিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথের আশাবাদী মন কিন্তু সব সময়েই মনে করিয়াছে যে তাঁহার বাঁশী প্রতিনিয়তই আহ্বান করিতেছে—জন্ম-জন্মান্তর, রূপ-রূপান্তরের মধ্য দিয়া অভিযাত্রী মানুষ একদিন না একদিন উদ্ধার পাইবেই।

প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের সাহিত্যে সাধারণতঃ ব্যবহৃত প্রতীকগুলির অধিকাংশই মরমী, কারণ শিল্পীরা মরমী অনুভূতিগুলি বিশেষ রূপের দ্বারা প্রকাশ করিতে চাহেন। শিল্পে এবং জীবনে রহস্যময়তার তাৎপর্য কি তাহা শিল্পী ও মরমী হিসাবে মেটারলিঙ্ক সর্বাপেক্ষা ভালরূপে বুঝিতে পারিয়াছিলেন। তাঁহার নিকট নাট্যশালাও প্রতীক মাত্র।

পরবর্তীকালের নাটকে মেটারলিঙ্কের চিত্তের হতাশা কাটিয়া গিয়া গভীর বিশ্বাস এবং আশাবাদ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে দেখা যায়। তাঁহার সর্বাপেক্ষা জনপ্রিয় নাটক L'oisean blue (The Blue Bird : ১৯০৮)-এ টিল্‌টিল্ ও মিট্‌ল্ আবিষ্কার করে যে মৃত্যুর অস্তিত্ব নাই এবং আনন্দ সন্ধানীর অন্তরে ব্যতীত আর কোথাও আনন্দের অস্তিত্ব নাই। তাঁহার শেষের নাটক-গুলিতে (Le Bourgmeste de Stilmonde : ১৯১৮) গভীর বিশ্বাস প্রতিষ্ঠা পাইয়াছে। তিনি দৃঢ়তার সহিত বলিয়াছেন যে আত্মা অন্যায়-

---

৩০। A History of Modern Drama : Edited by Barrett H. Clark & George Freedly : p-248.

শক্তিকে প্রতিহত করিতে পারে—আত্মিক জগৎকে জড় শক্তির পাপ কখনও কলঙ্কিত করিতে পারে না।[৩১]

রবীন্দ্রনাথের সহিত পরবর্তীকালের মেটারলিঙ্ককে সমগোত্রীয় বলা যায়। যে বিশ্বাস মেটারলিঙ্কের জীবনে প্রথমে তত্ত্বরূপে আসিয়াছিল তাহাই ধীরে ধীরে জীবনের সত্য হইয়া উঠিয়াছিল। রবীন্দ্রনাথের মনে এই বিশ্বাস প্রথম হইতেই সত্যরূপে প্রতিষ্ঠিত ছিল। ইহার প্রধান কারণ ভারতীয় অধ্যাত্ম সাধনায় বিশ্বাসের মর্যাদা বোধ এবং বিশেষ করিয়া তাঁহাদের পরিবারের জীবনচর্যা।

ভারতীয় অধ্যাত্ম সাধনা এই দেশের সাহিত্যিকদের উপর বিশেষ প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। তাঁহারা জ্ঞাতসারে অথবা অজ্ঞাতসারে প্রচুর প্রতীক এবং প্রতিরূপকের প্রযোগ করিয়াছেন। রামায়ণে, মহাভারতে, পুরাণে, কাব্যে তাহার যথেষ্ট পরিচয় রহিযাছে। বাংলা সাহিত্যের গোড়াপত্তনের যুগের যে সাহিত্য আমাদের হাতে আসিয়াছে (চর্যাপদ) তাহাতেও আলো-আঁধারী ভাষায় ভাবের সঙ্কেত করা হইয়াছে। প্রতীকের সহিত প্রতিরূপক ইহার অনেকগুলি পদেই বিজড়িত হইয়া গেছে।[৩২] পরবর্তী-কালের বৈষ্ণবপদকর্তাদের রচনাযও প্রতীক এবং প্রতিরূপকের সম্মিলন হইযাছে।

এই যুগের কোন কোন লেখকের রচনায়ও উহার পরিচয় আছে। কবির জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের (১৮৪০-১৯২৬) স্বপ্নপ্রয়াণ (১৮৭৭), গিরিশচন্দ্র ঘোষের স্বপ্নের ফুল, বিল্বমঙ্গল, দেলদার, প্রভৃতির নাম করা যাইতে পারে। সুতরাং রবীন্দ্রনাথ ইউরোপীয় প্রতীকধর্মী লেখকদের দ্বারা অনুপ্রাণিত হইয়া প্রতীকী নাটকগুলি লিখিয়াছেন ইহা মনে করিবার কোনই কারণ নাই। তবে তাঁহার প্রতীকী নাটকের কলাকৌশলে পাশ্চাত্য প্রতীকী নাটকের প্রভাব যে কিছু কিছু পড়িয়াছে তাহাতে কোন সন্দেহ নাই।

পাশ্চাত্য প্রভাবেই যে রবীন্দ্রনাথ প্রতীকী রচনায় হাত দেন নাই তাহার প্রমাণ রবীন্দ্রনাথ নিজেই। তাঁহার কাব্যের যে পরিচয় পাওয়া

৩১। A History of Modern Drama: Edited by Barrett H. Clark & George Freedly: pp. 248-249.

৩২। সোনে ভরিতী করুণা নাবী—চর্যাপদ : কম্বলাম্বর (হরপ্রসাদ শাস্ত্রী)।

যায় তাহাতে দেখা গিয়াছে যে বাল্যকাল হইতেই তিনি ছিলেন অলৌকিক সৌন্দর্যের কবি। গৃহভৃত্যদের দ্বারা গণ্ডীবদ্ধ জীবনে যখন তিনি আবদ্ধ হইয়া থাকিতেন তখন হইতেই তিনি সুদূরের আহ্বান শুনিয়াছেন। প্রথম হইতেই তিনি অসীম রহস্যের হাতছানি দেখিয়াছেন: তাঁহার কাব্যে সেই রহস্যের সন্ধান সর্বত্রই পাওয়া যায়। পৃথিবীর বৃক্ষলতা মাটির সহিত তিনি মনে মনে একাত্মতা অনুভব করিয়াছেন। এই দৃষ্টিভঙ্গীই তাঁহাকে মরমী করিয়া তুলিয়াছে। অসীম অরূপ তাঁহার চিত্তকে কত বিচিত্ররূপেই না স্পর্শ করিয়াছে।

সীমার মাঝে, অসীম, তুমি
বাজাও আপন সুর।
আমার মধ্যে তোমার প্রকাশ
তাই এত মধুর।
(গীতাঞ্জলি—১২০ সংখ্যক কবিতা)

অসীমকে, অজানার অনুভূতিকে কাব্যে রূপদান করিতে গিযা রবীন্দ্রনাথকে বহুদিন হইতেই প্রতীকের প্রয়োগ করিতে হইয়াছে। মরমী কবির পক্ষে ইহা ব্যতীত অন্য উপায়ও নাই। 'প্রভাত সঙ্গীত'-এর (১৮৮১-১৮৮২) 'নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ' কবিতাটিতে অস্পষ্টরূপে প্রতীকের একটা আভাস দেখা যায়। সোনার তরী (১৮৯১-১৮৯৩) কাব্যে 'সোনার তরী', 'নিরুদ্দেশ যাত্রা' প্রভৃতি কবিতায় প্রতীক এবং প্রতিরূপকের স্পষ্ট পরিচয় আছে—

ঠাঁই নাই, ঠাঁই নাই—ছোটো সে তরী
আমারি সোনার ধানে গিয়েছে ভরি। (সোনার তরী)

'সোনার তরী' কবিতাটির তাৎপর্য আজও স্পষ্ট হয় নাই—ইহাকে সার্থক প্রতীকধর্মী বলা যায়।

খেয়া (১৯০৫-১৯০৬) কাব্যগ্রন্থ হইতেই রবীন্দ্রনাথের প্রকৃত মরমী কবিতার আরম্ভ। এই সময় হইতেই তিনি যেন পরমযাত্রার জন্য প্রস্তুত হইতেছেন—'ঘাটের পথ' কবিতায় কর্ম অবসানে পরপারের জন্য প্রতীক্ষা করিবার সঙ্কেত আছে। 'বালিকা বধূ' 'কৃপণ' প্রভৃতি প্রতীক ধর্মী।

এই ধরণের অনুভূতি প্রকাশেই রবীন্দ্রনাথ বেশী সার্থকতা দেখাইয়াছেন। উপন্যাসও তিনি লিখিয়াছেন সত্য কিন্তু সেইগুলি রচনার কালে তিনি খুব ভাব বিভোর হইতে পারিয়াছিলেন বলিয়া মনে হয় না। তত্ত্বজ্ঞ

রবীন্দ্রনাথের পরিচয় তাহাতে আছে কিন্তু তাঁহার প্রাণরসে তাহারা সঞ্জীবিত হইয়া ওঠে নাই; ছোট গল্পে কবিধর্মের স্বচ্ছন্দ লীলার অবকাশ আছে বলিয়া সেইগুলি উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে—বিশেষ করিয়া যেখানে রহস্যের স্পর্শ আছে (ক্ষুধিত পাষাণ প্রভৃতি), স্নেহরসের পরিচয় আছে (অনধিকার প্রবেশ প্রভৃতি) সেইগুলি জীবন্ত বলিয়া মনে হয়। তথাপি নিঃসন্দেহে এই কথা বলা চলে যে কবির প্রধান লক্ষ্য ছিল কাব্যের প্রতি এবং তাহার পরেই তাঁহার আকর্ষণ স্থল ছিল তাঁহার নাটকগুলি এবং তাহারও মধ্যে বিশেষ করিয়া তাঁহার প্রতীক ধর্মী নাটকগুলি। গদ্যে ও কাব্যে যখন যাহাই রচনা করুন না কেন বার বার সে সমস্ত পরিহার করিয়া নাটক নাটিকায় হাত দিয়াছেন[৩৩]। নাটক রচনার আগ্রহ ছিল তাঁহার মজ্জাগত। অনেক রচনাই তাঁহাকে মাসিক পত্রের তাগিদে করিতে হইয়াছে সত্য কিন্তু নাটক রচনা করিয়াছেন তিনি নিজের অন্তরের নির্দেশে। নিজে অভিনয় করিতে ভালবাসিতেন বলিয়াই হয়ত তিনি নাটক রচনায় এত অধিক অভিনিবিষ্ট হইতেন।

নাটকের আঙ্গিক প্রতীকিতার বিশেষ উপযোগী। উপন্যাস একা পাঠ করিতে হয়—দুই-চারিজন শ্রোতা কখন কখন থাকে না তাহা নহে। ইহাতে নাটকের ন্যায় ভ্রান্তি সৃষ্টি করা সম্ভব নয়। বিশেষ উপন্যাস শেষ করিতে কমপক্ষেও পাঁচ-ছয় ঘণ্টা সময় লাগে। এতটা সময় একটা মানুষকে বাস্তব পৃথিবী ভুলাইয়া সুদূর লোকে ধরিয়া রাখা প্রায় অসম্ভব। নাটকে সেই অসুবিধা নাই—এখানে চক্ষুর সম্মুখে যে ব্যাপার ঘটে তাহা স্বভাবতঃই আকর্ষণ করে। দুই ঘণ্টা আড়াই ঘণ্টার মধ্যেই নাটক শেষ হইয়া যায়: এই সময়টুকু অভিনেতা-অভিনেত্রীরা দর্শকদের মনকে ধরিয়া রাখিতে পারেন। প্রতীকিতায় যে মোহময় অনুভূতি সৃষ্টি করা প্রয়োজন তাহা এই সময়টুকুর জন্য বিস্তার করা নাটকের দ্বারা সম্ভব। সেই জন্যই রবীন্দ্রনাথ প্রতীক সৃষ্টিতে নাটককেই বাছিয়া লইয়াছিলেন। কাব্যে মনকে আকর্ষণ করা গেলেও অভিনেতা-অভিনেত্রীর সাহায্য পাওয়া যায় না। তাই নাটকে প্রতীকের প্রয়োগ যেমন একদিকে উপন্যাসে প্রয়োগ অপেক্ষা শতগুণ সুবিধাজনক সেইরূপ কাব্যে প্রয়োগ অপেক্ষাও সহজতর।

৩৩। ১৮৮১, ১৮৮২, ১৮৮৪, ১৯০৮, ১৯১২ প্রভৃতি সালে কাব্য, প্রবন্ধ রচনার অবসরে নাটক রচনা করেন।

প্রতীকধর্মী নাটকগুলির মধ্যে তাঁহার মরমী দৃষ্টিভঙ্গী উৎসারিত হইয়াছে। কয়েকটি রূপান্তরিতও করিয়াছেন[৩৪]। শান্তিনিকেতনের ছেলেমেয়েদের লইয়া বিভিন্ন নাটকের অভিনয়ও তিনি বহুবার করিয়াছেন। সংক্ষেপে বলা চলে যে এইগুলিকে তিনি পক্ষপুটে আশ্রয় দিয়াছিলেন। নিজের মনের বিশেষ উপলব্ধি এই নাটকগুলিতে প্রতীকের সাহায্যে সঙ্কেত করিতে পারিয়াছিলেন বলিয়াই হয়ত এইগুলি তাঁহার এত প্রিয় ছিল।

সুতরাং রবীন্দ্রনাথ প্রতীকের প্রয়োগে ফরাসী প্রতীকধর্মী লেখকদের সমকালীন বলিলে বোধ হয় ভুল হইবে না। তাঁহাকে অনুকারী বলা চলে না। তাঁহার মনের গড়নই ছিল প্রতীকিতার একান্ত উপযোগী।

৩৪। শারদোৎসব (১৯০৮) পরিবর্তিত রূপ—ঋণশোধ (১৯২১)
রাজা (১৯১০) „ „ —অরূপরতন (১৯২০)
অচলায়তন (১৯১২) „ „ —গুরু (১৯১৮)

দ্বিতীয় খণ্ড

(নাটকের ব্যাখ্যা)

শারদোৎসব ঃ ঋণশোধ

(১৩১৫ ঃ ১৯০৮)

শারদোৎসব বা ঋণশোধ সম্পূর্ণরূপেই যাত্রার ভঙ্গীতে রচিত। এই নাটক অভিনয়ের জন্য কোন মঞ্চেরও প্রয়োজন হয় না। একটি কুঞ্জবনের চারিদিকে উপবিষ্ট দর্শকদের মধ্যে প্রকৃতি ও মানুষের একটা ঘনিষ্ঠ যোগবন্ধন স্থাপন করিবার উপযুক্ত করিয়া নাটকটি অভিনীত হইবার যোগ্য, "বিশেষ বিশেষ ফুলে ফলে হাওয়ায় আলোকে আকাশে পৃথিবীতে বিশেষ বিশেষ ঋতুর উৎসব চলিতেছে"—(গ্রন্থ পরিচয় ঃ পৃ-৮৯)। এই ঋতুর উৎসবকে জীবনে গ্রহণ না করিলে মানুষের পূর্ণতা লাভের কোন সম্ভাবনা থাকে না। প্রকৃতিজগৎ মানুষকে বেষ্টন করিয়া আছে, যাহা এইরূপে বেষ্টন করিয়া আছে তাহা যদি কোন প্রভাব ফেলিতে না পারে তবে মানুষের হৃদয়ের পরিচয় কিরূপে পাওয়া যাইবে! মানুষকে যদি পরিপূর্ণ করিয়া তুলিতে হয় তবে তাহাকে বিশ্বপ্রকৃতির পটভূমিকায় দাঁড় করাইতে হইবে। শান্তিনিকেতনের আশ্রমে এই ব্যবস্থাই করা হইয়াছে। সেইজন্যই সমস্ত নাটকে যে ভাবটি পরিব্যাপ্ত হইয়া আছে তাহা শান্তিনিকেতনের আশ্রম বালকদের পক্ষে উপলব্ধি করা সহজ। কিন্তু ইহা কেবল আশ্রম বালকদিগেরই বোধগম্য হইবার বিষয় তাহা নহে। ভারতীয় জীবনাদর্শে বিশ্বপ্রকৃতির একটা বিশেষ স্থান বরাবরই ছিল, "অন্য দেশের সাহিত্যে দেখতে পাই বিশ্বপ্রকৃতিকে নাটকে কেবল আভাসে রক্ষা করা হয় মাত্র; তার মধ্যে তাকে বেশি জায়গা দেবার অবকাশ থাকে না। আমাদের দেশের প্রাচীন যে নাটকগুলি আজ পর্যন্ত খ্যাতি রক্ষা করে আসছে তাতে দেখতে পাই, প্রকৃতিও নাটকের মধ্যে নিজের অংশ থেকে বঞ্চিত হয় না"। (শান্তিনিকেতন ঃ ১ম খণ্ড ঃ তপোবন ঃ পৃ-৪১২)। সেই কথাটা স্মরণ রাখিয়া মানুষকে পূর্ণতা দিবার উদ্দেশ্যেই রবীন্দ্রনাথের ঋতু উৎসবের নাটকগুলি লেখা। মানুষের পূর্ণতা কেবল মানুষের সংসারেই হয় না, "বিশ্বপ্রকৃতির সঙ্গে আমাদের চিত্তের মিলনের অভাব আমাদের মানব-প্রকৃতির পক্ষে একটা প্রকাণ্ড অভাব" (গ্রন্থ পরিচয় ঃ পৃ-৯১)।

রবীন্দ্রনাথের প্রথম ঋতু উৎসবের নাটক শারদোৎসব। নাটকটির মঞ্চ রূপায়ণের যেটুকু অসুবিধা ছিল রবীন্দ্রনাথ তাহা সংশোধন করিয়া লন ঋণশোধ-এ[১]। রবীন্দ্রনাথের যে ধনঞ্জয় বৈরাগী, ঠাকুরদাদা, দাদাঠাকুরের সন্ধান পাওয়া যায় বিভিন্ন নাটকে তাহারই সূত্রপাত শারদোৎসব-এ। কিন্তু এই নাটকের ঠাকুরদাদা পূর্ণতা পান নাই। ইঁহারা অসীমের মাধ্যম রূপে অসীম অনন্তকে সহজ স্বাভাবিকভাবে সঙ্কেত করিয়াছেন[২]। কিন্তু শারদোৎসব বা ঋণশোধ নাটকের ঠাকুরদাদা সেই মর্যাদা পান নাই। তিনি অনন্তের স্বরূপ উপলব্ধি করিতে পারেন নাই : অহং বোধকে লুপ্ত করিয়া মনকে উদার করিয়া প্রস্তুত হইয়া রহিয়াছেন মাত্র। অসীম অনন্তকে জানিবার আগ্রহ তাঁহার জন্মিয়াছে এবং তাহারই সাধনায় তিনি শিশুর দলের সহিত প্রকৃতি জগতের উন্মুক্ত প্রাঙ্গণে আসিয়া দাঁড়াইয়াছেন। অন্যান্য নাটকে যে ঠাকুরদাদা জাতীয় চরিত্র আছে তাঁহাদের সাধনা শেষ হইয়াছে। তাঁহারা রাজার চিঠির সংবাদ রাখেন[৩] এবং ভৈরবের নৃত্যের আরম্ভও দেখিতে পান[৪]। কিন্তু শারদোৎসব-এর ঠাকুরদাদা বেদনা কাতর এবং স্নেহপ্রবণ হইলেও তাঁহার গভীর দৃষ্টি নাই : উপনন্দ-র ঋণশোধের তাৎপর্য তাঁহার বোধগম্য হয় না। তাই সাধারণ স্নেহশীল মানুষের ন্যায় বলিয়া ওঠেন, "হায় হায়, তোমার মতো কাঁচা বয়সের ছেলেকেও ঋণশোধ করতে হয়! আর এমন দিনেও ঋণশোধ। ঠাকুর, আজ নতুন উত্তরে হাওয়ায় ও পারে কাশের বনে ঢেউ দিয়েছে, এ পারে ধানের খেতের সবুজে চোখ একেবারে ডুবিয়ে দিলে, শিউলিবন থেকে আকাশে আজ পুজোর গন্ধ ভরে উঠেছে, এরই মাঝখানে ঐ ছেলেটি আজ ঋণশোধের আয়োজনে বসে গেছে এও কি চক্ষে দেখা যায়" (শারদোৎসব : পৃ-২১ ; ঋণশোধ : র, র, ১৩ খণ্ড : পৃ-২৩৪)। এখানে সন্ন্যাসীই (ছদ্মবেশী চক্রবর্তী সম্রাট বিজয়াদিত্য) পরবর্তী নাটকগুলির ঠাকুরদাদা জাতীয় চরিত্রের কাজ সম্পন্ন করিয়াছেন : তিনিই অসীম অনন্ত সত্তার সন্ধান জানেন, প্রকৃতি জগৎ ও মনুষ্য জগতের অভিব্যক্তির অর্থ

১। এই গ্রন্থের ৩য় খণ্ডের ২য় পরিচ্ছেদ দ্রষ্টব্য
২। তদেব
৩। ডাকঘর
৪। মুক্তধারা

বোঝেন। সেইজন্যই ঠাকুরদাদার কথার উত্তরে তিনি বলেন, "বল কী, এর চেয়ে সুন্দর কি আর কিছু আছে! এই ছেলেটিই তো আজ সারদার বরপুত্র হয়ে তাঁর কোল উজ্জ্বল করে বসেছে। তিনি তাঁর আকাশের সমস্ত সোনার আলো দিয়ে ওকে বুকে চেপে ধরেছেন। আহা, আজ এই বালকের ঋণশোধের মতো এমন শুভ্র ফুলটি কি কোথাও ফুটেছে, চেয়ে দেখো তো" ! (শা পৃ-২১-২২ ; ঋ : ১৩শ খণ্ড : পৃ-২৩৪)।

রবীন্দ্রনাথ বুঝিয়াছিলেন যে স্বয়ং চক্রবর্তী সম্রাটকে অসীমের মাধ্যমরূপে সৃষ্টি করার পর আর তাঁহাকে সন্ন্যাসী সাজাইবার বিশেষ তাৎপর্য থাকে না। যাঁহার আত্মচেতনা সম্পূর্ণ হইয়া গিয়াছে তাঁহার ছদ্মবেশ ধারণ করিয়া ছুটির আনন্দ উপভোগের তাৎপর্য খুব বেশী নয়। সেইটুকু বুঝিয়া রবীন্দ্রনাথ আপনা হইতেই যেন একটা কারণ দর্শাইয়াছেন—

রাজা

মহারাজ, দাসকে কি পরীক্ষা করতে বেরিয়েছিলেন।—

সন্ন্যাসী

না সোমপাল, আমি নিজের পরীক্ষাতেই বেরিয়েছিলেম। (শা : পৃ-৭৬)

পাঠকমাত্রেই জানেন যে শারদোৎসব-এ বিজয়াদিত্যের পরীক্ষার কোন প্রয়োজন ছিল না। যেখানে সংশয় সেখানেই জিজ্ঞাসার এবং পরীক্ষার প্রয়োজন। বিজয়াদিত্যের মনে সে-সংশয়ের পরিচয় কোথাও নাই। মনে হয় সেই জন্যই 'ঋণশোধ'[৫]-এ রবীন্দ্রনাথ একটা বড রকমের পরিবর্তন সাধন করিয়াছেন। এই নাটকের 'শেখর' চরিত্র সংশোধনী রূপেই সৃষ্টি করিয়াছেন বলিয়া ধরা যাইতে পারে। শেখর কবি, সুতরাং সৃষ্টিকার্যের মহাকবির সঙ্গে নিশ্চয়ই সৌন্দর্য এবং রসের যোগে আবদ্ধ। তাই তাঁহার পক্ষে অনন্ত সত্তার স্বরূপ প্রকাশক হইয়া ওঠা কিছুমাত্র বিচিত্র নয়। ঋণশোধ নাটকে শেখরই প্রধান, রাজচক্রবর্তী সম্রাট বিজয়াদিত্য দ্বিতীয় স্থানে সরিয়া গিয়াছেন। শেখরকে সম্রাট তাঁহার গুরুর আসন দিয়াছেন।[৬]

ঋণশোধ-এ শেখরকে আনিয়া রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরদাদাকে আরও পশ্চাতে ফেলিয়াছেন সত্য, কিন্তু ইহা ব্যতীত অন্য উপায়ও ছিল না। পরবর্তী

৫। রবীন্দ্রনাথ নাটকের উপযোগী করিয়া শারদোৎসব-এ কিছু পরিবর্তন সাধন করেন। তাহারই নাম তিনি দেন ঋণশোধ। ইহা ১৩২৮ (১৯২১) সালে প্রকাশিত হয়।

৬। আমি যে কবির কাছে দীক্ষা নিয়েছিলুম। (ঋণশোধ : র, র : ১৩শ খণ্ড পৃ-২৫১)

প্রতীক নাটকগুলিতে শেখর ও ঠাকুরদাদা মিলিয়া মিশিয়া এক হইয়া গিয়াছেন।

শারদোৎসব নাটকের দ্বন্দ্ব তাহার প্রথম দৃশ্যেই স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে—এই দ্বন্দ্ব সংকীর্ণ নীরস জীবনের সঙ্গে উন্মুক্ত প্রাণের আনন্দ বোধের। বালকের দল প্রকৃতির সহিত মিলিয়া গিয়াছে ছুটির আনন্দ উপভোগ করিতে, আনন্দ তাহাদের মনকে উধাও করিয়া দিয়াছে, "কী করি আজ ভেবে না পাই, পথ হারিয়ে কোন্ বনে যাই"। (পৃ-৭) মানুষের সঙ্গে প্রকৃতির সঙ্গে তখন তাহাদের মিলিয়া যাইবার আকাঙ্ক্ষা—

রাখাল-ছেলের সঙ্গে ধেনু
চরাব আজ বাজিয়ে বেণু,
মাখব গায়ে ফুলের রেণু
চাঁপার বনে লুটি। (পৃ-৭)

এই ভাবটির সম্মুখে মূর্তিমান বিরোধ লক্ষেশ্বর: মিলনের উদ্দামতা এবং সকল কিছুর মধ্যে নিজেদের বেহিসাবী মিলাইয়া দিবার প্রচেষ্টার মুখোমুখি লক্ষেশ্বরের হিসাবের খাতা—লাভের মাপকাঠিতে তাহা ক্ষুদ্রতর গণ্ডীতে বাঁধা; সেখানে সৌন্দর্যের অখণ্ডতার বোধ নাই, তাহা স্বার্থবোধের দ্বারা খণ্ডিত, "গান গাবার বুঝি সময় নেই! আমার হিসাব লিখতে ভুল হয়ে যায় যে" (শা: পৃ-৯; ঋণ: র, র: ১৩শ খণ্ড: পৃ-২২৬)। গানের সুর অসীমের দিকে উধাও হয় বলিয়াই হিসাবের গরমিল করিয়া দেয়। মন উধাও হইলে যে অখণ্ডতার দিকেই টানিয়া লইয়া যাইবে! তাই খণ্ডতার পক্ষে আবদ্ধ লক্ষেশ্বর গান সহ্য করিতে পারে না। শারদোৎসব নাটকের দ্বন্দ্ব এইখানে।

একদিকে—

লাভ ক্ষতি টানাটানি, অতি সূক্ষ্ম ভগ্ন অংশ ভাগ,
কলহ সংশয়

আর একদিকে—

সহে না সহে না আর জীবনেরে খণ্ড খণ্ড করি
দণ্ডে দণ্ডে ক্ষয়॥ (কল্পনা: বর্ষশেষ)

কবি নিজেই বলিয়াছেন, "আমাদের আশ্রমে আমরা প্রকৃতির ঋতু-উৎসবগুলিকে নিজেদের মধ্যে স্বীকার করিয়া লইয়াছি। শারদোৎসব সেই ঋতু-উৎসবেরই একটি নাটকের পালা। নাটকের পাত্রগণের মধ্যে এই উৎসবের বাধা কে। লক্ষেশ্বর—সেই বণিক আপনার স্বার্থ লইয়া, টাকা উপার্জন লইয়া, সকলকে সন্দেহ করিয়া, ভয় করিয়া, ঈর্ষা করিয়া, সকলের কাছ হইতে আপনার সমস্ত সম্পদ গোপন করিয়া বেড়াইতেছে। এই উৎসবের পুরোহিত কে। সেই রাজা যিনি আপনাকে ভুলিয়া সকলের সঙ্গে মিলিতে বাহির হইয়াছেন, লক্ষ্মীর সৌন্দর্যের শতদল পদ্মটিকে যিনি চান" (শা : গ্রন্থপরিচয় : পৃ-৯২-৯৩)।

এই দ্বন্দ্ব মূলতঃ ভারতবর্ষের পুরাতন ধারার সহিত নূতন যুগ-চেতনার। ভারতীয় জীবনাদর্শে মিলনের সুরই ধ্বনিত হইত ; ভোগ অপেক্ষা ত্যাগের মন্ত্রেই দীক্ষিত ছিল তখনকার মানুষ। পিতার আদেশে অভিষেকের পূর্বমুহূর্তে বনের পথে বাহির হইয়া পড়িতেন রামচন্দ্ররা, এবং অকারণে কেবল ভালবাসিয়াই সঙ্গে যাইতেন লক্ষ্মণের দল। ইঁট-কাঠের স্তূপই মানুষের কাম্য ছিল না। রাজপুত্ররাও প্রাসাদ ছাড়িয়া বনপ্রদেশে গুরুর আশ্রমে দীর্ঘকাল থাকিয়া শিক্ষা গ্রহণ করিতেন। বনপ্রদেশ হিংস্র জন্তুর আবাসস্থল বলিয়াই নিতান্ত তুচ্ছ বলিয়া কেহ মনে করিত না। বর্তমান যুগে প্রয়োজনটাই বড় হইয়া উঠিয়াছে। টাকার অঙ্কে একদিকে শূন্যের পর শূন্য বৃদ্ধি পাইতেছে, চিত্তের সরসতাও সেইরূপ অপরদিকে মরুভূমির ন্যায় শূন্য হইয়া উঠিতেছে, "ভারতবর্ষে এই একটি আশ্চর্য ব্যাপার দেখা গেছে, এখানকার সভ্যতার মূল প্রস্রবণ শহরে নয়, বনে। ভারতবর্ষের প্রথমতম আশ্চর্য বিকাশ যেখানে দেখতে পাই সেখানে মানুষের সঙ্গে মানুষ অত্যন্ত ঘেঁষাঘেঁষি করে একেবারে পিণ্ড পাকিয়ে ওঠে নি। সেখানে গাছপালা নদীসরোবর মানুষের সঙ্গে মিলে থাকবার যথেষ্ট অবকাশ পেয়েছিল। সেখানে মানুষও ছিল, ফাঁকাও ছিল, ঠেলাঠেলি ছিল না। অথচ এই ফাঁকায় ভারতবর্ষের চিত্তকে জড়প্রায় করে দেয় নি, বরঞ্চ তার চেতনাকে আরও উজ্জ্বল করে দিয়েছিল" (শান্তিনিকেতন : ১ম খণ্ড : তপোবন : পৃ-৪০৭)। "তরুলতা পশুপক্ষী সকলের সঙ্গে মানুষের মিলনের পূর্ণতা, এই হচ্ছে এর ভিতরকার ভাব" (তদেব : পৃ-৪১১)।

আর বর্তমান যুগচেতনা স্বাতন্ত্র্যের চেতনা : স্বাতন্ত্র্যের বোধ যখন

মানুষকে আচ্ছন্ন করে তখন তাহার ভোগচেতনাই বড় হইয়া ওঠে। কি দিতে পারি এই বোধ অপেক্ষা কি আদায় করিতে পারি এই বোধটাই সর্বদা চেতনাকে জাগ্রত করিয়া রাখে। ইহা সত্য যে এই যুগেও মানুষ দল বাঁধে, কিন্তু তাহা তো স্বাতন্ত্র্যবোধ হইতেই উদ্ভূত, স্বার্থচেতনা হইতে জাত। দলই শক্তি ইহা বোঝে বলিয়াই আজ তাহারা দল বাঁধে, মনের মধ্যে ঐক্য উপলব্ধি করে বলিয়া নহে। ব্যষ্টি যদি সমষ্টির মধ্যে বিলীন হইয়া যাইতে পারিত তবে তো দল বাঁধিবার প্রয়োজনও হইত না। সুতরাং এই নাটকের মূল দ্বন্দ্ব বিশ্বচেতনার সঙ্গে স্বার্থচেতনার।

ঋণশোধ-এর দ্বন্দ্বও তাহাই। ভূমিকায় রবীন্দ্রনাথ তাহা প্রকাশ করিয়াই বলিয়াছেন। রাজা বিজয়াদিত্য এবং মন্ত্রী সুভূতির রাজনীতি বোধের মধ্যেই রহিয়াছে নাটকের দ্বন্দ্বটি—

মন্ত্রী। রাজ্য রাখতে গেলে রাজ্য বাড়াতে হবে···কেবলই জয় করতে হবে, কেননা প্রতাপ জিনিসটা যেখানে থামে সেইখানে নিবে যায়।

... ...

বিজয়াদিত্য। রাজ্যের লোভ মিটবে বলেই আমি রাজত্ব করি, বাড়বে বলে নয়। রাজা হয়েছি বলেই দেখতে পেয়েছি রাজ্যটা কিছুই নয়।—

... ...

সেই জন্যেই তো আমি রাজ্যে লোভ করতে চাইনে। কোনো সাম্রাজ্যই তো আজ পর্যন্ত টেঁকেনি—যে সাম্রাজ্য যতই বড়োই হ'ক। কিন্তু একবারের মত যে সত্যকার রাজা হতে পেরেছে চিরকালের মতো সে বেঁচে রইল।

(ঋণ': র, র: ১৩শ খণ্ড: পৃ-২১৯)

এখানেও সেই একই কথা। বিজয়াদিত্য প্রকৃত রাজার ন্যায় সকলের মধ্যে নিজের হৃদয় রাজ্য বিস্তার করিতে চাহেন: আর সুভূতি যে রাজ্য বিস্তারের কথা বলেন তাহা মানুষে মানুষে সংঘর্ষ সৃষ্টি করে—স্বার্থবোধের দ্বারা তাহা খণ্ডিত। "প্রবলতার মধ্যে সম্পূর্ণতার আদর্শ নেই। সমগ্রের সামঞ্জস্য নষ্ট করে প্রবলতা নিজেকে স্বতন্ত্র করে দেখায় বলেই তাকে বড়ো মনে হয়, কিন্তু আসলে সে ক্ষুদ্র" (শান্তিনিকেতন: ১ম খণ্ড: তপোবন: পৃ-৪৪০)

প্রতিটি ঋতুর উৎসবের সঙ্গে মানুষ যুক্ত হউক ইহাই ছিল রবীন্দ্রনাথের কামনা। তাঁহার একটা শক্তি তো প্রকৃতি জগতের মধ্যেও কাজ করিয়া চলিয়াছে তাহাকে না জানিলে তাঁহাকেই যে যথার্থরূপে জানা যাইবে না। বিশ্বপ্রকৃতির মধ্য দিয়া আমাদের দেহ ও মনের পুষ্টিকর যে অন্নজল এবং আলোবাতাস আমরা প্রতিনিয়ত গ্রহণ করিতেছি সেগুলি যে কেবল বস্তু অথবা শূন্যতা হইতে আসে নাই, এক চেতন অনন্ত আনন্দময় সত্তাই যে তাহাদেব উৎস তাহা যদি উপলব্ধি করিতে না পারি তবে যে সত্যকে জানা হইবে না। সেই সত্যকে উপলব্ধি কবিবাব জন্যই চক্রবর্তী সম্রাট বাহির হইযাছেন সন্ন্যাসীর বেশে, "চোখেব পাতার উপবে পুঁথির পাতাগুলো আড়াল কবে খাড়া হযে দাঁড়িযেছে—সেইগুলো খসিয়ে ফেলতে চাই" (শা: পৃ-১৮; ঋণ: ব, র: ১৩শ খণ্ড: পৃ-২৩৩)। ইংরাজ কবি ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থও (William Wordsworth: ১৭৭০-১৮৫০) প্রকৃতিকে শিক্ষাদাতা বলিযা মনে করিতেন: মানুষকে সঞ্জীবিত কারযা তুলিতে গ্রন্থ অপেক্ষা প্রকৃতিব শক্তি অধিক এই বিশ্বাস তাঁহাব ছিল—

> Up! up! my Friend, and quit your books;
> Or surely you'll grow double,
> Up! up! my Friend, and clear your looks;
> Why all this toil and trouble?
>
> ... ...
>
> Books! 'tis a dull and endless strife:
> Come, hear the woodland linnet,
> How sweet his music! on my life,
> There's more of wisdom in it.
>
> (Wordsworth: Books and Nature)

তবে প্রকৃতির শিক্ষা গ্রহণের জন্য মনেব প্রস্তুতি আবশ্যক। ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থও তাহা বুঝিযাছিলেন—সেইজন্যই উল্লিখিত কবিতাটিব শেষ স্তবকে তিনি বলিয়াছেন—

> Come forth, and bring with you a heart
> That watches and receives.

অন্তরকে প্রস্তুত করিবার উপায় কি? নিজেকে সংযত করা—সুখার্থী সংযতো ভবেৎ। সৌন্দর্যভোগ করিতে হইলে, অনন্ত সত্তাকে প্রকৃতির মধ্যে উপলব্ধি করিতে হইলে ইচ্ছাকে, ভোগাকাঙ্ক্ষাকে শাসনে রাখিতে

হইবে। অহংকে লুপ্ত না করিয়া বিশ্বের দিকে চাহিলে কিছু দেখিবার জো নাই। অহং যতক্ষণ দৃঢ়তার সহিত রাজ্য অধিকার করিয়া থাকে ততক্ষণ যাহা দেখি তাহাতেই একটা মিথ্যা জড়িত হইয়া থাকে, "আমি একদা একখানি নৌকায় একাকী বাস করিতেছিলাম। একদিন সায়াহ্নে একটি মোমের বাতি জ্বালাইয়া পড়িতে পড়িতে অনেক রাত হইয়া গেল। শ্রান্ত হইয়া যেমনি বাতি নিবাইয়া দিলাম, অমনি এক মুহূর্তেই পূর্ণিমার চন্দ্রালোক চারিদিকের মুক্ত বাতায়ন দিয়া আমার কক্ষ পরিপূর্ণ করিয়া দিল। আমার স্বহস্ত জ্বালিত একটি মাত্র ক্ষুদ্র বাতি এই আকাশ পরিপ্লাবী অজস্র আলোককে আমার নিকট হইতে অগোচর করিয়া রাখিয়াছিল। এই অপরিমেয় জ্যোতিঃ সম্পদ লাভ করিবার জন্য আমাকে আর কিছুই করিতে হয় নাই, কেবল সেই বাতিটি এক ফুৎকারে নিবাইয়া দিতে হইয়াছিল। তাহার পরে কি পাইলাম। বাতির মতো কোন নাড়িবার জিনিস পাই নাই, সিন্দুকে ভরিবার জিনিস পাই নাই—পাইয়াছিলাম আলোক, আনন্দ, সৌন্দর্য, শান্তি। যাহাকে সরাইয়াছিলাম তাহার চেয়ে অনেক বেশী পাইয়াছিলাম" (ধর্ম : ধর্মের সরল আদর্শ : পৃ-৩৪-৩৫)।

শুষ্ক জ্ঞানের জগতে পড়িয়া থাকিলেই চলিবে না : অহংকে সংযত করিয়া প্রেমের আলোকে পৃথিবীর দিকে চাহিয়া দেখা চাই। ইহাই পুরাতন ধারাকে পরিবর্তিত করিয়া নবীন করিয়া তুলিতে পারে। অনেক সংস্কারই হয়তো ভাল ; কিন্তু উহার ত্রুটি এইখানে যে সংস্কার মাত্রই মানুষের স্কন্ধে অপদেবতার মতো চাপিয়া থাকে। উহাই তখন বোঝা হইয়া উঠিয়া মানুষের অগ্রগতিকে বাধা দিতে চায়। মাত্র এক বৎসর হইল সিংহাসনে আরোহণ করিয়া বিজয়াদিত্য অনুভব করেন, "আমাদের বংশে যতদিন যত রাজা হয়েছে সকলের বয়স একত্র হয়ে আমার ঘাড়ে চেপে বসেছে।" (ঋণশোধ : ভূমিকা)। রাজা হওয়ার এই বয়সের বোঝা স্কন্ধ হইতে নামাইতে হইলে সিংহাসনের অহমিকা ত্যাগ করিয়া সকলের মধ্যে বাহির হইয়া পড়িতে হইবে। শেখর কবিকে দিয়া কবি রবীন্দ্রনাথ সেই কথা স্মরণ করাইয়া দিয়াছেন, "সিংহাসন থেকে একবার মাটিতে পা ফেলেন দেখি। ওই মাটির মধ্যে জীবন যৌবনের জাদুমন্ত্র রয়েছে" (তদেব : পৃ-২২০)। মাটি বাঁধিয়া রাখে না, সে মুক্তি দেয়। অনন্তের পথে পা বাড়াইবার বাধা সেখানে নাই।

মরমীদের আত্মাকে প্রোজ্জ্বল করিয়া তুলিবার সহজতম কৌশলটিও তাহাই। প্রকৃতির মধ্যে ঈশ্বরকে দেখিতে হইবে। বস্তুবিশ্বের মধ্যে একটা উজ্জ্বল চেতন সত্তার উপলব্ধি চাই।[৭] মরমী রবীন্দ্রনাথও ঋণশোধ-এ সেই কথাই বলিয়াছিলেন। একবার উদার মুক্ত মন লইয়া প্রকৃতির মধ্যে বাহির হইয়া পড়িলেই প্রকৃতিও সজীব সত্তার মতো একেবারে হৃদয়ের মধ্যে প্রবেশ করিবে। প্রকৃতি তো প্রকাশিত হইয়াই আছে। যে মনে ক্ষুদ্রতার বাধা আছে, সংকীর্ণতার বাধা আছে, যে কেবলি ক্ষুদ্র স্থানকে নিজের বলিয়া চিহ্নিত করিয়া রাখিতে চায়, যে বলে, "ওঠ্ ওঠ্ ঐ জায়গা থেকে" (শা: পৃ-৩১) অথবা, "এই জন্যেই হাত জোড় করে বলছি আমার ঘরটার দিকে উঁকি দিয়ো না" (ঋণ: র, ব: ১৩শ খণ্ড: পৃ-২২৯) সে নিজের হৃদয়ে প্রকৃতির প্রবেশের পথে বাধা সৃষ্টি করে। অসীমের সঙ্গে তাহার যোগ সাধন কখনও সম্ভব নয়। কিন্তু যেখানে ছুটির আনন্দ সেখানে প্রাণের দ্বার সম্পূর্ণ মুক্ত—সেখানে গান একেবারে আকাশে গিয়া পৌঁছায়। সারদা যে শরৎকালে বাহির হইয়া আসেন তাহা আর অগোচরে থাকে না: তাঁহাকে দেখিয়া তখন চক্ষু সার্থক হয়, শরীর পবিত্র হয়, মন প্রশান্ত হয়। তখন পরিপূর্ণ প্রকৃতি মানুষের মনকে পরিপূর্ণ করিয়া তোলে। শরৎ প্রকৃতির উন্মুক্ত প্রকাশকে হৃদয়ে বরণ করিয়া লইবার জন্য তিনি নাটক আরম্ভের পূর্বেই দর্শকদের নির্দেশ দিয়াছেন—

প্রফুল্ল শেফালি কুঞ্জ যাঁর পায়ে ঢালিছে অঞ্জলি,
কাশের মঞ্জরীরাশি যাঁর পানে উঠিছে চঞ্চলি',
স্বর্ণদীপ্তি আশ্বিনের স্নিগ্ধ হাস্যে সেই রসময়
নির্মল শারদরূপে কেড়ে নিল সবার হৃদয়।[৮]

মনের প্রস্তুতি না থাকিলে 'শারদরূপে'র সাধ্য নাই হৃদয় কাড়িয়া লয়। হৃদয় দিলে তবে তো হৃদয় পাওয়া যাইবে। ভারতীয় কল্পনায় প্রকৃতি সজীব। এই সজীব প্রকৃতিকে যে হৃদয় দেয় নাই সে তাহাকে হৃদয়ে পাইবেই বা কি করিয়া? শরৎকে দেখিয়া বিভিন্ন মানুষের চিত্ত বিভিন্ন রূপে আলোড়িত হইয়া উঠিয়াছে—

৭। Underhill, E.: Mysticism: The Illumination of the Self.

৮। শারদোৎসব: গ্রন্থ পরিচয়: পৃ-১০৩: শান্তিনিকেতনে শারদোৎসব নাটকের প্রথম অভিনয় (১৩১৫) উপলক্ষে কবির লিখিত নান্দীর কিয়দংশ। উহা গ্রন্থে মুদ্রিত হয় নাই।

সেনাপতি বলিতেছে, "মহারাজ শরৎকালে জয়যাত্রায় বেরোবার নিয়ম"
(ঋণ : র, র : পৃ-২২০)

লক্ষেশ্বর বলে, "শরৎকাল এসেছে, আর ঘরে বসে থাকতে পারছি নে—এখন বাণিজ্যে বের হতে হবে" (শা : পৃ-৩৮ : ঋণ : র, ব: পৃ-২৪২)

রাজা সোমপাল, "শরৎকাল এসেছে—সকাল বেলা উঠে, বেতসিনীর জলের উপর যখন আশ্বিনের রৌদ্র পড়ে, তখন আমার সৈন্য-সামন্ত নিয়ে দিগ্বিজয়ে বেরিয়ে পড়তে ইচ্ছে করে"

(শা: পৃ-৪৩, ঋণ: পৃ-২৪৪)

বিজয়াদিত্য বাহির হইয়া পড়েন সন্ন্যাসীর বেশে এবং মনে করেন যে তাঁহারও ছুটি ফুরাইয়া আসিতেছে। উপনন্দের মনে হয়, "ইচ্ছা করছে আমার প্রভুর জন্যে আজ আমি অসাধ্য কিছু একটা করি। আমি তোমাকে মিথ্যা বলছি নে, তাঁর ঋণ শোধ করতে যদি আজ প্রাণ দিতে পারি তা হলে আমার খুব আনন্দ হবে—মনে হবে আজকের এই সুন্দর শরতের দিন আমার পক্ষে সার্থক হল" (শা : পৃ-৪৭ : ঋণ পৃ-২৪৬) এবং বালকের দল শরতের আহ্বানে সকল কাজ হইতে ছুটি লইয়া বাহির হইয়া পড়িয়াছে—

মেঘের কোলে রোদ হেসেছে
বাদল গেছে টুটি,
আজ আমাদের ছুটি ও ভাই,
আজ আমাদের ছুটি। (শা : পৃ-৭)

রবীন্দ্রনাথ দেখাইয়াছেন যে সেনাপতি গতানুগতিক অভ্যাসের দাস : সোমপাল এবং লক্ষেশ্বর শরৎ প্রকৃতিকে নিজ নিজ স্বার্থ সাধনের সুবিধা রূপেই কাজে লাগাইতে চাহিয়াছে। কিন্তু আনন্দের স্পর্শ পাইয়াছেন সম্রাট বিজয়াদিত্য, কবি শেখর, ঠাকুরদাদা, ছেলের দল এবং উপনন্দ। শেখর তো অসীমেরই মাধ্যম, বিজয়াদিত্য এবং ছেলের দল ছুটির আনন্দ উপভোগের মধ্য দিয়া অনন্তের আস্বাদ গ্রহণ করে। ঠাকুরদাদাও ক্ষুদ্রতার অনেক উর্ধ্বে, "একেবারে পুঁজি নেই তা নয়। ভিতরে ভিতরে জমিয়েছে" (শা : পৃ-৫৫, ঋণ : পৃ-২৫০)। সুতরাং প্রকৃতির ভিতর দিয়া অসীমকে স্পর্শ করিতে হইলে হৃদয়কে উন্মুক্ত করিতে হইবে অথবা

ছুটি লইয়া বাহির হইয়া পড়িতে হইবে। তবে উপনন্দের সার্থক হইবার কারণ কি? সে তো ছুটি লয় নাই, কাজের মধ্যেই আত্মনিয়োগ করিয়া ছেলের দলের আহ্বানকে ফিরাইয়া দিয়াছে, "আজ ছুটির দিন—কিন্তু আমার ঋণ আছে, শোধ করতে হবে, তাই আজ কাজ করছি" (শাঃ পৃ-২১, ঋণ : পৃ-২৩৪)। তাহা হইলে ভানুসিংহের পত্রাবলীতে শারদোৎসব সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ যে লিখিলেন,—"ওটা হচ্ছে ছুটির নাটক[১]। ওর সময়ও ছুটির, ওর বিষয়ও ছুটির। রাজা ছুটি নিয়েছে রাজত্ব থেকে, ছেলেরা ছুটি নিয়েছে পাঠশালা থেকে। তাদের আর কোন মহৎ উদ্দেশ্য নেই কেবল একমাত্র হচ্ছে—'বিনা কাজে বাজিয়ে বাঁশি কাটবে সকল বেলা'। ওর মধ্যে একটা উপনন্দ কাজ করছে, কিন্তু সেও তার ঋণ থেকে ছুটি পাবার কাজ" (২৪শে ভাদ্র, ১৩২৯)—তাহার কি কোন অর্থ নাই! এই অর্থের সন্ধান করিতে কবির ছুটির তত্ত্বটি জানিতে হইবে এবং সেই সঙ্গে স্মরণ করিতে হইবে কর্ম সম্বন্ধে ভারতীয় জনসাধারণের একটি বিশেষ ভাবকে। রবীন্দ্রনাথ লিখিয়াছেন—

"কর্ম থেকে মাঝে মাঝে আমরা যে এইরূপ অবসর লই সে কর্ম থেকে বিচ্ছিন্ন হবার জন্য নয়—কর্মের সঙ্গে যোগকে নবীন রাখবার এই উপায়।

"মাঝে মাঝে কর্মক্ষেত্র থেকে যদি এইরকম দূরে না যাই তবে কর্মের যথার্থ তাৎপর্য আমরা বুঝতে পারি নে। অবিশ্রাম কর্মের মাঝখানে নিবিষ্ট হয়ে থাকলে কর্মটাকেই অতিশয় একান্ত করে দেখা হয়।··· এইজন্য অভ্যস্ত কর্মকে পুনরায় নূতন ক র দেখবার সুযোগ লাভ করব বলেই এক-একবার কর্ম থেকে আমরা সরে যাই" (শান্তিনিকেতন : ১ম খণ্ড : ছুটির পর)। সুতরাং ছুটিও একপ্রকার কর্ম ব্যতীত আর কিছুই নয়। কর্ম হইতে ছুটি লইয়া প্রকৃতির উন্মুক্ত প্রাঙ্গণে নামিয়া আসিলে কর্তব্য কর্মকেই ভালরূপে চিনিয়া লওয়া যায়। অবিশ্রাম কর্মের মাঝখানে থাকিয়া যদি পথ ভুল করি তবে এই ছুটিই তাহা নির্দেশ করিতে পারিবে। আমাদের নির্ধারিত কর্ম, যে কর্মের দায়িত্ব লইয়া আমরা পৃথিবীতে আসিয়াছি তাহা সম্পূর্ণরূপে সম্পন্ন না করিলে যে আমাদের বড় ছুটি মিলিবে না, মুক্তি পাওয়া যাইবে না। ভারতবর্ষের জনচিত্তের সাধারণ

১। ছুটি অর্থে কর্মহীনতা কি নয়।

বিশ্বাস এই যে প্রত্যেকেই কিছু না কিছু কর্ম লইয়া সংসারে আসে; সেই কর্ম শেষ না করিয়া তাহার মুক্তি নাই—এই কর্মের বন্ধন তাহাকে জন্ম-জন্মান্তর ধরিয়া মুক্তির পথে অগ্রসর করিয়া দিতেছে। কর্ম শেষ হইলে তবেই তাহার সকল কিছু শেষ হইবে। বুদ্ধদেব নানা জন্মের ভিতর দিয়া নানা কর্ম করিতে করিতে বুদ্ধত্ব লাভ করিয়া দেহবন্ধন হইতে ছুটি পাইয়াছিলেন। রবীন্দ্রনাথও তাই বলেন—

তুমি কাজ দিলে কাজেরই সঙ্গে
দাও যে অসীম ছুটি (খেযা: ভার)

সুতরাং উপনন্দ ভববন্ধনের ঋণ হইতে ছুটি পাইবার কাজেই রত ছিল, তাই সন্ন্যাসী (বিজয়াদিত্য) বলিয়াছেন, "তুমি পঙ্‌ক্তির পর পঙ্‌ক্তি লিখছ, আর ছুটির পর ছুটি পাচ্ছ" (শা: পৃ-২২, ঋণ: পৃ-২৩৪)। ছেলের দল যে ছুটি লইয়া বাহির হইয়াছে তাহা কর্তব্যকে চিনিয়া বড ছুটি লাভের সাধনা করিবার জন্য—উপনন্দের সেই সাধনার কাজ চলিয়াছে। এই দিক দিয়া উপনন্দর ছুটির আয়োজন উচ্চতর পর্যাযের, "কিন্তু এমন ছেলেও আছে ইস্কুলের সাধনার দুঃখকে স্বেচ্ছায়, এমন কি আনন্দে যে গ্রহণ করে, যেহেতু ইস্কুলের অভিপ্রায়কে সে মনের মধ্যে সত্য করে উপলব্ধি কবেছে। এই অভিপ্রায়কে সত্য করে জানছে বলেই সে যে মুহূর্তে দুঃখকে পাচ্ছে সেই মুহূর্তে দুঃখকে অতিক্রম করছে, যে মুহূর্তে নিয়মকে মানছে সেই মুহূর্তে তার মন তার থেকে মুক্তি লাভ করছে। এই মুক্তিই সত্যকার মুক্তি।... তার যে আনন্দ দুঃখকে স্বীকার করে, সে আনন্দ কিছু না করার চেয়ে বডো, সে আনন্দ খেলা করার চেয়ে বডো" (আত্মপরিচয়: পৃ-৩৮)।

তবে কি সোমপাল বা লক্ষেশ্বর কর্ম করিতেছে না? তাহারাও কর্মে লিপ্ত হইয়া আছে, কিন্তু তাহাদের কর্মজগৎ স্বার্থবোধের দ্বারা খণ্ডিত। রাজ্য বিস্তারের কোন সীমা নাই, "কেবলই জয় করতে হবে" (ঋণ: ভূমিকা); সঞ্চয়েরও কোন সীমা নাই, "একবার সঞ্চয় করতে আরম্ভ করলে ক্রমে আমরা সঞ্চয়ের কল হয়ে উঠি, তখন আমাদের সঞ্চয় প্রয়োজনকেই বহু দূরে ছাড়িয়ে চলে যায়, এমন কি, প্রয়োজনকেই বঞ্চিত ও পীড়িত করতে থাকে" (শান্তিনিকেতন: ১ম খণ্ড: সঞ্চয় তৃষ্ণা: পৃ-৮৫)। কেবলই রাজ্য জয়ের আকাঙ্ক্ষা, কেবলই সঞ্চয়ের তৃষ্ণা মানুষকে মানুষ হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া ফেলে; মানবতা ধর্ম ভুলাইয়া দেয়, ভুলাইয়া দেয় যে

পৃথিবীর সব কিছুই ঈশ্বর দ্বারা আবৃত—"ঈশাবাস্যমিদম্ সর্বম্ যৎ কিঞ্চ জগত্যাং জগৎ।[১০] সেই জন্যই ইহাদের স্বার্থবুদ্ধির দ্বারা প্রণোদিত কর্মকে কর্তব্য বলা যায় না। বিধাতার জগতের কোন ঋণই ইহারা শোধ দিতেছে না। মন্ত্রী সুভূতি মনে করেন, "রাজত্ব পাবার যে পিতৃঋণ, সে শোধ করবার জন্যে" বিজয়াদিত্যের মন নাই। কিন্তু পুত্রের ধর্মের সহিত মানবধর্মের বিরোধ থাকিতেই পারে না। যদি থাকিত তবে সমস্ত মানব সংসারের পুত্রদের মধ্যে বিরোধই চিরকাল থাকিয়া যাইত। জগতে বিরোধটাই একান্ত সত্য হইয়া উঠিত। রবীন্দ্রনাথ তাহা কখনও স্বীকার করেন নাই। তিনি উপনিষদের পরিবেশে জীবন গঠন করিয়াছেন, তাঁহার অন্তরের বিশ্বাস এই যে বিরোধ সত্ত্বেও সমগ্র জগৎ ঐক্যে বিধৃত। এই ঐক্যই পরম সত্য। বিজ্ঞানেও তাহার স্বীকৃতি আছে। সৌরমণ্ডলের যাহা যেখানে আছে তাহাদের পরস্পরের আকর্ষণ-বিপ্রকর্ষণের ফলেই ইহার সামঞ্জস্য: কোন একটা কিছুকে লুপ্ত করিতে পারিলেই সৌরজগতের ভারসাম্য নষ্ট হইয়া যাইত। সুতরাং জগতের ঐক্যকে অস্বীকার করিবার উপায় নাই। বাঁচিবার জন্য সংগ্রামই একমাত্র সত্য নহে, পারস্পরিক সাহায্য দানও পৃথিবীর অস্তিত্বরক্ষার জন্য অপরিহার্য।[১১] "দল বাঁধিবার, পরস্পরকে সাহায্য করিবার ইচ্ছা, ঠেলিয়া উঠিবার চেষ্টার চেয়ে অল্প প্রবল নহে; বস্তুতঃ নিজের বাসনাকে খর্ব করিয়াও পরস্পরকে সাহায্য করিবার ইচ্ছাই প্রাণীদের মধ্যে উন্নতির প্রধান উপায় হইয়াছে" (ধর্ম: স্বাতন্ত্র্যের পরিণাম: পৃ-১২৫)। পিতৃঋণ অপেক্ষাও বড় ঋণ শোধ করিতে হইবে এবং সেই ঋণ শোধ করিলে রাজার ঋণ, বণিকের ঋণ যথার্থরূপে শোধ হয়। রাজার যথার্থ ঋণশোধ সত্যকার রাজা করিয়া তোলে: ভূখণ্ডের রাজা মাত্র না থাকিয়া মনের রাজা করে। বণিকের প্রকৃত ঋণশোধ হইবে মানব কল্যাণে তাহার উপার্জন ব্যয়ে। তাই বিশ্বসৃষ্টির মহাকবির অংশস্বরূপ কবি শেখর বলেন, "এই যে বিশ্ব আমাদের চিত্তে অমৃত ঢেলে দিচ্ছে তার ঋণ আমাদের শোধ করতে হবে" (ঋণ: পৃ-২২১)। সেই জন্যই উপনন্দ নিজের মনের নিকট কিছুতেই মুক্তি পাইল না। প্রভুর বীণাখানি পরিষ্কার

১০। যজুর্বেদ সংহিতার ৪০ অধ্যায়—ঈশোপনিষদ (১ম শ্লোক)

১১। Prince Kropotkin: Mutual Aid.

করিতে গিয়া তাহার তন্ত্রীতে পুনরায় ঋণশোধের বেদনা জাগিয়া উঠিল। বেদনাকে স্বেচ্ছায় গ্রহণ করিয়া পৃথিবীর ঋণ পরিশোধ করিতে হইবে, "লক্ষেশ্বরের কাছে আমার প্রভু ঋণী হয়ে রইলেন, আর আমি নিশ্চিন্ত হয়ে আছি! ঠাকুর, এ তো আমার কোনোমতেই সহ্য হচ্ছে না। ইচ্ছা করছে আমার প্রভুর জন্যে আজ আমি অসাধ্য কিছু একটা করি। আমি তোমাকে মিথ্যা বলছি নে, তাঁর ঋণ শোধ করতে যদি আজ প্রাণ দিতে পারি তা হলে আমার খুব আনন্দ হবে" (শা : পৃ-৪৭ ; ঋণ : পৃ-২৪৫)। কাহারও প্রত্যাশায় ফেলিযা না রাখিযা নিজের ঋণ নিজেরই মাথায় তুলিয়া লইতে হয়। এইরূপ ঋণশোধেব, কর্তব্য সাধনের, মধ্য দিয়াই ছুটির ঘণ্টাকে আগাইযা আনা যায—এই ভাবেই মুক্তি সম্ভব। উপনন্দের মধ্যে সেই ঋণশোধের ছবিটি দেখিলেন বিজযাদিত্য : উপলব্ধি করিলেন, "আজ স্পষ্ট প্রত্যক্ষ দেখতে পাচ্ছি—জগৎ আনন্দের ঋণ শোধ করছে। বড়ো সহজে করছে না, নিজের সমস্ত শক্তি দিযে সমস্ত ত্যাগ ক'রে করছে। সেইজন্যেই ধানের খেত এমন সবুজ ঐশ্বর্যে ভরে উঠেছে, বেতসিনীর নির্মল জল এমন কানায় কানায় পরিপূর্ণ। কোথাও সাধনার এতটুকু বিশ্রাম নেই, সেই জন্যেই এত সৌন্দর্য" (শা : পৃ-৫৩)—মানুষ যখন গ্রহণ করে তখন সে সঙ্কুচিত, যেখানে সে দান করে সেখানেই তাহার পূর্ণ প্রকাশ। পদ্মেব দলগুলি যখন নিজেদের পূর্ণতায় ঝলমল করে তখনই ফুলটির অপূর্ব শোভা বিকশিত হয। নিজেকে উৎসারিত করিয়া দিয়াই মানুষ সুন্দর হয। প্রকৃতি জগতের বেলাযও তাহাই ঘটে। সকলেই যখন নিজ নিজ ঋণশোধের কাজে লাগিয়া যায় তখনই প্রকৃতি জগৎ এবং মানব জগৎ পরম সুন্দর হইয়া ওঠে। ঋণশোধের অর্থ আর কিছুই নয়—পৃথিবী সকলকে রূপ দিয়াছে তাহার পরিবর্তে সকলকেই সাধ্যমত পৃথিবীর রূপ গডিযা তুলিতে হইবে। তাহা করিতে গেলেই প্রত্যেককেই বিকশিত হইতে হইবে : বিকাশই সুন্দর এবং তাহাই মানব কল্যাণ সাধন করে, "তিনি কেবলমাত্র বলেছেন, প্রকাশিত হও। সূর্যকেও তাই বলেছেন, পৃথিবীকেও তাই বলেছেন, মানুষকেও তাই বলেছেন। সূর্য তাই জ্যোতির্ময় হয়েছে, পৃথিবী তাই জীবধাত্রী হয়েছে, মানুষকেও তাই আত্মাকে প্রকাশ করতে হবে।

"বিশ্বজগতের যে-কোনো প্রান্তে তাঁর এই আদেশ বাধা পাচ্ছে,

সেইখানেই কুঁড়ি মুষড়ে যাচ্ছে, সেইখানেই নদী স্রোতোহীন হয়ে শৈবাল-জালে রুদ্ধ হচ্ছে—সেইখানেই বন্ধন, বিকার, বিনাশ।...

"সর্বলোকে আপনাকে পরিকীর্ণ করা আত্মার ধর্ম—পরমাত্মারও সেই ধর্ম।...তিনি নির্বিকার, তাঁতে পাপের কোনো বাধা নেই। সেইজন্যে সর্বত্রই তাঁর প্রবেশ।

"পাপের বন্ধন মোচন করলে আমাদেরও প্রবেশ অব্যাহত হবে।... আমরাও আনন্দময় কবি হব, মনের অধীশ্বর হব, দাসত্ব থেকে মুক্ত হব, আপন নির্মল আলোকে আপনি প্রকাশিত হব।......

"মৈত্রেয়ীর প্রার্থনাও সেই প্রকাশের প্রার্থনা। যে প্রার্থনা বিশ্বের সমস্ত কুঁড়ির মধ্যে, কিশলয়ের মধ্যে, যে প্রার্থনা দেশকালের অপরিতৃপ্ত গভীরতার মধ্য হতে নিয়ত উঠছে, বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের প্রত্যেক অণুতে পরমাণুতে যে প্রার্থনা, যে প্রার্থনার যুগযুগান্তব্যাপী ক্রন্দনে পরিপূর্ণ হয়ে উঠেছে বলেই বেদে এই অন্তরীক্ষকে 'ক্রন্দসী' 'রোদসী' বলেছে, সেই মানবাত্মার চিরন্তন প্রার্থনাই মৈত্রেয়ীর প্রার্থনা। আমাকে প্রকাশ করো, আমাকে প্রকাশ করো" (শান্তিনিকেতন : ১ম খণ্ড : আদেশ : পৃঃ ২৯৪-২৯৬)।

প্রকাশিত হইবার এই আদেশ বাণী স্পর্শ করিযাছে ছেলের দলকে, ঠাকুরদাদাকে, উপনন্দকে ; বিজযাদিত্য বাহির হইযাছেন পথে : শেখর তো অসীমেরই বার্তাবহ। মোহের বন্ধনে, পাপের বেষ্টনীতে আবদ্ধ লক্ষেশ্বর-সোমপাল : "ঠাকুরদা, যেখানে আলস্য, যেখানে কৃপণতা, যেখানেই ঋণশোধে ঢিলে পড়ে যাচ্ছে, সেইখানেই সমস্ত কুশ্রী, সমস্তই অব্যবস্ত" (শা : পৃ-৫৩)। অর্থের ঘোরে, শক্তির মাদকতায় আমরা নিজেদের গৌরবান্বিত বলিয়া মনে কারি। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে দেখি যে আমাদের শান্তি ভঙ্গ করিয়াই বসিয়া আছি, "এক সুরঙ্গ হতে আর-এক সুরঙ্গে টাকা বদল করে বেড়াতে হয়" (শা : পৃ-১৩, ঋণ : পৃ-২৭৭)। অথবা রাজ্য বিস্তারের পর পুনরায় রাজ্য বিস্তারের কথা ভাবিতে হয়—

নিজেরে করিতে গৌরব দান
নিজেরে কেবলি করি অপমান,
আপনারে শুধু ঘেরিয়া ঘেরিয়া
ঘুরে মরি পলে পলে।

(গীতাঞ্জলি : প্রথম কবিতা)

এই পলে পলে ঘুরিয়া মরিবার হাত হইতে রক্ষা করিতে পারে একমাত্র প্রেম। প্রেমের হাত ধরিয়া দুস্তর সাগর পাড়ি দেওয়া যায়। প্রেমই সকলের সহিত মানুষকে যুক্ত করিয়া পাপের বেষ্টনী ছিন্ন করিয়া দিতে পারে। একমাত্র উহারই প্রেরণায় মানুষ নিরলস ভাবে কাজ করিতে পারে: প্রিয় পাত্রের জন্য কাজ করিযাই তো আনন্দ, "পতিব্রতা স্ত্রীব পক্ষে তাহার পতিগৃহের কর্মই গৌরবের, তাহা আনন্দের, সে বর্ম তাহার বন্ধন নহে" (ধর্ম : মনুষ্যত্ব)। জগতের জন্য বেদনা বোধই বুদ্ধদেবের হৃদয়ে গভীর প্রেম জাগ্রত করিযাছিল। বড বেদনা না হইলে বড প্রেমও আসে না। প্রেম যে কার্যে প্রেরণা দেয অর্থাৎ বেদনাবোধ যে কার্যের মূল প্রেরণা তাহাই সুন্দর, তাহাই মধুর : প্রেমের জন্য নিজেকে উৎসর্গ করিতে হইবে—

আমার এ ধূপ না পোডালে
গন্ধ কিছুই নাহি ঢালে,
আমার এ দীপ না জ্বালালে
দেয না কিছুই আলো।

(গীতাঞ্জলি : ৯১ সংখ্যক কবিতা)

নিজেকে খণ্ডিত করিয়া কল্যাণ নাই, সোমপাল-লক্ষেশ্বর সমাজের কোন কল্যাণেই আসে না। নিজেকে উৎসর্জন করিযা সৌরভ দান সম্ভব : বিজযাদিত্য-উপনন্দরাই সমাজকে সৌরভে আমোদিত করিযা রাখে। দুঃখবরণেই কর্মেব সার্থকতা, কর্মের মর্যাদা বৃদ্ধি হয, "যদি তাকিযে দেখ তবে দেখবে সব সুন্দরই দুঃখের শোভায সুন্দর : উপনিষৎ বলিযাছেন--

স তপোঽতপ্যত স তপস্তপ্তা সর্বম্‌সৃজৎ যদিদং কিঞ্চ

তিনি তপ করিলেন, তিনি তপ করিযা এই যাহা-কিছু সমস্ত সৃষ্টি করিলেন। সেই তাঁহার তপই দুঃখ রূপে জগতে বিরাজ করিতেছে। আমরা অন্তরে বাহিরে যাহা কিছু সৃষ্টি করিতে যাই সমস্তই তপ করিযা করিতে হয— আমাদের সমস্ত জন্মই বেদনার মধ্য দিয়া, সমস্ত পথই ত্যাগের পথ বাহিয়া, সমস্ত অমৃতত্বই মৃত্যুর সোপান অতিক্রম করিয়া" (ধর্ম : দুঃখ : পৃ-১০৭) মানুষের ক্ষেত্রেও তাই, সেই তপস্যা চাই—

আমার সকল কাঁটা ধন্য করে ফুটবে গো ফুল ফুটবে।
আমার সকল ব্যথা রঙিন হয়ে গোলাপ হয়ে উঠবে।

(গীতিমাল্য)

ত্যাগের পথই পৃথিবীকে সুন্দর করিয়া তুলিয়া নিজেকে সার্থক করিবার একমাত্র উপায়। সোমপালকে সেইজন্য সন্ন্যাসী (বিজয়াদিত্য) ব্যবস্থা দিলেন যে অখণ্ড রাজ্যের অধীশ্বর হইতে গেলে নিজের খণ্ড রাজ্যটি পরিত্যাগ করিতে হইবে: অহং-এর দ্বারা বেষ্টিত রাজ্যই খণ্ড রাজ্য। অহং-এর মিথ্যা গৌরব বোধের পরিবর্তে চাই প্রেম। মানুষ বিজয়াদিত্যের সেই কারণেই রাজা বিজয়াদিত্যের বিরুদ্ধে নানা অভিযোগ, "রাজন্; তবে সত্য কথা বলি, আমার পক্ষেও সে ব্যক্তি অসহ্য হয়ে উঠেছে" (শা: পৃ-৪১): রাজা হইয়া থাকিলে সে মানুষের সহিত মিলিবে কেমন করিয়া! রাজা ভয়-ভক্তির পাত্র, তিনি ভালবাসা পান না, ভালবাসিতেও পারেন না। নিজের জীবনেও রবীন্দ্রনাথের একসময় সেই অভিজ্ঞতা হইয়াছিল—

"অতি ক্ষুদ্র অংশে তার সম্মানের চির নির্বাসনে
সমাজের উচ্চ মঞ্চে বসেছি সংকীর্ণ বাতায়নে।
মাঝে মাঝে গেছি আমি ওপাড়ার প্রাঙ্গণেব ধারে,
ভিতরে প্রবেশ করি সে শক্তি ছিল না একেবারে।" (জন্মদিনে)

মানুষের অন্তরে প্রবেশের পথ পাওয়া যায না সমাজের উচ্চ মঞ্চে বসিয়া থাকিয়া। রাজা হইয়া বসিযা থাকিলে অন্তবে উপবাসী হইযাই থাকিতে হইবে। বিজয়াদিত্য তাই সার্থকতার পথে নামিযা আসিয়াছেন। তিনি কুবেরকে ত্যাগ করিযাছেন লক্ষ্মীকে পাইবার জন্য, ঐশ্বর্য ছাড়িয়াছেন সৌন্দর্য উপলব্ধির আশায। লক্ষেশ্বরকে সেইজন্যই তিনি বলেন, "লক্ষ্মী যে সোনার পদ্মটির উপরে পা দুখানি রাখেন আমি সেই পদ্মটির খোঁজে আছি" (শা: পৃ-৩৯)। এই সৌন্দর্য শ্রীকে পাইবার উপায কি? "সব ব্যবসা যদি ছাডতে পার তবেই এ ব্যবসা চলবে" (শা: পৃ-৪০)— সব ব্যবসা ছাড়ার অর্থ সকল দিকের লাভের আকাঙ্ক্ষা ত্যাগ করা। ভোগের জগতের আকাঙ্ক্ষা ত্যাগ করিলে তবেই আত্মার মুক্তি হয় এবং কেবল তখনই সৌন্দর্য উপলব্ধি সম্ভব।

রাজা সোমপাল মুক্তি পাইলেন, "আজ আমার হার মেনে আনন্দ" (ঋণ: পৃ-২৫৭)। কিন্তু লক্ষেশ্বরেব মুক্তি মিলিল না। সন্ন্যাসী (বিজয়াদিত্য) কেবল বলিলেন, "এখনো দেরি আছে" (শা: পৃ-৮৩, ঋণ: পৃ-২৫৯)। রাজাকে নানা কারণে বহু মানুষের সম্পর্কে আসিতে হয়। নিজ রাজ্যের

মধ্যে হইলেও সমস্ত প্রজার সম্পর্কে একটা বিধি বিধান, ন্যায়-নীতি রক্ষা করিয়া তাঁহাকে চলিতেই হয়; প্রজাদের জলদানের জন্য কূপ খননও রাজা করিয়া থাকেন; কিন্তু বণিকের সে বালাই নাই, প্রতিটি মানুষকে প্রবঞ্চিত করিয়াই তাহার গজমতি কৌটা সংগ্রহ করিতে হয়। সেইজন্যই সোমপালের দ্রুত মুক্তি মিলিল, লক্ষেশ্বরেরও মিলিবে, কিন্তু 'দেরি' আছে।

'ঋণশোধ' লিখিবার পূর্বে রবীন্দ্রনাথ জাপান-মার্কিন দেশ ঘুরিয়া আসিয়াছিলেন।[১২] সেই সময় জাতীয়তাবাদ এবং দেশাত্মবোধের মারাত্মক বিষক্রিয়ার পরিচয় তিনি পান। জাতীয়তাবোধের বিরুদ্ধে তিনি আমেরিকায় ধারাবাহিক ভাবে অনেকগুলি বক্তৃতাও করেন। সেই আদর্শ প্রকাশ করিয়াছেন শেখর চরিত্রের মধ্য দিয়া। 'শারদোৎসব' লিখিবার সময় এই উগ্র জাতীয়তাবোধের সহিত তাঁহার পরিচয় না থাকিবারই কথা—সেইজন্য এই বিষয়ে তাঁহার বিশেষ চিন্তার ফসল শারদোৎসব-এ ফলে নাই। 'ঋণশোধ'-এ কবি শেখর নিজেকে পরদেশী বলিয়া পরিচয় দিয়াছেন। সমস্ত দেশেরই তিনি পরদেশী, অর্থাৎ কোন একটি দেশের গণ্ডীতে তিনি আবদ্ধ নহেন, "আমি সব জায়গাযই দেশ খুঁজে বেড়াই" (ঋণ: পৃ-২৩১)। এই দেশটি যুদ্ধ করিয়া জিতিবার নহে, বেষ্টনী দিয়া বাঁধিয়া রাখিবার নহে। তিনি উপলব্ধি করিয়াছিলেন যে একদেশের স্বজাতি পূজা অন্য দেশের মানুষের কণ্ঠরোধ করে, "যে জাতির যে দিকে যতখানি বড় হবার শক্তি আছে, সেদিকে তাকে ততখানি বড় হয়ে উঠতে দিতে বাধা দেওয়া যে স্বজাতি পূজা থেকে জন্মেছে, তার মত এমন সর্বনেশে পূজা জগতে আর কিছুই নেই" (জাপানযাত্রী)। সেইজন্যই শেখর পরদেশীর সাজে সব-দেশী হইয়া উঠিয়াছে।

রবীন্দ্রনাথের দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে বৈপরীত্যের মধ্য দিয়াই যে কোন বিষয়কে ভালরূপে বোঝা যায়: সেইজন্যই তিনি বার বার বলিয়াছেন যে দুঃখের ভিতর দিয়াই সুখ লাভ সম্ভব। এই নাটকেও তিনি বলিতেছেন, "রাজাকে সাজতে হয় সন্ন্যাসী, রাজা যে কী জিনিস সেই বোঝবার জন্যে।

১২। Mr. Pond রবীন্দ্রনাথকে আমেরিকায় বক্তৃতার জন্য আহ্বান করেন। আমেরিকার লোক পয়সা খরচ করিয়া বক্তৃতা শোনে। সেখানে কতকগুলি প্রতিষ্ঠান আছে যাহারা এইরূপ বক্তৃতার ব্যবস্থা করেন। Mr. Pond সেইরূপ একটি প্রতিষ্ঠানের মালিক। রবীন্দ্রনাথ জাপান হইয়া ১৯১৬ খ্রী:-এর শেষের দিকে আমেরিকায় পৌঁছান।

যে-মানুষ সব দেশেই দেশকে খুঁজতে চায় তাকে পরদেশী সাজতে হয়। এই আমাদের ঠাকুরদা বুড়ো হয়ে বসে আছেন ওটা ওর সাজ মাত্র—উনি যে বালক সেটা উনি বার্ধক্যের ভিতর দিয়ে খুব ভাল করে চিনে নিচ্ছেন" (ঋণ : পৃ-২৩৫)।

নাটকখানিরও একটি বাহিরের সাজ আছে। সেই রূপক উন্মোচনের চেষ্টা করিলে দেখা যাইবে যে মানুষের মুক্তি সম্ভব। তাহার জন্য* পরিবেশটি আনন্দময় করিয়া তুলিতে হয়, ছেলের দলের চঞ্চলতার মধ্যে তাহার পরিচয় আছে। কর্তব্য সাধনের জন্য দুঃখ বরণ চাই, উপনন্দ ইহার পরিচয়। উজ্জ্বল আদর্শ সম্মুখে থাকিলে মানুষের দ্রুত পরিবর্তন হয়, সেই মহান আদর্শ বিজয়াদিত্য 'আর সেই সঙ্গে আভাসিত করিয়া তুলিতে হয় অনির্বচনীয় অনন্তকে : 'শারদোৎসব'-এ সেই কাজের ভার ছিল সন্ন্যাসীর (বিজয়াদিত্যের) উপর, 'ঋণশোধ'-এ সেই ভার বর্তাইয়াছে কবি শেখরের স্কন্ধে। সোমপালের পরিবর্তন হইল দ্রুত, লক্ষেশ্বরেরও ভাবনা নাই, দেরি হইলেও তাহারও মুক্তি অবশ্যম্ভাবী।

*শারদোৎসব প্রথম অভিনীত হয় ১৩১৫ সালে ছাত্র ও অধ্যাপকদের মিলিত চেষ্টায়। সন্ন্যাসীর (বিজয়াদিত্য) ভূমিকায় ক্ষিতিমোহন সেন, ঠাকুরদাদার ভূমিকায় অজিতকুমার চক্রবর্তী, লক্ষেশ্বরের ভূমিকায় দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং উপনন্দর ভূমিকায় নরেন্দ্রনাথ খাঁ (ছাত্র) অভিনয় করেন (প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় : রবীন্দ্রজীবনী : ২য় খণ্ড, পৃ-১৮০)।

রাজা ঃ অরূপরতন

(১৩১৭ ঃ ১৯১০)

রাজা নাটক রচিত হয় ১৩১৭ সালের আশ্বিন মাসে (ইংরাজী ১৯১০ খ্রীঃ), মুদ্রিত হয় সেই বৎসরই পৌষ মাসে। সেই বৎসরই তাহা প্রথম অভিনীত হয় শান্তিনিকেতনে। দ্বিতীয়বার অভিনয় হয় কবির জন্মদিনে।[১]

কুশ জাতক হইতে রাজা নাটকের গল্পাংশ গৃহীত হইয়াছে।[২] কুশ জাতকে দেখান হইয়াছে যে রূপ অপেক্ষা গুণ অধিক বরণীয়। রবীন্দ্রনাথ এই জাতকের কাহিনীর এই সূত্রটুকু গ্রহণ করিযাছিলেন। এইখানে সংক্ষেপে কুশ জাতকের কাহিনীটি বিবৃত করা যাইতে পারে—

পুরাকালে মল্লরাজ্যের রাজধানী কুশাবতী (কুশিনগরের প্রাচীন নাম) নগরে ইক্ষাকু নামে এক রাজা যথাধর্ম রাজত্ব করিতেন। এক অদ্ভুত প্রথা অবলম্বন করিয়া অপুত্রক রাজা পুত্র লাভ করিলেন। অগ্রমহিষী রানী শীলাবতী শক্রের আশীর্বাদে দুইটি পুত্র গর্ভে ধারণ করিলেন। প্রথমটি, প্রভাবান কিন্তু রূপবান নহেন ; দ্বিতীয়টি, রূপবান্ কিন্তু প্রভাবান্ নহেন। প্রথমটির নাম কুশ—বোধিসত্ত্বই কুশ রূপে জন্মগ্রহণ করিলেন। দ্বিতীয় পুত্রটিও একজন দেবপুত্র। আচার্যের উপদেশ ব্যতীতই কুশরূপী বোধিসত্ত্ব নিজের প্রজ্ঞাবলে সর্ববিদ্যায় নৈপুণ্য লাভ করিলেন।

বিবাহের কথায় কুশকুমার ভীত হইলেন। মনে ভাবিলেন যে তাঁহার রূপ দেখিলে কোন রূপবতী রাজকন্যা তাঁহার নিকট থাকিবে না, পলাইয়া যাইবে। শেষ পর্যন্ত বুদ্ধি করিয়া সুবর্ণদ্বারা তিনি এক দিব্য কন্যার মূর্তি গঠন করিয়া মাতার নিকট পাঠাইয়া দিয়া জানাইলেন যে ঐরূপ পাত্রী পাইলে তিনি বিবাহে প্রস্তুত আছেন।

মদ্ররাজের সাতটি দেবকন্যার ন্যায় পরমাসুন্দরী কন্যা ছিল। জ্যেষ্ঠা কন্যা প্রভাবতীর দেহ হইতে প্রাতঃসূর্যের আভার ন্যায় আভা বিচ্ছুরিত হইত।

১। প্রভাত কুমার মুখোপাধ্যায় ঃ রবীন্দ্রজীবনী ঃ ২য় খণ্ড ঃ পৃ-২৪০।

২। জাতক অর্থাৎ গৌতমবুদ্ধের অতীত জন্মসমূহের বৃত্তান্ত ঃ কুশকুমার রূপে বোধিসত্ত্ব একবার ইক্ষ্বাকু বংশে জন্মগ্রহণ করেন। শ্রীঈশানচন্দ্র ঘোষের জাতক (পঞ্চম খণ্ড) হইতে কাহিনীটি সংক্ষিপ্ত আকারে গৃহীত হইল।

ঘোর অন্ধকারেও তাঁহার কক্ষে চতুর্হস্ত পরিমিত স্থানে প্রদীপের কোন প্রয়োজন হইত না। এই কন্যার সহিত কুশকুমারের বিবাহ হইল। বুদ্ধিমতি শীলাবতী কুলপ্রথার নাম দিয়া প্রভাবতীকে একটি কথা স্বীকার করাইয়া লইলেন—জননী হইবার পূর্বে প্রভাবতী দিনে স্বামীর মুখ দেখিতে পাইবে না।

বহুদিন অতিবাহিত হইবার পর প্রভাবর্তার স্বামীকে স্পষ্ট আলোকে দেখিবার ইচ্ছা হইল। শীলাবতীর দ্বারা পুনঃ পুনঃ প্রত্যাখ্যাতা হইয়াও প্রভাবতী নিজের প্রার্থনা জানাইতে লাগিলেন। শীলাবতী নিরুপায় হইয়া বলিলেন যে আগামীকল্য তোমার স্বামী নগর প্রদক্ষিণ করিবে, তুমি বাতায়ন হইতে দেখিতে পাইবে। পরদিন দ্বিতীয় কুমারকে রাজবেশ পরাইয়া হস্তী পৃষ্ঠে বসাইয়া সুসজ্জিত নগর প্রদক্ষিণ করিতে পাঠাইলেন শীলাবতী। বাতায়ন হইতে পরমসুন্দর দেবরকে স্বামী মনে করিয়া প্রভাবতী সন্তুষ্ট হইলেন। ঐদিন মহাসত্ত্ব (কুশকুমার) হস্তিপালকের বেশে ভ্রাতার পশ্চাতে বসিয়াছিলেন। তিনি মনের সাধ মিটাইয়া প্রভাবতীকে দেখিয়া লইলেন এবং হস্ত সঞ্চালন দ্বারা নানারূপ ভঙ্গী করিয়া নিজের মনের আনন্দ জানাইলেন। রাজার পশ্চাতে উপবিষ্ট হস্তী পালকের দুর্বিনীত ব্যবহারে প্রভাবতীর মনে সন্দেহ হইল : সে যে রাজাকেও রাজা বলিয়া গ্রাহ্য করে না! হয়ত এই কুরূপ ব্যক্তিই কুশকুমার হইবেন। পরে তিনি সত্য জানিয়া কুরূপ স্বামীকে ত্যাগ করিয়া পিতার রাজধানীতে ফিরিয়া গেলেন।

প্রভাবতীর অবর্তমানে রাজভবন কুশ রাজার নিকট শূন্য বলিয়া মনে হইল। তিনি পঞ্চবিধ আয়ুধ, সহস্র কার্ষ পণ এবং কোকনদ বীণাটি লইয়া নগর হইতে বাহির হইলেন প্রভাবতীকে ফিরাইয়া আনার উদ্দেশ্যে। রাত্রে তাঁহার বীণার ধ্বনি প্রভাবতীর পিতাকে মুগ্ধ করিল; প্রভাবতীও তাহা শুনিয়া কুশরাজার আগমনের কথা বুঝিতে পারিলেন। কুশরাজা সাত মাস মদ্ররাজার রাজধানীতে কষ্টে দিন অতিবাহিত করিলেন।

শক্রের কৌশলে প্রভাবতীকে লাভ করিবার জন্য সাতজন রাজা সৈন্য সামন্ত লইয়া নগর পরিবেষ্টন করিয়া মদ্ররাজকে বলিয়া পাঠাইলেন, "হয় আমাদের সকলকেই প্রভাবতীকে দান কর, নয় যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হও।" মদ্ররাজ কন্যার উপর ক্রুদ্ধ হইয়াছিলেন। জম্বুদ্বীপের সর্বপ্রধান রাজাকে যে পরিত্যাগ করিয়া আসিয়াছে তাহার শাস্তি হওয়াই উচিত বলিয়া তিনি

মনে করিলেন। তিনি স্থির করিলেন, কন্যাকে সাতটুকরা করিয়া সাত রাজার নিকট পাঠাইবেন ; তাহার রূপের দম্ভ এইরূপেই চূর্ণ হইবে।

ভয়ে প্রভাবতীর মনে পরিবর্তন আসিল। কুশ তাহা বুঝিয়াছিলেন, তিনি স্থির করিয়াছিলেন "আজ মান ভাঙ্গিয়া ইহাকে আমার পাদমূলে লুণ্ঠিত করাইব"। প্রভাবতী কুশরাজার পায়ে লুটাইয়া পড়িয়া শ্লোক উচ্চারণ করিয়া বলিলেন, "তোমার অপ্রিয় আর করিব না এ জীবনে আমি কদাচন"—কুশরাজাও উত্তরে ঠিক তাহাই বলিলেন।

এইবার কুশরাজা যুদ্ধে গিয়া সাত রাজাকে বন্দী করিলেন। ইহাদের বধ করা নিরর্থক বুঝিয়া তিনি মদ্ররাজের সাত কন্যার সহিত সাত রাজার বিবাহ দিলেন।

উপরের কাহিনী হইতে রবীন্দ্রনাথ নাটক রচনার সূত্র পাইয়াছিলেন। কুরূপ হইলেও বোধিসত্ত্বই কুশরাজা। তিনি ঈশ্বর সদৃশ—সেইজন্যই অন্ধকার ঘরের রাজা। অন্ধকার ঘরেই প্রভাবতীর সহিত তাঁহার মিলন হইত। প্রভাবতী তাঁহাকে বাহিরে দেখিতে চাহিয়াই বিপদ ডাকিয়া আনিয়াছিলেন। তারপর অনেক দুঃখের ভিতর দিয়াই তাঁহার মুক্তি মিলিল। বোধিসত্ত্বের সত্যরূপকেই প্রভাবতী জানিলেন প্রেমের আলোকে।

এই নাটকের বক্তব্যও তাহাই। ঈশ্বরোপলব্ধির কথাই এখানে প্রতীকের ছলে বিবৃত হইয়াছে। অরূপের উপলব্ধি না থাকিলে রূপের জগতে পথভ্রান্তির সম্ভাবনাই অধিক। নাটকের দ্বন্দ্বও এইখানে। সুদর্শনা তাহার রাজাকে বাহিরে দেখিবে বলিয়া পণ করিয়াছে ঃ সুরঙ্গমা মনে করে অন্ধকার ঘরেই আগে তাঁহার পরিচয় লওয়া আবশ্যক—

সুদর্শনা। কোথাও অন্ধকার কেন থাকবে।

সুরঙ্গমা। তাহলে যে আলোও চিনবে না অন্ধকারও চিনবে না।

... ...

সুরঙ্গমা। এ-ঘর মাটির আবরণ ভেদ করে পৃথিবীর বুকের মাঝখানে তৈরি। তোমার জন্যেই রাজা বিশেষ করে করেছেন্।

সুদর্শনা। তাঁর ঘরের অভাব কী ছিল যে, এই অন্ধকার ঘরটা বিশেষ করে করেছেন।

সুরঙ্গমা। আলোর ঘরে সকলেরই আনাগোনা—এই অন্ধকারে কেবল একলা তোমার সঙ্গে মিলন।

সুদর্শনা। না, না, আমি আলো চাই—আলোর জন্যে অস্থির হয়ে আছি। তোকে আমি আমার গলার হার দেব যদি এখানে একদিন আলো আনতে পারিস।

সুরঙ্গমা। আমার সাধ্য কী মা! যেখানে তিনি অন্ধকার রাখেন আমি সেখানে আলো জ্বালব! (রাজা : পৃ-৫-৬)

অপূর্ব নাটকীয় শিল্প কৌশলের পরিচয়ও আছে এইখানে। নাটকের মূল দ্বন্দ্বের কথা তো বলা হইয়াছেই—ইহাও দেখান হইয়াছে যে, যে-সুদর্শনা আলো আলো করিয়া অস্থির তাহারই মন অন্ধকারে পরিপূর্ণ। যেখানে তিনি অন্ধকার রাখেন সেখানে আলো জ্বালাইবার সাধ্য কাহারও নাই। বাহিরে বসন্ত উৎসবে কত আলো কত আনন্দ আকাশে বাতাসে ছড়াইয়া যাইবে, কিন্তু আলোর ভিখারী সুদর্শনার মনে সেই আলোটুকু তখনও দেখা দিবে না যাহা তাহার উৎসবরাজকে চিনাইয়া দিতে পারে। এই নাটকে আলো এবং অন্ধকার অনেক কিছুই সঙ্কেত করে এবং নাটকের ভাবজগৎ নানাভাবে আলোড়িত করে—সুতরাং ইহাও নাটকীয় লক্ষণাক্রান্ত। সুদর্শনার অন্তরে বিষাদেব অন্ধকার, সেই অন্ধকাব কক্ষেই তাহাকে সাধনা করিতে হইবে : এই অন্ধকার কক্ষ আত্মার কক্ষ ব্যতীত আর কিছুই নয়।

মঞ্চের উপযোগী করিয়া 'রাজা'কে পরিবর্তিত করিযা রবীন্দ্রনাথ 'অরূপরতন' নাটকটি রচনা করেন ১৩২৬ সালে (১৯২০ খ্রীঃ)। এই নাটকের দ্বন্দ্বটি প্রথমেই উদ্ঘাটিত করা হইযাছে প্রাসাদকুঞ্জে সুরঙ্গমা ও নেপথ্য রাজার কথার ভিতর দিযা। অহং-এর অবলুপ্তি না করিয়া প্রিয়তম রাজাকে পাওয়া যায না। পূর্ণ অহং বোধ লইযা প্রেমিক হওযা সম্ভব নয। সুদর্শনা রাজাকেই বরণ করিতে চায় এবং সেখানেই তাহার অহংকার। এই দুইযের সংঘাত বড কঠিন এবং তাহা হইতে উত্তীর্ণ হইতে গেলে অনেক দুঃখ বরণ করিতে হইবে—

সুরঙ্গমা॥ রাজকন্যা সুদর্শনা যে তোমাকেই বরণ করতে চায়, তাকে কি দয়া করবে না?

নেপথ্যে॥ সে কি আমাকে চেনে?

সুরঙ্গমা॥ না প্রভু, সে তোমাকে চিনতে চায়। তুমি তাকে নিজেই চিনিয়ে দেবে, নইলে তার সাধ্য কী।

নেপথ্যে ॥ অনেক বাধা আছে।

সুরঙ্গমা ॥ তাই তো তাকে কৃপা করতে হবে।

নেপথ্যে ॥ বহু দুঃখে যে আবরণ দূর হয়।

সুরঙ্গমা ॥ সেই দুঃখই তাকে দিয়ো, তাকে দিয়ো।

নেপথ্যে ॥ আমার নাম নিয়ে সকলের চেয়ে বড়ো হবে, এই অহংকারে সে আমাকে চায়।

সুরঙ্গমা ॥ এই সুযোগে তার অহংকার দাও ভেঙে। সকলের নীচে নামিয়ে তোমার পায়ের কাছে নিয়ে এসো তাকে।

(অরূপরতন : পৃ-৯)

... ...

সুদর্শনা ॥ আমি তোমাকে বরণ করব, সে কি না দেখেই ?

নেপথ্যে ॥ চোখে দেখতে গেলে ভুল দেখবে, অন্তরে দেখো মন শুদ্ধ ক'রে। (অরূপ : পৃ-১৫)

উভয় ক্ষেত্রেই মূল দ্বন্দ্বটি একই কিন্তু 'অরূপরতন'-এ দ্বন্দ্বটি বড বেশী স্পষ্ট। 'রাজা'র মধ্যে যে শিল্পকৌশলের পরিচয আছে এখানে তাহার অনেকটা অভাব। 'রাজা'র দ্বন্দ্বটি উপলব্ধি করিতে দর্শক ও পাঠক চিত্তকে যতখানি সক্রিয় হইতে হয় 'অরূপরতন'-এর দ্বন্দ্ব তাহাদের ততখানি সক্রিয় করে না। মঞ্চে রূপায়ণের দিক দিয়া 'অরূপরতন'-এর সুবিধা অনেক, কিন্তু কাব্য এবং নাট্য কলার দিক দিয়া 'রাজা'র মর্যাদাই সমধিক। দৃশ্যগুলির পরিবর্তন সাধন করিয়া পরিপূর্ণ 'রাজা' নাটকটিকে বজায় রাখিতে পারিলেই ভাল হইত মনে হয়। তাহাতে নাট্য এবং কাব্য গুণও বজায় থাকিত আবার প্রতীক নাটকের মঞ্চায়নের অসুবিধাও অনেকখানি দূর করা যাইত। 'রাজা'য় যেমন স্থান পরিবর্তন করিয়া কান্যকুব্জ পর্যন্ত সুদর্শনাকে লইয়া যাওয়া হইয়াছে তাহার প্রয়োজন ছিল না।' অবশ্য ইহাও সত্য যে 'অরূপ-রতন'-এ সুদর্শনাকে কুমারী রূপে দেখাইয়া তাহার পিতার রাজ্য এবং অন্ধকারের রাজার রাজ্য এক করিয়া ফেলিয়া কাহিনীর দিক দিয়া একটু জটিলতা নিশ্চয়ই সৃষ্টি করা হইয়াছে। কিন্তু এই জটিলতা দূর করিয়াও কান্যকুব্জ পর্যন্ত সুদর্শনাকে না লইয়া যাওয়া কিছুমাত্র কঠিন হইত না। অবশ্য ইহাও স্বীকার করিতে হইবে যে এই সব নাট্যকে কাহিনী খুব বড ব্যাপার কিছুই নয়—রসের খাতিরেই তাহার মর্যাদা। ডক্টর মুহম্মদ

সহীদুল্লাহ্ 'রাজা' নাটক সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন তাহা এইখানে উদ্ধৃত করা যাইতে পারে—"ভালোবাসা, বিরহ, মিলন, প্রতিদ্বন্দ্বী, প্রেমাস্পদ, উৎসব-উদ্যান, রণক্ষেত্র, নৃত্যগীত, যুদ্ধবিগ্রহ যাহা কিছু নাটকে গতিদান করে, বৈচিত্র্য সৃষ্টি করে সমস্তই এই 'রাজা' নাটকে আছে। রানীর মনে গভীর বিষাদ। বাহিরে প্রমোদ বনে আনন্দ উৎসব। ইহাতে নাটকে একসঙ্গে আলো-আঁধারের বৈচিত্র্য দান করিয়াছে।...প্রেমাস্পদের আলিঙ্গন অন্তে তাহার প্রেমের অনুভূতি যেমন দেহ মন আনন্দ বিহ্বল করিয়া রাখে, তেমনই 'রাজা' নাটকের অভিনয় শেষে তাহার অন্তর্নিহিত আধ্যাত্মিক মধুর রসটি সমগ্র হৃদয়মন ভাবাবিষ্ট করে। নাট্যকারের চরম সার্থকতা এইখানে" (প্রবাসী : শ্রাবণ, ১৩৫২)।

'রাজা' নাটকে ২৬টি এবং তাহা অপেক্ষাও আকারে ছোট 'অরূপরতন'-এ ২৪টি গান সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। ফলে উভয় নাটকেই একটা যাত্রার ভাব পরিলক্ষিত হয়। বিশেষ, 'রাজা' নাটকের কোন কোন গানে ধুয়ার ব্যবস্থা ছিল তাহার স্পষ্ট পরিচয় আছে—

আমরা সবাই রাজা আমাদের এই রাজার রাজত্বে
নইলে মোদের রাজার সনে মিলব কী স্বত্বে।
(আমরা সবাই রাজা)
আমরা যা খুশি তাই করি
তবু তাঁর খুশিতেই চরি,
আমরা নই বাঁধা নই দাসের রাজার ত্রাসের দাসত্বে
নইলে মোদের রাজার সনে মিলব কী স্বত্বে।
(আমরা সবাই রাজা)
(রাজা : পৃ-২৭-২৮)

'অরূপরতন'-এ 'আমরা সবাই রাজা' এই ধুয়াটুকু গানটি হইতে বাদ দেওয়া হইয়াছে (অরূপরতন : পৃ-২৩-২৪)।

'রাজা' নাটকে রাজার কণ্ঠেও রবীন্দ্রনাথ গান দিয়াছেন : এই চরিত্রে গান না থাকাই বাঞ্ছনীয়, কথাও তাঁহার বেশী না থাকাই বিধেয়। 'অরূপরতন'-এ রাজার নিজের কোন গান নাই। নাটকের দিক দিয়া ইহাকে উন্নতি সাধন বলিতেই হইবে। 'রাজা'র মধ্যে ঠাকুরদার শম্ভু-সুধনদের দলের মৃত্যু ঘটাইয়া রাজার সহিত কাঞ্চী প্রভৃতি রাজাদের যুদ্ধকে আধি

দৈবিক ব্যাপার হইতে দেওয়া হয় নাই—'অরূপরতন'-এ কিন্তু সেই ব্যবস্থাটা করা হয় নাই ; এখানে রাজার যুদ্ধ দৈব ব্যাপার হইয়া উঠিয়াছে। 'রাজা' মানসিক দ্বন্দ্ব এবং নাটকীয় সংঘাত সৃষ্টির দিক দিয়াও 'অরূপরতন' হইতে শ্রেষ্ঠ। তবে তত্ত্বের দিক দিয়া নাটক দুইটির মধ্যে কোথাও পার্থক্য সৃষ্টি করা হয় নাই।

এখানে রাজার স্বরূপ সন্ধান করা হইয়াছে এবং কোন্ উপায়ে তাঁহাকে উপলব্ধি করা সম্ভব তাহাও সঙ্কেতের সাহায্যে বলা হইয়াছে। এই রাজা আছেন প্রতিটি মানুষের অন্তরে—

অন্তর মাঝে তুমি একা একাকী। (চিত্রা)

এবং "আলোর ঘরে সকলেরই আনাগোনা—এই অন্ধকারে কেবল একলা তোমার সঙ্গে মিলন" (রাজা : পৃ-৬)। আমাদেরই আত্মায় আমাদের স্বজ্ঞার সাহায্যে আমরা সেই অসীমের উপলব্ধি করি। বুদ্ধির সীমিত দৃষ্টির দ্বারা আমরা তাঁহার সন্ধান পাইনা : সেখানে জগতের বিধানকে আমাদের ভয়ঙ্কর বলিয়া মনে হয় ; বুদ্ধি দিয়া বিধিকে নিষ্ঠুর বলিয়া মনে হয়—

রাজা। কেমন দেখলে রানী ?

সুদর্শনা। ভয়ানক, সে ভয়ানক। সে আমার স্মরণ করতেও ভয় হয়।
কালো, কালো, তুমি কালো।…ঝড়ের মেঘের মতো কালো—
কূলশূন্য সমুদ্রের মতো কালো…। (রাজা : পৃ-৭৮)

বুদ্ধির রাজ্যের বাহিরের অন্ধকার রাজ্যেরই তিনি রাজা। বুদ্ধির সীমা অসীমকে স্পর্শ করিতে পারে না। আলোকের মধ্যে বস্তুকে দেখার মতো করিয়া তাহাকে দেখিবার উপায় নাই। যাহার হৃদয়ের দৃষ্টি উন্মুক্ত হইয়াছে সে অন্ধকারের মধ্যেও অপরূপকে দেখিয়া লইতে পারে, "এ ব্রহ্মাণ্ডে যাহা যত গভীর, যত সীমাহীন—তাহা ততই অন্ধকার। অগাধ বারিধি মসীকৃষ্ণ ; অগম্য গহন অরণ্যানী আঁধার ; সর্বলোকাশ্রয়, আলোর আলো, গতির গতি, জীবনের জীবন, সকল সৌন্দর্যের প্রাণপুরুষও মানুষের চোখে নিবিড় আঁধার ! কিন্তু সে কি রূপের অভাবে ? যাহাকে বুঝি না, জানি না,— যাহার অন্তরে প্রবেশের পথ দেখি না, তাহাই তত অন্ধকার" (শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় : শ্রীকান্ত, ১ম পর্ব)।

রূপে যিনি ধরা পড়েন না তাঁহাকে কোন উপমা দ্বারা উপমিত করা সম্ভব নয়। তাঁহাকে নির্দিষ্ট করিয়া বলা যায় না, নেতি নেতি করিয়াও

বুঝাইয়া দেওয়া যায় না। তিনি উপলব্ধির বিষয় ঃ তিনি অনির্বচনীয়। সুরঙ্গমা তাঁহাকে চিনিয়াছে, ঠাকুরদা তাঁহাকে জানিয়াছেন। যাহা উপলব্ধি সাপেক্ষ তাহাকে ব্যাখ্যা করা চলে না—

সুদর্শনা। আচ্ছা সুরঙ্গমা, মাথা খা, সত্যি করে বল্ আমার রাজাকে দেখতে কেমন? আমি একদিনও তাঁকে চোখে দেখলুম না।··· কত লোককে জিজ্ঞাসা করি কেউ স্পষ্ট করে জবাব দেয় না—সবাই যেন কী একটা লুকিয়ে রাখে।

সুরঙ্গমা। আমি সত্যি বলছি রানী, ভালো করে বলতে পারব না। তিনি কি সুন্দর। না, লোকে যাকে সুন্দর বলে তিনি তা নন। (রাজা ঃ পৃঃ ৭-৮)।

এবং "সুন্দর বললে তাঁকে ছোটো করে বলা হবে" (রাজা ঃ পৃ-৮); "সুন্দর নয় বলেই এমন অদ্ভুত এমন আশ্চর্য" (তদেব)। উপলব্ধির শেষে সুদর্শনাকেও সেইজন্য বলিতে হইয়াছিল, "তুমি সুন্দর নও, প্রভু সুন্দর নও, তুমি অনুপম" (রাজা ঃ পৃ-১৩১)। তবে তিনি কি। সুরঙ্গমা বলে, "সব কথা তো বোঝানো যায় না" (পৃ-৮), ঠাকুরদাও বলেন, "ওরে বোকারা, সব কথাই কি খোলসা করে বলতে হবে নাকি। কিছু ঢাকা থাকবে না?" (পৃ-২৫)। রাজা নিজেও সুদর্শনাকে ভরসা দিয়াছেন। অজানা বলিয়াই কালো এবং অজানা বলিযাই ভয়। কিন্তু একবার অন্তরের দৃষ্টি দিয়া দেখিয়া লইলে সমস্ত ভয় দূর হইয়া যায়। বুদ্ধিকে ছাড়িয়া স্বজ্ঞাকে শ্রেষ্ঠতা দিলেই প্রেমের দৃষ্টি খুলিয়া যাইবে। তখন, "যে-কালো দেখে আজ তোমার বুক কেঁপে গেছে সেই কালোতেই একদিন তোমার হৃদয় স্নিগ্ধ হয়ে যাবে। নইলে আমার ভালোবাসা কিসের" (পৃ-৭৯)। ভালোবাসার দৃষ্টি খুলিয়া গেলে আর কোন চিন্তা থাকে না কারণ তখন সীমার ভিতর অসীমেরই সন্ধান পাওয়া যায়। লক্ষ লক্ষ যুগ হৃদয়ে হৃদয় রাখিয়াও যে তৃপ্তি হয় না তাহার কারণও তাহাই, ভালোবাসা তখন অসীমের দিকে টানিয়া লইয়া যায় মানুষের অন্তরকে—সেই জন্যই ওই পাইয়াও না পাওয়ার বোধ থাকিয়া যায়। কিন্তু এই ভালোবাসাকে উদ্বুদ্ধ করিতে অনেক সাধনার প্রয়োজন, অনেক ত্যাগ স্বীকার করিতে হয়। অহং-এর আবরণ হইতে মুক্তি চাই এবং সেই আবরণ বহু দুঃখে দূর হয়।

দুঃখবরণ ব্যতীত মোহপাশ হইতে মুক্তিলাভ করা যায় না—নিজেকে নূতন করিয়া সৃষ্টি করিতে হইলে তপস্যার দুঃখবরণ করিতেই হইবে।

রবীন্দ্রনাথ অনেক স্থলেই দেখাইয়াছেন যে দুঃখই মানুষকে শুদ্ধ করে। দুঃখকে এড়াইয়া সত্য লাভ হয় না। শারদোৎসবেও উপনিষদোক্ত তপস্যার কথা বলিয়াছেন। আমাদের অহংকে ভালবাসায় উজ্জ্বল করিয়া বিশ্বচরাচরের মধ্যে প্রসারিত করিয়া দিবার জন্য নূতন রূপে সৃষ্টি করিয়া লওয়া প্রয়োজন; সেখানে আমারই সঙ্গে সকলের মিলন। সকল মহৎ প্রেরণার বাধা স্বরূপ অহংকে সকলের মধ্যে ক্ষয় করিয়া ফেলিতে হইবে। সুরঙ্গমা, সুদর্শনা, কাঞ্চীরাজ কেহ বাদ যায় নাই। তাহাদের প্রত্যেককেই দুঃখ বরণ করিয়া পরিশুদ্ধ হইতে হইয়াছে। ঈশ্বর দুঃখের আগুনে পুড়াইযা খাঁটি করিয়া লন। তাঁহাকে নিষ্ঠুর বলিয়া মনে হয়, কঠিন বলিযা মনে হয়, "উঃ কী নিষ্ঠুর। কী নিষ্ঠুর। কী অবিচলিত নিষ্ঠুরতা" (রাজা: পৃ-৭)। অথচ এই নিষ্ঠুরতা যে মঙ্গলের জন্যই তাহা মানুষ বুঝিতে চায় না। তাহারা সন্দেহ সংশয় অবিশ্বাস করে, "ঘরে যাদের অন্ন জোটে না তাদের আবার রাজা কিসের।" (পৃ-৫২); অর্থাৎ অন্ন জুটিলে রাজাকে স্বীকার করা যাইত, ভোগের সুবিধার উপরই যেন তাঁহার অস্তিত্ব নির্ভর করে। সাধারণ মানুষের মনে ঈশ্বর বিষয়ে এই প্রকার সন্দেহ আছে। জড়বাদী, যুক্তিবাদী কাঞ্চীরাজ তাঁহার অস্তিত্বই অস্বীকার করে, "এখানে রাজা নেই বলেই যে-খুশি নির্ভাবনায় আপনাকে রাজা বলে পরিচয় দেয় (পৃ-৪৩)। মঙ্গল সাধনের জন্যই অন্ন না দেওয়া, এবং সেই একই উদ্দেশ্যে নিজেকে লুকাইয়া রাখা। অন্ন যদি সহজলভ্য হইত তবে মানুষের মর্যাদা কমিত বই বাড়িত না। শ্রমের প্রয়োজনই মানুষের বুদ্ধিকে সূক্ষ্ম করিয়াছে; ইহা ব্যতীত কর্মের জগতের কোন সার্থকতা থাকে না। ঘরে বসিয়া মুক্তি লাভ করা যায় না। অন্ন সংস্থানের কর্মে নামিয়া কর্তব্য কর্মের ভিতর দিয়াও সাধনায় সিদ্ধি হইতে পারে, "তা সেই অন্নরাজাকেই খুঁজে বের কর্। ঘরে বসে হাহাকার করলেই তো তিনি দর্শন দেবেন না" (পৃ-৫২)। যে কর্ম করে, তাহা অন্নরাজের কর্ম হইলেও, সে মুক্তির সাধনায় ব্রতী। অন্নময় কোষের পরই মনোময় কোষ। আনন্দময় কোষের উচ্চস্তরে উঠিতে হইলে, অর্থাৎ আনন্দের জগতে পৌছাইতে হইলে স্তরগুলি অতিক্রম করিতেই হইবে। কাঞ্চী রাজের তাহাই হইয়াছিল।

সে আপন শক্তিতে নির্ভর করিয়া কাজের জগৎকেই প্রধান করিয়া লইয়াছিল বলিয়াই রাজাকে অস্বীকার করিয়াও রাজাকে লাভ করিয়াছিল। কর্মের পথও মুক্তিরই পথ। সেইজন্যই এই অদৃশ্য রাজার রাজ্যে পথের জন্য ভাবিতে হয় না, "এখানে সব রাস্তাই রাস্তা। যেদিক দিয়ে যাবে ঠিক পৌঁছোবে। সামনে চলে যাও" (পৃ-১৯)। সব পথ দিয়াই ভগবৎ সন্নিধানে যাওয়া যায়—'যত মত তত পথ'। অর্থাৎ যেভাবেই তাঁহাকে সাধনা করা যাইবে সেই ভাবেই তাঁহাকে পাওয়া যাইবে। ভুল পথে নামিলেও সেই ভুলেরই ভিতর দিয়া সত্য পথের সন্ধান মিলিবে। তবে ইতস্তত করিলে চলিবে না—সামনে চলিয়া যাইতে হইবে। পথে যাহারা নামে এবং একান্ত নিষ্ঠায় অগ্রসর হয় তাহারা কোন না কোন সময়ে তাঁহার নিকট গিযা পৌঁছাইবেই। সুরঙ্গমা, ঠাকুরদা পৌঁছাইয়া গিয়াছেন। এই নাটকে কাঞ্চী এবং বিশেষ করিয়া সুদর্শনার যাত্রার কথা বলা হইয়াছে—তাহারাও নিশ্চয়ই শেষ লক্ষ্য স্থলে গিয়া পৌঁছাইবে। সেই অসীম অনন্ত সত্তা অনির্বচনীয় হইলেও যাহাবা একান্ত আগ্রহে, নিষ্ঠায় তাঁহার সন্ধানে বাহির হয় তাহাদের ব্যর্থ হইবার কোন সম্ভাবনাই নাই। 'পাগলে'র মত মানসিক অবস্থা হওয়া চাই—

তোরা যে যা বলিস ভাই
আমার সোনার হরিণ চাই।
সেই মনোহরণ চপল চরণ
সোনার হরিণ চাই॥
... ...
যাহা যায়না পাওয়া তারি হাওয়া
লাগল কেন মোরে?
... ...
আমি আপন মনে মাঠে বনে
উধাও হ'ে যাই॥ (রাজা : পৃ-৩৯-৪০)

তিনি নিষ্ঠুর, অটল—দুঃখের মধ্য দিয়া না লইয়া তিনি কাহাকেও মুক্তি দেন না। তথাপি তিনিই আমাদের আশ্রয়। শাক্ত কল্পনায় সেই জন্যই তিনি নৃমুণ্ড মালিনী, খড়্গ ধারিণী অথচ তিনিই মা—একাধারে 'লোলরসনা করালবদনী' এবং 'নীলনলিনী জিনি ত্রিনয়নী'। তিনি নিষ্ঠুর

বলিয়াই ভরসা এই যে অমঙ্গলের পথে তিনি আমাদের বেশীদূর অগ্রসর হইতে দিবেন না: প্রয়োজন হইলে কঠিন দুঃখ দিয়াও শেষ পর্যন্ত আমাদের তিনি সত্য পথ নির্দেশ করিবেনই, "এত অটল এত কঠোর বলেই এত নির্ভর এত ভরসা" (রাজা : পৃ-৭)।

আঘাত প্রথমে অসহ্য মনে হইলেও ক্রমেই তাহা সহ্য হইয়া আসে এবং তখনই নিজের অজ্ঞাতসারেই কখন যে মন বদল হইয়া যায়, 'কখন যে লোভের পথ, লাভের পথ একেবারে তুচ্ছ হইয়া যায় তাহা জানাও যায় না—

সুদর্শনা। তোর মন বদল হল কখন ?

সুরঙ্গমা। কী জানি কখন হয়ে গেল। সমস্ত দুরন্তপনা হার মেনে একদিন মাটিতে লুটিযে পডল। তখন দেখি যত ভয়ানক ততই সুন্দর। (রাজা : পৃ-৭)

ঈশ্বরের সৃষ্ট জগতে মানুষই শ্রেষ্ঠতম সৃষ্টি। নিজের ছাযায তিনি মানুষকে সৃষ্টি করিয়াছেন। মানুষের মধ্যেই তাঁহার বিশেষ প্রকাশ। আত্মার অস্তিত্ব কেবল মানুষের মধ্যেই আছে। ইহা পরমাত্মারই সমগোত্রীয়। সে অমৃতের পুত্র—অমৃতস্য পুত্রাঃ[৩]। সৃষ্টির এই পরিপূর্ণতায় তিনি আসিয়া পৌঁছিয়াছেন অনেক পরে। বিবর্তনবাদেও ইহাই স্বীকৃত—সৃষ্টিতে যাহা দেখি মানুষই তাহার মধ্যে শেষতম: সে-ই সৃষ্টির মধ্যে পূর্ণতর। পরবর্তীকালে সুন্দরতর আরও কোন জীব সৃষ্টি হইতে পারে কিন্তু আজ পর্যন্ত যে সৃষ্টির সহিত আমাদের পরিচয হইযাছে তাহার মধ্যে মানুষ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ কিছু নাই। ঈশ্বরের কত কল্পনা, কত ধ্যানই না মানুষের রূপ ধারণ করিয়াছে! সেই জন্যই সুদর্শনার মধ্যে রাজা দেখিতে পান—"দেখতে পাই যেন অনন্ত আকাশের অন্ধকার আমার আনন্দের টানে ঘুরতে ঘুরতে কত নক্ষত্রের আলো টেনে নিয়ে এসে একটি জায়গায় রূপ ধরে দাঁডিয়েছে। তার মধ্যে কত যুগের ধ্যান, কত আকাশের আবেগ, কত ঋতুর উপহার" (রাজা : পৃ-১৫)। মানুষও সেইজন্য তাঁহারই ন্যায় স্বাধীন—It is the self of man which the great king of the universe has not shadowed with his throne—he has left it free......in his self he is free to disown him. (Sādhanā : p-41). সেইজন্যই তো

৩। শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ্—২য় অধ্যায়। ৫-এর শ্লোক

কত সংশয়, সন্দেহ অবিশ্বাস। কিন্তু মানবাত্মার সহিত পরমাত্মার তো চিরবিচ্ছেদ থাকিতে পারে না। লীলার আনন্দ উপভোগ করিবার জন্যই তো তাঁহার এই সৃষ্টি। দূরে সরাইয়া রাখিয়াই সেখানে তৃপ্তি নাই : নিকটেও তাহাকে টানিয়া লইতে হইবে। আনন্দের জন্যই লীলারও বৈচিত্র্য চাই। তাই মানবাত্মার যেমন পরমাত্মাকে না পাইয়া মুক্তি নাই, পরমাত্মারও সেইরূপ মানবাত্মাকে না পাইলে লীলার আনন্দ সম্পূর্ণ হইবে না—

আমায় নইলে, ত্রিভুবনেশ্বর,
তোমার প্রেম হত যে মিছে।
(গীতাঞ্জলি : ১২১ সংখ্যক কবিতা)

অথবা, আমার মিলন লাগি তুমি
আসছ কবে থেকে।
(গীতাঞ্জলি : ৩৯ সংখ্যক কবিতা)

মানবাত্মাকে না পাইলে তাঁহারও চলিবে না। মানুষের আত্মাকে স্বাধীন করিয়া দিয়াও তিনি নিশ্চিন্ত হন নাই—প্রতিনিয়তই নিজের বাঁশীটি বাজাইয়া মানুষকে আহ্বান করিয়া চলিয়াছেন : জনতার ভেঁপুর মধ্যেও তাঁহার বাঁশী বাজিয়াই চলিয়াছে। যাহারা কান পাতিয়া থাকে তাহারাই এই বাঁশীর ধ্বনি শুনিতে পায়—

সুরঙ্গমা। কোন্‌খানে বাঁশি বাজছে এবার বাতাসে কান দিলে বোঝা যাবে।

ঠাকুরদা। সবাই যখন নিজের তালপাতার ভেঁপু বাজাচ্ছিল তখন বিষম গোল।

সুরঙ্গমা। উৎসবে ভেঁপুর ব্যবস্থা তিনিই করে রেখেছেন।

(রাজা : পৃ-৬৭)

সুতরাং বাঁশী তিনি বাজাইয়াই চলিয়াছেন নিজেরই গরজে। নিজের লীলাকে সার্থক করিবার জন্যই এই ভেঁপুর অন্তরালে অস্পষ্ট মধুর সুরে তিনি আহ্বান করিয়াই চলিয়াছেন। কারণ—

আমার মাঝে তোমার লীলা হবে,
তাই তো আমি এসেছি এই ভবে।
(গীতাঞ্জলি : ১৩০ সংখ্যক কবিতা)।

নিজেরই প্রয়োজনে তিনি আমাদের মোহ ঘোর ঘুচাইয়া দিবার জন্য আহ্বান করিতেছেন : এ আহ্বান অরূপের আহ্বান, ভালোবাসার আহ্বান—

আমি রূপে তোমায় ভোলাব না
ভালোবাসায় ভোলাব।
আমি হাত দিয়ে দ্বার খুলব না গো
গান গেয়ে দ্বার খোলাব। (রাজা: পৃ-৭৯)।

কবীরের কণ্ঠেও এই একই প্রকার কথা শোনা গিয়াছে—

তোহি মোহি লগন লগায়ে, রে ফকীরবা।
সোবত হী মঁয়য় অপ্‌নে মন্দিরমেঁ,
শব্দ মার জগায়ে, রে ফকীরবা।
বূডত হী মঁয্য্ ভবকে সাগরমেঁ,
বঁহিয়া পক্‌ড্ সুল্‌ঝায়ে, রে ফকীরবা।
একৈ বচন, দূজৈ বচন নাহীঁ,
তুম্ মো-সে বন্ধ্ ছুডায়ে, রে ফকীরবা।
কহৈঁ কবীর, সুনো ভাই সাধো,
প্রাণন্ প্রাণ লগায়ে, রে ফকীরবা।
(কবীর : ব্রহ্মসংগীত : ১৯৫৮ সংখ্যক কবিতা)।

হে আমার প্রেমভিখারী (পরমেশ্বর), তুমি তোমার ও আমাব মধ্যে কি বাঁধন বাঁধিযাছ। আমি আপন ঘরে মোহ-নিদ্রায নিদ্রিত ছিলাম, তুমি তোমার গানের আঘাতে আমাকে জাগাইলে, হে আমার ভিখারী। আমি ভবসাগরে মগ্ন হইতেছিলাম, তুমি হাত ধরিযা আমাকে মুক্ত করিলে, হে আমার ভিখারা! তোমার একটি মাত্র বাক্য, ("আমি তোমায চাই"), দ্বিতীয় বাক্য নাই; তাহাতেই তুমি আমার সকল বন্ধন ছাডাইয়া লইলে, হে আমার ভিখারী। কবীর বলেন, (আমার এই নিবেদন) শোন ভাই সাধু। তুমি তোমার প্রাণে আমার প্রাণ যুক্ত করিলে, হে আমার ভিখারী! (তদেব : ব্যাখ্যা)।

একহার্টও বলিয়াছেন যে ঈশ্বর মানুষকে চাহেন। রয়েস (Royce) তাঁহার 'দি ওয়ার্লড্ এণ্ড দি ইন্‌ডিভিডুয়াল' গ্রন্থে বলিয়াছেন যে বাহিরের স্বর্গীয় সত্তার আকর্ষণে অন্তরের স্বর্গীয় সত্তা যে প্রেরণা দেয় তাহাকেই

মানবাত্মার গৃহাভিমুখীন যাত্রা বলা যাইতে পারে। আমরা সেই অনন্ত অবিনশ্বর সত্তাকে সেই অনুপাতে চাই যে অনুপাতে তিনি আমাদের চাহেন। ফ্রান্সিস্ টম্‌সন্ (Francis Thompson : ১৮৫৯-১৯০৭) তাঁহার 'দি হাউণ্ড অব হেভেন' গ্রন্থেও এই ভাবকল্পনারই প্রকাশ করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন যে অনিচ্ছুক আত্মাকে সন্ধান করিয়া বেড়ান সেই চিরন্তন সত্য। যে আত্মা আত্মসমর্পণ করিতে অনিচ্ছুক তাহাকে পাইবার জন্য স্বর্গীয় সত্তার অক্লান্ত অনুসন্ধান চলিয়াছে। এই আত্মা যেন বধূ এবং তিনি জীবন স্বামী।[৪]

কিন্তু সাধারণ মানুষের সঙ্গে এই স্বর্গীয় সত্তার পার্থক্য এইখানে যে ভালোবাসিয়া বধূরূপ আত্মাকে তিনি আহ্বান করিলেও অনিচ্ছুক আত্মার ইচ্ছার জাগরণ পর্যন্ত তিনি অপেক্ষা করিয়া থাকেন—আত্মার হৃদয়ের দরজা খুলিবার জন্য বাঁশী বাজাইয়া চলিলেও নিজে তাহার হৃদয় দ্বার উন্মুক্ত করিয়া দেন না। কবীর যেখানে বলিলেন 'তুমি হাত ধরিয়া আমাকে মুক্ত করিলে', রবীন্দ্রনাথ সেখানে মনে করেন 'হাত দিয়ে দ্বার খুলব না গো'। কবীর বলিয়াছেন 'তোমার গানের আঘাতে আমাকে জাগাইলে', রবীন্দ্রনাথও বলিয়াছেন 'গান গেয়ে দ্বার খোলাব'। আত্মা নিজের হৃদয় দুয়ার যতক্ষণ না খুলিয়া দিবে স্বর্গীয় সত্তা ততক্ষণ সেখানে অপেক্ষা করিয়াই থাকিবে :— রাজার গান—

খোলো খোলো দ্বার রাখিয়ো না আর
বাহিরে আমায় দাঁড়ায়ে।
দাও সাড়া দাও এই দিকে চাও
এসো দুই বাহু বাড়ায়ে॥
… … …
… … …
তোমারি দুয়ারে এসেছি, আমারে
বাহিরে রেখো না দাঁড়ায়ে॥

(রাজা : পৃ-১০-১১)।

৪। St. Bernard : The Divine word is the Bridegroom, the human soul is the Bride.
রবীন্দ্রনাথ : খেয়া : বালিকাবধূ।
Evelyn Underhill : Mysticism : The Illumination of the Self.

সুরঙ্গমা। তোমার দুয়োর কে বন্ধ রাখতে পারে রাজা? ও তো বন্ধ নেই কেবল ভেজানো আছে, একটু ছোঁও যদি আপনি খুলে যাবে। সেটুকুও করবে না? নিজে উঠে গিযে না খুলে দিলে ঢুকবে না?···রানী, যাও তবে, দরজাটা খুলে দাও, নইলে আসবেন না। (তদেব : পৃঃ ১১-১২)।

"In the book of Hidden things it is written, says Eckhart, "I stand at the door and knock and wait···thou needs not seek Him here and there. He is no farther off than the door of the heart. There He stands and waits and waits until He finds thee ready to open and let Him in. Thou needst not call Him from a distance : to wait until thou openest is harder for Him than for thee. He needst thee a thousand times more than thou canst need Him. Our attainment of the Absolute is not a one-sided ambition, but the fulfilment of a mutual desire" (Evelyn, Underhill : Mysticism : Ch. IV : I).

দুজনেই যেখানে স্বাধীন সেখানেই মিলনের আনন্দ চরিতার্থতা লাভ করে। সেই আনন্দ পূর্ণমাত্রায় উপলব্ধি করিবার জন্যই তো তিনি আমাদের স্বাধীন করিয়া দিয়াছেন। অধিকার দিয়াছেন আমাদের, দিযাছেন মর্যাদা। তিনি নিজেও যেমন রাজা, মনবাত্মাও সেইরূপ রাজা—

দ্বিতীয়। দেখো দাদা, আজকের দিনে মনে একটা কথা বড়ো লাগছে।

ঠাকুরদা। কী বল্ দেখি।

দ্বিতীয়। এবার দেশবিদেশের লোক এসেছে, সবাই বলছে, সবই দেখছি ভালো কিন্তু রাজা দেখিনে কেন। কাউকে জবাব দিতে পারিনে। আমাদের দেশে ওইটে একটা বড়ো ফাঁকা রয়ে গেছে।

ঠাকুরদা। ফাঁকা! আমাদের দেশে রাজা এক জায়গায় দেখা দেয় না বলেই তো সমস্ত রাজ্যটা একেবারে রাজায় ঠাসা হয়ে রয়েছে—তাকে বল ফাঁকা! সে যে আমাদের সবাইকেই রাজা করে দিয়েছে! (রাজা : পৃ-২৭)

এই রাজা করিয়া দিবার উদ্দেশ্য কি? কবিকেশরীর গানেই তাহা বলা হইয়াছে—

আমরা সবাই রাজা আমাদের এই রাজার রাজত্বে
নইলে মোদের রাজার সনে মিলব কী স্বত্বে।
(আমরা সবাই রাজা)
আমরা যা খুশি তাই করি
তবু তাঁর খুশিতেই চরি।
আমরা নই বাঁধা নই দাসের রাজার ত্রাসের রাজত্বে
নইলে মোদের রাজার সনে মিলব কী স্বত্বে
(আমরা সবাই রাজা : পৃ-২৭)

অন্তরের মধ্যে রাজাকে পাওয়াই যদি সব হয় তবে এই বাইরের জগৎটার তাৎপর্য কি? সেটা কি নিতান্তই মিথ্যা! রবীন্দ্রনাথ তাহা মুহূর্তের জন্যও মনে করেন না—

যার খুশি রুদ্ধ চক্ষে করো বসি ধ্যান,
বিশ্ব সত্য কিংবা মিথ্যা লভ সেই জ্ঞান।
আমি ততক্ষণ বসি নিদ্রাহীন চোখে,
বিশ্বেরে দেখিযা লই দিনের আলোকে।

উপনিষদও বলিযাছেন, 'আনন্দরূপমমৃতম্ যদ্বিভাতি।' তবে তো বাহিরের জগৎকেও তুচ্ছ করিবাব নয। তবে ঠাকুবদার মুখে এই গানটি কেনই বা শোনা গেল—

কোথা বাইরে দূরে যায় রে উড়ে হায় রে হায়,
তোমার চপল আঁখি বনে পাখি বনে পালায়।
... ...
... ...
তবে ঘুচে গো ত্বরা ঘুরিযা মরা হেথা হোথায়—
আহা আজি সে আঁখি বনের পাখি বনে পালায়। (পৃ-১৮)

আঁখি চপল বলিয়াই তো ভয়। নহিলে তিনি কেবল হৃদয়ের ভিতরেই প্রাপ্তব্য তাহাই নহেন, তিনি বিশ্বের মধ্যেও আছেন, তাঁহাকে সেখানেও উপলব্ধি করা সম্ভব। কবীর বলিয়াছেন—

If I say that He is within me, the universe is ashamed. If I say that He is without me, it is falsehood." (Kabir's Poems : IX)

তবে বাহিরের জগতের মধ্যে তাঁহাকে জানিবার পূর্বে অন্তরের মধ্যে ভালো করিয়া দেখিয়া লইতে হইবে। অন্তরে উপলব্ধির পূর্ণতা আসিলে আর বাহিরে দেখায় ভ্রান্তি আসে না—

আমার প্রাণের মানুষ আছে প্রাণে
তাই হেরি তায় সকল খানে।
(রাজা :-বাউলদের গান : পৃ-৩১)

প্রাণের মানুষকে প্রাণে দেখিতে পাইলে বাহিরেও তাহার অস্তিত্ব আর ঢাকা থাকে না। সুদর্শনা প্রাণের ভিতরের উপলব্ধিকে প্রথমে অস্বীকার করিয়াছিল বলিয়াই বাহিরের জগতেও প্রতারিত হইয়াছিল। সকল কিছুরই প্রস্তুতি প্রয়োজন। রবীন্দ্রনাথ জানিতেন যে তাঁহার পিতা মহর্ষিদেবও নির্জনে সাধনা করিয়া প্রস্তুত হইয়াছেন—"আমি কখন কখন কোন নির্জন পর্বতের পার্শ্বস্থ শিলাতলে বসিয়া ধ্যানে মগ্ন হইয়া এক বেলা কাটাইতাম" (মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের আত্মজীবনী : পৃ-২৭৯)।

তিনি অরূপ অনন্ত অসীম। কোন বিশেষ রূপের বাঁধনে তিনি বাঁধা নন। আবার তিনিই পৃথিবীতে আভাসিত : সকল কিছু তাঁহারই প্রতিভাস মাত্র। সুন্দর অসুন্দরেও তিনি। সুন্দরে অধিকতর পূর্ণরূপে তিনি প্রকাশিত। শুধু রূপের জগতেই যদি তিনি থাকিতেন তবে তিনি সীমিত হইয়া পড়িতেন। রূপের জগৎ তাঁহার প্রতীক মাত্র। কোন একটি বিশেষ রূপের ভিতর দিয়াও তাঁহারই সাধনা সম্ভব যদি জানা থাকে যে সেই বিশেষ রূপটি অসীমের প্রতীক ব্যতীত আর কিছুই নয়। যে অন্তরে সেই অসীমকে উপলব্ধি করে নাই সে অবিদ্যার দ্বারা আচ্ছন্ন। তাঁহার দৃষ্টিতে তখন সেই বিশেষ রূপটি, সেই প্রতীকটিই ঈশ্বর হইয়া উঠিয়া তাহার সাধনাকেই নষ্ট করিয়া দেয়। সুদর্শনার চোখেও সেই রূপের ঘোর লাগিয়াছিল—"রূপের নেশা আমাকে লেগেছে—সে নেশা আমাকে ছাড়বে না, সে যেন আমার দুই চক্ষে আগুন লাগিয়ে দিয়েছে, আমার স্বপনসুদ্ধ ঝলমল করছে" (রাজা : পৃ-৭৯-৮০)। রূপের ঝলমল ও চমকের হাত হইতে মুক্তির জন্যই অন্ধকার ঘরের সাধনা সমাপ্ত করিয়া লওয়া চাই। অন্তরের গভীরে এই অন্ধকার কক্ষটি—ইহা আত্মার কক্ষ। সুরঙ্গমা বলে, "এ-ঘর মাটির আবরণ ভেদ করে পৃথিবীর বুকের মাঝখানে তৈরি। তোমার

জন্যেই রাজা বিশেষ করে করেছেন" ।[৫] রানীকে পাইবার জন্যই তো তাহাকে তিনি স্বাধীন রূপে সৃষ্টি করিয়াছেন। অন্ধকার ঘরটিও বিশেষ করিয়া তাহারই জন্য তৈয়ারী হইয়াছে—উহাই আত্মার সাধনার ক্ষেত্র : এই খানেই পরমাত্মার সহিত আত্মার প্রথম পরিচয় হওয়া চাই—

সুরঙ্গমা। রানীমা, তোমার ঘরে ঘরেই তো আলো জলছে—তার থেকে সরে আসবার জন্যে কি একটা ঘরেও অন্ধকার রাখবে না।

সুদর্শনা। কোথাও অন্ধকার কেন থাকবে।

সুরঙ্গমা। তা হলে যে আলোও চিনবে না অন্ধকারও চিনবে না।

(রাজা : পৃ-৫)।

আলোকে চিনিবার জন্যই অন্তরের গভীরে তাঁহাকে জানিবার সাধনা সমাপ্ত করিয়া লইতে হইবে। এই সাধনা সমাপ্ত করিতে দুঃখ বরণ চাই—

সুরঙ্গমা। দেখো ঠাকুরদা, আজ এই উৎসবের ভিতরে ভিতরে কেবলই আমার মনে হচ্ছে রাজা আমাকে এবার দুঃখ দেবেন।

ঠাকুরদা। দুঃখ দেবেন।

সুরঙ্গমা। হাঁ ঠাকুরদা। এবার আমাকে দূরে পাঠিয়ে দেবেন, অনেক দিন কাছে আছি সে তাঁর সইছে না।

ঠাকুরদা। এবার তবে কাঁটাবনের পার থেকে তোমাকে দিয়ে পারিজাত তুলিয়ে আনাবেন। (রাজা : পৃ-৬৭)।

জেরার্দ দ্য নের্ভাল্ (Ge'rard De Nerval : ১৮০৮-১৮৫৫)[৬] নিজের যে স্বপ্নের কথা বলিয়াছেন তাহাতেও এই আভাসই পাওয়া যায়—

"During my sleep, I had a marvellous vision. It seemed to me that the goddess appeared before me, saying to me : I am the same as Mary, the same as thy mother, the same also whom, under all forms, thou hast always loved At each of thine ordeals I have dropt yet one more of the masks with which I veil my countenance, and soon thou shalt see me as I am !

৫। রাজা : পৃ-৫।

৬। Nerval was not a great writer, he had moments of greatness. He had to go to assylum thrice and ultimately committed suicide. In him we find a writer, graceful and elegant, when he is sane, but only inspired, only wise, passionate, collected, only really master of himself, when he is insane. (Symons : The Symbolist Movement in Literature : p : 16-17).

(**Nerval : Sylvie**). একটি একটি করিয়া দুঃখ বরণ করিয়া মানুষ সত্যের আবরণ একটি একটি করিয়া উন্মোচন করে। সেই দুঃখদাতা অদৃশ্য রাজা কখনও ননির পুতুল হইতেই পারেন না—

ঠাকুরদা। তোর এমন বুদ্ধি কবে হল ? আমার রাজা ননির পুতুল, আর তুই তাকে ছায়া করে রাখবি !

... ...

কুম্ভ। ধ্বজা দেখতে পেলুম যে গো।

ঠাকুরদা। ধ্বজায় কী দেখলি।

কুম্ভ। কিংশুক ফুল আঁকা—একেবারে চোখ ঠিকরে যায়।

ঠাকুরদা। আমার রাজার ধ্বজায় পদ্মফুলের মাঝখানে বজ্র আঁকা।

(রাজা : পৃ-৩৮)।

অদৃশ্য রাজার ধ্বজায় এই অপূর্ব, আশ্চর্য প্রতীক। শহীদুল্লাহ সাহেব বলিয়াছেন, "তিনি বজ্রের মতো কঠিন আর ফুলের মতো কোমল। তাই তাঁহার ধ্বজাচিহ্ন পদ্মের মাঝে বজ্র" (প্রবাসী, ১৩৫২ : শ্রাবণ : পৃ-২৫৬ : প্রভাত কুমার মুখোপাধ্যায় : রবীন্দ্রজীবনী : ২য় খণ্ড : পৃ-২৪১)। পদ্ম কেবল একটি ফুলই নয়, ইহা সৌন্দর্গের প্রতীক এবং নারীর অর্থাৎ সৃষ্টির প্রতীক। পদ্ম ও বজ্র—সুন্দর ও ভয়ঙ্কর : সৃষ্টি ও ধ্বংসের প্রতীক। সেই অনন্ত সত্তার যথার্থ সঙ্কেত করে ধ্বজার প্রতীকটি। কিংশুকের লাল রঙে একটা সংগ্রামের দ্যোতনা হয়ত' আছে কিন্তু ফুলটি গুণহীন বলিয়া সংগ্রামের শক্তির সঙ্কেত উহাতে নাই। বিশেষতঃ চোখ ঠিকরাইয়া যাইবার কথা নয়—রাজায় ধ্বজায় থাকিবে ভয়-বিস্ময় এবং সৌন্দর্যের আকর্ষণ। সুতরাং কিংশুক বাহিরের চোখ ধাঁধাঁনো একটা শূন্যতা ব্যতীত আর কিছুই নয়—উহা কখনও ঠাকুরদার রাজার ধ্বজায় আঁকা থাকিতে পারে না। এই রাজাকে জানিতে পারাই আত্মার চরম সার্থকতা।—অন্তরে বাহিরে তাঁহাকে জানিতে হইবে—

ন তং বিদাথ য ইমা জজান,
অন্যৎ যুষ্মাকমন্তরং বভূব।[৭]

"তাঁহাকে তোমরা জানিলে না, তিনি এই সমুদায় সৃষ্টি করিয়াছেন, সেই অন্যকে জানিলে না, যিনি তোমাদের অন্তরে রহিয়াছেন"।[৮] তাঁহাকে

৭। ঋক্‌বেদ : ১০।৮২।৭ : মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের আত্মজীবনী : পৃ-১৪৪।
৮। তদেব : ব্যাখ্যা।

জানিবার সার্থকতা কোথায় রাজা নাটকের কুম্ভ তাহাই জানিতে চাহিয়াছিল। পার্থিব সুখের কথা মনে করিয়াই সে জিজ্ঞাসা করিল, "যে পারে সে বোধ হয় যা চায় তাই পায়" (রাজা : পৃ-৩৯)। কিন্তু তাঁহাকে পাইলেই যে সমস্ত পাওয়ার শেষ তাহা জাগতিক দৃষ্টি সম্পন্ন মানুষ বুঝিতে পারে না। সমস্তই যাহা হইতে আসিতেছে, যাহা সকল কিছুর উৎস তাহা পাইলে আর চাহিবার কিছুই থাকে না—ঠাকুরদা তাই উত্তর দিলেন, "সে যে কিচ্ছু চায় না" (তদেব)।

এই রাজাকেই চিনিযাছে সুরঙ্গমা, জানিযাছেন ঠাকুরদা। তাই তাহাদেরও কিছুরই প্রয়োজন নাই। সুরঙ্গমার আদরের প্রয়োজন নাই, ভালোবাসি এই কথাটা বলিবারও প্রয়োজন নাই : শুধু সেবা করিয়া নিজেকে উৎসর্জন করিয়াই তাহার আনন্দ—

আমি কেবল তোমার দাসী।
কেমন করে আনব মুখে তোমায় ভালোবাসি।
গুণ যদি মোর থাকত তবে
অনেক আদর মিলত ভবে,
বিনামূল্যের কেনা আমি শ্রীচরণপ্রয়াসী॥ (রাজা : পৃ-৯২)

তাঁহাকে সম্পূর্ণরূপে পাইবার পর আর অন্য কোন মূল্য পাওয়ার কথা মনেও থাকে না। বৈষ্ণবতত্ত্বে যে দাসীরূপে সাধনার কথা আছে সুরঙ্গমা সেই সাধনাই করিয়াছে। একেবারে বুকে উঠিবার অভিপ্রায় তাহার নাই, সেই জন্যই তাহার দৃষ্টিও পায়ের দিকেই—"এখন এমন হয়েছে যে যখন সকালবেলায় তাঁকে প্রণাম করি তখন কেবল তাঁব পায়ের তলার মাটির দিকেই তাকাই—আর মনে হয এই আমার ঢের—আমার নয়ন সার্থক হয়ে গেছে" (রাজা : পৃ-৮-৯)। দাসীরূপে সাধনা সহজতম পথ : সমস্ত জীবের সেবা করিব কারণ সেই জীবের মধ্যেই ঈশ্বর আছেন—ইহার জন্য জীবনে দুঃখ বরণ করিয়া লইলেই হইল. বড দাবী কিছু নাই, শুধু সেবার অধিকারটুকু চাহিয়া লওয়া—

জীবে দয়া করে যেই জন,
সেই জন সেবিছে ঈশ্বর। (বিবেকানন্দ)

ইহারাও ভগবানকে উপলব্ধি করে : তাঁহার সম্বন্ধে কেমন একটা বোধ

জন্মাইয়া যায়; অতি সহজেই স্বজ্ঞার দ্বারা তাঁহার উপস্থিতি, আগমন তাহারা বুঝিয়া লয়—

সুরঙ্গমা।…আমি তাঁর এই অন্ধকার ঘরের সেবকা কিনা তাই আমার একটা বোধ জন্মে গেছে—আমার বোঝবার জন্যে কিছুই দেখবার দরকার হয় না। (রাজা: পৃ-৯-১০)

… … … … …

সুদর্শনা। দাসী হয়ে তোর এত সহজ হল কী করে? রানী হয়ে আমার হয় না কেন?

সুরঙ্গমা। আমি যে দাসী সেই জন্যেই এত সহজ হল।

(রাজা: পৃ-১০)।

দাসী রূপে সুরঙ্গমা ভজনা করিয়াছে বলিয়াই তাহার নিকট কেবলই তাঁহার আদেশ আসে—"আমাকে যেদিন তিনি এই অন্ধকার ঘরের ভার দিয়ে বললেন, সুরঙ্গমা, এই ঘরটা প্রতিদিন তুমি প্রস্তুত করে রেখো, এই তোমার কাজ, তখন আমি তাঁর আজ্ঞা মাথায় করে নিলুম—আমি মনে মনেও বলিনি যারা তোমার আলোর ঘরে আলো জ্বালে তাদের কাজটি আমাকে দাও" (তদেব)। এই প্রকার সাধনায় কোন প্রশ্ন করিবার থাকে না—এখানে তো তাঁহার সহিত সমপর্যায়ে উঠিয়া আসা নয়: কোন প্রশ্ন না তুলিয়া সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণ। তবে ইহাও স্মরণ রাখা কর্তব্য যে সাধক যে ভাবেই সাধনা করুক না কেন ঈশ্বরের স্বরূপ অনেকখানিই বুঝিতে পারেন। উচ্চতম পর্যায়ে না পৌঁছাইলেও সুরঙ্গমা অনেক কথা জানে—

রাজা। রানী আজ আমাকে চোখে দেখতে চান।

সুরঙ্গমা। কোথায় দেখবেন?

রাজা। যেখানে পঞ্চমে বাঁশি বাজবে, ফুলের কেশরের ফাগ উড়বে, জ্যোৎস্নায় ছায়ায় গলাগলি হবে সেই আমাদের দক্ষিণের কুঞ্জবনে।

সুরঙ্গমা। সে-লুকোচুরির মধ্যে কি দেখা যাবে। সেখানে যে হাওয়া উতলা, সবই চঞ্চল, চোখে ধাঁদা লাগবে না?

রাজা। রানীর কৌতুহল হয়েছে।

সুরঙ্গমা। কৌতুহলের জিনিস হাজার হাজার আছে—তুমি কি তাদের সঙ্গে মিলে কৌতূহল মেটাবে। তুমি আমার তেমন রাজা

> নও! রানী, তোমার কৌতূহলকে শেষকালে কেঁদে ফিরে আসতে হবে (রাজা : পৃ-১৭-১৮)।

রাজার এই পরিচয় তাহার জানা আছে। তাঁহার আদেশ আসিবার অনেক পূর্ব হইতেই সে তাহা জানিতে পারে ; মনের মধ্যে যে আলোড়ন সৃষ্টি হয় তাহা সেই আদেশের স্বরূপ সম্বন্ধেও তাহাকে সচেতন করিয়া দেয়। স্পষ্ট করিয়া বুঝিতে না পারিলেও এই বোধ সব সময়েই তাহার চেতনাকে উদ্দীপ্ত রাখে—"কোন্‌খানে বাঁশি বাজছে এবার বাতাসে কান দিলে বোঝা যাবে" ('রাজা : পৃ-৬৭) : "এবার আমাকে দূরে পাঠিয়ে দেবেন, অনেক দিন কাছে আছি সে তাঁর সইছে না" (তদেব)। সুরঙ্গমা আরও বোঝে যে মানবাত্মাকে ছাড়িযা থাকিবার উপায় পরমাত্মার নাই—"যদি ছেড়ে দিতেই পারেন তাহলে তাঁকে আর দরকার নেই। তাহলে তিনি নেই" (তদেব : পৃ-১০০)। দাসীভাবে সেবা করিয়া, জীবের সেবার ভিতর দিয়া ধীরে ধীরে প্রেমের জগতে উন্নীত হওযা যায়। সুরঙ্গমারও প্রেমের অনুভূতি হইযাছিল। সুদর্শনাকে আহ্বানেব জন্য তাঁহার বীণা নিশ্চয়ই বাজিবে তাহা সে জানে, এই বীণা ধ্বনি তাহাকেও শুনিয়া লইতে হইবে—

> সুদর্শনা। কিন্তু বললে বিশ্বাস করবিনে তারই মধ্যে বার বার আমার মনে হচ্ছিল কোথায তার বীণা বাজছিল।......সে-বীণা তুই কি শুনেছিলি সুবঙ্গমা। না, সে আমার স্বপ্ন ?
>
> সুরঙ্গমা। সেই বীণা শুনব বলেই তো তোমাব কাছে কাছে আছি। অভিমান-গলানো সুর বাজবে জেনেই কান পেতে পড়ে ছিলুম।
>
> (তদেব : পৃ-১২৪-১২৫)

সুদর্শনার যখন পরিপূর্ণ মুক্তি হইল, যখন তাহার মন প্রেমের স্পর্শে আকুল হইয়া উঠিল—সে যখন পথে বাহির হইযা পডিল তাহার প্রিয়তম রাজার সন্ধানে তখন সুরঙ্গমার কণ্ঠে ধ্বনিত হইল প্রেম সঙ্গীত। যে একদিন গাহিয়াছিল—

> আমি কেবল তোমার দাসী।
> কেমন করে আনব মুখে তোমায় ভালোবাসি।

সে-ই আজ সুদর্শনার প্রেম-মূর্তি দেখিয়া গান ধরিল—

অন্ধকারের মাঝে আমায় ধরেছ দুই হাতে।
কখন তুমি এলে, হে নাথ, মৃদু-চরণপাতে ?
ভেবেছিলেম জীবনস্বামী,
তোমায় বুঝি হারাই আমি,
আমায় তুমি হারাবে না বুঝেছি আজ রাতে। (তদেব : পৃ-১২৬

ভক্তি প্রেমের জগতে উত্তীর্ণ হইল।

ঠাকুরদা এখানেও সেই অসীমেরই মাধ্যম। অসীমের পরিচয় পাওয়া যায় সীমার মধ্যেই—তিনিই সেই আশ্চর্য জনক অসীমের সীমা। তাঁহার সাধনা সখারূপে। দাস্যভাবের উপরে সখ্যভাব। সেই জন্য সুরঙ্গমা যাহার তাৎপর্য বোঝে না ঠাকুরদাকে তাহা বলিয়া দিতে হয়। সুরঙ্গমা কেবল অনুভব করিয়াছে যে এইবার তিনি দুঃখ দিবেন—নিকট হইতে দূরে সরাইবেন। এই দুঃখ দিবার তাৎপর্য বুঝাইয়া ঠাকুরদাই ব্যাখ্যা করিয়া বলেন, "এবার তবে কাঁটাবনের পার থেকে তোমাকে দিয়ে পারিজাত তুলিয়ে আনাবেন। সেই দুর্গমের খবরটা আমরা যেন পাই ভাই।" সুরঙ্গমার উত্তরটা লক্ষণীয়—"তোমার নাকি কোনো খবর পেতে বাকি আছে ? রাজার কাজে কোন্ পথটাতেই বা তুমি না চলেছ ? হঠাৎ নতুন হুকুম এলে আমাদেরই পথ খুঁজে বেড়াতে হয়" (রাজা : পৃ-৬৭)।

ঠাকুরদা সমস্ত রাস্তাই রাঙাইয়া বেড়ান ; অনেক প্রকার সাধনাতেই তিনি সিদ্ধি লাভ করিয়াছেন তাই সুরঙ্গমা যেখানে থামিয়া যায় সেখানে ঠাকুরদাকে আগাইয়া আসিতে হয়—

সুদর্শনা। সুরঙ্গমা তুই যা, একবার তাঁর খবর নিয়ে আয় গে।

সুরঙ্গমা। কোথায় তাঁর খবর নেব তা তো কিছুই জানি নে। ঠাকুরদাকে ডাকতে পাঠিয়েছি—তিনি এলে হয়তো তাঁর কাছ থেকে সংবাদ পাওয়া যাবে। (রাজা : পৃ-১১৫)।

ঠাকুরদা সব পথেই চলিয়াছেন বটে কিন্তু সিদ্ধির ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ চরিতার্থ হইয়াছেন কিনা তাহাও সুরঙ্গমার জানা নাই তাই সে নিশ্চিত করিয়া বলিতে পারিল না যে ঠাকুরদা নিশ্চয়ই তাঁহার সন্ধান করিয়া দিতে পারিবে। সুরঙ্গমার বক্তব্যের এই 'হয়তো' কথাটি সেই ইঙ্গিতই করে।

ঠাকুরদা সখারূপে সাধনা করিয়াছেন, সেই জন্যই তিনি রাজারূপী

পরমাত্মার মাধ্যম হইতে পারিয়াছেন। ঠাকুরদার পরিচয় রহিয়াছে কবি কেশরীর গানে—

যেখানে রূপের প্রভা নয়নলোভা,
সেখানে তোমার মতন ভোলা কে। (ঠাকুরদাদা)
যেখানে রসিক-সভা পরম শোভা
সেখানে এমন রসের ঝোলা কে। (ঠাকুরদাদা)
(রাজা : পৃ-২৫)

যাহার রূপ চোখ ধাধাঁনো তাহাতে ঠাকুরদার মন নাই, সুবর্ণরা তাঁহাকে কখনও প্রতাবিত করিতে পারে না। তিনি রসের জগতের মানুষ, বন্ধুকে প্রীতির বন্ধনে বাঁধিযাছেন। সাধনার সমস্ত পথকেই সেই জন্যই তিনি রাঙাইয়া দেন অন্তরের রস সিঞ্চন করিযা—"আজ সব রাস্তাই গানে ভাসিযে দিয়ে চলব" (তদেব : পৃ-২১)

যেখানে গলাগলি কোলাকুলি
তোমারি বেচাকেনা সেই হাটে,
পড়ে না পদধূলি পথ ভুলি
যেখানে ঝগড়া কবে ঝগড়াটে,
যেখানে ভোলাভুলি খোলাখুলি
সেখানে তোমার মতন খোলা কে—
ঠাকুরদাদা। (তদেব : পৃ-২৬)।

সখ্যরসের সাধকের পূর্ণ পাবিচয এইখানে দেওযা হইয়াছে। ঈশ্বরকে যে সখারূপে দেখে পৃথিবীর সকল কিছুর সঙ্গেই তাহার বন্ধুত্বের সম্পর্ক। বালকের দল, অকিঞ্চনেরা, বাউলের দল, পাগল, স্ত্রীগণ, নাগরিক সাধারণ সকলেরই সহিত তাঁহার সমপর্যাযের মিতালি। উৎসব করিতে বাহির হইতে যাহারা আসিয়াছে তাহাদের সহিতও তিনি মিলিয়া লইতে চাহেন—"এখানে সকল আগন্তুকের সঙ্গে একবার মিলে নিতে হবে" (তদেব : পৃ-৪৬)। বন্ধুর উৎসবদ্বার পর্যন্ত তাই তিনি সকলকে পৌছাইয়া দিয়া সেইখানে অপেক্ষা করিতে থাকেন—"আজ আমি দ্বারে, আজ আমাকে অন্য জায়গায় খুঁজলে মিলবে কেন" (তদেব)। বিশ্বশুদ্ধ সকলেই তাঁহার বন্ধু, সেইজন্য তিনি কাহারও প্রণাম গ্রহণ করেন না—"কর কী কর কী রানী! আমি কারও প্রণাম গ্রহণ করিনে। আমার সঙ্গে সকলের হাসির সম্বন্ধ"

(পৃ-১১৬)। তিনি ঈশ্বরকে চিনিয়া লইয়াছেন বলিয়াই জানেন যে তিনি কোমল অথচ কঠোর। তিনি ননির পুতুল নহেন। তিনি অহেতুক দান হয়ত করিতে পারেন কিন্তু ব্যথা দিয়াই সাধারণতঃ সত্য পথ চিনাইয়া দেন—সেই জন্যই রসের ঝোলা যে ঠাকুরদা তিনিও যোদ্ধবেশে রাজাদের মধ্যে আসিয়া উপস্থিত হন এবং তাঁহার আহ্বান শুনাইয়া দেন—

ঠাকুরদা। রাজা এসেছেন।

... ...

কলিঙ্গ। কোথাকার রাজা।

ঠাকুরদা। আমার রাজা।

... ...

কোশল। কে সে।

ঠাকুরদা। আপনারা সকলেই জানেন তিনি কে। তিনি এসেছেন।

বিদর্ভ। এসেছেন?

কোশল। কী তাঁর অভিপ্রায়।

ঠাকুরদা। তিনি আপনাদের আহ্বান করেছেন।

কাঞ্চী। ইস্। আহ্বান! কী-ভাবে আহ্বান করেছেন?

ঠাকুরদা। তাঁর আহ্বান যিনি যে-ভাবে গ্রহণ করতে ইচ্ছা করেন বাধা নেই—সকল প্রকার অভ্যর্থনাই প্রস্তুত আছে।

... ...

ঠাকুরদা। যখন তিনি আহ্বান করেন তখন তিনি আর অপেক্ষা করেন না।

... ...

কাঞ্চী। আচ্ছা আমিও যাচ্ছি, রাজদূত—কিন্তু সভায় নয়, রণক্ষেত্রে।

ঠাকুরদা। রণক্ষেত্রেই আমার প্রভুর সঙ্গে আপনার পরিচয় হবে, সে-ও অতি উত্তম প্রশস্ত স্থান। (রাজা : পৃ-১১১-১১৩)

ঠাকুরদা জানেন যে নত হইতে চায় না তাহাকে তিনি নত করাইয়া লন, কারণ সকলকেই যে তাঁহার প্রয়োজন। যাহাকে তিনি বেশী দুঃখ দেন তাহাকেই তাঁহার প্রেম উজাড় করিয়া দেন। চারিদিকে ভয়ঙ্কর অগ্নি প্রজ্জলিত করিয়া তাহাকে অধিকতর শুদ্ধ করিয়া তোলাই তাঁহার ইচ্ছা। তাই তিনি সুরঙ্গমাকে বলিয়াছিলেন—"এবার তবে কাঁটাবনের পার থেকে

তোমাকে দিয়ে পারিজাত তুলিয়ে আনাবেন" (পৃ-৬৭)। সুদর্শনা যখন জানিতে চাহিল যে ঈশ্বর তাহাকে পরিচয় দিবেন কিনা তখনও ঠাকুরদা উত্তর দিলেন, "দেবে বই কি—নইলে এত দুঃখ দিচ্ছে কেন। ভালো করে চিনিয়ে তবে ছাড়বে, সে তো সহজ লোক নয়" (রাজা : পৃ-১১৭)। ঠাকুরদা নিজেও দুঃখ স্বীকার করিযা লইয়াছেন তথাপি ঈশ্বরবোধ তাঁহার মুহূর্তের জন্যও বিচলিত হয নাই। সুরঙ্গমার সাধনার সহিত ঠাকুরদার সাধনার পার্থক্য এইখানে : সুরঙ্গমার নিকট কেবল আদেশ আসে আর ঠাকুরদা সকলকে নানা পথে হাত ধরিযা ঈশ্বরের নিকট পৌঁছাইয়া দিবার কাজ করেন। সেইজন্য ঈশ্বরও তাহাদের পৃথক উপাযে প্রস্তুত করিয়া লইযাছেন। সুরঙ্গমাকে রাজা দুঃখ কম দেন নাই, কিন্তু নিজে হইতে তিনি তাহাকে উদ্ধার করিযাছেন—তাহার নষ্ট হইবার পথে বাধা দিযাছেন —'বাপের কাছ থেকে কেড়ে' নিজের নিকট লইযা গিযাছেন। কিন্তু ঠাকুরদাকে এমন জোর করিযা নিজের দিকে টানিযা আনেন নাই। 'একে একে পাঁচ ছেলে মারা গেল একটি বাকি রইল না' তথাপি তিনি রাজাকে অবিশ্বাস করেন নাই। প্রেমে তো কোন বন্ধন নাই, সে তো কোন কিছুর বিনিমযে দিবার জিনিস নয। সেইটাই ঠাকুবদার গর্ব—"বন্ধুকে কি কেউ কোনো দিন পুরস্কার দেয" (বাজা : পৃ-৫৩)।

সুদর্শনার অহঙ্কার চূর্ণ হইযাছে—রাজবেশও আর সে চায় না। মনের এই অবস্থাতেই যে ভিতরের রসেব দীপ্তি ফুটিযা উঠিযা পরম সুন্দর করিয়া তোলে তাহাও ঠাকুরদার অজানা নাই—"...আমাদের রানীকে দেখো—ও নিজের উপর ভারি রাগ করেছিল—মনে করেছিল গযনা ফেলে দিয়ে নিজের ভুবনমোহন রূপকে লাঞ্ছনা দেবে—কিন্তু সে-রূপ অপমানের আঘাতে আরও ফুটে পড়েছে—সে যেন কোথাও আর কিছু ঢাকা নেই। আমাদের রাজাটি নিজের নাকি রূপের সম্পর্ক নেই তাই তো এই বিচিত্র রূপ সে এত ভালোবাসে, এই রূপই তো তার বক্ষের অলংকার। সেই রূপ আপনার গর্বের আবরণ ঘুচিয়ে দিয়েছে—আজ আমার রাজার ঘরে কী সুরে যে এতক্ষণে বীণা বেজে উঠেছে তাই শোনবার জন্যে প্রাণটা ছটফট করছে" (রাজা : পৃ-১৩০)।

কাঞ্চীর সাধনা বস্তুবাদী যুক্তিবাদীর সাধনা। ভারতবর্ষের আকাশে বাতাসে এই কথাটা ছড়াইয়া আছে যে ঈশ্বরের মিত্রভাবে মুক্তি মেলে সাত

জন্মে। আর শত্রুভাবে মুক্তি মেলে তিন জন্মে। কিন্তু এই শত্রুতা সাধনের কালে আস্তিক্য ও নাস্তিক্য বুদ্ধির দোটানায় পড়িয়া ইতস্তত করিলে চলিবে না। সেখানে বীরত্ব চাই, বলিষ্ঠতা চাই। কাঞ্চীর ছিল আত্মবিশ্বাস, ছিল যুক্তিবাদী মন। অন্য রাজারা যেখানে যুক্তির দিকে না গিয়া সহজেই বিচলিত হয়, কাঞ্চী কখনও সেরূপ দুর্বলতা প্রদর্শন করে না। সুবর্ণকে দেখিয়া যখন অন্য রাজারা সহজেই রাজা বলিয়া স্বীকার করিতে চায় তখনও কাঞ্চী তাহাকে যাচাই করিয়া লয় এবং যুক্তির বিশ্লেষণে তাহার মিথ্যা মুখোস উদ্ঘাটন করে—

কাঞ্চী। তোমাদের রাজা কোথাকার?

প্রথম পদাতিক। এই দেশের। তিনি আজ উৎসব করতে বেরিয়েছেন।

প্রস্থান

কোশল। এ কী কথা। এখানকার রাজা বেরিয়েছে।

অবন্তী। তাই তো তাহলে এঁকে দেখেই ফিরতে হবে—অন্য দর্শনীয়টা রইল।

কাঞ্চী। শোন কেন। এখানে রাজা নেই বলেই যে-খুশি নির্ভাবনায় আপনাকে রাজা বলে পরিচয় দেয়। দেখছ না, যেন সেজে এসেছে—অত্যন্ত বেশি সাজ।

অবন্তী। কিন্তু লোকটাকে দেখাচ্ছে ভালো, চোখ ভোলাবার মতো চেহারাটা আছে।

কাঞ্চী। চোখ ভুলতে পারে কিন্তু ভালো করে তাকালেই ভুল থাকে না। আমি তোমাদের সামনেই ওর ফাঁকি ধরে দিচ্ছি।

(রাজা : পৃ-৪২-৪৩)।

রূপ দেখিয়া অন্য রাজারা ইতস্তত করিতে পারে, সুদর্শনা নিজেও ভুল করিয়া তাহার উদ্দেশ্যে মালা পাঠাইতে পারে, কিন্তু ক্ষুরধার যুক্তির খড়্গো বস্তুবাদী কাঞ্চীরাজ ভ্রান্তি খণ্ডন করিয়া সত্য আবিষ্কার করিবেই। যাহা দৃষ্টিগোচর নহে, বুদ্ধির দ্বারা যাহা বোঝা যায় না তাহার অস্তিত্বও কাঞ্চী স্বীকার করে না—"অমন শূন্যতার কাছে চীৎকার করে লাভ কী। ততক্ষণ পথ বের করবার চেষ্টা করা যাক" (তদেব : পৃ-৭৫)। যেখানে যুক্তির দ্বারা বিশ্লেষণ করিয়াও কোন ঘটনা বোধগম্য হয় না সেখানেও ইহারা আকস্মিকতার দোহাই দিবে তথাপি দুর্জ্ঞেয় কোন কিছুকে স্বীকার করিবে না—

সুবর্ণ। ভেবে দেখুন না, বাগানে কী কাণ্ডটা হল। আপনি আটঘাট বেঁধেই তো কাজ করেছিলেন, তার মধ্যেও কোথা দিয়ে কিন্তু এসে ঢুকে পড়ল। তিনিই তো রাজা, তাঁকে মানব না ভেবেছিলুম, আর না মেনে থাকবার জো রইল না।

কাঞ্চী। ভয়ে মানুষের বুদ্ধি নষ্ট হয়, তখন মানুষ যা-তা মেনে বসে। সেদিন যা ঘটেছিল সেটা অকস্মাৎ ঘটেছিল। (রাজা : পৃ-৯৫)।

এই সব মানুষেরা ঈশ্বরে বিশ্বাস করুক আর নাই করুক নিজেদের অধ্যবসায় এবং বুদ্ধির দ্বারা মানুষের জীবনের অনেক প্রয়োজনীয় সামগ্রী সৃষ্টি করে সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। রবীন্দ্রনাথ তাঁহার প্রাচীন সাহিত্য গ্রন্থে এই ধরণের মানুষের সম্বন্ধে বলিয়াছেন, "যে জাতি খণ্ড সত্যকে প্রাধান্য দেন, যাঁহারা বাস্তব সত্যের অনুসরণে ক্লান্তিবোধ করেন না, ...তাঁহারা জগতে অনেক কাজ করিতেছেন ; তাঁহারা বিশেষভাবে ধন্য হইয়াছেন ; মানবজাতি তাঁহাদের কাছে ঋণী" (রামায়ণ : পৃ-১২)। সুতরাং কাঞ্চী-রাজের নিকটও জগতের ঋণ আছে। কাঞ্চীর বৃথা দম্ভ নাই, যুক্তি বুদ্ধি এবং শক্তির উপর তাহার একান্ত বিশ্বাস। সাহসে ভর করিয়াই সে কাজে নামে : রহস্যময় অদৃশ্য রাজার সহিত যুদ্ধক্ষেত্রে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতেও তাহার ভয় নাই, "আচ্ছা আমিও যাচ্ছি, রাজদূত—কিন্তু সভায় নয়, রণক্ষেত্রে" (রাজা : পৃ-১১৩)। ইহারা অদৃষ্টে বিশ্বাসী হয় না, পুরুষকারের জীবন্ত মূর্তি কাঞ্চীরাজ, "অদৃষ্ট যখন দৃষ্ট হবেন তখন তাঁর সঙ্গে বোঝাপড়া করা যাবে" (তদেব : পৃ-১১০)। ভয়কে প্রথমেই ইহারা জয় করিয়া লয়, সেইজন্যই মুক্তির পথে অনেকটা দূর আগাইয়া থাকে, শেষ পুরস্কার লাভে বিশেষ বিলম্ব হয় না। তাই নাগরিকদের মুখে শুনি—

দ্বিতীয়। আমি শুনেছি সকল রাজারই দণ্ড হয়েছে কেবল কাঞ্চীর রাজাকে বিচারকর্তা নিজের সিংহাসনের দক্ষিণপার্শ্বে বসিয়ে স্বহস্তে তার মাথায় রাজমুকুট পরিয়ে দিয়েছে" (তদেব : পৃ-১১৯)। নাগরিকেরা এই বিচারের তাৎপর্য খুঁজিয়া পায় নাই : ঈশ্বরের বিচার বুঝিয়া ওঠাও যায় না, এবং বুঝিনা বলিয়াই বিচার কর্তাকে পর্যন্ত অস্বীকার করিয়া বসি। কাঞ্চীর নিষ্ঠাই তাহাকে মুক্তি দিয়াছে—এইখানেই তাহার সহিত অন্য রাজাদের পার্থক্য। প্রথম নাগরিকের কথায় রবীন্দ্রনাথ তাহা একরকম স্পষ্ট করিয়াই দিয়াছেন—

প্রথম। ...অপরাধ যা-কিছু করেছে সে তো ওই কাঞ্চীর রাজা। এরা তো একবার লোভে একবার ভয়ে কেবল এগোচ্ছিল আর পিছোচ্ছিল। (পৃ-১১৯)

অন্য রাজারা নিষ্ঠাহীন সুতরাং তাহাদের মুক্তি হইতে বিলম্ব আছে।

যাহারা শক্তির পূজারী তাহাদের লজ্জাটা দূব হইতেই কিছু বিলম্ব হয়। কাঞ্চী রাজেরও তাহাই হইয়াছিল। পথে বাহির হওয়া 'সত্ত্বেও লজ্জা একেবারে দূর করিতে পারিতেছিল না—

কাঞ্চী। ...যখন কিছুতেই তাকে রাজা বলে মানতেই চাইনি তখন কোথা থেকে কালবৈশাখীর মতো এসে এক মুহূর্তে আমার ধ্বজা পতাকা ভেঙে উড়িয়ে ছারখার করে দিলে, আর আজ তার কাছে হার মানবার জন্যে পথে পথে ঘুরে বেড়াচ্ছি তার আর দেখাই নেই।

ঠাকুরদা। তা হোক সে যত বড়ো রাজাই হোক হার-মানার কাছে তাকে হার মানতেই হবে। কিন্তু রাজন্, রাত্রে বেরিয়েছ যে।

কাঞ্চী। ওই লজ্জাটুকু এখনও ছাডতে পারিনি। কাঞ্চীর রাজা থালায় মুকুট সাজিয়ে তোমার রাজার মন্দির খুঁজে বেড়াচ্ছে এই যদি দিনের আলোয় লোকে দেখে তাহলে যে তারা হাসবে (পৃ-১২১-১২২)।

এই লজ্জাটুকু দূর হইলেই রাজার মন্দির খুঁজিয়া পাইতে আর বিলম্ব হইবে না। কারণ, 'হার-মানার কাছে তাকে হার মানতেই' হয়। সুতরাং যে সুন্দর হৃদয় দুয়ারে অপেক্ষা করিয়া আছে, তাহাকে বিড়ম্বিত না করিয়া নিজেকে উন্মুক্ত করিতে পারিলেই জীবন সার্থক হইবে—

আজি খুলিয়ো হৃদয়-দল খুলিয়ো,
আজি ভুলিয়ো আপন পর ভুলিয়ো, (তদেব : পৃ-১২৩)।

বসন্ত উৎসবের নানা পথের খেলায় কাঞ্চী যে-পথটি বাছিয়া লইয়াছে তাহাও রাঙাইয়া উঠিতে আর বিলম্ব নাই—"সে আর দেরী হবে না ভাই। যেখানে নেবে এসেছ এখানে যত তোমার মিথ্যে মান সব ঘুচে গেছে—এখন দেখতে দেখতে রং ফিরে যাবে" (পৃ-১৩০)।

সুদর্শনার পথ দুর্গম, তাই স্বভাবতই এই পথে কাঁটাও অধিক। রাজা তাহাকে সুরঙ্গমার ন্যায় নষ্ট হইবার পথে বাধা সৃষ্টি করিয়া কাড়িয়া

লইয়া আসেন নাই। তাহাকে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা দিয়া বীণা বাজাইয়া কেবল আকর্ষণ করিয়াছেন। যাহার মধুর রসের সাধনা, যে একেবারে বক্ষলগ্ন হইতে চায়, তাহার প্রেম জোর করিয়া আকর্ষণ করিলে কিছুমাত্র তৃপ্তি থাকে না। নিজের ইচ্ছায় সে যদি ধরা না দিল তবে আর প্রেম কী! তাই সুদর্শনা যখন সুবর্ণের রূপের টানে বাঁধা পড়িল তখনও রাজা তাহাকে বাধা দিলেন না। সুরঙ্গমার নষ্ট হইবার পথে বাধা সৃষ্টি করিলেও তিনি সুদর্শনার নষ্ট হইবার পথকে উন্মুক্ত করিয়াই রাখিলেন। অন্ধকার ঘরের সাধনা সমাপ্ত না করিয়া, নিজের হৃদয়কে পরিপূর্ণরূপে প্রস্তুত না করিয়া রূপের জগতে অরূপের সন্ধান করা সম্ভব নয়। ভাব দৃষ্টি না থাকিলে রূপের মধ্যে অরূপকে দেখা অসম্ভব। রূপজগৎ সীমার জগৎ, অন্তর্দৃষ্টি জাগ্রত না করিয়া ইহার দিকে দৃষ্টি দিলে সীমার ঊর্ধ্বে উঠিবার কোন উপায় থাকে না। সুদর্শনা তাহা না করিয়াই ভ্রান্তিতে পতিত হইয়াছিল : যিনি বিচিত্ররূপে রহিয়াছেন তাঁহাকে একটি রূপের মধ্যে দেখিতে ইচ্ছা করা ভ্রান্তি ব্যতীত আর কিছুই নহে। তাই রাজা তাহাকে সাবধান করিয়া দিয়াছিলেন, "আলোয় তুমি হাজার হাজার জিনিসের সঙ্গে মিশিয়ে আমাকে দেখতে চাও? এই গভীর অন্ধকারে আমি তোমার একমাত্র হয়ে থাকি না কেন" (পৃ-১৩)। কিন্তু হৃদয়ের সাধনাকে স্বীকার না করিয়া সুদর্শনা তাহাকে বাহিরেই দেখিতে চাহিল—"এখানে নয়, এখানে নয়। যেখানে আমি গাছপালা পশুপাখি মাটিপাথর সমস্ত দেখছি সেইখানেই তোমাকে দেখব" (পৃ-১৬)। বাহিরের জগতেও তিনিই আছেন : চেষ্টার দ্বারা তাঁহাকে এইখানেও দেখা সম্ভব। কিন্তু সেই সাধনা দুরূহ। তাই সুদর্শনার দুঃখ আরম্ভ হইল।

রাজাকে পাইবার একান্ত আগ্রহ প্রথম হইতেই সুদর্শনাব মনে ছিল—একান্ত করিয়া সে তাঁহাকেই চাহিয়াছিল, রাজাকে না দেখিলেও সুরঙ্গমার মুখে তাঁহার কথা শুনিতে তাহার খুবই ভাল লাগিত, "তোর সব কথা বুঝতে পারিনে তবু শুনতে বেশ ভালো লাগে। কিন্তু যাই বলিস তাঁকে দেখবই" (পৃ-৯)। কিন্তু হৃদয়ের দরজা খুলিয়া সে রাজাকে ভিতরে আহ্বান করিয়া লইতে পারিল না। বাহিরের জগৎকেই বাছিয়া লইল। সেখানেই রাজা তাঁহাকে দেখা দিলেন। কিন্তু প্রাসাদের শিখর হইতে, অহংবোধের মঞ্চে দাঁড়াইয়া বস্তু বিশ্বের মধ্যে সেই অসীম অনন্ত সত্তাকে

জানা যায় না। তাঁহাকে জানিতে হইলে পথে বাহির হইয়া পড়িতে হইবে। সুদর্শনা প্রাসাদ শিখর হইতে চাহিয়া দেখিয়া প্রতারিত হইল, "ভুল তোরা করতে পারিস কিন্তু আমার ভুল হাতে পারে না। আমি হলুম রানী। ওই তো আমার রাজাই বটে" (পৃ-৫৪): ভুল হইবে না নিশ্চয় করিয়া বলা সত্ত্বেও ভুল হয়। অহংকারের আড়ম্বরের চুড়ায় ভুল তো হইবেই! সুবর্ণকে দেখিয়া সে রাজা বলিয়া মনে করিল। '

ভুল হইলেও সুবর্ণকে রাজা বলিয়া মনে হইবার পর হইতেই সুদর্শনার মনের জাগরণ আরম্ভ হইল—"আমার মনে হচ্ছে যা পাবার জিনিস তাকে হাতে পাবার জো নেই—তাকে হাতে পাবার দরকার নেই" (পৃ-৫৮) অথবা, "এইমাত্র হঠাৎ বুঝতে পেরেছি, যা সকলের চেয়ে বড়ো পাওয়া তা ছুঁয়ে পাওয়া নয়, তেমনি যা সকলের চেয়ে বড়ো দেওয়া তা হাতে করে দেওয়া নয়" (পৃ-৫৯)। স্পষ্টই দেখা যাইতেছে যে রূপের জগৎ হইতে অরূপের জগতে প্রয়াণের জন্য সুদর্শনার মনে দোলা লাগিয়াছে। কিন্তু রূপের জগতের আকর্ষণ অত্যন্ত বেশী। তাই সুবর্ণ রাজা নয় জানিয়া অগ্নিতে আত্মবিসর্জন দিবার আকাঙ্ক্ষা তীব্র হইয়া উঠিবার পরও সে সুবর্ণকে ভুলিতে পারিল না। ভুলিতে পারিল না সত্য কিন্তু তাহার "অন্তঃপুরের চারিদিকে আগুন" (পৃ-৭৬) ধরিযা গিয়াছিল। এই আগুনে অহং পুড়িযা ছাই হইয়া যাইবে। এখানে 'অরূপরতন' অপেক্ষা 'রাজা'য় দ্বন্দ্ব বেশী। 'রাজা'য অগ্নি শুদ্ধির পরেও রূপের আকাঙ্ক্ষা একেবারে লুপ্ত হয় নাই: প্রচণ্ড অন্তর্দ্বন্দ্ব আরম্ভ হইয়াছে বটে তথাপি রূপের আকর্ষণ অভিমানের পালে ভর দিয়া মাঝে মাঝে প্রচণ্ড হইয়া উঠিতেছে। 'অরূপ-রতন'-এ অগ্নিশুদ্ধির পর আর সে ভাব নাই—রূপের কামনা সেই আগুনেই পুড়িয়া মরিযাছে। তত্ত্বের দিক দিয়া ইহা অধিকতর সার্থক, মানবিকতার বিচারে 'রাজা'র সুদর্শনা 'অরূপরতন' অপেক্ষা অধিক সজীব। 'রাজা'য় অন্তর্দ্বন্দ্ব যে তীব্র হইয়া উঠিয়াছে তাহার পরিচয় রহিয়াছে সুদর্শনার কথায়, "হবে না, হবে না, শুধু তোমার ভালোবাসায় কী হবে। আমার ভালোবাসা যে মুখ ফিরিয়েছে। রূপের নেশা আমাকে লেগেছে—সে নেশা আমাকে ছাড়বে না, সে যেন আমার দুই চক্ষে আগুন লাগিয়ে দিয়েছে, আমার স্বপন সুদ্ধ ঝলমল করছে। এই আমি তোমাকে সব কথা বললুম এখন আমাকে শাস্তি দাও" (পৃ: ৭৯-৮০)। এই রূপের নেশা যে অন্যায় সে বোধ

তাহার হইয়াছে, সুতরাং সুদর্শনার আর চিন্তা নাই। শাস্তি তো তাহার আরম্ভই হইয়া গিয়াছে : বিবেকের দংশন ঈশ্বরের নিজের হাতে দেওয়া শাস্তি, অনুতাপের অনলে তাহার চিত্ত দগ্ধ হইতেছে "...আমি অশুচি, আমি অসতী, তোমার কাছে থাকলে এই ঘৃণা কেবলই আমাকে আঘাত করবে" (পৃ-৮১)। কিন্তু তাই বলিয়া দূরে যাইবারও উপায় নাই : দূরে যাইবার চেষ্টাতেই যে রাজার আরও নিকটে সরিয়া আসিতেছে। অতি কৌশলে রবীন্দ্রনাথ একটি মনের পূর্ণ জাগরণ দেখাইয়াছেন এবং সেই সঙ্গে নিজের তত্ত্বটিও প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। অনুতাপ সুদর্শনার মোহ ভাঙ্গিয়া দিয়াছে, তাহার অন্তর দৃষ্টি খুলিয়া দিয়া রূপের জগৎ হইতে তাহাকে মুক্তি দিয়াছে, সুবর্ণের প্রতি কি কারণে সে আকৃষ্ট হইয়াছিল আজ তাহা সে ভাবিয়া পায় না—"ওকেই আমি সেদিন দেখেছিলুম? না, না। সে আমি আলোতে অন্ধকারে বাতাসে গন্ধেতে মিলে আর একটা কী দেখেছিলুম, ও নয়, ও নয়" (পৃ-১০৫)। মানুষ অনুতাপের অনলে শুদ্ধ হইয়াই স্বর্গ লাভের উপযুক্ত হয় এই কথা রবীন্দ্রনাথ অন্যত্রও বলিয়াছেন। রাজা সোমক এবং তাঁহার পুরোহিত একই অপরাধ করিলেও সোমক কেন স্বর্গ গমনের অধিকারী হইলেন এবং ঋত্বিক কেনই বা নরকবাস করিবে সেই কথা বুঝাইয়া ধর্ম বলিলেন—

করিয়াছ প্রায়শ্চিত্ত তার
অন্তর-নরকানলে। সে পাপের ভার
ভস্ম হয়ে ক্ষয় হয়ে গেছে। যে ব্রাহ্মণ
বিনা চিত্তপরিতাপে পরপুত্রধন
স্নেহবন্ধ হতে ছিঁড়ি করেছে বিনাশ
শাস্ত্রজ্ঞান-অভিমানে, তারি হেথা বাস
সমুচিত। (কাহিনী : নরকবাস : পৃ-৭৬)

সেইজন্য সুদর্শনারও মুক্তির ব্যবস্থা হইয়া গেল। তাহার অহং গেল, ভয় গিয়াছে, লজ্জাও দূর হইল : এইবার তাহার সম্পূর্ণ মুক্তি। ঠাকুরদা যখন তাঁহাকে রানীর বেশ পরিয়া রাজভবনে যাইতে বলিলেন তখন সুদর্শনা একান্ত বিনয়ে বলিয়া উঠিল, "না না না। সে রানীর বেশ তিনি আমাকে চিরদিনের মতো ছাড়িয়েছেন—সবার সামনে আমাকে দাসীর বেশ পরিয়েছেন—বেঁচেছি বেঁচেছি—আমি আজ তাঁর দাসী—যে-কেউ তাঁর

আছে আমি আজ সকলের নিচে" (পৃ-১২৯)। মধুর রসের সাধনা করিতে গেলেও দাসী হইতে হয়। প্রেমের ক্ষেত্রে দাসীই রাজ্যেশ্বরী আবার রাজ্যেশ্বরীই দাসী। দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের জীবনের উপলব্ধির দিকে দৃষ্টি দিলে রবীন্দ্রনাথের সুদর্শনা তত্ত্বও বোধগম্য হইবে, "দেবেন্দ্রনাথের ধর্মজীবনের বিকাশের ক্রম এইরূপ :—প্রথম, ঈশ্বরের স্বরূপ জানা; তৎপরে, ঈশ্বরের আদেশের অধীন হওয়া; তৎপরে, ঈশ্বরের প্রেম অনুভব করা ও তাঁহার নিত্য সহবাস লাভ করা। দেবেন্দ্রনাথ প্রেমানুভূতিতে পৌঁছিলেন, ভাবচর্চার পথ দিয়া নয়, আজ্ঞাধীনতার পথ দিয়া" (মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের আত্মজীবনী : ২৮ পরিশিষ্ট : পৃ-৩৭৯)। সুদর্শনার প্রেমানুভূতিও হইয়াছিল এই পথেই। তাই শেষ পর্যায়ে অন্ধকার ঘরেই অর্থাৎ হৃদয়ের মধ্যেই তাহার মিলন হয় রাজার সঙ্গে। সুদর্শনা তখন পরিপূর্ণ, তৃপ্ত—

সুদর্শনা।···তুমি সুন্দর নও, প্রভু সুন্দর নও, তুমি অনুপম।

রাজা। তোমারই মধ্যে আমার উপমা আছে।

সুদর্শনা। যদি থাকে তো সেও অনুপম। আমার মধ্যে তোমার প্রেম আছে সেই প্রেমেই তোমার ছায়া পড়ে, সেইখানেই তুমি আপনার রূপ আপনি দেখতে পাও—সে আমার কিছুই নয়, সে তোমার। (রাজা : পৃ-১৩১)।

হৃদয়ের মধ্যে যথার্থ ভাবে তাঁহাকে চিনিয়া লইতে পারিলে বাহিরের সকল কিছুর মূলে, সকল কিছুর ঐক্য সূত্ররূপে তাঁহাকে চিনিয়া লইতে আর কোন বাধা থাকে না। তখন আর সুবর্ণরূপী সীমা অসীমকে আড়াল করিয়া ফেলিতে পারে না। তাই অন্ধকারের লীলা শেষের পরে বাহিরের জগতে আসিয়া দাঁড়াইবার আর কোন অসুবিধা থাকে না। সুদর্শনারও তাহাই হইল, রাজা বলিলেন, "আজ এই অন্ধকার ঘরের দ্বার একেবারে খুলে দিলুম—এখনকার লীলা শেষ হল। এসো, এবার আমার সঙ্গে এসো, বাইরে চলে এসো—আলোয়" (রাজা : পৃ-১৩২)।

যে আত্মা মুক্তি পাইয়াছে আলোর জগৎ তাহাকে লোভের পথে লইয়া যাইতে পারে না : সে তখন সেই আলোর জগতেও রূপহীন অনন্ত সত্তাকে উপলব্ধি করে।

অচলায়তন : গুরু

(১৩১৮ : ১৯১২)

রবীন্দ্রনাথ শিলাইদহে বাস করিবার সময়, ১৫ই আষাঢ, ১৩১৮ সালে অচলায়তন নাটকটি সমাপ্ত করেন। তিন মাস পরে ইহা প্রবাসীতে প্রকাশিত হয়। অভিনয়ের উপযোগী অচলায়তনের সংক্ষিপ্ত রূপ গুরু, রচনা কাল ১৯১৮ খ্রীঃ। "এই নাটকটি অচলায়তনের 'কিঞ্চিৎ রূপান্তরিত এবং লঘুতর' আকার। এই রূপান্তরে রবীন্দ্রনাথ অচলায়তনের অনেক অংশ বর্জন করেন এবং কয়েকটি নূতন অংশ যোগ করেন" (রবীন্দ্র রচনাবলী : ১৩শ খণ্ড : গ্রন্থপরিচয় : পৃ-৫৩৭)।

'অচলাযতন'-এ ছয়টি দৃশ্য আছে : অচলায়তনের গৃহ, পাহাড়-মঠ, অচলায়তন, দর্ভক পল্লী, অচলায়তন, এবং দর্ভক পল্লী। দৃশ্যপটের ব্যবহার রবীন্দ্রনাথ বিশেষ করিতে চাহিতেন না। কিন্তু এই নাটকে তাহা সম্পূর্ণ এড়াইযা যাইবার উপায় ছিল না। অচলায়তনে বাহির হইতে বাতাস আনিবার প্রয়োজন আছে, সুতরাং অচলায়তনের ভিতরটাও দেখাইতে হইবে এবং তাহার বাহিরটাও চাই। এই নাটকে 'তিন'-এর সমাবেশ হইয়াছে, এই 'তিন'কে তিনটি বিভিন্ন স্থানে স্থাপন না করিয়া উপায নাই। গুরুতে দৃশ্য চারিটি মাত্র : অচলায়তন, পাহাড়-মঠ, দর্ভকপল্লী এবং অচলায়তন—অর্থাৎ অচলায়তন-এর তৃতীয় দৃশ্যটি প্রথমের সহিত এবং ষষ্ঠ দৃশ্যটি চতুর্থের সহিত মিশিয়া গিযাছে। অভিনযের দিক দিয়াই কেবল যে ইহাতে সুবিধা সৃষ্টি করা হইয়াছে তাহাই নহে তত্ত্বের দিক দিয়াও সার্থকতর করা হইয়াছে। অচলায়তন তো গুঁড়াইয়া দেওয়া হইয়াছে কিন্তু নূতন সৌধ গড়িবার ভার গুরু দিয়া গেলেন স্থবিবক এবং শোণপাংশুদের (যূণক) উপর। সুতরাং শেষ দৃশ্যে অচলায়তনের অধিবাসীদের মানসিক অবস্থাটা একবার দেখা প্রয়োজন। যেখানে ভিত করিয়া নূতন সৌধ নির্মাণ করিতে হইবে সেই স্থানটিতেই তো সমাপ্তির পূর্বে গুরুকে দেখা চাই। 'গুরু'র শেষ গানটিও খুবই তাৎপর্য পূর্ণ, কিন্তু স্বীকার করিতেই হইবে যে এই গানটি যূণক ও দর্ভকদের মুখে দেওয়ায় এই নাটকের তত্ত্বকে জটিল করিয়া ফেলা হইয়াছে। পঞ্চকের মুখেই এই গানটি শোভা পায়। শেষ

দৃশ্যে পঞ্চকের প্রবেশেরও কোন উল্লেখ নাই অথচ সে শেষ কথাটি বলিয়াছে। যোদ্ধবেশে দাদাঠাকুর যখন প্রবেশ করিলেন সেই সঙ্গে পঞ্চকের প্রবেশ ঘোষিত হইলে তত্ত্ব যথাযোগ্য হইত। সমবেত সঙ্গীত শুনাইবার জন্যই হয়তো রবীন্দ্রনাথ শেষ গানটি যূণক এবং দর্ভকদের মুখে বসাইয়াছেন। পঞ্চক এবং বালকদের দ্বারা এই সঙ্গীতটি করানই সঙ্গত ছিল। তত্ত্ব 'আলোচনা কালে ইহা দেখা যাইবে।

এই নাটকের দ্বন্দ্বটিও প্রথমেই সূত্রাকারে দেওয়া হইয়াছে। দুইটি ভ্রাতার মানস গড়নের মধ্যেই দ্বন্দ্বের বীজটি রহিয়াছে। দুই সহোদর হলেও দুইজনে সম্পূর্ণ বিপরীতমুখী—

মহাপঞ্চক। গান! আবার গান!

পঞ্চক। দাদা, তুমি তো দেখলে—তোমাদের এখানকার মন্ত্রতন্ত্র আচার-আচমন সূত্র-বৃত্তি কিছুই পারলুম না।

মহাপঞ্চক। সে তো দেখতে বাকি নেই—কিন্তু সেটা কি খুব আনন্দ করবার বিষয়? তাই নিয়ে কি গলা ছেড়ে গান গাইতে হবে?

পঞ্চক। একমাত্র ওইটেই যে পারি।

মহাপঞ্চক। পারি। ভারি অহংকার। গান তো পাখিও গাইতে পারে। সেই-যে বজ্রবিদারণ মন্ত্রটা আজ সাত দিন ধরে তোমার মুখস্থ হল না, আজ তার কী করলে।

পঞ্চক। সাতদিন যেমন হয়েছে অষ্টম দিনেও অনেকটা সেইরকম। বরঞ্চ একটু খারাপ।

মহাপঞ্চক। খারাপ! তার মানে কী হল?

পঞ্চক। জিনিসটা যতই পুরোনো হচ্ছে মন ততই লাগছে না, ভুল ততই করছি—ভুল যতই বেশিবার করছি ততই সেইটেই পাকা হয়ে যাচ্ছে। তাই, গোড়ায় তোমরা যেটা বলে দিয়েছিলে আর আজ আমি যেটা আওড়াচ্ছি দুটোর মধ্যে অনেকটা তফাৎ হয়ে গেছে। চেনা শক্ত।

মহাপঞ্চক। সেই তফাতটা ঘোচাতে হবে নির্বোধ।

পঞ্চক। সহজেই ঘোচে, যদি তোমাদেরটাকেই আমার মতো করে নাও! নইলে, আমি তো পারব না।

(অচলায়তন: পৃ-৯-১০)

নাটকের সংঘাত এইখানেই : হৃদয়কে পাখির ন্যায় আনন্দ উদ্বেল করিয়া রাখিতে হইবে, না, যন্ত্রের ন্যায় মন্ত্র অভ্যাস করিয়া বাহিরের পৃথিবীকে ভুলিয়া থাকিতে হইবে। পুরাতনের স্থলে নূতনকে সৃষ্টি করা চাই, না, পুরাতনকে ধরিয়া রাখাতেই জীবনের সার্থকতা। নাটকের তত্ত্বও ইহারই মধ্যে নিহিত। পঞ্চক এবং মহাপঞ্চকের ভাব-সংঘাতেই নাটকের দ্বন্দ্ব এবং তাহাতেই নাটকের তত্ত্ব। গুরু আসিয়া সমস্যার সমাধান করিয়া যাইবেন মাত্র। বার বার সমস্যার সমাধানের জন্য গুরুর আগমন হয়।

এই নাটকটিতে রবীন্দ্রনাথ মন্ত্রকে আক্রমণ করিয়াছেন এইরূপ অভিযোগ উঠিয়াছিল।[১] অভিযোগটিকে স্বীকার করা চলে না। রবীন্দ্রনাথ নিজেই এই সমালোচনার উত্তরে বলিয়াছেন, "অচলায়তনে মন্ত্রমাত্রের প্রতি তীব্র শ্লেষ প্রকাশ করা হইয়াছে একথা কখনোই সত্য হইতে পারে না --যেহেতু মন্ত্রের সার্থকতা সম্বন্ধে আমার মনে কোনো সন্দেহ নাই। কিন্তু মন্ত্রের যথার্থ উদ্দেশ্য, মননে সাহায্য করা। ধ্যানের বিষয়ের প্রতি মনকে অভিনিবিষ্ট করিবার উপায় মন্ত্র। আমাদের দেশে উপাসনার এই-যে আশ্চর্য পন্থা সৃষ্ট হইয়াছে ইহা ভারতবর্ষের বিশেষ মাহাত্ম্যের পরিচয়"। (অচলায়তন : গ্রন্থ-পরিচয় : পৃ-১১২)।

রবীন্দ্রনাথের নিজের বক্তব্য ব্যতীতও তাঁহার আচরণের সাক্ষ্যও আছে। ১৩১৫ সালে তাঁহার ইচ্ছায় বর্ষাকালে শান্তিনিকেতনে বর্ষা উৎসব সম্পন্ন হয়। ক্ষিতিমোহন সেন ও বিধুশেখর শাস্ত্রী বেদাদি গ্রন্থ হইতে বর্ষার উপযোগী শ্লোক ও স্তোত্র সংগ্রহ করিয়া ছাত্রদের দ্বারা আবৃত্তির ব্যবস্থা করেন। উৎসব ক্ষেত্রে পর্জন্য দেবতার বেদী বৈদিক রীতিতে রচিত হইয়াছিল। এই সময় হইতেই আশ্রমের উৎসবাদির মধ্যে বৈদিক মন্ত্রাদি প্রচলনের সূত্রপাত হয়।[২] এই সময় রবীন্দ্রনাথ 'মন্ত্রের বাঁধন'-এ বলেন, "মন্ত্র জিনিসটি একটি বাঁধবার উপায়। মন্ত্রকে অবলম্বন করে আমরা মননের বিষয়কে মনের সঙ্গে বেঁধে রাখি" (মন্ত্রের বাঁধন, ২৭শে চৈত্র, ১৩১৫ : রবীন্দ্র রচনাবলী ১৪শ খণ্ড : পৃ : ৪২৩-৪২৪)। রবীন্দ্রনাথ নিজে প্রতিদিন উপাসনা করিতেন এবং বিশেষ মন্ত্রধ্যান করিতেন।[৩]

১। ললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের সমালোচনা : আর্যাবর্ত মাসিক পত্রিকা, কার্তিক ১৩১৮।

২। প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় : রবীন্দ্রজীবনী : ২য় খণ্ড : পৃ-১৭৮।

৩। তদেব : পৃ-১৭৭।

সুতরাং মন্ত্রের বিরুদ্ধে রবীন্দ্রনাথের আক্রমণ কল্পনা করা সত্য নহে। মন্ত্র যখন মননে সাহায্য করে না, যখন তাহা স্বার্থরক্ষার উপায় স্বরূপ হইয়া উঠিয়া জীবনকে বিশুষ্ক করিয়া তোলে তখন মানবতার জন্যই তাহাকে আঘাত দেওয়া প্রয়োজন। ললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের সমালোচনার উত্তরে রবীন্দ্রনাথ সেই কথাটি স্মরণ করাইয়া দিয়াছেন, "সেই মন্ত্রকে মনন-ব্যাপার হইতে যখন বাহিরে বিক্ষিপ্ত করা হয়, মন্ত্র যখন তাহার উদ্দেশ্যকে অভিভূত করিয়া নিজেই চরম পদ অধিকার করিতে চায়, তখন তাহার মতো মননের বাধা আর কী হইতে পারে? কতকগুলি বিশেষ শব্দসমষ্টির মধ্যে কোনো অলৌকিক শক্তি আছে এই বিশ্বাস যখন মানুষের মনকে পাইয়া বসে তখন সে আর সেই শব্দের উপরে উঠিতে চায় না, তখন মনন ঘুচিয়া গিয়া সে উচ্চারণের ফাঁদেই জড়াইয়া পড়ে; তখন, চিত্তকে যাহা মুক্ত করিবে বলিয়াই রচিত তাহাই চিত্তকে বদ্ধ করে। এবং ক্রমে দাঁড়ায় এই, মন্ত্র পড়িয়া দীর্ঘজীবন লাভ করা, মন্ত্র পড়িয়া শত্রু জয় করা ইত্যাদি নানাপ্রকার নিরর্থক দুশ্চেষ্টায় মানুষের মূঢ় মন প্রলুব্ধ হইয়া ঘুরিতে থাকে। ...যাগযজ্ঞ মন্ত্রতন্ত্র যখনই অত্যন্ত প্রবল হইয়া মানুষের মনকে চারি দিকে বেষ্টন করিয়া ধরে তখনই তো মানবের গুরু মানবের হৃদয়ের দাবি মিটাইবার জন্য দেখা দেন" (অচলায়তন : গ্রন্থ-পরিচয় : পৃ-১১২-১১৩)।

'অচলায়তন' নাটকে যে মন্ত্রের কথা রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন তাহা মননে সাহায্য করে না, তাহা ক্ষুদ্র উদ্দেশ্যে আবদ্ধ। এখানে মন্ত্রের অলৌকিক শক্তিতে সকলের বিশ্বাস উৎপাদনের চেষ্টা করা হয়, "ওঁ তট তট তোতয় তোতয়" মন্ত্র "প্রত্যহ সূর্যোদয়-সূর্যাস্তে উনসত্তর বার করে জপ করলে নব্বই বৎসর পরমায়ু হয়।" (পৃ-১০)। দীপকেতন পূজায় ডুমুরতলা হইতে মাটি লইয়া পঞ্চগব্য মাখিয়া বিরোচন মন্ত্র পড়িতে হইবে। তাহার পর সেই মাটি দিয়া ছোট ছোট মন্দির গড়িয়া তাহার উপর ধ্বজা বসাইতে হয়। এইরূপ হাজারটা গড়িয়া সূর্যাস্তের পর জলগ্রহণ করিলে তবে প্রেতলোকে পিতামহদের ঘর তৈয়ারী হয়। এই প্রকার ক্ষুদ্র উদ্দেশ্যমূলক মন্ত্রকেই রবীন্দ্রনাথ কটাক্ষ করিয়াছেন। তাঁহার এই বক্তব্যটুকু উপলব্ধি করিতে পারিলে 'অচলায়তন'-এর তত্ত্ব আর দুর্বোধ্য থাকে না।

গুরু বহু বৎসর দেখা দেন নাই। আচার্যকে আয়তনে বসাইয়া তিনি সেই যে গিয়াছেন তাহার পর বৎসরের পর বৎসর কাটিয়া গেলেও ফিরিয়া আসেন

নাই। আচার্যের মুখেই শুনি, "আজ আমার একটু একটু মনে পড়ছে বহুপূর্বে সর-প্রথমে সেই ভোরের বেলা অন্ধকার থাকতে থাকতে যাঁর কাছে শিক্ষা আরম্ভ করেছিলুম তিনি গুরুই" (পৃ-৩০)। অন্যত্র গুরুকে অনুযোগ করিয়া তিনি বলিয়াছেন, "আমাদের আয়তনের পাশেই এই দর্ভকপাড়ায় তুমি আনাগোনা করছ, আর কত বৎসর হয়ে গেল আমাদের আর দেখা দিলে না" (পৃ-৯৯)। তিনি নিকটে থাকিয়াও সম্মুখে আসেন নাই। পরম সুন্দরের আগমন পরম মুহূর্তেই হয়। মন ব্যাকুল না হইলে তিনি ধরা দেন না। ভিতরে আকুলতা দেখা দিলেই বাহিরের আকর্ষণ অনুভব করা যায়। মানুষের দিক হইতেও চেষ্টা চাই, আগ্রহ চাই। অভ্যাসের চক্রে ঘুরিতে ঘুরিতে, মন্ত্র ও প্রায়শ্চিত্তের চাপে 'কুশলশীল'দের 'জল জল' করিয়া মৃত্যু বরণ করিতে দেখিযা আচার্যের মনে সংশয় জাগিয়াছে। আজ তিনি স্পষ্ট করিয়া বুঝিয়াছেন যে সবার উপরে মানুষই সত্য, পঞ্চককে সেই জন্যই তিনি বলিলেন, "তোমাকে যখন দেখি আমি মুক্তিকে যেন চোখে দেখতে পাই। এত চাপেও যখন দেখলুম তোমার মধ্যে প্রাণ কিছুতেই মরতে চায় না তখনই আমি বুঝতে পারলুম মানুষের মন মন্ত্রের চেয়ে সত্য, হাজার বছরের অতিপ্রাচীন আচারের চেয়ে সত্য" (পৃ-৩২)। নিজেকে বিপথগামী বলিযা তিনি বুঝিয়াছেন। নানা মন্ত্রতন্ত্রের জোরে জাগতিক নানা ঐশ্বর্যলাভ এমন কি ঈশ্বরকেও অধিকার করিবার চেষ্টা করার ফলেই বিভ্রান্তি সৃষ্টি হইয়াছে। ঈশ্বরকে অধিকার করিবার জন্য আমাদের প্রার্থনা নয়—

"Our daily worship of God is not really the process of gradual acquisition of him, but the daily process of surrendering ourselves, removing all obstacles to union and extending our consciousness of him in devotion and service, in goodness and in love." (Sādhanā : p-149)

তাই বহুদিনের সাধনায় মনে শান্তি না পাইয়া সত্য পথ আবিষ্কারের জন্য আচার্য আজ আকুল। সত্যকে জানিবার আগ্রহ তীব্র হইয়া উঠিলে সত্যবোধে বিলম্ব হয় না। এই বিশেষ মুহূর্তেই গুরুর আবির্ভাব হয়—আচার্য অদীনপুণ্য সেইজন্যই গুরুর পত্র পাইয়াছেন। নিয়মের কঠোর শাসনের শুষ্কতা হইতে মুক্তি পাইবার আকাঙ্ক্ষাই গুরুর আগমন ঘটাইয়াছে : গুরুর আগমনের ফলে নবজীবনের সঞ্চার হইবে, অন্তর জাগ্রত হইবে সরসতায়।

এই গুরু কে? তিনি অনন্ত, অসীম—তিনি রুদ্র, পরমসুন্দর। নিজেই নিজের প্রতিভূ হইয়া তিনি বার বার পৃথিবীতে আসেন। যখনই পৃথিবী অন্যায়ে, অত্যাচারে, শুষ্কতায় ভরিয়া উঠিয়াছে তখনই তিনি তাহাকে নূতন রূপে সজ্জিত করিতে আসিয়াছেন—

যদা যদা হি ধর্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত।

অভ্যুত্থানমধর্মস্য তদাত্মানাং সৃজাম্যহম্॥ (গীতাঃ অঃ ৪ঃ৭ম শ্লোক)

মানুষের সমাজ জীবনে এক আশ্চর্য ব্যাপার লক্ষ্য করা যায়। নানা আঘাতে সে পরিবর্তনকে স্বীকার করিয়া লইয়া নিজের কাঠামোটি রূপান্তরিত করে, সে বোঝে যে গতিকে অস্বীকার করিবার উপায় নাই; কিন্তু তাহা সত্ত্বেও আচরণের দ্বারা তাহার পরিচয় দেয় না। রূপান্তর লাভ করিয়াই সমাজ আর একটি আবরণের মধ্যে আত্মগোপন করিবার চেষ্টা করে। নূতন করিয়া আঘাতের প্রয়োজন হয় সেই আবরণ চূর্ণ করিয়া পুনরায় নূতন রূপ দিবার জন্য। গতিহীনতার ফলে বাব বার সমাজে আবর্জনা জমা হইতেছে, "ধর্ম-সম্প্রদায়েও যেমন সমাজেও তেমনি, কোনো এক পূর্বতনকালে যে-সমস্ত মত ও প্রথা প্রচলিত ছিল সেগুলি পরবর্তীকালেও আপন অধিকার ছাডতে চায় না। পতঙ্গমহলে দেখা যায়, কোনো কোনো নিরীহ পতঙ্গ ভীষণ পতঙ্গের ছদ্মবেশে নিজেকে বাঁচায়। সমাজরীতিও তেমনি। তা নিত্যধর্মের ছদ্মবেশে আপনাকে প্রবল ও স্থায়ী করতে চেষ্টা করে। একদিকে তার পবিত্রতার বাহ্যাড়ম্বর, অন্য দিকে পারত্রিক দুর্গতির বিভীষিকা, সেই সঙ্গে সম্মিলিত শাসনের নানাবিধ কঠোর, এমন কি অন্যায় প্রণালী—ঘরগড়া নরকের তর্জনী সংকেতে নিরর্থক অন্ধ আচারের প্রবর্তন" (মানুষের ধর্ম : পৃ-৪৯-৫০)।

আধ্যাত্মিক আদর্শকে দৃঢ় করিয়া রাখিবার জন্য যে প্রাচীর সে একদিন গড়ে তাহাই পরবর্তী কালে ইহার বৃদ্ধি ও প্রয়োগের বাধা স্বরূপ হইয়া ওঠে। তখন তাহাকে ভাঙ্গিয়া না ফেলিলে সকল দিক দিয়াই জীর্ণ হইয়া পড়িতে হয়। এই বিশেষ মুহূর্তে গুরুর আগমনের প্রয়োজন হয়। তিনি কাহাকেও তুচ্ছ করেন না—মানুষ মাত্রই যে মহান। তাই গুরু অচলায়তনিক (স্থবিরক)-দের গুরু, শোণপাংশু (যুণক)-দের দাদাঠাকুর এবং দর্ভকদের গোঁসাই। নানা রূপে সেই একই সকলের নিকট আসিয়া থাকেন। এই গুরুর স্বরূপটি বুঝিতে না পারার ফলেই বিভ্রান্তি ঘটে। অভ্যাস মত "অমরা যখন গুরুকে মানি তখন গুরুকেই মানি সত্যকে না,—

সত্যকে তখনই যথার্থ মানি যখন আত্মার কাছে তাকে পাই" (চিঠিপত্র : ৭ম খণ্ড : পৃ : ১২৭-১২৮)। ভারতবর্ষে সেই গুরুর আবির্ভাব বহুবার ঘটিয়াছে।

আত্মার বাণীর সহিত গুরুর আদর্শের সুর মিলাইয়া লইতে হয়, অন্তরকে যাহা সরস করিতে পারে তাহাই গ্রহণীয়। তাহার জন্যও বিধিবিধানের নিশ্চয়ই প্রয়োজন আছে। নদীকে স্বচ্ছন্দে সমুদ্রের দিকে প্রবাহিত হইতে দিবার জন্যই নদীর পাড়ের প্রয়োজন। ইহা তাহার বন্ধন নহে। সেইরূপ বিধি বিধান মাত্রই বন্ধন নহে। সেই জন্যই রবীন্দ্রনাথ মন্ত্রকে স্বীকার করিয়াছেন। সেই জন্যই গুরু নিজে যুবক অদীনপুণ্যকে আয়তনের আচার্য করিয়া দিয়া গিয়াছিলেন। আয়তনকে তিনি তুচ্ছ করিয়া দিয়া যান নাই। পথের দীক্ষা দিয়া তিনি অদীনপুণ্যের উপরই বহু মানুষের ভার দিয়া গিয়াছিলেন। সত্ত্বগুণে তাঁহাকে অধিষ্ঠিত করিয়া তবেই তিনি অন্যত্র যাত্রা করিয়াছিলেন। তিনি আমাদের নিয়ন্ত্রণও করেন আবার আমাদের স্বাধীনতাও দিয়াছেন। আচার্য নিয়ম নির্দিষ্ট পথে চলিলেন। সত্ত্বগুণে প্রতিষ্ঠিত যাঁহারা তাঁহারা জ্ঞানমার্গে চলেন। জ্ঞানের দ্বারা সত্যদৃষ্টি লাভ করিয়া কর্মের জগতে যদি তাঁহারা আসেন তবে তাঁহাদের মুক্তি অবশ্যম্ভাবী। কিন্তু জ্ঞানের পথকেই একমাত্র সত্য মনে করিয়া যদি তাঁহারা কর্মত্যাগ করেন তবে তাঁহাদের ভ্রান্তি হইবেই, "মানুষের মধ্যে এই যে জীবনের আনন্দ, এই যে কর্মের আনন্দ আছে, এ অত্যন্ত সত্য। এ কথা বলতে পারব না এ আমাদের মোহ, এ কথা বলতে পারব না যে একে ত্যাগ না করলে আমরা ধর্ম সাধনার পথে প্রবেশ করতে পারব না। ধর্মসাধনার সঙ্গে মানুষের কর্ম-জগতের বিচ্ছেদ ঘটানো কখনোই মঙ্গল নয়" (রবীন্দ্র রচনাবলী : ১৬শ খণ্ড : শান্তিনিকেতন : কর্মযোগ : পৃ-৩৪৭)।

কর্মজগতে না নামিলে পরিবর্তনশীল জগৎকে জানা যায় না সুতরাং সত্য উপলব্ধির জন্যই সত্ত্বগুণ সম্পন্ন ব্যক্তিরও কর্ম করিতে হইবে—

কর্মনৈব হি সংসিদ্ধিমাস্থিতা জনকাদয়ঃ।
লোকসংগ্রহমেবাপি সংপশ্যন্ কর্তুমর্হসি ॥

(গীতা : অধ্যায় ৩ : শ্লোক ২০)

"জনকাদি কর্মদ্বারাই পরম সিদ্ধি পাইয়াছিলেন। জগৎ হিতের জন্যও তোমার কর্ম করা দরকার" (গান্ধীজীর ভাষ্য)। কর্ম না করার অর্থই জড়তা প্রাপ্তি। যে প্রাণপূর্ণ নহে সে প্রাণের স্রষ্টাকে উপলব্ধি করিবে কিসের

জোরে? "যাহা স্বভাবতই প্রবহমান তাহাকে কোনো একটা জায়গায় রুদ্ধ করিবামাত্র তাহা যে মিথ্যা হইয়া উঠিতে থাকে সমাজে তাহার অনেক দৃষ্টান্ত আছে। তাই বলিতেছি, সত্যকে, সুন্দরকে, মঙ্গলকে, যে রূপ যে সৃষ্টি ব্যক্ত করিতে থাকে তাহা বদ্ধরূপ নহে. তাহা একরূপ নহে, তাহা প্রবহমান এবং তাহা বহু" (সঞ্চয়: রূপ ও অরূপ: পৃ-১৭-১৮)। কর্মের জগতে না নামিলে এই উপলব্ধি কখনও হইবে না।

গতি হারাইলে শাস্ত্রের বিধানকেই গুরু বলিয়া মনে হইবে। আচার্য অদীনপুণ্য সত্যকার গুরুর স্পর্শে আসিয়াছিলেন এবং সেই সময় নিশ্চয়ই অন্তরে সরসতাও অনুভব করিয়াছিলেন। তারপর কর্ম হইতে সরিয়া আসিয়া আয়তনের এবং নিজেরও বিপর্যয় ঘটাইযাছেন। কিন্তু গুরু আসিবেন এই পত্র পাইবামাত্র তিনি নিশ্চয়ই গুরুর সহিত অবস্থানের অতীত দিনগুলির সহিত মনে মনে বর্তমান নীরস জীবনযাত্রার তুলনা করিয়া লইয়াছেন এবং উপলব্ধি করিযাছেন যে সেই দিনের সরসতার রাজ্য হইতে আজ তিনি নির্বাসিত হইযাছেন। সেই জন্যই গুরুর পত্র পাইবার পর হইতেই তিনি অত্যন্ত বিচলিত হইয়া উঠিয়াছিলেন—

আচার্য।…অনেক দিন থেকে মনের মধ্যে বেদনা জেগে উঠছে, কাউকে বলতে পারছিনে'। আমি এই আয়তনের আচার্য; আমার মনকে যখন কোনো সংশয বিদ্ধ করতে থাকে তখন একলা চুপ করে বহন করতে হয়। এতদিন তাই বহন করে এসেছি। কিন্তু যেদিন পত্র পেয়েছি গুরু আসছেন সেই দিন থেকে মনকে আর যেন চুপ করিয়ে রাখতে পারছিনে। সে কেবলই আমাদের প্রতিদিনের সকল কাজেই বলে বলে উঠছে—বৃথা, বৃথা, সমস্তই বৃথা!

উপাচার্য। আচার্যদেব, বলেন কী। বৃথা, সমস্তই বৃথা?

আচার্য। সুতসোম, আমরা এখানে কতদিন হল এসেছি মনে পড়ে কি? কত বছর হবে?

উপাচার্য। সময় ঠিক করে বলা বড়ো কঠিন। এখানে মনের পক্ষে প্রাচীন হয়ে উঠতে বয়সের দরকার হয় না। আমার তো মনে হয় আমি জন্মের বহু পূর্ব হতেই এখানে স্থির হয়ে বসে আছি।

আচার্য। দেখো সুতসোম, প্রথম যখন এখানে সাধনা আরম্ভ করেছিলুম তখন নবীন বয়স, তখন আশা ছিল সাধনার শেষে একটা কিছু পাওয়া যাবে। সেই জন্যে সাধনা যতই কঠিন হচ্ছিল উৎসাহ আরও বেড়ে উঠছিল। তার পরে সেই সাধনার চক্রে ঘুরতে ঘুরতে একেবারেই ভুলে বসেছিলুম যে, সিদ্ধি বলে কিছু একটা আছে। আজ গুরু আসবেন শুনে হঠাৎ মনটা থমকে দাঁড়ালো—আজ নিজেকে জিজ্ঞাসা করলুম, ওরে পণ্ডিত, তোর সব শাস্ত্রই তো পড়া হল, সব ব্রতই তো পালন করলি, এখন বল্ মূর্খ, কী পেয়েছিস? কিছু না, কিছু না, সুতসোম! আজ দেখছি—এই অতিদীর্ঘকালের সাধনা কেবল আপনাকেই আপনি প্রদক্ষিণ করেছে—কেবল প্রতিদিনের অন্তহীন পুনরাবৃত্তি রাশীকৃত হয়ে জমে উঠেছে। (পৃ-২৭-২৮)।

ইহাই হয়। আমরা উদ্দেশ্যটা প্রায়ই ভুলিয়া গিয়া উপায়টাকেই বড় করিয়া তুলি—উপলক্ষ্য লক্ষ্যের স্থান অধিকার করিয়া বসে, "একথা সকলেই জানেন, অনেক সময় মানুষ যাহাকে উপায়রূপে আশ্রয় করে তাহাকেই উদ্দেশ্যরূপে বরণ করিয়া লয়; যাহাকে রাজ্যলাভের সহায়মাত্র বলিয়া ডাকিয়া লয় সেই রাজসিংহাসন অধিকার করিয়া বসে। আমাদের ধর্মসমাজ রচনাতেও সে বিপদ আছে। আমরা ধর্মলাভের জন্য ধর্মসমাজ স্থাপন করি; শেষকালে ধর্মসমাজই ধর্মের স্থান অধিকার করে" (ধর্ম : ধর্মপ্রচার : পৃ-৭২)। গতিকে অস্বীকার করিয়া, কর্মকে অস্বীকার করিয়া স্বত্বগুণ ধীরে ধীরে তামসিকতায় পরিণত হয়।

গুরুকে দেখিয়াছে মালী এবং শঙ্খবাদক। রবীন্দ্রনাথ ইচ্ছা করিয়াই এই দুইটি প্রাণীকে গুরুর দর্শন লাভের উপযুক্ত করিয়াছেন। যে ফুলের কাজ করে, সুন্দরের সহিত যাহার কারবার সে পরমসুন্দরের প্রতিভূকে না দেখিয়া পারে না; যে তাঁহার কথা স্মরণ করাইয়া শঙ্খ বাজায় সেও তাঁহাকে নিশ্চয়ই একবার দেখিয়াছে। আচার্য, মালী এবং শঙ্খ বাদক যে তিনজন মাত্র গুরুকে সাক্ষাৎ ভাবে দেখিয়াছে তাহারা সার্থক হইতে পারে, অভ্যাসের দ্বারা আবদ্ধও হইতে পারে। উপাচার্য, মহাপঞ্চকে, উপাধ্যায় গুরুকে দেখেন নাই তাই মন্ত্রতন্ত্র এবং পুঁথিই তাহাদের নিকট গুরুর মর্যাদা

পাইয়াছে। আচার্য অদীনপুণ্যের বাহিরটাকেই তাঁহারা কেবল দেখিয়াছেন : তাঁহার অন্তরের দ্বিধার সন্ধান তাঁহারা রাখেন নাই। পুঁথি লইয়া একান্ত নিষ্ঠায় এবং বিশ্বাসে নিমগ্ন রহিয়াছেন মহাপঞ্চক, এই দিক দিয়া তিনি সকলকে ছাড়াইয়া গিয়াছেন। মনে তাঁহার কোন সংশয় নাই। তাঁহার চিত্তে বিশ্বাসের জলন্ত অগ্নিশিখা। অভ্যাসের দ্বারা তিনি মনকে সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ করিতে শিখিয়াছেন। জগৎকে সম্পূর্ণ অস্বীকার করিতেও তিনি পারেন। মনের মধ্যে সরসতা নাই বটে, কিন্তু সরসতা লাভের জন্য চিত্তে কোন ব্যাকুলতাও নাই। ইঁহারা সাধনার ক্ষেত্রে অনেকদূর পর্যন্ত অগ্রসর হইয়া থাকেন, যদিও শেষ স্তর ইঁহাদের জন্য নহে। কোন্ পদ্ধতিতে চলিতে হইবে তাহা তাঁহারা পুঁথির মধ্য হইতে খুঁজিয়া বাহির করিতে চান ; প্রকৃতি জগৎ, মানুষের অন্তর জগৎ তাঁহাদের নিকট কিছুই নহে। পুঁথির পাণ্ডিত্যের পথে তাঁহারা সংস্কারগ্রস্ত হইয়া পড়েন। মহাপঞ্চক তাই পুঁথির সংবাদ অন্য সকলের হইতে বেশী করিয়া জানেন—

উপাধ্যায়। আচার্যদেব, সুভদ্র আমাদের আয়তনের উত্তর দিকের জানলা খুলে বাইরে দৃষ্টিপাত করেছে।

আচার্য। উত্তর দিকটা তো একজটা দেবীর।

... ...

উপাচার্য। এখন কথা হচ্ছে এ পাপের প্রায়শ্চিত্ত কী।

আচার্য। আমার তো স্মরণ হয় না। উপাধ্যায় বোধ করি—

উপাধ্যায়। না, আমিও তো মনে আনতে পারিনে। আজ তিন-শ বছর এ প্রায়শ্চিত্তটার প্রয়োজন হয় নি—সবাই ভুলেই গেছে। ওই-যে মহাপঞ্চক আসছে—যদি কারও জানা থাকে সে তো ওর (পৃ-৩৪)।

সত্যই মহাপঞ্চক ব্যতীত পুঁথির সমস্ত সংবাদ আর কেহ রাখেন না। মহাপঞ্চক তাই বলেন, "ক্রিয়াকল্পতরুতে এর কোনো উল্লেখ পাওয়া যায় না—একমাত্র ভগবান জলনানন্তকৃত আধিকর্মিক বর্ষায়ণে লিখছে অপরাধীকে ছয় মাস মহাতামস সাধন করতে হবে" (পৃ-৩৪)। মহাপঞ্চককে রবীন্দ্রনাথ পুঁথিপড়া পণ্ডিতের স্থান দিয়াছেন। তাঁহার নিষ্ঠা এবং পাণ্ডিত্য অচলায়তনের অন্যান্য অধিবাসী হইতে অধিক। নিয়মতান্ত্রিক পথই তাঁহার একমাত্র পরিচিত পথ। তাই গুরুর আগমনের মুহূর্তেও তিনি 'যে ছেলের

মা বাপ ভাই বোন কেউ মরেনি এমন নবম গর্ভের সন্তান এখনও জুটিয়ে আনতে' পারা গেল না বলিয়া ক্ষুব্ধ হইয়া উঠিয়াছেন। কারণ গুরুর আগমনের সময় দ্বারে দাঁড়াইয়া এইরূপ একটি বালককেই মহারক্ষা পড়িতে হইবে। মহাপঞ্চক তাই অচল বুদ্ধির প্রতীক। পরিবর্তনের সহিত তাঁহার কোন যোগ নাই। এই অচল বুদ্ধির গোড়ায়ও আজ আঘাত লাগিয়াছে। নিয়মতন্ত্র সকলই ব্যর্থ হইয়া যাইতেছে। অচলায়তনের রক্ষক দেবতা তাহাকে আর রক্ষা করিতে পারিলেন না। প্রাচীর গুঁড়াইয়া গিয়াছে, দরজার চিহ্ন মাত্র নাই। অচলায়তনে আজ মুক্তির আহ্বান শোনা যাইতেছে—

দ্বিতীয় বালক। আজ চার দিক থেকেই আলো আসছে—সব যেন ফাঁক হয়ে গেছে।

তৃতীয় বালক। এত আলো তো আমরা কোনোদিন দেখি নি!

প্রথম বালক। কোথাকার পাখির ডাক এখান থেকেই শোনা যাচ্ছে।

দ্বিতীয় বালক। এ-সব পাখির ডাক আমরা তো কোনোদিন শুনি নি! এ তো আমাদের খাঁচার ময়নার মতো একেবারেই নয়। (পৃ-৮৫)

মহাপঞ্চককেও তাই বলিতে হইল, "আজকের কথা ঠিক বলতে পারছি নে। আজ কোনো নিয়ম রক্ষা করা চলবে বলে বোধ হচ্ছে না" (পৃ-৮৫)। মুক্তির আহ্বান আসিয়া পৌঁছিয়াছে অচলায়তনের বালকদের মনে। এতদিন যে জীবনযাত্রা পদ্ধতিতে তাহারা অভ্যস্ত ছিল তাহা ছিল একান্তই নীরস, আজ তাহাদের মনে জাগিয়াছে নৃত্যের উল্লাস : বাঁধ ভাঙ্গা জোয়ারের জলের স্পর্শ তাহারা পাইয়াছে। খাঁচার পাখী যেন মুক্তির স্বাদ পাইয়াছে, "যতদিন খাঁচায় ছিল ততদিন সে দৃঢ়রূপেই জানিত তাহার বাসা চিরকালের জন্যই কোনো এক বুদ্ধিমান পুরুষ বহুকাল হইল বাঁধিয়া দিয়াছে; আর কোনো প্রকার বাসা একেবারে হইতে পারে না, নিজেব শক্তিতে তো নহেই; সে জানিত তাহার প্রতিদিনের খাদ্য পানীয় কোনো একজন বুদ্ধিমান পুরুষ চিরকালের জন্য বরাদ্দ করিয়া দিয়াছে, অন্য আর কোনো প্রকার খাদ্য সম্ভবপরই নহে, বিশেষতঃ নিজের চেষ্টায় স্বাধীনভাবে অন্নপানের সন্ধানের মত নিষিদ্ধ তাহার পক্ষে আর কিছুই নাই। এই নির্দিষ্ট খাঁচার মধ্য দিয়া যেটুকু আকাশ দেখা যাইতেছে তাহার বাহিরেও যে বিধাতার সৃষ্টি আছে একথা একেবারেই

অশ্রদ্ধেয় এবং এই সীমাকে লঙ্ঘন করার চেষ্টামাত্রই গুরুতর অপরাধ" (সঞ্চয়: ধর্মের নবযুগ: পৃ-২৮)। অচলায়তনের বালকদের সেই অবস্থাই ছিল। তন্ত্র মন্ত্র আচারের জালে ছিল তাহারা আবৃত। কিন্তু গুরু আসিয়া বাহিরকে টানিয়া আনিলেন অচলায়তনের ভিতরে। মানুষের আত্মার স্বাধীনতাকে স্বীকৃতি দেওয়া হইল। সত্য প্রতিষ্ঠায় শাস্ত্র গুরু বর্জন করিয়া মানুষের নিজের সহজ বুদ্ধিকেই কষ্টিপাথর রূপে গ্রহণ করা কর্তব্য। আত্মা ঈশ্বরের অংশ, তাহাকে চারিদিক হইতে বন্ধ করিবার অর্থ অবিদ্যায় আচ্ছন্ন করিয়া রাখা। অবিদ্যা দূর না হইলে তো মানুষের আত্মার মুক্তি নাই—

দ্বার বন্ধ ক'রে দিয়ে ভ্রম টাবে রুখি।

সত্য বলে, 'আমি তবে কোথা দিযে ঢুকি।' (কণিকা: একই পথ)

অচলাযতন স্মষ্টি করিয়া মিথ্যাকে দূরে সরাইযা রাখা যায় না। তাহাব মধ্যেই মিথ্যা পুঞ্জীভূত হইয়া ওঠে। কারণ, "আইডিযা জিনিসটা সজীব, কিন্তু কোন ইন্‌স্টিট্যুশনের লোহার সিন্দুকে ত তাকে বাঁচিযে রাখা যায না—মানুষের চিত্ত ক্ষেত্রে যদি সে স্থান পায তবেই সে বর্তে গেল" (চিঠিপত্র: ৫ম খণ্ড: পৃ-৪৬)।

বৃহতের সহিত মিলাইয়াই সত্যকে চিনিতে হয। ছোট্ট গণ্ডীর মধ্যে যাহাকে একান্ত সত্য বলিযা মনে হয় বৃহত্তর ক্ষেত্রে তাহাকে মিলাইতে গেলে তাহা যে কত বড মিথ্যা তাহা ধরা পডে, "মদের বৈঠকে মাতাল জগৎ সংসারকে ভুলিয়া গিয়া নিজেদের সভাকে বৈকুণ্ঠপুরী বলিযা মনে করে, কিন্তু অপ্রমত্ত দর্শক চারিদিকের সংসারের সঙ্গে মিলাইযা দেখিলেই তাহার বীভৎসতা বুঝিতে পারে" (সাহিত্য: সৌন্দর্যবোধ: পৃ-৩৯)। কবি রজ্জবও বলিয়াছেন—

"সব সাঁচ মিলৈ সো সাঁচ হৈ না মিলৈ সো ঝুঁঠ।—

জন রজ্জব সাঁচী কহী ভাবই রিঝি ভাবই রূঠ॥

সব সত্যের সঙ্গে যা মেলে তাই সত্য, যা মিলল না তা মিথ্যে; রজ্জব বলছে, এই কথাই খাঁটি—এতে তুমি খুশিই হও আর রাগই কর" (মানুষের ধর্ম: পৃ-৬১)।

গুরু আসিয়া সেই সত্যকে চিনাইয়া দিলেন—অচলায়তনের ভিতরটাকে বাহিরের সহিত মিলাইয়া দিলেন। যাহা এতদিন খণ্ডিত থাকিয়া সত্যকে

চিনিতে দেয় নাই তাহাই আজ অসীমের সহিত মিশিয়া গিয়াছে। তাই জয়োত্তমের মন নাচিয়া উঠিতে চায়, সকলের মনেই আজ নূতনের স্পর্শ লাগিয়াছে। কিন্তু মহাপঞ্চক অস্ত্রধারী ম্লেচ্ছদের সহিত যোদ্ধবেশে গুরুকে আসিতে দেখিয়াও অটল হইয়া রহিলেন। তিনি গুরুকে স্বীকার করিবেন না। আচার এবং শাস্ত্রীয় বিধি বিধান পালন ব্যতীত অন্য কর্মে তিনি বিশ্বাসী নহেন। তাই তিনি নূতনের আহ্বান শুনিলেন না, তিনি দৃঢ়তার সহিত বলিলেন, "পাথরের প্রাচীর তোমরা ভাঙতে পারো, লোহার দরজা তোমরা খুলতে পারো, কিন্তু আমি আমার ইন্দ্রিয়ের সমস্ত দ্বার রোধ করে এই বসলুম—যদি প্রায়োপবেশনে মরি তবু তোমাদের হাওয়া তোমাদের আলো লেশমাত্র আমাকে স্পর্শ করতে দেব না" (পৃ-৯০-৯১)। সাধনার পক্ষে ইন্দ্রিয় সংযম একটা বড় কাজ ; কর্মের জগতে নামিবার পূর্বে ইন্দ্রিয়কে বশীভূত করিয়া লইতে হয় : কর্মের মধ্য দিয়া মুক্তিলাভের তাহাই পথ ; গীতায় ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন—

যস্ত্বিন্দ্রিয়াণি মনসা নিয়ম্যারভতেঽর্জুন।
কর্মেন্দ্রিয়ৈঃ কর্মযোগমসক্তঃ স বিশিষ্যতে॥ (অধ্যায় ৩ : ৭)

"হে অর্জুন, যে মানুষ ইন্দ্রিয়সকলকে মনদ্বারা নিয়মিত রাখিয়া, সঙ্গ-রহিত হইয়া কর্মেন্দ্রিয়দ্বারা কর্মযোগের আরম্ভ করে সে শ্রেষ্ঠ পুরুষ" (গান্ধীজীর ভাষ্য)।

মনদ্বারা ইন্দ্রিয়গুলিকে সার্থকরূপে সংযত করিয়াছেন মহাপঞ্চক। কর্মের জগতে তাহাকে আনিতে পারিলেই তাহার মুক্তি সম্ভব হইবে। কেবল ইন্দ্রিয় সংযমের দ্বারাও যে মানুষ অনেক দূর উঠিতে পারে মহাপঞ্চক তাহার প্রমাণ। নিষ্ঠা এবং বিশ্বাস তুচ্ছ করিবার মত বিষয় নহে। ইহাকে শুধু সঠিক পথটি দেখাইয়া দিতে হয়। যিনি ইন্দ্রিয় সংযমে সার্থক তাঁহাকে বন্দী করা যায় না, শাস্তি দেওয়া যায় না। বাহিরের জগৎ সেখানে ঘা খাইয়া ফিরিয়া যায়। গুরুই কেবল তাঁহাকে প্রণত করিতে পারেন। শাস্ত্রীয় আচার পালনের ফলে হৃদয় বিশুষ্ক হইলেও বিশ্বাসের দৃঢ়তা আসে, কোনো ভয়ই আর তাহাকে ভীত করিতে পারে না—মৃত্যু ভয়ও তখন তুচ্ছ হইয়া যায়, "কিসের ভয় দেখাও আমায়? তোমরা মেরে ফেলতে পারো, তার বেশি ক্ষমতা তোমাদের নেই" (পৃ-৯১)। প্রেমের পথেই তখন তাহার শুষ্ক হৃদয়কে সঞ্জীবিত করিতে হয় : আর কোন পথ

নাই তাহাকে জাগ্রত করিবার। সেই কাজ করিতে পারেন একমাত্র গুরু। সেই কাজ তাই তিনি নিজের হাতেই সমাধা করিয়াছেন। যিনি ছিলেন অচল বুদ্ধি তাঁহাকে তিনি সচল করিয়া দিয়াছেন, "তার ওখানে অনেক কাজ। এতদিন ঘর বন্ধ করে অন্ধকারে ও মনে করছিল চাকাটা খুব চলছে, কিন্তু চাকাটা কেবল এক জায়গায় দাঁড়িয়ে ঘুরছিল তা সে দেখতেও পায়নি। এখন আলোতে তার দৃষ্টি খুলে গেছে, সে আর সে-মানুষ নেই।' কী করে আপনাকে আপনি ছাড়িয়ে উঠতে হয় সেইটে শেখাবার ভার ওর উপর। ক্ষুধাতৃষ্ণা-লোভভয়-জীবনমৃত্যুর আবরণ বিদীর্ণ করে আপনাকে প্রকাশ করার রহস্য ওর হাতে আছে" (পৃ-১০২)। মন্ত্র-তন্ত্র, বিধি-বিধান সবই লক্ষ্যে পৌঁছিবার জন্য। এই উপলক্ষ্যগুলি লক্ষ্যের স্থান অধিকার করিয়া না বসা পর্যন্ত ইহাদের প্রয়োজনকে অস্বীকার করিবার কোন কারণ নাই। কবিতার সৌন্দর্যের জন্যও ছন্দের বাঁধনের প্রযোজন। সুতরাং বিধি মাত্রই নিষিদ্ধ নহে। অভ্যাসের দ্বারা ক্ষুধা-তৃষ্ণা-লোভ জয় করা যায়। বুদ্ধির দ্বারা মৃত্যুভয়কে অতিক্রম করা সম্ভব। সুতরাং ইহা স্বীকার্য যে বুদ্ধির দ্বারাও অনেক দূর অগ্রসর হওয়া যায়। সে সত্যকে চিনাইয়া দিতে পারে না, কিন্তু সেই পথে অগ্রসর করাইয়া দিতে পারে। পরিপূর্ণ সত্যকে জানিবার জন্য স্বজ্ঞার প্রয়োজন। এই স্বজ্ঞাই পঞ্চক। বুদ্ধির ভ্রাতা স্বজ্ঞা, তাই মহাপঞ্চকের ভ্রাতা পঞ্চক। সে বয়সে ছোটও বটে ঃ বুদ্ধির রক্ত চক্ষুর সম্মুখে সে সহজে আত্মপ্রকাশ করে না। কিন্তু ছোট বলিয়াই দৃষ্টি তাহার শিশুর মতই স্বচ্ছ। তাহার ভিতরকার আবেগকে চাপিয়া রাখাও কাহারও পক্ষে সম্ভব নয়—

হারে রে রে রে রে—
আমায় ছেড়ে দে রে, দে রে!
যেমন ছাড়া বনের পাখি
মনের আনন্দে রে।
... ...

হারে রে রে রে রে
আমায় রাখবে ধরে কে রে!
দাবানলের নাচন যেমন
সকল কানন ঘেরে! (পৃ-৫৮-৫৯)।

স্বজ্ঞা মানুষকে সকল বন্ধন অতিক্রম করিতে পরামর্শ দেয়। মন্ত্র তন্ত্রে তাহার একেবারেই বিশ্বাস নাই। সেই জন্যই শনিবারে যে দিন মহা ময়ূরী দেবীর পূজা পড়িল, সেই দিন কাঁসার থালায় ইঁদুরের গর্তের মাটি রাখিয়া তাহার উপর পাঁচটা শিয়ালকাঁটার পাতা আর তিনটা মাসকালাই সাজাইয়া আঠারো বার ফুঁ দিতে তাহার কোন ভয় হয় না। বজ্রবিদারণ মন্ত্র সেই জন্যই তাহার বহু দিনের চেষ্টায়ও কণ্ঠস্থ হইল না।

স্বজ্ঞা কখনও যুক্তির পথে চলে না। বরং স্বজ্ঞার নির্দেশকে অযৌক্তিক বলিয়াই মনে হয়। তাই পঞ্চকের মুখে শুনি, "কুতর্কটা আমার পক্ষে এমনি সুন্দর স্বাভাবিক যে সেটা আমার মুখে ভারী মিষ্ট শোনায়। সকলেই খুশি হয়ে বলে, ঠিক হয়েছে, পঞ্চকের মতোই কথা হযেছে। কিন্তু ঘোরতর বুদ্ধির পরিচয় না দিতে পারলে তোমাদের আদর নেই" (পৃ-১৮)।

স্বজ্ঞা জানে যে মানুষের জগতে ভেদ নাই। সমস্ত বন্ধনের গণ্ডী কাটিয়া সে সকলের সহিত মিলিতে চায়। পঞ্চকের আচরণে তাহার পরিচয় আছে। সেই জন্যই অচলায়তনের প্রাচীর ডিঙাইয়া সে মাঝে মাঝে শোণপাংশুদের সঙ্গে আসিয়া মেলে। 'গতি'কে বাদ দিয়া সত্যকে লাভ করা যায় না তাহা সে জানে। মাঝে মাঝে প্রাচীর ডিঙাইয়া বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইলেও অচলায়তনে তাহাকে ফিরিয়া যাইতে হয়। বুদ্ধির সহিত তাহার বিরোধ থাকিলেও, গতিকে পরিবর্তনকে স্বীকার করে যে বুদ্ধি তাহার সহিত তাহার কোন বিরোধ থাকিবার কারণ নাই। সত্য বুদ্ধির সহিত স্বজ্ঞার মিলন হইলেই মানুষের মুক্তি সম্ভব হয়। গুরু সেই জন্যই পঞ্চককে অচলায়তনের ভার দিলেন—

দাদাঠাকুর। আমি তোমার জায়গা ঠিক করে রেখেছি।

পঞ্চক। কোথায় ঠাকুর?

দাদাঠাকুর। ওই অচলায়তনে।

পঞ্চক। আবার অচলায়তনে! আমার কারাদণ্ডের মেয়াদ ফুরোয় নি?

দাদাঠাকুর। কারাগার যা ছিল সে তো আমি ভেঙে ফেলেছি, এখন সেই উপকরণ দিয়ে সেইখানেই তোমাকে মন্দির গেঁথে তুলতে হবে (পৃ-১০০)

কেবল তাহাই নহে মহাপঞ্চক এবং পঞ্চককে একত্র কার্য করিতে হইবে। একজন বুদ্ধির পথে মানুষের পার্থিব চিন্তাকে দূর করিবে, ইন্দ্রিয়গুলিকে

সংযত করিবে, আর একজন পরমার্থের সন্ধান দিবে ; কারণ তাহার হাতই সেই দিকে প্রসারিত হইয়া আছে—

সে যে আকাশ-পানে হাত পেতেছে,
তারে আজ নামায় কে রে ! (পৃ-৬৬)

ঐহিক এবং পারমার্থিক সাধন পরস্পর বিরোধী নহে, "ঐহিক সাধনের প্রকৃত পথ পারমার্থিক সাধনের প্রকৃত পথ হইতে ভিন্ন নহে। "যদেবেহ তদমুত্র যদমুত্র তদন্বিহ"।" (ভূদেব মুখোপাধ্যায় : সামাজিক প্রবন্ধ : ঐহিকতা)

শোণপাংশু (বা যূণক)-রা রজোগুণের প্রতীক : তাহারা কেবল কর্মেই বিশ্বাসী। শোণপাংশু অর্থ পাঁশুটে রং। ইহার মধ্যে একটা সংমিশ্রণের ইঙ্গিত আছে। যূণক কথাটির অর্থও তাহাই। সত্ত্ব এবং তমোগুণের মিশ্রণের ফল রজোগুণ নিশ্চযই নহে। কিন্তু দুই-এর মাঝামাঝি বলিয়া মিশ্রণের সম্ভাবনার ইঙ্গিত করে। সত্ত্বগুণের জ্ঞান ও কর্মেব কর্মটুকু এবং তমোগুণের সংস্কারগ্রস্ত ভক্তি এবং অজ্ঞতার অজ্ঞতাটুকু মিশ্রিত হইযাছে শোণপাংশু (যূণক)-দের মধ্যে। তাহারা সেই জন্যই কেবল কর্ম করিতেই জানে, অজ্ঞতার জন্য বোঝে না যে কর্মই লক্ষ্য নয, তাহা লক্ষ্যে পৌছিবার উপায মাত্র। সেই কথাটা বুঝাইবার জন্যই রবীন্দ্রনাথ তাহাদের বিস্তৃত পাহাড মাঠের বাসিন্দা করিযাছেন। ইহা তাহাদের বাধা বন্ধহারা কর্মক্ষেত্রের ইঙ্গিত করে। সীমা টানিযা মাঝে মাঝে যে স্থির হইতে হয তাহা তাহারা বোঝে না। তাহারা গতি ব্যতীত আর কিছুই জানে না—

পঞ্চক। ওদের বসিযে রাখা। সর্বনাশ। তার চেযে ওদের ভাঙতে-চুরতে দিলে ওরা বেশি ঠাণ্ডা থাকে। ওরা যে কেবল ছট্‌ফট্‌ করাকেই মুক্তি মনে করে।

দাদাঠাকুর। ছোটো ছেলেকে পাকা বেল দিলে সে ভারী খুশি হয়ে মনে করে এটা খেলার গোলা। কেবল সেটাকে গডিয়ে নিয়ে বেড়ায়। ওরাও সেইরকম স্বাধীনতাকে বাইরে থেকে ভারী একটা মজার জিনিস বলে জানে—কিন্তু জানে না স্থির হয়ে বসে তার ভিতর থেকে সার পদার্থটা বের করে নিতে হয়। (পৃঃ ১০১-১০২)

গতি এবং স্থিতি এই উভয়ে মিলিয়াই পরিপূর্ণ সত্য। কর্ম ও জ্ঞানের সমন্বয় না হইলে চলে না। গতি এবং স্থিতির সম্মিলনেই প্রকৃত জ্ঞান এবং কর্মের তাৎপর্য উপলব্ধ হয়। ইহাতেই ভক্তি এবং প্রেম স্বতঃই হৃদয়ে জাগ্রত হয়। সেইদিকে লক্ষ্য রাখিয়াই দাদাঠাকুর (গুরু) শোণপাংশুদের স্থির হইয়া বসিবার ব্যবস্থা করেন, "ওদেরও ডেকে এনে বসাতে হবে, ওরা একটু বসতে শিখুক" ('পৃ-১০১)। অন্তরের ভিতরে পাক ধরাইতে হইবে, তাহার জন্য জ্ঞান চাই। স্থির হইয়া বসিবার শিক্ষা দিতে পারেন মহাপঞ্চক। তাহার হাতেই শোণপাংশুদের এই দিক্‌কার শিক্ষার ভার দেওয়া চাই, 'কিছুদিনের জন্যে তোমার মহাপঞ্চকদাদার হাতে ওদের ভার দিলেই খানিকটা ঠাণ্ডা হয়ে ওরা নিজের ভিতরের দিকটাতে পাক ধরাবার সময় পাবে' (পৃ-১০২)। ইউরোপের কর্মব্যস্ততার পরিচয়ের আভাস আছে শোণপাংশুদের জীবনযাত্রার রীতিতে। স্বাধীনতাকেই তাহারা একান্ত বড় করিয়া দেখিয়াছে। তাই প্রতিনিয়ত সেখানে কোলাহল লাগিয়াই আছে, শান্তিকে যেন তাহারা স্থবিরতা মনে করে। সেই জন্যই পঞ্চকের মনে হয় "এই শোণপাংশুগুলো বাইরে থাকে বটে কিন্তু দিনরাত্রি এমনি পাক খেয়ে বেড়ায় যে, বাহিরটাকে দেখতেই পায় না। এরা যেখানে থাকে সেখানে একেবারে অস্থিরতার চোটে চতুর্দিক ঘুলিয়ে যায়। এরা একটু থেমেছে অমনি সমস্ত আকাশটা যেন গান গেয়ে উঠেছে। এই শোণপাংশুদের দেখছি, ওরা চুপ করলেই আর কিছু শুনতে পায় না—ওরা নিজের গোলমালটা শোনে, সেই জন্যেই এত গোল করতে ভালোবাসে" (পৃ-৪৫-৪৬)। তাই সত্যের নিকটে থাকিয়াও তাহারা সত্যকে পায় না, চক্ষু থাকিতেও তাহারা একেবারে অন্ধ—

> পঞ্চক। ···ওরা দিনরাত তোমাকে কাছে পায়।
>
> দাদাঠাকুর। ছুটোপাটি করলেই কি কাছে পাওয়া যায়? কাছে আসবার রাস্তাটা কাছের লোকের চোখেই পড়ে না (পৃ-৫৮)।

দর্ভক দল তমোগুণের প্রতীক। তাহারা সত্যকে জানে না। সত্ত্ব ও তমোগুণের মানুষের আচার-আচরণের পার্থক্য অনেক সময়েই বোঝা যায় না, অনেকটা একই রকম বলিয়া মনে হয় : উভয়েই যেন কাছাকাছি। তাই রবীন্দ্রনাথ অচলায়তনের পাশেই দর্ভক পল্লী স্থাপন করিয়াছেন।

তাহারা সহজ বিশ্বাসে কেবল ভক্তি করিতেই জানে। অন্ধ ভক্তির দ্বারা কখনও মুক্তি হয় না ইহাই রবীন্দ্রনাথের বিশ্বাস—

যে ভক্তি তোমারে ল'য়ে ধৈর্য নাহি মানে,
মুহূর্তে বিহ্বল হয় নৃত্যগীতগানে
ভাবোন্মত্ত-মত্ততায়, সেই জ্ঞানহারা
উদ্‌ভ্রান্ত উচ্ছল-ফেন ভক্তিমদধারা
নাহি চাহি, নাথ॥ (নৈবেদ্য ঃ অপ্রমত্ত)

সুতরাং জ্ঞানহারা ভক্তিতে রবীন্দ্রনাথের একেবারেই বিশ্বাস নাই, উহা কখনও মানুষের মুক্তির পথ পরিষ্কার করে না। অন্তরের ভক্তিতে তাহারা ঈশ্বরের নামগান করিতে পারে, কিন্তু তাহার সম্পূর্ণ তাৎপর্য বোঝে না বলিয়াই নিজেদের কেবল অশুচি বলিয়াই মনে করে। মানুষের জীবনে বিনয় মহৎ গুণ সন্দেহ নাই, কিন্তু সর্বদা নিজেকে অশুচি মনে করিলে আত্মার পবিত্রতা উপলব্ধি করা কখনই সম্ভব হয় না। দর্ভকদের ক্ষেত্রে তাহাই হইয়াছে,—"ঠাকুর, আমরা নীচ দর্ভকজাত—আমরা ওসব কিছুই জানি নে। আজ কত পুরুষ ধরে এখানে বাস করে আসছি, কোনোদিন তো তোমাদের পায়ের ধুলা পড়ে নি। আজ তোমাদের মন্ত্র পড়ে আমাদের বাপ-পিতামহকে উদ্ধার করে দাও ঠাকুর" (পৃ-৭৩)। ইহাকে বিনয় বলিযা ভুল করিলে চলিবে না। অবিদ্যার অন্ধকারে ইহারা নিমজ্জিত। সুতরাং তামসিক ভাব না কাটিয়া যাওয়া পর্যন্ত তাহাদের মুক্তি হইতেই পারে না। নামগান রূপ আরাধনার দ্বারা তাহাদের মনকে উচ্চ পর্যাযে তুলিয়া লইতে হয়—সেই সময় তমোগুণ দূরীভূত হইয়া রজোগুণে তাহারা অধিষ্ঠিত হয়। তান্ত্রিক সাধনায়ও এই প্রকার ব্যাপার আছে। এই সাধনায় প্রধানতঃ পশু, বীর ও দিব্যভাবের অবতারণা রহিয়াছে। তামসিক, রাজসিক ও সাত্ত্বিক গুণসম্পন্ন ব্যক্তি পশু, বীর ও দিব্য ভাবে সাধনা করেন। গুরুর উপদেশ লইয়া প্রথমে পশুভাবে সাধনা করিতে হয়। ইহাতে যোগ-শিক্ষাই প্রধান। যোগের দ্বারা মন উন্নত হইলে, বীর ভাবের সাধনা আরম্ভ হয়। দিব্য ভাব এই বীরভাবেরই চরম উৎকর্ষ। তখন ভেদাভেদ আর কিছু থাকে না।

দর্ভকদের ভক্তি প্রকৃত ভক্তিও নয় কারণ তাহাতে সত্য দৃষ্টি নাই। অচলায়তনে যে লড়াই আরম্ভ হইয়াছে সেই লড়াইতে যোগ দিয়া তাহারা অচলায়তনকে রক্ষা করিতে চায়, "বাবাঠাকুর, তোমরা যদি হুকুম করো

আমরা যাই ঠেকাই গিয়ে" (পৃ-৯৪) অথবা, "বাবাঠাকুর, হুকুম করো, একবার ওদের সঙ্গে লড়ে আসি—দেখিয়ে দিই এখানে মানুষ আছে" (পৃ-৯৫)। তাহারা জানে যে অচলায়তনের মানুষগুলি লড়াই করিতে পারে না, মন্ত্র-তন্ত্র লইয়াই তাহারা সময় অতিবাহিত করে, 'শুনেছি কত রকম মন্ত্র-লেখা তাগাতাবিজ দিয়ে তারা দুখানা হাত আগাগোড়া কষে বেঁধে রেখেছে। খোলে না, পাছে কাজ করতে গেলেই তাদের হাতের গুণ নষ্ট হয়'. (পৃ-৯৪)। মন্ত্রতন্ত্রের এই দুর্দশা দেখিয়াও কিন্তু তাহাদের অন্ধ বিশ্বাস যায় না। মন্ত্রের জোরেও অচলায়তনের লোকেরা লড়াই জয় করিতে পারিতেছে না, তাহাদের সাহায্য প্রয়োজন। মন্ত্রের শক্তি তবে কোথায়? স্পষ্ট করিয়া তাহা দেখিয়াও তাহারা বলে—

প্রথম দর্ভক। এখানে তোমাদের গুরু এলে তাঁকে বসাব কোথায়?

দ্বিতীয় দর্ভক। বাবাঠাকুর, তুমি এখানে তাঁর বসবার জায়গাটা একটু শোধন করে নাও—আমরা তফাতে সরে যাই (পৃ-৯৭)।

অচলায়তনিক (স্থবিরক)-রা এবং শোণপাংশু (যূণক)-রা সত্যের অনেক নিকটবর্তী কিন্তু দর্ভকরা অনেক পশ্চাতে পড়িয়া আছে। সেই জন্যই গুরু অচলায়তনিক এবং শোণপাংশু (যূণক)-দের ভার দিলেন নূতন মন্দিরের ভিত তুলিতে সেই স্থানটির উপর যেখানে 'যুদ্ধের রাত্রে স্থবিরকের (অচলায়তনিক) রক্তের সঙ্গে শোণপাংশুদের রক্ত মিলে গিয়েছে' (পৃ-১০৫)। সংগ্রামের ভিতর দিয়া, রক্ত পাতের ভিতর দিয়া সৃষ্টি হইবে পবিত্র সৌধ 'এবার আর লাল নয়, এবার একেবারে শুভ্র। নূতন সৌধের সাদা ভিতকে আকাশের আলোর মধ্যে অভ্রভেদী করে দাঁড় করাও। মেলো তোমরা দুই দলে, লাগো তোমাদের কাজে' (পৃ-১০৬)। এবার গড়িয়া উঠিবে মন্দির, পঞ্চককে সেই আদেশই দিয়াছেন গুরু, "কারাগার যা ছিল সে তো আমি ভেঙে ফেলেছি, এখন সেই উপকরণ দিয়ে সেইখানেই তোমাকে মন্দির গেঁথে তুলতে হবে" (পৃ-১০০)। এই মন্দিরে সকলের স্থান হওয়া চাই। মন্দিরের উপকরণ হইবে জ্ঞান এবং কর্ম। দর্ভকরাও নিশ্চয়ই একদিন অবিদ্যার হাত হইতে উদ্ধার পাইয়া সত্যকে পরিপূর্ণরূপে জানিতে পারিবে। কেহ বাহিরে পড়িয়া থাকিবে না—

পঞ্চক। আমাকে কী করতে হবে?

দাদাঠাকুর। যে যেখানে ছড়িয়ে আছে সবাইকে ডাক দিয়ে আনতে হবে।

পঞ্চক। সবাইকে কি কুলোবে?

দাদাঠাকুর। না যদি কুলোয় তা হলে এমনি করে দেয়াল আবার আর-একদিন ভাঙতেই হবে সেই বুঝে গেঁথো—আমার আর কাজ বাড়িয়ো না। (পৃ-১০১)

স্থান সকলেরই হইবে, কিন্তু সৌধ নির্মাণে অবিদ্যা আচ্ছন্ন দর্ভকদের স্থান নাই ইহাই রবীন্দ্রনাথের বক্তব্য।

'অচলায়তন' নাটকে দর্ভকদের কিছু অধিকদূর পর্যন্ত টানিয়া লওয়া হইয়াছে এবং উহাতে তাহাদের সম্পূর্ণরূপে তামসিকতায় আচ্ছন্ন বলা যায় না। তাহাদের মুখের দ্বিতীয়[৪], তৃতীয়[৫] এবং চতুর্থ[৬] গানে জ্ঞানের পরিচয় আছে। বিশেষ করিয়া উহাদের তৃতীয় গানটি—

পারের কাণ্ডারী গো, এবার ঘাট কি দেখা যায়?
নামবে কি সব বোঝা এবার ঘুচবে কি সব দায়?

শুনিতে শুনিতে আচার্যেরও মনে হইল "যেন একটা পাথরের দেহ গলে গেল। দিনের পর দিন কী ভার বয়েই বেড়িয়েছি! কিন্তু কতই সহজ সরল প্রাণ নিয়ে সেই পারের কাণ্ডারীর খেয়ায় চডে বসা! (পৃ-৭৬)

'অচলায়তন' নাটকে দর্ভকদের তামসিক গুণসম্পন্ন অবিদ্যার অন্ধকারে আচ্ছন্ন করা হয় নাই অথচ নূতন মন্দির নির্মাণে তাহারা স্থান পাইল না। ইহাতে যে সামঞ্জস্য রক্ষিত হয় নাই রবীন্দ্রনাথ নিশ্চয়ই তাহা উপলব্ধি করিয়াছিলেন। তাই 'গুরু' নাটকে দর্ভকদের জন্য দুইটি দৃশ্যও রাখেন নাই এবং তাহাদের মুখে 'অচলায়তন'-এর প্রথম গানটি[৭] মাত্র বজায় রাখিয়াছেন। অন্য গান গুলি একেবারেই তিনি বর্জন করিয়াছেন। এই কারণেই দৃঢ় বিশ্বাস জন্মে যে দর্ভকদের তামসিকতায় আচ্ছন্ন করিয়াই দেখাইয়াছেন।

সত্ত্ব, রজ ও তমোগুণকে কেন্দ্র করিয়াই 'অচলায়তন' (গুরু) নাটক রচিত। সত্ত্বগুণ সম্পন্ন ব্যক্তি কর্মকে এড়াইলে পথভ্রান্ত হয়—সমগ্রকে

৪। পৃঃ ৭৪-৭৫। ৫। পৃ-৭৬। ৬। পৃঃ ৮০-৮১।
৭। ও অকূলের কূল, ও অগতির গতি, ও অনাথের নাথ, ও পতিতের পতি

ভুলিয়া খণ্ডের মধ্যে আত্মগোপন করিয়া সে কুসংস্কারের দ্বারা অবৃত হয়; রজোগুণ সম্পন্ন ব্যক্তি জ্ঞানকে অস্বীকার করিয়া কেবল কর্ম এবং গতিকে মানিয়া ধ্রুবকে হারায়, গুরুর মধ্যে যে 'নতুনও আছে পুরোনোও আছে' (পৃ-৩৮) তাহা তাহাদের চোখেই পড়ে না। জ্ঞান ও কর্ম, সত্ত্ব ও রজের সমন্বয়েই মুক্তি। তামসিকতায় আচ্ছন্ন যাহারা তাহারাও নিশ্চয়ই একদিন মুক্তি পাইবে: অজ্ঞতায় আচ্ছন্ন হইলেও সরল মনে ঈশ্বরের নামগানের ভিতর দিয়া একদিন তাহারা জ্ঞান ও কর্মের প্রতিষ্ঠিত মন্দিরে স্থান লাভ করিয়া ক্রমে অবিদ্যার অন্ধতা হইতে মুক্তি পাইবে। কাহারও মুক্তির পথ চিররুদ্ধ হইতে পারে না। যদি রুদ্ধ হয়, তবে গুরুকে পুনরায় আসিতে হইবে দ্বার ভাঙিয়া, প্রাচীর চূর্ণ করিয়া নূতন আলোর প্রবেশ পথ করিয়া দিতে, 'না যদি কুলোয তা হলে এমনি করে দেয়াল আবার আর-একদিন ভাঙতেই হবে' (পৃ-১০১)। পরম সুন্দর যে প্রয়োজন হইলে জোর করিয়াও আদর্শ প্রতিষ্ঠা করেন তাহা অনেক সময়েই মানুষ ভুলিয়া যায়। বৃন্দাবনের বংশীধ্বনি মহাভারতের সুদর্শনকে আচ্ছন্ন করিতে চায়। কিন্তু মহাভারতের সুদর্শনও সত্য। প্রযোজন হইলে মানুষকে আঘাত করিতে দ্বিধা করেন না গুরু। নিরর্থক অন্ধ আচারের প্রবর্তন করিয়া যখন মানুষ অধর্মের অন্ধকারে নিমজ্জিত হয তখনই গুরুর সেই আঘাত নামিয়া আসে। তিনি কেবল প্রণাম ভিক্ষাই করেন না, প্রযোজনমত প্রণতও করেন। দুঃখের দুর্গম পথ অতিক্রম করিয়া মুক্তি তাহার জযভেরী বাজাইয়াও আসে। সেই কথাটি স্মরণ করিয়াই রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন—

এক হাতে ওর কৃপাণ আছে
আর এক হাতে হার।
ওযে ভেঙেছে তোব দ্বার।
আসেনি ও ভিক্ষা নিতে,
লডাই করে নেবে জিতে
পরানটি তোমার
ওযে ভেঙেছে তোর দ্বার। (গীতালী)

অচলায়তনেরও দ্বার ভাঙিয়া, প্রাচীর ধূলিসাৎ করিয়া গুরু প্রবেশ করিয়াছেন শত্রুবেশে। তাঁহার আগমনের পূর্ব মুহূর্তে তাই প্রকৃতি জগৎও ভয়ঙ্কর রূপ ধারণ করিয়াছিল—

পঞ্চক। ওই আবার বজ্র!

আচার্য। দ্বিগুণ বেগে বৃষ্টি এল।

উপাচার্য। আজ সমস্ত রাত এমনি করেই কাটবে। (পৃ-৮১)

'গুরু' নাটকের শেষ গানটির কথা পূর্বে একবার উল্লেখ করা হইয়াছে। এই নাটকে এই গানটি যূণক (শোণপাংশু) এবং দর্ভকদের মুখে দেওয়া হইয়াছে। গানটি তাৎপর্য পূর্ণ—অন্ধকার ভেদ করিয়া মহান পুরুষের আগমনের কথা আছে গানটিতে, 'ভেঙেছ দুয়ার এসেছ জ্যোতির্ময়'। কিন্তু যে যূণক (শোণপাংশু)-রা কেবল গতিকেই অবলম্বন করিয়াছে, যাহারা দাদাঠাকুরের নিকটে থাকিয়াও তাহাকে চেনে নাই তাহারা সেই জ্যোতির্ময় পুরুষের কথা জানিবে কেমন করিয়া? যে দর্ভকদের রবীন্দ্রনাথ মন্দির গড়ার কাজের অংশীদার হইবার যোগ্য বলিয়াও মনে করেন নাই তাহাদের পক্ষেও সেই মহান পুরুষের আগমনের সংবাদ পাইবার কথা নয়। সেইজন্য অতি সহজেই বলা যায় যে রজ ও তমোগুণ সম্পন্ন যূণক এবং দর্ভকদের কণ্ঠে এই গানটি দেওয়া যুক্তি সঙ্গত হয় নাই। যাহারা কেহই সত্যকে জানে না তাহারা কেহই নবীন আশার খড়্গধারী বিজয়ী বীরকে অভ্যর্থনা করিতেও পারে না। যে পঞ্চক গুরুকে গুরু এবং দাদাঠাকুর এই উভয় রূপেই উপলব্ধি-যোগ্য বলিয়া মনে করে[৮] সেই কেবল সেই জ্যোতির্ময় পুরুষকে যথার্থরূপে চিনিতে পারে। পঞ্চক জানে যে তিনি মানুষকে স্বাধীন করিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন আবার ইচ্ছা করিলে নিয়ন্ত্রণও করিতে পারেন। সুতরাং গুরু নাটকের শেষ গানটি গাহিবার যোগ্যতা কেবল তাহারই আছে। নূতন আলোকের জোয়ার লাগা বালকদেরও শেষ গানটির অংশীদার করা যাইতে পারিত। 'গুরু'তে মহাপঞ্চককে যূণকদের বসাইবার ভারও দেওয়া হয় নাই: পঞ্চক ও মহাপঞ্চক—স্বজ্ঞা ও বুদ্ধিকে কর্মের মধ্যে সম্মিলিতও করা হয় নাই। এই দিক দিয়া 'অচলায়তন'-এর তত্ত্ব 'গুরু' অপেক্ষা অনেক অধিক সার্থক। অপরদিকে দৃশ্য সংখ্যা কমাইয়া এবং দর্ভকদের কণ্ঠে কস্তু

৮। দাদাঠাকুর। যে জানতে চায় না যে আমি তাকে চালাচ্ছি আমি তার দাদাঠাকুর, আর যে আমার আদেশ নিয়ে চলতে চায় আমি তার গুরু।

পঞ্চক। প্রভু, তুমি তাহলে আমার দুইই। আমাকে আমিই চালাচ্ছি, আর আমাকে তুমিই চালাচ্ছ—এই দুটোই আমি মিশিয়ে জানতে চাই। (পৃ-১০০)

মূলক গানগুলি[১] না দিয়া 'গুরু' নাটককে নাট্য কলার দিক দিয়া সার্থকতর এবং প্রতীকিতায় উন্নততর করা হইয়াছে। সংক্ষেপে বলিতে পারা যায় যে, তত্ত্বের বিচারে কোন কোন ক্ষেত্রে 'গুরু' নাটকের সার্থকতা অধিক, আবার কোন কোন ক্ষেত্রে 'অচলায়তন' সার্থকতর। তবে নাট্য কলার বিচারে 'গুরু' অধিকতর সার্থক হইযাছে সন্দেহ নাই।

১। অচলায়তন নাটকে দর্ভকদের কণ্ঠের দ্বিতীয়, তৃতীয় এবং চতুর্থ গান।

ডাকঘর

(১৩১৮ : ১৯১২)

ছোট্ট নাটিকা ডাকঘর। তাহার প্রধান চরিত্র ছোট্ট একটি ছেলে। কিন্তু এই সব ছোটরা মিলিয়া যে সঙ্কেতটি করিয়াছে, তাহা নেহাৎ ছোট নয়। কয়েক পৃষ্ঠার মধ্যেই নাটকের দ্বন্দ্বটি ফুটাইয়া তোলা হইয়াছে। একদিকে কবিরাজ নস্য লইয়া শাস্ত্রের বিধান দিয়া গেল : 'অমলকে যদি রক্ষা করিতে হয় তবে 'ওকে বাইরে একেবারে যেতে দিতে পারবেন না' (পৃ-২) কারণ, 'শরৎকালের রৌদ্র আর বায়ু দুই-ই ঐ বালকের পক্ষে বিষবৎ '(পৃ-২)। অপরদিকে ঠাকুরদা, 'ছেলে খেপাবার সদ্দার' (পৃ-৩), 'শরতের রৌদ্র আর হাওয়ারই মতো' (পৃ-৫) ; যদিও ঠাকুরদা বলেন, 'ঘরে ধরে রাখবার মতো খেলাও আমি কিছু জানি (পৃ-৫)। কিন্তু সে-খেলার সঙ্গেও কবিরাজী শাস্ত্রের সংঘাতও বড কম নয়। মাধবদত্তের মনের মধ্যেও সংঘাত সৃষ্টি হইয়াছে—'ও কোথা থেকে এসে আমার ঘর জুড়ে বসল ; ও চলে গেলে আমাব এ ঘর যেন আর ঘরই থাকবে না' (পৃ-১)। নাটকের নামটিও হইয়াছে সুন্দর : পাঠক ও দর্শক চিত্তে স্বভাবতই এক অনির্দেশময়তা সৃষ্টি করিয়া বসে। ডাকঘর হইতে বিলি করা পত্রে কি যেন একটা রহস্যময়তা সর্বদাই থাকিয়া যায়। রবীন্দ্রনাথ নিজেও বলিয়াছেন, "চিঠিব দ্বাবা পৃথিবীতে একটা নূতন আনন্দের সৃষ্টি হয়েছে। …চিঠিপত্রে যে আমরা কেবল প্রত্যক্ষ আলাপের অভাব দূর করি তা নয়, ওর মধ্যে আরও একটু রস আছে যা প্রত্যক্ষ দেখাশোনায় নেই।…এই কারণে, চিঠিতে মানুষকে দেখবার এবং পাবার জন্য আরও একটা যেন নতুন ইন্দ্রিয়ের সৃষ্টি হয়েছে" (ছিন্নপত্র : ৮ই মার্চ, ১৮৯৫ : পৃ-২৭০)।

সি, এফ, এণ্ডরুজকে লেখা একখানি চিঠিতে রবীন্দ্রনাথ ডাকঘর-এর পত্রের ইঙ্গিত করিয়া বলিয়াছেন—

"I remember, at the time when I wrote it (The Post Office) my own feeling which inspired me to write it. Amal represents the man whose soul has received the call of the open road—he seeks freedom from the enclosure of habits sanctioned by

the prudent and from walls of rigid opinion built for him by the respectable (4th June, 1921).

অমল গুপ্ত মানুষের হৃদয়ের গভীরে সংগুপ্ত আত্মা : জীবাত্মা। পরমাত্মার সহিত মিলনেই জীবাত্মার পরম সার্থকতা। বিশ্বের নানা বৈচিত্র্য দেখিয়া তাহার কৌতূহল জন্মে। বৈচিত্র্যের মধ্যে, এই সমস্ত প্রকৃতির মধ্যেই পরম পুরুষের প্রকাশ, আনন্দরূপমমৃতম্ যদ্বিভাতি[১]। পৃথিবীর সকল কিছুই সেই ঈশ্বরের দ্বারা আবৃত—ইশাবাস্যমিদম্ সর্বম্ যৎ কিঞ্চ জগত্যাং জগৎ[২]। জগতের সকল কিছুর প্রতিই জীবাত্মা রূপ অমলের সপ্রেম দৃষ্টি। নিজের মনের মাধুরী দিয়া সে সকল কিছুকেই স্পর্শ করিতে চায়। বস্তুকে বস্তুমাত্র বলিয়াই সে মনে করে না, ভাবদৃষ্টি মেলিয়াই সে চাহিয়া থাকে। ভাবরূপে দেখার অর্থই অনির্বচনীয়কে বস্তুর মধ্যে দেখা--অসীমকে সীমার মধ্যে উপলব্ধি করা। তাই অমল সকলের সঙ্গেই নিজেকে মিলাইয়া দিতে চায়, "আমি যদি কাঠবিড়ালী হতুম তবে বেশ হত" (পৃ-৭)। পৃথিবীর সমস্ত কিছুই সে দুই চক্ষু মেলিয়া দেখিয়া লইতে চায়, "আমি, যা আছে সব দেখব—কেবলই দেখে বেড়াব" (পৃ-৮)। এই সময়ে রবীন্দ্রনাথের মনেও বাহির হইয়া পড়িবার বিশেষ আকাঙ্ক্ষা জাগ্রত হইয়াছিল। সমস্ত বন্ধন হইতে মন তখন মুক্তি চাহিতেছে, "...আমাকে আজ এমন করে টেনে নিয়ে যাচ্ছে যে কালের কোনো প্রয়োজন সংসারের কোনো দায়িত্ব আমাকে কোনোমতেই বসে থাকতে দিচ্ছে না। বেরো, বেরো, বেরো, রাস্তায় বেরিয়ে পড়...আজ আমার আর অন্য কোনো চিন্তা করবার জো নেই—তাই বেরিয়ে পড়বার আয়োজনে আমার "কটুও ক্লান্তি বা কৃপণতা নেই—মন একবারো পিছনে ফিরে তাকাতে চাইবে না" (দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের পুত্রবধূ—হেমলতা দেবীকে লিখিত পত্র : চিঠিপত্র ২৩শে আশ্বিন, ১৩১৮)। অমলেরও সেইরূপই ইচ্ছা, "আমাদের জানলার কাছে বসে সেই যে দূরে পাহাড় দেখা যায়, আমার ভারি ইচ্ছে করে, ঐ পাহাড়টা পার হয়ে চলে যাই" (পৃঃ ৮-৯)। মুক্তির জন্য এই বাহির হইয়া পড়ার আকাঙ্ক্ষা একান্তরূপেই প্রয়োজন। সমস্ত প্রকৃতির মধ্যে নিজেকে দেখিতে হইবে : যে মানুষটি ঝরণার ধারে বসিয়া ছাতু খাইতেছে তাহার সহিতও নিজেকে

১। মুণ্ডকোপনিষৎ : দ্বিতীয় মুণ্ডক : দ্বিতীয় খণ্ড :
২। ঈশোপনিষৎ

মিলাইয়া দেওয়া চাই। অমলের মানসিক অবস্থা এইরূপই। তাই যাহা কিছু সে দেখে তাহাই হইতে চায়। সে দইওয়ালা হইবে, সে ঘণ্টা বাজাইবার প্রহরী হইবে—কী না হইবে সে! এই বিশেষ অবস্থাই মুক্তির মুহূর্ত :

"When a man does not realise his kinship with the world, he lives in a prison-house whose walls are alien to him. When he meets the eternal in all objects, then he is emancipated, for then he discovers the fullest significance of the world into which he is born; then he finds himself in perfect truth, and his harmony with the all is established. In India men are enjoined to be fully awake to the fact that they are in the closest relation to things around them, body and soul, and that they are to hail the morning sun, the flowing water, the fruitful earth, as the manifestation of the same living truth which holds them in its embrace. (Sādhanā : p : 8-9)

আত্মা শিশুরই মত বিশুদ্ধ এবং নিজের আনন্দেই পরিচালিত হইতে চায়। যীশুর সেই বাণী স্মরণীয়—শিশুরাই স্বর্গে প্রবেশ করিতে পারে। আত্মা সেই শিশু। কিন্তু চারিদিক হইতে এই আত্মাকে শিশুরই ন্যায় আবদ্ধ করিয়া রাখিবার চেষ্টা দেখা যায়। শিশুকে মুক্তির আনন্দ না দিবার একটা চেষ্টা আছে, সে যে প্রাণবন্ত তাহা সমাজব্যবস্থা অস্বীকার করিতে চায়। রবীন্দ্রনাথের ব্যক্তিগত জীবনের অভিজ্ঞতার রসে ইহা পুষ্ট। তাঁহার বাল্যকালও ভৃত্যতন্ত্রে এইরূপ বন্ধনের মধ্যে কাটিয়াছে। আত্মাকেও সেইরূপ অবিদ্যা আবৃত করিয়া রাখিতে চায়—যতদিন অবিদ্যা দ্বারা সে আবৃত থাকে ততদিন তাহার মুক্তি নাই ; অমলরূপী আত্মাকেও তাই নানা বাধানিষেধের ডোরে আবদ্ধ করিয়া রাখিবার চেষ্টা দেখিতে পাই—

কবিরাজ

ওকে বাইরে একেবারে যেতে দিতে পারবেন না।

মাধবদত্ত

ছেলেমানুষ, ওকে দিনরাত ঘরের মধ্যে ধরে রাখা যে ভারি শক্ত।

কবিরাজ

তা কী করবেন বলেন। এই শরৎকালের রৌদ্র আর বায়ু দুই-ই ঐ বালকের পক্ষে বিষবৎ (পৃ-২)।

আত্মা স্বভাবতই মুক্ত না তাহা পরিবেশের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত ইহাই দার্শনিকদের প্রশ্ন। রবীন্দ্রনাথ বিশ্বাস করেন যে পরিবেশ বাধা দানের চেষ্টা করিলেও আত্মা শরৎকালের রৌদ্রের মতই বিশুদ্ধতায় ঝল্‌মল্‌ করে এবং বায়ুর মত মুক্ত। অবিদ্যার দ্বারা আবৃত থাকে বলিয়াই সে তাহার স্বরূপ চিনিতে পারে না। যেদিন সে নিজের স্বরূপ চিনিয়া লয় অর্থাৎ যেদিন মানুষ আত্মোপলব্ধি করে সেদিন আর তাহাকে কেহ রোধ করিতে পারে না—

"When a man sleeps he is shut up within the narrow activities of his physical life. He lives, but he knows not the varied relations of his life to his surroundings,—therefore he knows not himself. So when a man lives the life of Avidyā he is confined within his own self. It is a spiritual sleep ; this consciousness is not fully awake to the highest reality that surrounds him, therefore he knows not the reality of his own soul. When he attains Bodhi, i.e., the awakenment from the sleep of self to the perfection of consciousness, he becomes Buddha" (Sādhanā : p-32),

আত্মার মুক্তিই সেই বুদ্ধত্বলাভ। দৃষ্টিকে আচ্ছন্ন করিয়া থাকে যে অবিদ্যা তাহা অমলের নিকট হইতে দূরে সরিয়া যাইতেছে। পৃথিবীর মায়ার খেলার সম্বন্ধে সে সচেতন হইয়া উঠিতেছে, "দেখো ফকির, আজ সকালবেলা থেকে আমার চোখের উপরে থেকে থেকে অন্ধকার হয়ে আসছে ; মনে হচ্ছে, সব যেন স্বপ্ন" (পৃ-৫৪)। সকল কিছুর জন্য প্রেমের বোধই অবিদ্যাকে দূর করে। অমল তাই মুক্তি লাভ করিয়াছে—ঠাকুরদা তাহা জানেন, "বাবা, তোমার আর ভিক্ষার দরকার হবে না, তিনি তোমাকে যা দেবেন অমনিই দিয়ে দেবেন" (পৃ-৪৯)।

ভালবাসিলে ভালবাসা পাওয়াও যায়। অনেক সময় মনে সংশয় জাগে যে এই বস্তুতান্ত্রিক জগতে যেখানে লাভ এবং লোভই বড় হইয়া উঠিয়াছে সেখানে কি প্রেমের কোন মর্যাদা আছে! মহান হৃদয়ের প্রেম এই

অন্ধজগতে কেবল ঘা খাইযা ব্যর্থ হইযাই বুঝি যায। রবীন্দ্রনাথ তাহারও উত্তব মুক্ত আত্মা অমলের মধ্য দিযা দিয়াছেন। প্রেমের টান বিরূপ মনেও প্রেম জাগ্রত করিযা তোলে। অমল যখন দইওয়ালাকে ডাকিল তখন অকাবণ আহ্বানে দইওযালা অসন্তুষ্টই হইযাছিল---

অমল

দইওযালা, দইওযালা, ও দইওযালা।

দইওযালা

ডাকছ কেন। দই কিনবে ?

অমল

কেমন কবে কিনব। আমাব তো পযসা নেই।

দইওযালা

কেমন ছেলে তুমি। কিনবে না তো আমাব বেলা বইযে দাও কেন। (পৃ-১৪)

কিন্তু কিছুক্ষণেব মধ্যেই সেই মনোভাব পবিবর্তিত হইযা গেল। আত্মার মধুব পবিত্রতাব স্পর্শ লাগিল তাহাব মধ্যে। সেও যেন এক অনির্দেশ, অনির্বচনীযেব সন্ধান পাইল। তাহাব সন্ধান পাওযায তাহাব বস্তুগত লাভ এবং সীমিত সমষ তুচ্ছ হইযা গেল—

দইওযালা

বাবা, এক ভাঁড দই তুমি খাও।

অমল

আমার তো পযসা নেই।

দইওযালা

না না, না না—পযসাব কথা বোলো না। তুমি আমার দই একটু খেলে আমি কত খুশি হব।

অমল

তোমার কি অনেক দেরি হযে গেল।

দইওয়ালা

কিচ্ছু দেরি হয নি বাবা, আমার কোনো লোকসান হয় নি। দই বেচতে যে কত সুখ সে তোমার কাছে শিখে নিলুম। (পৃ-১৮-১৯)

প্রহরীর বেলায়ও তাহাই দেখি। অমলের তো প্রহরীকে দেখিয়া ভয় পাইবারই কথা, 'আমাকে ভয় কর না তুমি'। কিন্তু অমলের ভয় বলিয়া কিছু নাই, "কেন, তোমাকে কেন ভয় করব" (পৃ-২০)। একবার তাঁহাকে জানা হইয়া গেলে আর কোন কিছুতেই ভয় থাকে না। কারণ তখন যে সকলের মধ্যেই তিনি। ভয়ের মধ্যেও তাঁহার সেই অভয় মূর্তি বর্তমান! যে প্রহরী ভয়ের কথা স্মরণ করাইয়া দিয়াছে সেই প্রহরীর মুখেও শোনা গেল, "ছেলেটি ভারি মজার" (পৃ-২৪) "ছেলেটাকে আমার বেশ লাগছে" (পৃ-২৫)। প্রহরী তাহাকে রাজার চিঠির কথা বলিয়া গেল। অমলকেও যে রাজা চিঠি লিখিবেন তাহার প্রমাণস্বরূপ যে যুক্তি প্রহরী দেখাইয়াছে তাহা সরল মানুষের সহজ কথা, "তা নইলে তিনি ঠিক তোমার এই খোলা জানলাটার সামনেই অতবড়ো একটা সোনালি রঙের নিশেন উড়িয়ে ডাকঘর খুলতে যাবেন কেন" (পৃ-২৫)। বুদ্ধি অপেক্ষা স্বজ্ঞার দ্বারাই সত্য নির্ণয়ের সম্ভাবনা অধিক। প্রহরীর কথাই সত্য। যে প্রস্তুত হইয়াছে, যে প্রকৃতির মধ্যে অনির্বচনীয়কে দেখিয়াছে সে পিতার আশীর্বাদ যদি না পায় তবে পিতার অস্তিত্ব স্বীকার করিবার সার্থকতা নাই—

আলো, তোমায় নমি, আমার
মিলাক অপরাধ।
ললাটেতে রাখো আমার
পিতার আশীর্বাদ।
বাতাস, তোমায় নমি, আমার
ঘুচুক অবসাদ।
সকল দেহে বুলায়ে দাও
পিতার আশীর্বাদ।
মাটি, তোমায় নমি, আমার
মিটুক সর্বসাধ।
গৃহ ভরে ফলিয়ে তোলো
পিতার আশীর্বাদ।

(গীতাঞ্জলি : ৪৮ সংখ্যক কবিতা)

অমল আলো, মাটি, বাতাসকে অন্তরে আহ্বান করিয়াছে, পিতার আশীর্বাদ নিশ্চয়ই সে লাভ করিবে। "ভগবান স্বয়ং বলিয়াছেন, 'যাহারা

আমাতে নিরন্তর আসক্ত ও আমাকে প্রেমের সহিত উপাসনা করে, আমি তাহাদিগের বুদ্ধি এমনভাবে চালিত করি, যাহাতে তাহারা আমাকে লাভ করে" (স্বামী বিবেকানন্দ ঃ ভক্তিযোগ)। তাই অমলের মুক্তিরও আর বিলম্ব নাই। যে অন্তর্দৃষ্টি লাভ করিয়াছে তাহার মুক্তি আসন্ন তাই সংসারের মায়া তাহাকে টানিয়া রাখিবার চেষ্টা করিলেও অন্তরের প্রেরণা এবং অনন্ত ঈশ্বরের আহ্বান তাহাকে বাহির করিয়া লইয়া যাইবেই। সংসারের কবিরাজ যতই তাহাকে বাহিরে যাইতে নিষেধ করুক 'তার চেয়ে ভালো কবিরাজ যিনি আছেন তিনি এসে ছেড়ে দিয়ে যান' (পৃ-২৩)। তাই অমল যখন জিজ্ঞাসা করে, কবে সে ভালো হইবে তাহার উত্তরে মাধবদত্ত বলে, 'আর তো দেরি নেই বাবা'। অমলের মুক্তির আর বিলম্ব নাই—জীবাত্মা এইবার পরমাত্মার আহ্বান লিপি পাইবে। সেইজন্যই সোনালি নিশান, পবিত্রতার জয় পতাকা উড়াইয়া তাহারই কক্ষের সম্মুখে রাজা ডাকঘর স্থাপন করিয়াছেন। 'ডাকঘর' নাটক অভিনয়ের সময় প্রতীক হিসাবে পাখী বিহীন একটি শূন্য দাঁড় মঞ্চের সম্মুখে ঝুলাইয়া রাখা হইত[৩] তাহার তাৎপর্য এইখানে। দাঁড়ের বাঁধন কাটিয়া পক্ষীটি বাহির হইয়া পড়িয়াছে, অমলও সংসারের বাধা, মায়াকে অতিক্রম করিয়া সুদূরের অভিসারে বাহির হইয়াছে কল্পনার সাহায্যে ঃ জীবাত্মা দেহসীমা অতিক্রম করিয়া পরমাত্মার উদ্দেশ্যে যাত্রা করিয়াছে। কবির এই সময়কার মনোভাব লক্ষণীয়, "শান্তিনিকেতনের ছাদের উপর মাদুর পেতে পড়ে থাকতুম। প্রবল একটা আবেগ এসেছিল ভিতরে। চল চল বাইরে, যাবার আগে তোমাকে পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ করতে হবে—সেখানকার মানুষের সুখ দুঃখের উচ্ছ্বাসের পরিচয় পেতে হবে। সে সময় বিদ্যালয়ের কাজে বেশ ছিলাম। কিন্তু হঠাৎ কি হল। রাত দুটো-তিনটের সময় অন্ধকার ছাদে এসে মনটা পাখা বিস্তার করল। যাই যাই এমন একটা বেদনা মনে জেগে উঠল।...কোথাও যাবার ডাক ও মৃত্যুর কথা উভয় মিলে, খুব একটা আবেগে, সেই চঞ্চলতাকে ভাষাতে 'ডাকঘরে' কলম চালিয়ে প্রকাশ করলুম" (শান্তিদেব ঘোষ ঃ রবীন্দ্রসঙ্গীত ঃ পৃ-২২৪)।

মুক্ত আত্মার কাহারও উপর ক্রোধ নাই, বিদ্বেষ নাই। সে সকলকেই

৩। অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, রাণী চন্দ ঃ ঘরোয়া ঃ পৃ-১৬২।

নিজের করিয়া লয়, শক্রকেও সে কখনও শক্র বলিয়া মনে করে না। তাই রাজকবিরাজ যখন মোড়লকে নির্দেশ করিয়া বলিলেন, "ঐ লোকটিকে তো এ ঘরে রাখা চলবে না" (পৃ-৬৩), তখন অমল তাহাকে ত্যাগ করিতে পারিল না। বন্ধু বলিয়া ধরিয়া রাখিল, "না, না কবিরাজমশায়, উনি আমার বন্ধু। তোমরা যখন আস নি উনিই আমাকে রাজার চিঠি এনে দিয়েছিলেন (পৃঃ ৬৩-৬৪)। এইরূপ না হইলে মহৎ হৃদয় হয়না। রবীন্দ্রনাথ অন্যত্র বলিয়াছেন, "শক্রকে ক্ষমা করিবে একথা বলিলে যথেষ্ট বলা হইল। কিন্তু তাঁহারা সে কথাও ছাড়াইয়া বলিয়াছেন শক্রকে প্রীতিদান করিবে যেমন করিয়া চন্দনতরু আঘাতকারীকেও সুগন্ধ দান করে। তাহার কারণ এই প্রেমের মধ্যেই তাহারা সত্যকে পূর্ণ করিয়া দেখিয়াছেন" (সঞ্চয় : ধর্মের অধিকার : পৃঃ ৯১-৯২)।

অমলের চরিত্রের মধ্য দিয়া রবীন্দ্রনাথ এই কথাটাও বলিয়াছেন যে পাণ্ডিত্যের দ্বারাই সকল কিছু লভ্য হয় না—

"We cannot attain the supreme soul by successive additions of knowledge (Sādhanā : p-37)

যাঁহারা কেবল পুঁথিই পড়িলেন, জগৎকে দেখিলেন না তাঁহাদের মুক্তি কখনও সম্ভব নয়—

মাধবদত্ত

দেখো, বড়ো বড়ো পণ্ডিতেরা সব তোমারই মতো—তারা ঘর থেকে তো বেরোয় না।

অমল

বেরোয় না?

মাধবদত্ত

না, কখন বেরোবে বলো। তারা বসে বসে কেবল পুঁথি পড়ে—আর কোনোদিকেই তাদের চোখ নেই। (পৃ-৭-৮)

আর কোনোদিকেই যাহাদের চোখ নাই তাহারা ছিদাম ভিখারীর মতোই অন্ধ। তাহাদের কানা বলা হউক আর নাই হউক তাহারা যে চোখে দেখিতে পায় না তাহা একান্তই সত্য কথা, "ও যেন মিথ্যা কানা-ই হল, কিন্তু চোখে দেখতে পায় না—সেটা তো সত্যি" (পৃ-৫১)।

বাহিরের বৈচিত্র্যের মধ্যে যিনি অন্তরের মধ্যেও তাঁহারই প্রতিষ্ঠা—

জগতের মাঝে কত বিচিত্র তুমি হে
তুমি বিচিত্র রূপিনী ॥
... ...
অন্তর মাঝে শুধু তুমি একা একাকী
তুমি অন্তরব্যাপিনী। (চিত্রা : চিত্রা)

এই উপলব্ধিতে পৌঁছাইলে তবেই যথার্থ মুক্তি। পরম সুন্দরের বার্তাবহ ঠাকুরদা সেইজন্যই যেমন স্থান হইতে স্থানান্তরে ঘুরিয়া বেড়ান তেমনি আবার তিনি ঘরে ধরিয়া রাখিবার খেলাটিও জানেন। অমলও সেই উপলব্ধির জগতে আসিয়া পৌঁছিয়াছে। নিত্য চঞ্চল এবং চির শান্ত স্থৈর্যের মধ্যে সেই একেরই অস্তিত্ব এবং প্রকাশ যেদিন সে অনুভব করিল সেদিন বৈচিত্র্যের মধ্যে নিজেকে মিলাইয়া দিয়া সার্থক হইবার আর তাহার প্রয়োজন হইল না। ঘরের মধ্যে থাকিয়াও সার্থকতা অর্জন করা যায় এ বোধ তাহার হইল। ঘরের মধ্যেও তাঁহার সহিত মিলনের কোন বাধা নাই, "...প্রথমে যখন আমাকে ঘরের মধ্যে বসিয়ে রেখে দিয়েছিল আমার মনে হয়েছিল যেন দিন ফুরোচ্ছে না, আমাদের রাজার ডাকঘর দেখে অবধি এখন আমার রোজই ভালো লাগে—এই ঘরের মধ্যে বসে বসেই ভালো লাগে—একদিন আমার চিঠি এসে পৌঁছবে, সে-কথা মনে করলেই আমি খুব খুশি হয়ে চুপ করে বসে থাকতে পারি" (পৃ-৫২) পুরাণের মার্কণ্ডেয়রও এইরূপ হইয়াছিল। তিনি বৈচিত্র্য এবং মায়াতত্ত্ব জানিতে গিয়া অকস্মাৎ সেই সঙ্গীত শুনিলেন। পরম সত্তার শ্বাস-প্রশ্বাসের শব্দ তিনি শুনিতেছিলেন। সেইজন্যই তিনি এক নির্জন স্থানে একাকী বসিয়া রহিলেন এবং জগতের গতি জানিবার জন্য আর কিছুমাত্র আগ্রহ তাঁহার রহিল না। সর্বত্র ঘুরিয়া বেড়াইয়া মায়াতত্ত্ব অনুসন্ধান করিবার আর তাঁহার কোনো ইচ্ছাও ছিল না। আনন্দদায়ক হইলেও বিচিত্র জগৎকে অনন্তকাল দেখিয়া বেড়াইবার যাদুতে তিনি যে মুগ্ধ হইয়াছিলেন তাহার হাত হইতে উদ্ধার পাইলেন। অপূর্ব স্বর্গীয় সঙ্গীত আজ তাঁহার সমস্ত চিত্তকে আকর্ষণ করিয়া লইয়াছে[৪]। যাঁহাকে সকলের মধ্যে দেখি, তাঁহাকেই স্তব্ধ হইয়া থাকিয়াও চিনিয়া লইতে আর অসুবিধা হয় না।

৪। Zimmer : Myths and Symbols in Indian Art and Civilisation.

এই উপলব্ধির পর আর আকাঙ্ক্ষিত কি থাকিতে পারে? এইবার তাঁহার আদেশলিপি পাইবার জন্য কেবল অপেক্ষা করিয়া থাকা, "রাজার কাছ থেকে রোজ একটা করে চিঠি যদি পাই তাহলে বেশ হয়" (পৃ-২৭)। রাজার এই চিঠি মৃত্যু নয়—ইহা পরম সুন্দরের আহ্বান। অক্ষর জ্ঞান থাকিলেই ইহার পাঠোদ্ধার করা যাইবে না, ইহা পাঠ করিতে হইলে 'বড়ো' হওয়া চাই। জ্ঞানে-প্রেমে বড়ো হইলে তবেই অন্তরের দৃষ্টি খুলিয়া যায়, "আমি তো পড়তে পারি নে। কে পড়ে দেবে। পিসিমা তো রামায়ণ পড়ে। পিসিমা কি রাজার লেখা পড়তে পারে। কেউ যদি পডতে না পারে জমিয়ে রেখে দেব, আমি বড়ো হলে পডব" (পৃ-২৭)।

মানুষ যখন জন্মগ্রহণ করে তখনও সে পরিচয়পত্র সঙ্গে লইয়া আসে। বিশ্বসংসারের নিকট তাহা না হইলে সে কিসের জোরে প্রতিষ্ঠা পাইবে! পরিচয়পত্র থাকে বলিয়াই না তাহার প্রতি তাহার ঘরের মানুষের প্রেম-প্রীতি উৎসারিত হয, "এই মেয়েটিও যেদিন প্রথম এই পৃথিবীতে আসিল উহার ছোট মুঠির মধ্যে একখানি অদৃশ্য পরিচয়পত্র ছিল। সকলের চেয়ে যিনি বড তিনিই নিজের নাম সই করা একখানি চিঠি ইহার হাতে দিয়াছিলেন তাহাতে লেখা ছিল, এই লোকটি আমার নিতান্ত পরিচিত, তোমরা যদি ইহাকে যত্ন কর তবে আমি খুসি হইব" (সঞ্চয়ঃ নামকরণঃ পৃ-১৯)। অদৃশ্য চিঠি অথবা মোডলের দেওয়া সাদা কাগজও অন্তদৃষ্টি সম্পন্ন মানুষের নিকট অর্থময হইয়া ওঠে। সংসারের দৃষ্টিতে যাহাকে খেপামি বলি তাহা অনেক সময়েই হৃদয়ের অনেক উচ্চতর অবস্থা হইতে পারেঃ রাজার ছেলের সংসার ছাডিয়া যাওয়াও খেপামি বলিয়া তুচ্ছ করিবার নয়। ইঁহারাই প্রকৃতপক্ষে পৃথিবীকে এক অদৃশ্য সোনার তারে এখনও বাঁধিয়া রাখিয়াছেন। ইঁহারাই যুগে যুগে রাজার নির্দেশ পান, "হাঁ, আমি খেপেছি। তাই আজ এই সাদা কাগজে অক্ষর দেখতে পাচ্ছি। রাজা লিখছেন, তিনি স্বয়ং অমলকে দেখতে আসছেন, তিনি তাঁর রাজকবিরাজকেও সঙ্গে করে আনছেন (পৃ-৫৯)।

রবীন্দ্রনাথ যে রাজার চিঠির কথা বলিয়াছেন বহু সাধকই তাহার সন্ধান পাইয়াছেন। প্রকৃতির বিচিত্রতার মধ্যে জ্ঞানদাসবঘেলি সেই পত্র পাইয়াছেন—

"ফ.জর্‌মেঁ জব্ আয়া, য়ল্‌চী, পুষাক্ সুনহ্‌লী তেরী।
গমক্ ভর জব্ শ্বাস্ লগায়া, চিত জগায়া মেরী।
ধূপমেঁ হম্‌কো কিয়া উদাসা, ক্যা পীড় দূর্ সমায়া।
গায়া গেরুবা সুর মগ্.রবী, মরণসা রয়্‌ন্ আয়া।
কাগ.জ্ কালা, হরফ্ উজালা, ক্যা ভারী খ.ত পায়া"।

জীবাত্মা অনন্তের দূতকে (বিশ্বচরাচরকে) জিজ্ঞাসা করিতেছেন, (১) "হে দূত, প্রভাতে তুমি যখন আসিলে, তখন তোমার পোষাক স্বর্ণবর্ণ ছিল। (২) পুষ্পগন্ধে, ভরিয়া তোমার নিঃশ্বাস যখন তুমি ফেলিলে, তখনই আমার চিত্তকে জাগাইয়া তুলিলে। (৩) মধ্যাহ্নের রৌদ্রে আমাকে তুমি উদাস করিয়া তুলিলে; কি এক ব্যথা যেন দূর (দিগন্ত পর্যন্ত) প্রবেশ করিল। (৪) সূর্যাস্তকালে তুমি যেন গৈরিকের (উদাস ভাবের) সুর গাহিলে; ক্রমে মরণ-সমান অন্ধকার রজনী আসিল। (৫) তখন (তোমার হাত হইতে প্রিয় পরমেশ্বরের) একখানি বৃহৎ পত্র পাইলাম, তার কাগজ কৃষ্ণবর্ণ (আকাশ), অক্ষরগুলি উজ্জ্বল (নক্ষত্র) (ব্রহ্মসঙ্গীত: ১৯৭১ সংখ্যক কবিতা)।

জীবাত্মা যখন মিলনের জন্য উদ্‌গ্রীব হয় তখন আর কোন বাধাই থাকে না। তখন পরমাত্মার চিঠি তাঁহার নিকট আসিয়া পৌঁছায়। আবেগ চঞ্চল হইয়া অমল তাই দেখিতে পায়, "রাজার ডাকহরকরা পাহাড়ের উপর থেকে একলা কেবলই নেমে আসছে—বাঁ হাতে তার লণ্ঠন, কাঁধে তার চিঠির থলি। কত দিন, কত রাত ধরে সে কেবলই নেমে আসছে। পাহাড়ের পায়ের কাছে ঝরনার পথ যেখানে ফুরিয়েছে সেখানে বাঁকা নদীর পথ ধরে সে কেবলই চলে আসছে"— (পৃ-৪৮)।

চিঠি আসা এবং অমলের ঘুম যে মৃত্যু নয় এই কথাটি রবীন্দ্রনাথ নিজেও বলিয়াছেন, "ডাকঘরের অমল মরেছে বলে সন্দেহ যারা করে তারা অবিশ্বাসী—রাজবৈদ্যের হাতে কেউ মরে না, কবিরাজটা ওকে মারতে বসেছিল বটে[৫]। রাজবৈদ্য মোহাচ্ছন্নতা দূর করেন, দ্বার ভাঙিয়া তিনি প্রবেশ করেন, সংস্কারের বন্ধনগুলি ছেদন করাই তাঁহার কাজ, "এ কী। চারিদিকে সমস্তই যে বন্ধ! খুলে দাও, খুলে দাও, যত দ্বার-জানলা আছে

৫। ১৭.২।৩৯ তারিখে লেখা: প্রমথনাথ বিশী: রবীন্দ্রনাট্য প্রবাহ; দ্বিতীয় খণ্ড ১৩১ পৃষ্ঠার পাদটীকা।

সব খুলে দাও" (পৃ-৬২)। এই মহালগ্নেই জীবাত্মার আত্মপরিচয় হয় ইহা এক পরম আনন্দময় অবস্থা, অমলের ঘুম আত্মার প্রশান্তি ব্যতীত আর কিছুই নয়—"···this state of supreme bliss is not 'death but completeness'. It is the perfection of consciousness···" (S. Radhakrishnan : The Philosophy of Rabindranath Tagore : p-60)। মৃত্যু বলিয়া যাহাকে মনে হইতেছে তাহা প্রতীক মাত্র। এইরূপ প্রতীকের প্রয়োগ অন্যত্রও হইয়াছে। রবীন্দ্রনাথ নিজেই বলিয়াছেন, "এইটে আমার ঘর বলে আমি-লোকটা দিনরাত্রি খেটে মরছে। যতক্ষণ না বলতে পারছে 'এইটে তোমারও ঘর', ততক্ষণ তার যে কত দাহ, কত বন্ধন, কত ক্ষতি তার সীমা নেই—ততক্ষণ ঘরের কাজ করতে করতে তার অন্তরাত্মা কেঁদে গাইতে থাকে, 'হরি, আমায় পার করো'। যখনই সে আমার ঘরকে তোমারই ঘর করে তুলতে পারে তখনই সে ঘরের মধ্য থেকে পার হয়ে যায়" (শান্তিনিকেতন ১ম খণ্ড : পার করো : পৃ-৮৯)। সুতরাং আত্মার পার হইবার জন্য দেহের মৃত্যুর কোন প্রয়োজন নাই। এই দেহের মধ্যে, সংসারের মধ্যে থাকিয়াও সে পার হইতে পারে। মৃত্যুকে প্রতীকরূপে বিভিন্ন ধর্মেও প্রয়োগ করা হয়—"It is not only in Budhism and the Indian religions, but in Christianity too, that the ideal of selflessness is preached with all fervour. In the last the symbol of death has been used for expressing the idea of man's deliverance from the life which is not true. This is the same as Nirvāna, the symbol of the extinction of the lamp." (Sādhanā : p-72).

'ডাকঘর'-এও দেখিতে পাই রাজকবিরাজ বলিতেছেন, "প্রদীপের আলো নিবিয়ে দাও—এখন আকাশের তারাটি থেকে আলো আসুক। ওর ঘুম এসেছে" (পৃ-৬৫)। প্রদীপ নিবাইয়া দেওয়ার তাৎপর্য এই যে আত্মা নির্বাণ লাভ করিয়াছে। আর সে সংসারের ক্ষুদ্রতার মধ্যে লুপ্ত হইয়া নাই, অবিদ্যার ঘোরে দেখা খণ্ড জগৎ তাহার দৃষ্টির বাহিরে চলিয়া গিয়াছে—তাই তাহার 'ঘুম এসেছে'। মুক্ত আত্মাকে অনন্ত সত্তা পথ দেখাইবে : আকাশের তারার আলোই এখন তাহার জীবনের পথ প্রদর্শক। ঈশ্বরের সহিত সাযুজ্য লাভের অনুভূতিকে সুফীরা 'ফণা' বলেন। ইহার তাৎপর্য

জীবিত অবস্থায় মৃত্যুবরণ অর্থাৎ অহংবোধকে লুপ্ত করিয়া দেওয়া[৬]। 'বিদ্যাঞ্চাবিদ্যাঞ্চ যস্তদ্বেদো ভয়ংসহ। অবিদ্যয়া মৃত্যুং তীর্ত্বা বিদ্যয়ামৃতমশ্নুতে'। বিদ্যা এবং অবিদ্যা উভয়কেই যিনি একত্র করিয়া জানেন তিনি অবিদ্যাদ্বারা মৃত্যু হইতে উত্তীর্ণ হইয়া বিদ্যাদ্বারা অমৃত প্রাপ্ত হন"। (ধর্ম : ততঃ কিম্) সুতরাং অমলের ঘুম সংসারের ক্ষুদ্রতা হইতে মৃত্যু, সে আবার জাগিয়া উঠিবে : এই জাগরণ মহৎ জীবনে, অধ্যাত্ম জীবনে জাগরণ—রাজার আহ্বানেই তাহা সম্ভব—

সুধা

অমল !

রাজকবিরাজ

ও ঘুমিয়ে পড়েছে।

সুধা

আমি যে ওর জন্যে ফুল এনেছি—ওর হাতে কি দিতে পারব না।

রাজকবিরাজ

আচ্ছা, দাও তোমার ফুল।

সুধা

ও কখন জাগবে।

রাজকবিরাজ

এখনি যখন রাজা এসে ওকে ডাকবেন। (পৃ-৬৬)

সুতরাং রবীন্দ্রনাথের কথা পুনবায় স্মরণ করিতে হয়, "ডাকঘরের অমল মরেছে বলে সন্দেহ যারা করে তারা অবিশ্বাসী—রাজবৈদ্যের হাতে কেউ মরে না"।

রাজার সন্ধান যে পাইয়াছে সে রাজার সংবাদ ঘরে ঘরে পৌঁছাইয়া দিবার আগ্রহ প্রকাশ না করিয়া পারে না—

"St. John of the cross says :

The state of union with the Divine consists in complete transformation of the will of the soul into that of God, in such

৬। K. S. Ramaswami Sastri : The Evolution of Indian Mysticism.

a way that the will of God becomes the only principle and motive underlying all action, as though the will of God and the will of the soul were but one" (K. S. Ramaswami : The Evolution of Indian Mysticism : p : 22-23).

সেই জন্যই অমল রাজার ডাকহরকরা হইবার জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছে। আত্মজ্ঞান লাভের পর তাঁহারই বার্তা ছড়াইয়া দেওয়া ব্যতীত আর কোন কাজ করা চলে না। তাই অমল বলে, "…তিনি যেন আমাকে তাঁর ডাকঘরের হরকরা করে দেন—আমি দেশে দেশে ঘরে ঘরে তাঁর চিঠি বিলি করব" (পৃ-৬৪)। তাহার হাতেও থাকিবে লণ্ঠন—সেই জ্ঞানের আলোতেই মানুষ সত্য পথ চিনিয়া লইতে পারিবে। প্রকৃতি জগতেও রহিয়াছে তাঁহার বিচিত্ররূপী ডাকহরকরা, ঋতুতে ঋতুতে তাহারা নূতনের বার্তা বহন করিয়া আনে, "একজন আছে বাদল হরকরা, একজন আছে শরৎ—আরও কত আছে (পৃ-৩৮)। সেইরূপ মানুষের জগতের ডাকহরকরা অমল জাতীয় মুক্ত জীবাত্মার দল যাঁহারা নির্বাণ লাভ করিয়া মানুষের জগৎকে ঈশ্বরের জগতে পরিণত করেন।

মাধবদত্ত খাঁটী সংসারী—সারাজীবন অর্থোপার্জন করিতে গিয়া সে নিজের আত্মাকে মায়াচ্ছন্ন করিয়া রাখিযাছে। কিন্তু অর্থোপার্জনের ফাঁকে ফাঁকে যে গৃহিনীর করুণ মুখখানির দিকে চাহিয়া মাঝে মাঝে শোকগ্রস্ত হয়, সে যে একেবারে রসহীন বিশুষ্ক হইয়া ওঠে নাই, তাহা সহজেই অনুমান করা চলে। তাই তাহার অন্তরাত্মাকে ধীরে ধীরে জাগিয়া উঠিতে দেখি—সেখানে একটা সাড়া জাগিয়াছে, পুলক লাগিয়াছে। সংসারক্লিষ্ট যন্ত্রস্বরূপ মাধবদত্তের সেই সদ্য জাগরিত আত্মা অমল। এই কুঁড়ির মতো প্রকাশোন্মুখ আত্মাকে মাধবদত্ত একটু একটু করিয়া ভাল না বাসিয়াও পারিতেছে না, "জান তো ভাই, অনেক কষ্টে টাকা করেছি, কোথা থেকে পরের ছেলে এসে আমার বহু পরিশ্রমের ধন বিনা পরিশ্রমে ক্ষয় করতে থাকবে, সে-কথা মনে করলেও আমার খারাপ লাগত। কিন্তু, এই ছেলেটিকে আমার যে কী রকম লেগে গিয়েছে" (পৃ-৪)। পূর্বে অর্থ উপার্জন ছিল একটা নেশা, কিন্তু এখন ছেলেটি সব পাইবে মনে হওয়ায় উপার্জনে সে খুবই আনন্দ অনুভব করিতেছে। এই আত্মা অথবা প্রাণপুরুষ যেন প্রক্ষিপ্ত হইয়াছে, তাহার নিজের নহে, অথচ তাহাকে দূরে সরাইয়া

দিবারও উপায় নাই। তাই নাটকটিতে অমলকে পাই পোষ্যপুত্ররূপে। এই প্রাণপুরুষ যেন বাহির হইতে আসিয়া জুড়িয়া বসিয়াছে। মাধব অমলকে পথের ধারে বসিতে দিয়াছে, কিন্তু বাহির হইয়া পড়িতে দেয় নাই। মাধবদত্তকে দেহ বা জৈব সত্তার প্রতীক বলা যাইতে পারে। ভোগের জগতের জানালা দিয়া সে-ই বাহিরের উন্মুক্ত ক্ষেত্রের দিকে চাহিয়া থাকে বটে, কিন্তু সংসারকে অতিক্রম করিয়া আত্মত্যাগের মহাযাত্রার পথে নামিয়া পড়িতে পারে না। বৈচিত্র্যের রহস্য একটু একটু করিয়া উপলব্ধি করিলেও পুরাতন ভোগপূর্ণ সংসার চেতনার সংস্কার ভেদ করিয়া সে পথে বাহির হইয়া পডিতে পারিতেছে না। জৈব সত্তায় কোথাও একটা পুলক দেখা দিয়াছে বলিয়া সে কবিরাজের শ্লোকগুলি আর শুনিতে না চাহিলেও তাহার বিধিনিষেধকে অস্বীকার করিতে পারিতেছে না। সংসার তাহাকে ছাডিয়াও ছাডিতেছে না। ক্ষুদ্রতার ভোগ বন্ধন কাটিতে পারিলেই যে বিরাটের প্রেমবন্ধনে ধরা পডিয়া দেহও সার্থক হয তাহা সে বুঝিতে পারিতেছে না। বাহির ও অন্তর—মাধব ও অমল—এক হইযা যাইতে পারে নাই। এক হইবার আগ্রহ জাগিলেও সংস্কার সহজে ভাঙ্গে না। রাজার আগমন স্বীকার করিলেও অবিশ্বাস তাহার ঘোচে না। জৈব সত্তা কি সহজে কখনও ভোগ ত্যাগ করিতে পারে! তথাপি ইহাও সত্য যে আত্মার যাদু তাহাতে লাগে এবং একদিন সে ভোগকে তুচ্ছ করিতে শেখে। তাই অমলের অভাব সে সহ্য করিতে পারে না, "আমার কেমন ভয় হচ্ছে। এ যা দেখছি এ-সব কি ভালো লক্ষণ। এরা আমার ঘর অন্ধকার করে দিচ্ছে কেন" (পৃ-৬৬)। এতদিন যে উপার্জনের নেশায় ছিল এখন তাহার মধ্যে প্রেমের স্পর্শ লাগিযাছে। ইহা তাহাকে অবশ্যই উচ্চতর লোকে লইয়া যাইবে। রাজ কবিরাজ সেই জন্যই তাহাকে ঘর হইতে বাহির করিয়া দিতে চাহেন নাই। মুক্ত আত্মার যাদু স্পর্শে ক্রমেই আচ্ছন্ন হইতেছে মাধবদত্ত।

ঠাকুরদা আনন্দ, জগতের লীলা পরিচয়ে ঈশ্বরের মাধ্যম। রোজই তিনি ডাকঘরের রাজার নিকট ভিক্ষা লইতে যান। নিজের অন্তরের পথে পরম পুরুষের নিকটে যাওয়া যায় ইহাই তিনি বলিয়া বেডান, "ভিতরের দিক দিয়ে সে একটা রাস্তা আছে, সে হয়তো খুঁজে পাওয়া শক্ত" (পৃ-৫১)। শিশুদের সঙ্গে তাই তাঁহার মিতালি—কারণ তাহাদের জন্যই স্বর্গের দ্বার

উন্মুক্ত। তাহারা সরল সহজ বলিয়া সেই ভিতরের পথটির, প্রেমের পথটির সন্ধান সহজেই করিতে পারিবে। অকারণ আনন্দে সদাই তাহারা উদ্বেল; তাহাদের মধ্যে সংসারের জটিলতার আকর্ষণ নাই। আনন্দের প্রতীক ঠাকুরদা সেইজন্যই অমলের নিকট হাল্‌কা দেশের গল্প করেন। তিনি হাল্‌কা দেশ দেখিয়া আসিয়াছেন। যেখানে মাধ্যাকর্ষণ রূপ ভোগাকর্ষণ অনেক কম, সেখানে "কোনো জিনিসের কোনো ভার নেই—যেখানে একটু লাফ দিলেই অমনি পাহাড় ডিঙিয়ে চলে যাওয়া যায়" (পৃ-৫১)—এখানে সামান্য চেষ্টাতেই বড় বড় বাধা অতিক্রম করা যায়। যেখানে সংস্কারের পিছু টান নাই, যেখানে দেহ-প্রাণ-মন একাকার হইয়া প্রজাপতির মত পাখা মেলিয়া উড়িয়া বেড়ায়, সেই তো আনন্দের দেশ! শিশু অমলের সহিত তাঁহার হৃদয়ের পরিচয়। যে আত্মা বৈচিত্র্যের মধ্যে পরম সুন্দরের সন্ধানে চক্ষু দুইটিকে সদা জাগ্রত রাখিয়াছে আনন্দ আসিয়া তাহাকে পরিপূর্ণ সত্যে দীক্ষিত করিবেই তো! ঘরের মধ্যে থাকিয়াও যে সেই পরম সুন্দরকে লাভ করা যায় এই সত্যের সন্ধান তিনি দিয়া যান, "ঘরে ধরে রাখবার মতো খেলাও আমি কিছু জানি" (পৃ-৫)। অমল যখন বলে, "তুমি যে কত বেড়াতে পাও, সবাই তো সে পায় না" (পৃ-৫২) তখন ঠাকুরদা বলেন, "বাবা, ঘরে বসে থাকলেই বা এত কিসের দুঃখ" (পৃ-৫২)। আনন্দের নিকট দীক্ষিত জীবাত্মার সেই উপলব্ধি হইল, ঘরের মধ্যে বসিয়া থাকিয়াও আর অমলের দুঃখ হয় না—এই ঘরের মধ্যেও রাজার আহ্বান আসিবে ইহা সে নিশ্চিতরূপে উপলব্ধি করিয়াছে, "একদিন আমার চিঠি এসে পৌঁছবে, সে-কথা মনে করলেই" অমল খুব খুশি হইয়া চুপ করিয়া থাকিতে পারে।

ঠাকুরদা ও অমল কবিরাজকে ভয় করে। কবিরাজ—বাধা, নিষেধ-সংস্কার; যন্ত্র বলিলেও চলে। এই যন্ত্রের নিষ্পেষণে আত্মা ও আনন্দ হাঁপাইয়া ওঠে। চারিদিকের জানালা. দরজা বন্ধ করিয়া রাখিয়া ইহারা বস্তুজগৎটাকেই একমাত্র সত্য করিয়া রাখিতে চায়, "তোমাদের সদর-দরজার ভিতর দিয়ে হুহু করে হাওয়া বইছে। ওটা একেবারেই ভালো নয়। ও-দরজাটা বেশ ভালো করে তালাচাবি বন্ধ করে দাও।......ঐ যে জানলা দিয়ে সূর্যাস্তের আভাটা আসছে, ওটাও বন্ধ করে দাও, ওতে রোগীকে বড়ো জাগিয়ে রেখে দেয়" (পৃ-৫৬)। কোন ফাঁক দিয়া যেন

কোন অনির্দেশ রহস্য আসিয়া অবিদ্যায় আচ্ছন্ন জীবাত্মাকে স্পর্শ না করে, তাহাকে যেন ভোগের জগৎ, মাযার জগৎ হইতে আকর্ষণ করিয়া না লয়। কবিরাজ সর্বপ্রকার গতিশীলতা এবং উদারতার বিরোধী, সেইজন্যই মাধব দত্তকে সে বুঝাইয়া দেয় যে অমলের পক্ষে শরৎকালের রৌদ্র এবং বায়ু দুই-ই বিষবৎ। জগৎটাকে বিধি-বিধানের ফাঁসে, জ্যামিতিক নিয়মে চালাইয়া লইবার ইচ্ছাই তাহাদের সমস্ত মন জুড়িয়া—আনন্দের কোন অর্থই নাই ইহাদের নিকট।

মোড়লকে দেখিয়া প্রহরীর কথা মনে পড়ে, "ও আপনি মোড়লি করে। যে ওকে না মানতে চায় ও তার সঙ্গে দিনরাত এমনি লাগে যে, ওকে সকলেই ভয় করে। কেবল সকলের সঙ্গে শত্রুতা করেই ও আপনার ব্যবসা চালায়" (পৃঃ ২৬-২৭)। মানুষের মন এই মোড়ল। জীবনের সব কিছুর উপর সে নিজের ব্যাখ্যা চাপাইয়া দিবার চেষ্টা করে। সে যতক্ষণ বস্তুকেই একমাত্র সত্য বলিয়া মনে করে ততক্ষণ আত্মাকে আচ্ছন্ন করিযা রাখিতে চায। তাহার শব্দ শুনিবামাত্র যতবড ডাকাতই হউক না কেন, ভয়ে থামিয়া যাইবে ইহাই তাহার বিশ্বাস। কিন্তু আত্মা যে নিজের ইচ্ছাযেই নিজেকে চালিত করিতে পারে সে সংবাদ সে রাখে না। আত্মার যাদু স্পর্শ যে ধীরে ধীরে তাহার উপরও প্রভাব বিস্তার করে তাহাও সে বুঝিতে পারে না। তাই রাজার আগমন সংবাদ দিতে পরিহাস করিযা মোডল যাহা বলিল তাহাই সত্য হইয়া গেল—অমলের স্পর্শে অজ্ঞাতসাবেই তাহার মধ্যে একটা সাডা লাগিয়া গিয়াছিল, "না, এ ছেলেটার ভক্তিশ্রদ্ধা আছে। বুদ্ধি নেই বটে, কিন্তু মনটা ভালো" (পৃ-৬০)। আত্মা তাহাকে বন্ধু বলিয়া গ্রহণ করিয়াছে। মন এবং অন্যান্য ইন্দ্রিয় দ্বারাই জীবাত্মাকে কাজ করিতে হয, মনকে তাই বাতিল করিয়া দেওয়া তাহার পক্ষে সম্ভব নয়। মনও আজ বস্তুসত্তার বাহিরেও যেন একটা কিছুর অস্তিত্ব অনুভব করিতে পারিয়াছে প্রাণ পুরুষের সাহচর্য পাইয়া। কিন্তু মন অপেক্ষা স্থূল এই সংস্কারে গড়া দেহ। তাই মাধবদত্ত তখনও অবিশ্বাসী: সেই শেষ সময়েও সে নিজের জডত্ব ভুলিয়া জীবাত্মা বা প্রাণপুরুষের নির্দিষ্ট পথে যাইতে পারিতেছে না। যে জীবাত্মা ধ্রুবতারাকে অনেকবার দেখিয়াও সংস্কারে আবদ্ধ থাকিয়া তাহাকে চিনিতে পারে নাই, একটা রহস্যের ইঙ্গিতই পাইয়াছে মাত্র আজ তাহার সেই ধ্রুবতারার সন্ধান মিলিবে।

জীবাত্মা ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছে। দেহ সংশয়ে দুলিতেছে—মনও মোড়লির কথা ভুলিয়া গিয়া রাজার ভোগের কথা চিন্তা করিতেছে।

মায়া-মমতা স্নেহ-ভালবাসার প্রতিমূর্তি সুধা। সে ফুলের সন্ধান রাখে, ফুলের মালা গাঁথে। ফুল সুন্দর, মায়া মমতা, স্নেহ প্রীতির প্রতিভূ। প্রাণপুরুষের সঙ্গে যখন তাহার প্রথম সাক্ষাৎ হয় তখন মায়া মমতাব ক্ষণিক মোহে সে তাহার একটিমাত্র উন্মুক্ত দ্বারও রুদ্ধ করিয়া দিতে চাহিয়াছিল—ফুলের বিনিময়ে মূল্য চাহিয়াছিল, "বাইরের দিকে তাকিয়ে তোমার মন ছট্‌ফট্‌ করছে, আমি বরঞ্চ তোমার এই আধখানা দরজা বন্ধ করে দিই" (পৃ-৩০) এবং "ফুল অমনি কেমন করে দেব। দাম দিতে হবে যে" (পৃ-৩৩)। সাধারণ জাগতিক ভালবাসার ইহাই তো স্বরূপ। কিন্তু পরিশেষে তাহার মোহ ভাঙিয়া গেল। জাগতিক ভালবাসার উপর কামনাহীন প্রেমের পতাকা উড়িল। তাই পরমাত্মার সহিত জীবাত্মার সেই মহামিলনের ক্ষণে সে তাহার শ্রেষ্ঠ উপহার দিয়া আসিল, জানাইল, সুধা তাহাকে ভোলে নাই। ভুলিবার উপায়ই যে নাই। ভালবাসা যে প্রাণেরই জিনিস! ওই যে মল বাজাইয়া চরম খুসীতে ঝম্ ঝম্ করিয়া যায় উহা প্রাণেরই লীলায়িত গতিভঙ্গী। কেবল জানাজানির অপেক্ষা—পরমক্ষণে সেই জানাজানি হইবেই।

একটি মানুষের মধ্যে যে দ্বন্দ্ব তাহাই রূপ পাইয়াছে 'ডাকঘর' নাটকের মধ্যে। ঘোরতর সংসারী মা‍ুষের আত্মাবও জাগরণ সম্ভব। চারিদিকের আকর্ষণ, সংস্কার-সংশয়, মনের রক্তচক্ষুও প্রাণপুরুষের শান্ত সমাহিত ভাবের নিকট পরাজয় স্বীকার করে। আনন্দ আসিয়া রহস্যময়ের সংবাদ দেয়। একান্তরূপে প্রস্তুত জীবাত্মাকে মায়ার জগতে মৃত্যুর ভিতর দিয়া সত্য জগতে অমর করিয়া তুলিবার জন্য অর্থাৎ এই জগতেই মুক্তি দিবার জন্য অমৃত পান করাইয়া দেন তিনি নিজেই এক রহস্যময় উপায়ে—রাজকবিরাজ তাহারই প্রতীক। আনন্দের পথে মহামিলনের জন্য জীবাত্মার যে অভিসার তাহাকে কেহ রোধ করিতে পারে না, বাধানিষেধ সংস্কার রূপ কবিরাজ অবশ্যই পরাজিত হয়। মুক্তি পাইয়া জীবাত্মা পরমাত্মার বার্তা দিকে দিকে প্রচার করিবার কর্মে নিজেকে সম্পূর্ণ রূপে নিয়োজিত করে—অন্য সকল কর্মই তখন তাহার নিকট ক্ষুদ্র বলিয়া প্রতিভাত হয়।

ফাল্গুনী

(১৩২১ : ১৯১৬)

১৩২১ সাল। শান্তিনিকেতনের উত্তেজনার হাত হইতে রক্ষা পাইবার জন্য রবীন্দ্রনাথ সুরুলের বাড়ীতে অবস্থান করিতেছিলেন। এইখানে নির্জনতার মধ্যে বোধ হয় তিনি তাঁহার এই সময়কার বিশেষ উপলব্ধ গতির স্বরূপটি স্পষ্ট করিয়া দেখিতে পাইলেন। গতির চেতনা অস্ফুটরূপ হইলেও পূর্ব হইতেই তাঁহার ছিল। কিন্তু এই সময় সেই চেতনা তাঁহাকে আচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছিল। বলাকার কবিতা লেখা চলিতেছে, গতিকে স্বীকৃতি দান করিয়া পূর্বেকার মনের অবসাদ দূর করিয়াছেন। পৌষের শেষের দিকে লেখা কবিতায় তিনি বলিতেছেন—

এ জীবন
সতর্ক বুদ্ধির ভারে নিমেষে নিমেষে
বৃদ্ধ হয় সংশয়ের শীতে পক্ককেশে।

... ...

... ...

চলার অমৃত পানে
নবীন যৌবন
বিকশিয়া ওঠে প্রতিক্ষণ।
ওগো আমি যাত্রী তাই—
চিরদিন সম্মুখের পানে চাই।
কেন মিছে
আমারে ডাকিছ পিছে।

... ...

আমি চির যৌবনেরে পরাইব মালা,
হাতে মোর তারি তো বরণ ডালা।

(বলাকা : যাত্রা : ২৯শে পৌষ)

১৮ই মাঘ দীনবন্ধু এণ্ডরুজকে লিখিত পত্রেও দেখিতে পাই তাঁহার অবসাদ অতিক্রমের পরিচয়—

"You are right. I had been suffering from a time of deep depression and weariness. But I am sane and sound again, and willing to live another hundred years, if critics would spare me. At that time I was physically tired; therefore the least hurt assumed a proportion that was perfectly absurd." (Letters to a friend : p-54).

অতীতের অবসাদ কাটিয়া যাইতেছে। শিলাইদহে বোটে আছেন। সঙ্গে শিল্পী ত্রয়—নন্দলাল বসু (জ-১৮৮২), সুরেন্দ্রনাথ কর (জ-১৮৯৩) এবং মুকুল চন্দ্র দে (জ-১৮৯৫)। স্বভাবতই কবির আনন্দ বৃদ্ধি পাইয়াছে। প্রকৃতির উন্মুক্ত বক্ষে বাস করিয়া শিল্পীর চোখে সকলেই অখণ্ডের উপলব্ধি করিতেছেন। কর্মময় সংসারের গতি উপলব্ধি করিতে হইলে ধ্যান দৃষ্টিতে সেই কর্মের জগতের দিকে চাহিয়া দেখিতে হয়। শোভাযাত্রার মধ্যে থাকিয়া তাহাকে বোঝা যায় না—দূর হইতে যাত্রীদের দিকে চাহিলে তবেই তাহার শোভা এবং যাত্রাটা বোঝা সম্ভব। প্রকৃতি জগতে আসিয়া কবি সেই দৃষ্টি লাভ করিলেন—

গর্ভ ছেড়ে মাটির 'পরে
যখন পড়ে
তখন ছেলে দেখে আপন মাকে।
তোমার আদর যখন ঢাকে,
জড়িয়ে থাকি তারি নাড়ীর পাকে,
তখন তোমায় নাহি জানি।

(বলাকা : মুক্তি : ১৯ মাঘ ১৩২১)

কিছুদিন পূর্বে বিলাতের কর্মচাঞ্চল্যও তিনি দেখিয়াছেন। কর্ম সম্বন্ধে কবির মনেও নানা কথা উঁকি মারিতেছিল সেকথা নিঃসন্দেহে বলা যায়। ১লা ফাল্গুন বঙ্গীয় হিতসাধন মণ্ডলীর উদ্বোধন হয়। এইখানে বক্তৃতায় রবীন্দ্রনাথ বলেন, "আমরা মরচি ঔদাসীন্যে, আমরা মরচি জরায়। প্রাণের প্রতি প্রাণের যে সহজ ও প্রবল আকর্ষণ আছে আমরা তা হারিয়েছি, ···তাই আমরা এবার যৌবনকে আহ্বান করচি। ···দেশের যৌবন—যে যৌবন

নূতনকে বিশ্বাস করতে পারে, প্রাণকে নিত্য অনুভব করিতে পারে[১]।"

রবীন্দ্রজীবনী লেখক শ্রীপ্রভাত কুমার মুখোপাধ্যায় মনে করেন, "যৌবনের জয়গানের সুরের রেশ কয়েক দিনের মধ্যেই ফাল্গুনী নাটিকায় নবযৌবনের দলের অভিযানের রূপকে মূর্তি লইল। বলাকার কবিতায় যে যৌবনের উচ্ছল গতিধর্মের কথা ছন্দে গাঁথিয়াছিলেন, তাহারই নূতন রূপ।" (পৃ-৩৭৬)।

শিলাইদহ হইতে ফিরিয়া সুরুলের শান্ত নির্জনতায় রবীন্দ্রনাথ ফাল্গুনী নাটকটি লেখেন। ইহা সমাপ্ত হয় ২০শে ফাল্গুন, ১৩২১ সাল। এক বৎসর পরে (ফাল্গুন, ১৩২২) ইহা গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়—"ইহার 'সূচনা' অংশ 'বৈরাগ্যসাধন' শিরোনামায় সবুজপত্রের ১৩২২ সালের মাঘ সংখ্যায় মুদ্রিত হয়। মূল নাটক তৎপূর্বেই ১৩২১ সালের চৈত্র মাসের সবুজপত্র-রূপে মুদ্রিত হইয়াছিল; উহাতে গীতিভূমিকাগুলি ও সর্বশেষের গানটি নাট্য-বিষয়ের প্রবেশকরূপে 'বসন্তের পালা' নাম দিয়া একত্র গ্রথিত ছিল, অবশিষ্ট অংশেরই নাম ছিল 'ফাল্গুনী'; এই দুইটি অংশের দুইটি পৃথক ভূমিকা ছিল" (ফাল্গুনী : পৃ-১০৭)।

ফাল্গুনী নাটক এই তিনটি অংশে বিভক্ত হইলেও অখণ্ড। বৈরাগ্যসাধন অর্থাৎ সূচনা অংশেই মানব জীবনের একটি প্রধান ভ্রান্তির সম্বন্ধে সচেতন করা হইয়াছে। মানব জীবনের একটা দ্বন্দ্বও এইখানে লক্ষিত হয়। বয়স যখন বাড়ে, কানের পাশে যখন একটা দুইটা করিয়া চুল পাকিয়া উঠিবার কথা মনে গিয়া পৌঁছায় তখন অকস্মাৎ মানুষের চমক ভাঙ্গে: মনে হয় এইবার যাইতে হইবে। অমনি জীবনের পড়িয়া থাকা কাজগুলি নিতান্ত তুচ্ছ বলিয়া মনে হয়, অনেক সময় কাজ করিবার সমস্ত প্রেরণাও লুপ্ত হয। মানব জীবনের এই হতাশা অথবা কর্মকে তুচ্ছ করিয়া দেখা কোনটাই মহৎ হইতে পারে না। এই দুর্বল ভাবটিকে আঘাত করিয়া দূরে সরাইয়া দিতে হইবে। তাহা কিসের দ্বারা সম্ভব সূচনা অংশে তাহাও বলা হইয়াছে। মহারাজের কানে সেই পাকা চুলের ঘণ্টাধ্বনি হইযাছে, সুতরাং এইবার বৈরাগ্যসাধন ব্যতীত আর কিছু করিবার নাই, "কিসের রাজকার্য। রাজকার্যের সময় নেই—শ্রুতিভূষণকে ডেকে আনো" (পৃ-৯)। কেবল শ্রুতিভূষণের আগমন হইলেই চলিবে না, বৈরাগ্য বারিধি পুঁথিটাও সঙ্গে আনা চাই। কারণ, "কালধীবরের জাল ছিন্ন করবার জন্যে ছটফট করা বৃথা, আজই হোক

১। প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় : রবীন্দ্রজীবনী : ২য় খণ্ড পৃঃ ৩৭৫-৩৭৬।

কালই হোক সে টেনে তুলবেই" (পৃ-১১)। কিন্তু কালধীবরের কি পাকা চুলের জন্য অপেক্ষা করিয়া থাকার কোন প্রয়োজন আছে? সে তো যে কোন সময়েই টানিয়া তুলিতে পারে! তাহা হইলে আর কর্মের জগতের প্রয়োজন থাকে না। সর্বকর্ম ত্যাগ করিয়া তবে তো সকলকেই কালধীবরের জন্য মুহূর্ত গণিতে হয়! রবীন্দ্রনাথ এই ভাবটিকে কখনও স্বীকার করেন নাই। তাই তাঁহার বৈরাগ্যসাধন কর্মত্যাগ করিয়া নয়। বহু পূর্বেই কবি সেকথা বলিয়াছেন—

বৈরাগ্য সাধনে মুক্তি, সে আমার নয়॥
অসংখ্য বন্ধন-মাঝে মহানন্দময়
লভিব মুক্তির স্বাদ। এই বসুধার
মৃত্তিকার পাত্রখানি ভরি বারম্বার
তোমার অমৃত ঢালি দিবে অবিরত
নানাবর্ণগন্ধময়। প্রদীপের মতো
সমস্ত সংসার মোর লক্ষ বর্তিকায়
জ্বালায়ে তুলিবে আলো তোমারি শিখায়
তোমার মন্দির মাঝে॥

(নৈবেদ্য : মুক্তি)

শ্রুতিভূষণ যে তত্ত্ব শিক্ষা দেন কবিশেখরের শিক্ষা তাহার বিপরীত। মহারাজ তাঁহাকে ভয় করেন, "ওই-যে কবিশেখর আসছে—আমার তপস্যা ভাঙলে বুঝি। ওকে ভয় করি। ওরে পাকাচুল. কান ঢেকে থাক্ রে, কবির বাণী যেন প্রবেশপথ না পায়" (পৃ-১৬)। কেবল মহারাজই যে তাহাকে ভয় করেন তাহাই নহে—কানের পাশে যাহাদের চুলে পাক ধরিয়াছে তাহারা প্রত্যেকেই কবিশেখরকে ভয় করেন। কবি যে চুলে পাক ধরাকে মনে পাক ধরার বহিঃপ্রকাশ বলিয়া মনে করেন! মনে পূর্ণতার ছাপ পড়িবার লক্ষণ এই চুলে পাক ধরা। মনে সব রঙ বাসা বাঁধিয়াছে বলিয়াই না পটভূমিটা সাদা হইয়া উঠিল—

"পাকাচুল? ওটাকে আপনি ভাবছেন কী।
যৌবনের শ্যামকে মুছে ফেলে সাদা করার চেষ্টা।
কারিকরের মতলব বোঝেন নি। ওই সাদা ভূমিকার উপরে আবার নূতন রঙ লাগবে।

কই, রঙের আভাস তো দেখি নে।

সেটা গোপনে আছে। সাদার প্রাণের মধ্যে সব রঙেরই বাসা।

(পৃঃ ১৬-১৭)

বিজ্ঞানও বলে, সকল রঙের সম্মিলনের ফল সাদা। সুতরাং ইহাকে কিছুতেই অক্ষমতার চিহ্ন বলা যায় না। আর তাহা যদি না যায় তবে কর্ম এড়াইয়া বৈরাগ্য সাধনের কোন অর্থই নাই। কবিশেখরের বৈরাগ্য সাধনের ব্যবস্থাই গ্রহণ করা বিধেয়—

বৈরাগ্যসাধন করব।

সেই খবর শুনেই তো ছুটে এসেছি, এ সাধনায় আমিই তো আপনার সহচর।

তুমি?

হাঁ, মহারাজ, আমরাই তো পৃথিবীতে আছি মানুষের আসক্তি মোচন করবার জন্য।

বুঝতে পারলুম না।

এতদিন কাব্য শুনিয়ে এলুম, তবু বুঝতে পারলেন না? আমাদের কথার মধ্যে বৈরাগ্য, সুরের মধ্যে বৈরাগ্য, ছন্দের মধ্যে বৈরাগ্য (পৃঃ ১৭-১৮)।

কাব্যের কথা তো আভিধানিক অর্থের মধ্যেই বক্তব্যকে ধরিয়া রাখে না। সে নিজেকে লুপ্ত করিয়া ব্যঞ্জনাময় হইয়া ওঠে। ছন্দও বাঁধিয়া রাখিবার জন্যই নয়, তীরভূমি যেমন নদীকে উদ্বেল হইয়া উঠিতে সাহায্য করে ছন্দও সেইরূপ উদ্বেল করিয়া তোলে। আর সুর? সে তো মনকে সুদূরের পিয়াসী করিয়া তুলিবার জন্যই সৃষ্ট। নিজেকে ভুলিয়া সমস্ত বিশ্ব-প্রকৃতিকে ভালবাসিতে না পারিলে কাব্য সৃষ্টি করাই যায় না। সেই জন্যই কবিশেখর কাজকে ভালবাসিয়া কাজের মধ্যে নামিয়া পড়িতে বলেন—

এখন তোমার কাজটা কী বলো তো, কবি।

মহারাজ, ওই-যে তোমার দরজার বাইরে কান্না উঠেছে, ওই কান্নার মাঝখান দিয়ে এখন ছুটতে হবে।

ওহে কবি, বল কী তুমি। এ-সমস্ত কেজো লোকের কাজ। দুর্ভিক্ষের মধ্যে তোমরা কী করবে।

কেজো লোকেরা কাজ বেসুরো করে ফেলে, তাই সুর বাঁধবার জন্যে আমাদের ছুটে আসতে হয়।

ওহে কবি, আর-একটু স্পষ্ট ভাষায় কথা কও।

মহারাজ, ওরা কর্তব্যকে ভালবাসে ব'লে কাজ করে, আমরা প্রাণকে ভালোবাসি ব'লে কাজ করি (পৃঃ ২০-২১)।

ভালবাসিয়া কাজ করার নামই 'বৈরাগ্য সাধন'। সেই জন্যই তো যৌবনের কানে কবিরা গতির মন্ত্র দেন—

আমাদের মন্ত্র এই যে, ওরে ভাই, ঘরের কোণে তোদের থলি-থালি আঁকড়ে বসে থাকিস নে—বেরিয়ে পড়্ প্রাণের সদর রাস্তায়, ওরে যৌবনের বৈরাগীর দল।

সংসারের পথটাই বুঝি তোমার বৈরাগ্যের পথ হল?

তা নয় তো কী, মহারাজ। সংসারে যে কেবলই সরা, কেবলই চলা; (পৃ-১৮)

যে চলে সেই নিজের ভার লাঘব করে, "নদী আনন্দে বয়ে চলে, তাই তো সে আপনার ভার লাঘব করেছে ব'লেই বিশ্বের ভার লাঘব করে" (পৃ-২০)।

সুতরাং কর্মের ভিতর দিয়াই মানুষ মুক্তি লাভ করে। কর্মহীন মানুষের জীবনে বোঝাটা ভারী হইয়া ওঠে। বের্গসঁও মনে করেন জগতে নিয়ত পরিবর্তন চলিতেছে, চলা বন্ধ হইলেই বস্তু পুঞ্জ জমা হইয়া ওঠে। রবীন্দ্রনাথও বলেন কর্মত্যাগ করিয়া বৈরাগ্য সাধনের চেষ্টা করিতে গেলেই গতিহারা হইতে হইবে—তখন বোঝা জগদ্দল পাথরের ন্যায় চাপিয়া বসে। 'কর্মযোগ'-এ রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন, "আপনার ভিতরেই আপনার প্রকাশ হতে পারে না বলেই আনন্দ বাহিরের নিয়মকে ইচ্ছা করে, তেমনি আপনার ভিতরেই আপনার মুক্তি হতে পারে না বলেই আত্মা মুক্তির জন্যে বাহিরের কর্মকে চায়। মানুষের আত্মা কর্মেই আপনার ভিতর থেকে আপনাকে মুক্ত করছে, তাই যদি না হত তা হলে কখনোই সে ইচ্ছা করে কর্ম করত না।

"মানুষ যতই কর্ম করছে ততই সে আপনার ভিতরকার অদৃশ্যকে দৃশ্য করে তুলছে, ততই সে আপনার সুদূরবর্তী অনাগতকে এগিয়ে নিয়ে আসছে। এই উপায়ে মানুষ আপনাকে কেবলই স্পষ্ট করে তুলছে—মানুষ আপনার নানা কর্মের মধ্যে, রাষ্ট্রের মধ্যে, সমাজের মধ্যে আপনাকেই নানা দিক থেকে দেখতে পাচ্ছে।

"এই দেখতে পাওয়াই মুক্তি" (শান্তিনিকেতন : ২য় খণ্ড : কর্মযোগ)

ফাল্গুনী নাটকের সূচনায় রবীন্দ্রনাথ এই দুইটি বিপরীত ভাবকল্পনাকে প্রতিদ্বন্দ্বীরূপে দাঁড় করাইয়াছেন। মানুষের মনের মধ্যেই এই ভাব দুইটি রহিয়াছে। কানের পাশে-পাকা চুলের ঘণ্টা শুনিলেই হঠাৎ মনে হয় কর্মের জগৎ হইতে অবসর গ্রহণের সময় হইয়াছে, মনে হয় পথের প্রান্তেই বুঝি তীর্থস্থান। রবীন্দ্রনাথ বলেন, 'পথের দুধারে আছে মোর দেবালয়'। এই দুইটি বিপরীত ভাবের পটভূমিকায় মূল ফাল্গুনী নাটকটি রচিত হইয়াছে।

মূল নাটকে কিন্তু রবীন্দ্রনাথ এই দুই বিপরীত ভাব কল্পনার দ্বন্দ্বটিকে দেখাইবার প্রয়াস পান নাই। জরা এবং বার্ধক্য কি তাহারই অন্বেষণ করিতে পাঠাইয়াছেন যৌবনের বৈরাগীর দলকে। সেখানে তাহাদের মনে যে সংশয় জাগিয়াছে তাহা আমাদেরই সংশয়। সেখানে চন্দ্রহাস যাহাকে ধরিয়া আনিল তাহাকে দেখিবার জন্য যৌবনের বৈরাগীর দলের যে আগ্রহ তাহা পাঠক চিত্তেরই আগ্রহ। সুতরাং এই নাটকের দ্বন্দ্ব নাটকের মধ্য হইতে পাঠকমনে সঞ্চারিত হইবে না—নাটকের অগ্রগতির সহিত পাঠক মনের দ্বন্দ্বই আন্দোলিত হইবে। কানের পাশে যাহাদের চুলে পাক ধরিয়াছে তাহাদের মনকে যে ভাবনা সঙ্কুচিত করে তাহার মধ্যে আলোড়ন সৃষ্টি করার উদ্দেশ্যেই এই নাটক—

> "তা হলে শ্রোতা কাদের ডাকা যায। আমার রাজ বিদ্যালয়ের নবীন ছাত্রদের ডাকব কি।
>
> না, মহারাজ, তারা কাব্য শুনেও তর্ক করে। নতুন-শিঙ-ওঠা হরিণশিশুর মতো ফুলের গাছকেও গুঁতো মেরে মেরে বেড়ায়।
>
> তবে?
>
> ডাক দেবেন যাদের চুলে পাক ধরেছে। (পৃ-২৭)

তাহার কারণ, যাহারা এখনও ভোগকে অতিক্রম করিতে পারে নাই তাহারা তো কর্মের ভিতর দিয়া কর্মত্যাগের তাৎপর্য বুঝিবে না। কর্মের ভিতর দিয়াই কর্ম পরিত্যাগ করিয়া আত্মার গৃহে পৌঁছাইতে হয়। ভোগবতী পার হইয়া আনন্দলোকের ডাঙ্গা যাহারা দেখিয়াছে তাহারাই কর্মের প্রকৃত মর্ম উপলব্ধি করিতে পারিবে। এই মানুষগুলির চিত্তকে আলোড়িত করিবার জন্যই এই নাটক। সেই কথাটা রবীন্দ্রনাথ এখানে স্পষ্ট করিয়াই বলিয়াছেন। চিরকালই তিনি অতিরিক্ত দৃশ্যপট অঙ্কনের বিরুদ্ধে মত

পোষণ করিয়াছেন।[২] এইখানে সেই কথার ছলেই রবীন্দ্রনাথ বুঝাইয়া দিয়াছেন যে এই নাটকের পটভূমিকায় আছে পাকা চুলওয়ালাদের চিত্তপট, "চিত্রপটে প্রয়োজন নেই—আমার দরকার চিত্তপট, সেইখানে শুধু সুরের তুলি বুলিয়ে ছবি জাগাব" (পৃ-২৯)।

মূল নাটকের দৃশ্য বিভাগের মধ্যেও সেই চিত্তপটের কথাটা আছে। গীতিভূমিকার বিভাগগুলি—নবীনের আবির্ভাব, প্রবীণের দ্বিধা, প্রবীণের পরাভব এবং নবীনের জয়। কর্মচেতনা এবং কর্মত্যাগের দ্বিধার ভিতর দিয়াই কর্মচেতনার জয়ের কথাই এখানে ঘোষিত হইয়াছে। মূল নাটকের দৃশ্য বিভাগ সূত্রপাত, সন্ধান, সন্দেহ, প্রকাশ : এখানেও বক্তব্য ওই একই, দ্বিধার ভিতর দিয়াই আত্মা নিজেকে প্রকাশ করে। সেই প্রকাশ হয় কর্মে : কর্মের ভিতর দিয়াই আত্মা নিজেকে প্রকাশ করে। তাই নাটকটির কাজ দ্বিধাগ্রস্ত অন্তরকে স্পর্শ করা ; স্পর্শ করিতে না পারিলে বুঝিতে হইবে যে মানুষটা মরিয়াছে।

বিশ্বপ্রকৃতি রবীন্দ্রনাথকে এই শিক্ষা দিয়াছিল যে, ভয়ঙ্করের ভিতর দিয়া না গেলে পরিপূর্ণতা আসে না। তাই ঝড়ঝঞ্ঝা বৃষ্টিপাতের পর প্রকৃতিদেবী ফসলের ভারে পরিপূর্ণতা লাভ করেন। শীতের জড়তা অতিক্রম করিতে না পারিলে বসন্তের বিকাশ হয় না। সেইরূপ দেহের জরা আর মনের লোভ-বিদ্বেষের আকর্ষণকে অতিক্রম করিতে না পারিলে সত্যকার জীবনকে জানা যায় না। কবির এই উপলব্ধি ফাল্গুনী রচনার কিছু পূর্ব হইতেই হইয়াছিল—

পউষের পাতা-ঝরা তপোবনে
আজি কী কারণে
টলিয়া পড়িল আসি বসন্তের মাতাল বাতাস
(বলাকা : যৌবনের পত্র)

প্রকৃতিতেই যদি শীতের জড়তার মধ্যে বসন্তের স্পর্শ অনুভূত হয় তবে মানবজীবনের দৈহিক জড়তাই বা এত বড় হইয়া উঠিবে কেন? দেহের বয়সের কি শক্তি আছে মনের যৌবনকে নষ্ট করিবার! প্রকৃতির নিকট

২। গ্রন্থের তৃতীয় খণ্ডের দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ দ্রষ্টব্য।

হইতে কবি চেতনা লাভ করিলেন। সে কবির মনকে আলোড়িত করিয়া তুলিল—

বহুদিনকার
ভুলে-যাওয়া যৌবন আমার
সহসা কী মনে ক'রে
পত্র তার পাঠায়েছে মোরে
উচ্ছৃঙ্খল বসন্তের হাতে
অকস্মাৎ সংগীতের ইঙ্গিতের সাথে। (যৌবনের পত্র)

যে পত্র কবি বসন্তের নিকট পাইযাছেন সেই পত্রকেই 'ফাল্গুনী'র রূপে তিনি সকল 'চুলে পাক ধরা' মানুষের হস্তে তুলিয়া দিয়াছেন। শীতের বস্ত্রহরণ পালাটা অন্য পুরাণে না থাকিলেও, "বিশ্বপুরাণে এই গীতের পালা আছে। ঋতুর নাট্যে বৎসরে বৎসরে শীত-বুড়োটার ছদ্মবেশ খসিয়ে তার বসন্তরূপ প্রকাশ করা হয়, দেখি পুরাতনটাই নূতন" (পৃ-২৯)। কবির বিশ্বাস বার্ধক্য বলিয়া কিছু নাই, মৃত্যু বলিয়া কিছু নাই। শেষের দিকে মেটারলিঙ্ক যেমন বুঝিয়াছিলেন যে মৃত্যুর অস্তিত্ব নাই, রবীন্দ্রনাথও সেইরূপ মৃত্যুকে অস্বীকার করিয়াছেন।[৩] সমস্ত প্রকৃতি জগতের সহিত মানুষও প্রতিনিয়ত পরিবর্তিত হইতেছে, মৃত্যু একটি বড় রকম পরিবর্তন ব্যতীত আর কিছুই নয—"ফুরায় যা তা ফুরায় শুধু চোখে"—সত্যই তাহা ফুরাইয়া যায় না। নব নব রূপে তাহাই বারে বারে ফিরিয়া আসে, "বিশ্বপ্রকৃতির মধ্যে প্রতি ফাল্গুনে চিরপুরাতন এই-যে চিরনূতন হযে জন্মাচ্ছে, মানুষ প্রকৃতির মধ্যেও পুরাতনের সেই লীলা চলছে। প্রাণশক্তিই মৃত্যুর ভিতর দিয়ে আপনাকে বারে বারে নূতন করে উপলব্ধি করছে। যা চিরকালই আছে তাকে কালে কালে হারিয়ে হারিয়ে না যদি পাওয়া যায তবে তার উপলব্ধিই থাকে না" (পৃ-১১১)। তবে দেহের বার্ধক্য আসে কেন? মৃত্যুকে এমন স্পষ্ট করিয়া দেখি কেন? অন্ধকার না থাকিলে তো আলোকে জানা যাইত না, দেহ জরাগ্রস্ত না হইলে যৌবনকে চিনিতাম না। মৃত্যুর ভিতর দিযাই মানুষ জীবনকে চেনে, "জগৎটার দিকে চেয়ে দেখলে দেখা

৩। এই গ্রন্থের প্রথম খণ্ডের তৃতীয় পরিচ্ছেদ দ্রষ্টব্য।

যায় যে, যদিচ তার উপর দিয়ে যুগ যুগ চলে যাচ্ছে তবু সে জীর্ণ নয়—আকাশের আলো উজ্জ্বল, তার নীলিমা নির্মল। ধরণীর মধ্যে রিক্ততা নেই, তার শ্যামলতা অম্লান; অথচ খণ্ড খণ্ড করে দেখতে গেলে দেখি ফুল ঝরছে, পাতা শুকোচ্ছে, ডাল মরছে। জরা মৃত্যুর আক্রমণ চারি দিকেই দিনরাত চলেছে, তবুও বিশ্বের চির নবীনতা নিঃশেষ হল না। Facts এর দিকে দেখি জরা মৃত্যু, Truth-এর দিকে দেখি অক্ষয় জীবন যৌবন" (পৃ-১১০)। Fact-এর মধ্যে এই Truth-কে দেখিবার উপায় কি? কবির মনোভূমিতেই সেই সত্য আসন পায়। যাহা ঘটে তাহাই সত্য নহে—বাহিরের এই 'ঘটা'র অন্তর্নিহিত তাৎপর্য কবির দৃষ্টিতেই ধরা পড়ে। কবির এই দৃষ্টি কিরূপ? উহা জগতের প্রতি প্রেমের দৃষ্টি। এই প্রেমের দৃষ্টিই সীমার জগতে অনির্বচনীয়কে দেখিতে পায়। বিশ্বজগতের মধ্যে সংগুপ্ত থাকিয়া যে অনির্বচনীয় আপনাকে নানা ভাবে প্রকাশ করিতেছেন তিনি নূতন এবং পুরাতন উভয়ই। আমাদের ভিতরেও সেই অবিনশ্বর সত্তাই রহিয়াছেন তিনি কখনও জরাগ্রস্ত হন না, মৃত্যুর মধ্যে লুপ্ত হইয়া যান না। এই যে প্রাণশক্তি; এই জীবন ইহাকে সেই জন্যই চন্দ্রহাস ধরিতে পারিয়াছিল। চন্দ্রহাস কে?—"যাকে আমরা ভালোবাসি—আমাদের প্রাণকে সেই প্রিয় করেছে" (পৃ-৩০)। সে সুন্দর, সে প্রেম—প্রেমের বন্ধনে আবদ্ধ না হইলে কোন কিছুই সুন্দর হয় না।

বুদ্ধদেবের গতিবাদ, বের্গসঁর গতিবাদ এবং ডারউইনের (Darwin C: ১৮০৯-১৮৮২) ক্রম বিবর্তনবাদ-এর প্রভাব রবীন্দ্রনাথের উপর পড়িয়াছিল। ব্রাহ্মধর্মে জন্মান্তরবাদ স্বীকৃত হয় নাই। তাহা সত্ত্বেও রবীন্দ্রনাথ এই বিশ্বাস ত্যাগ করিতে পারেন নাই। উপনিষদের কর্মফলের কথা, বুদ্ধের গতিবাদ এই দিকে স্বতঃই দৃষ্টি ফিরায়। মানবাত্মা মুক্তি পাইবে না ইহা যেন তিনি কিছুতেই বিশ্বাস করিতে পারিতেন না। সমস্ত অপরাধ সত্ত্বেও একদিন না একদিন তাহার চিত্তের জাগরণ হইবেই। পাপ আর কিছুই নয়, অপূর্ণতা মাত্র। আত্মোপলব্ধির অপূর্ণতা হইতেই পাপ আসে। কিন্তু এই জীবনে কয়জন পূর্ণতা পাইল? যদি না পাইল তবে বিশ্বাসের কারণ কি? অখণ্ডতায় যিনি বিশ্বাসী তিনি খণ্ড জীবনকেই শেষ বলিয়া কিছুতেই গ্রহণ করিতে পারেন না। সেইজন্যই তিনি বলেন, "বহু যুগ পূর্বে যখন তরুণী পৃথিবী সমুদ্রস্নান থেকে সবে মাথা তুলে উঠে তখনকার নবীন সূর্যকে বন্দনা

করছেন, তখন আমি এই পৃথিবীর নূতন মাটিতে কোথা থেকে এক প্রথম জীবনোচ্ছ্বাসে গাছ হয়ে পল্লবিত হয়ে উঠেছিলুম।…তার পরেও নব নব যুগে এই পৃথিবীর মাটিতে আমি জন্মেছি। আমরা দুজনে একলা মুখোমুখি করে বসলেই আমাদের সেই বহুকালের পরিচয় যেন অল্পে অল্পে মনে পড়ে (ছিন্নপত্র : পৃ-১৪৪)। সত্য দৃষ্টি থাকিলে এই বোধ হইবেই। রূপরূপান্তর জন্মজন্মান্তরের মধ্য দিয়া সকলেই হইয়া উঠিতেছে। কবির অখণ্ড দৃষ্টিতে জীবনের দিকে চাহিয়া তিনি কিছুতেই বিশ্বাস করিতে পারিতেন না যে বর্তমানের জীবনটা একটা খণ্ড খাপছাড়া জিনিস, বিশ্বাস করিতে চাহিতেন না যে ইহার সহিত আর কোন কিছুর যোগ নাই। জীবন যে বিশেষ উদ্দেশ্যে মানব দেহ ধারণ করিয়াছে তাহা একটি জন্মেই শেষ হইয়া যাইবে ইহা যদি বিশ্বাস করিতে হয় তবে সৃষ্টিকে উদ্দেশ্যহীন মনে করিতে হইবে। রবীন্দ্রনাথ সৃষ্টিকে কখনও উদ্দেশ্যহীন বলিয়া মনে করেন নাই, "জীবনের সমস্ত সুখ দুঃখকে যখন বিচ্ছিন্ন ক্ষণিক ভাবে দেখি তখন আমাদের ভিতরকার অনন্ত সৃজন রহস্য ঠিক বুঝতে পারিনে…। যেমন গ্রহ-নক্ষত্র, চন্দ্র-সূর্য জ্বলতে জ্বলতে ঘুরতে ঘুরতে চিরকাল ধরে তৈরী হয়ে উঠছে, আমার ভিতরেও তেমনি অনাদিকাল ধরে একটা সৃজন চলছে" (ছিন্নপত্র)। তাঁহার এই বিশ্বাসই রূপকের অন্তরালে আত্মগোপন করিয়া ফাল্গুনী নাটকে প্রকাশ পাইয়াছে। সেই জন্যই, "প্রাণের প্রতি গভীর বিশ্বাসের জোরে চন্দ্রহাস মৃত্যুর গুহার মধ্যে প্রবেশ করে সেই প্রাণকেই নূতন করে, চিরন্তন করে দেখতে পেলে। যুবকের দল বুঝতে পারলে জীবনকে যৌবনকে বারে বারে হারাতে হবে, নইলে ফিরে পাবার উৎসব হতে পারবে না। শীত না থাকলে ফাল্গুনের মহোৎসবের মহাসমারোহ তো মারা যেত" (পৃ-১১১)।

এই নাটকের দৃশ্য চারিটি—পথ, ঘাট, মাঠ এবং গুহাদ্বার। চারিটি দৃশ্য হইলেও পট পরিবর্তনের এখানে কোন প্রযোজন নাই। একটি দৃশ্যেই ইহার সব দৃশ্যগুলিই অভিনয় করা যায়। তত্ত্বের দিক দিয়া দৃশ্যের নামকরণ সার্থক হইয়াছে। জীবনকে জানিতে হইলে ঘর ছাড়িয়া পথে নামিয়া আসিতে হইবে; জরার জড়তায় বসিয়া থাকিলে জীবনকে ধরা যায় না, "বেরিয়ে পড়্ প্রাণের সদর রাস্তায়, ওরে যৌবনের বৈরাগীর দল" (পৃ-১৮)। কবি ইহারই অন্য নাম দিয়াছেন সূত্রপাত। পথে নামিলেই জীবনকে জানার

সূত্রপাত হয়। জীবনকে ধরিবার জন্য এইবার সন্ধান করিতে হইবে। মৃত্যুর ভিতর দিয়াই জীবনকে জানিতে হয়। মৃত্যুকে আমরা জীবনের পরপার বলিয়া জানিয়া আসিয়াছি, সুতরাং মৃত্যুর সন্ধানে ঘাটেই আসিয়া দাঁড়াইতে হয়। দ্বিতীয় দৃশ্যের নাম ঘাট এবং সন্ধান সেই সঙ্কেত করিতেছে। ঘাটের ধারে আসিয়া আমাদের মনে রাখা প্রয়োজন যে ইহার পরপার এই পার হইতে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন নয় ; তবে পরিবর্তনটা একটু বড় রকমের বলিয়া স্থলের পরিবর্তে জলের দ্বারা ব্যবধান রচিত হইয়াছে, প্রকৃত পক্ষে দুইয়ের মধ্যে কোন ব্যবধান নাই, "হে আনন্দসমুদ্র, এ পারও তোমার, ও পারও তোমার। কিন্তু, একটা পারকে যখন আমার পার বলি তখন ও পারের সঙ্গে তার বিচ্ছেদ ঘটে। তখন সে আপনার সম্পূর্ণতার অনুভব হতে ভ্রষ্ট হয়" (শান্তিনিকেতন ঃ ১ম খণ্ড ঃ পার করো)। এই বোধটি হইলে মৃত্যুর মধ্যেও জীবনকে অনুভব করা যাইবে ঃ জীবনই যে মৃত্যুর মধ্য দিয়া নবরূপ লাভ করিতেছে ইহা বুঝিতে আর বিলম্বও হইবে না। কিন্তু সত্যকে এত সহজে উপলব্ধি করা যায় না। কেবলই জীবনকে মৃত্যু হইতে পৃথক বলিযা মনে হয। সন্দেহ তো সহজে ঘুচিবার নয়, এ পারকে ওই পারের সহিত এক করিয়া দেখা সকলের পক্ষে সম্ভব নয! খোলা মাঠের মধ্যে যেমন মানুষ সহসা পথ স্থির করিতে না পারিয়া দিগ্‌ভ্রান্ত হয ঃ সন্দেহটা সেইরূপ ব্যাপার। নাটকের তৃতীয় দৃশ্যের নামও তাই মাঠ এবং সন্দেহ। মাঠেই পথের নিশানা সম্বন্ধে সন্দেহ জাগে। চতুর্থ দৃশ্য গুহাদ্বার—শেষ পর্যন্ত যৌবনের বৈরাগীর দল মৃত্যুর গুহাদ্বারে আসিয়া পৌছাইল। এইবার মৃত্যুর স্বরূপ প্রকাশ হইবে। মৃত্যুর রাজ্য অজানা বলিয়াই গুহার সহিত তুলনীয়। প্রাণের প্রতি একান্ত বিশ্বাস যাহার সে মৃত্যুর মধ্যে ঝাঁপাইয়া পড়িয়া তাহার পরিচয় উদ্ঘাটিত করিবে, দেখাইবে যে মৃত্যু জীবন ব্যতীত আর কিছুই নয়। সুতরাং যাহার নাম গুহাদ্বার তাহারই নাম প্রকাশ।

গীতিভূমিকার দৃশ্য বিভাগের সহিত মূল নাটকের দৃশ্য বিভাগের নাটকীয় এবং তাত্ত্বিক উভয় যোগই ঘনিষ্ঠ। যৌবন যেখানে পথে নামিয়া আসিয়া জরা মৃত্যুরূপী 'বুড়ো'র সন্ধানে অগ্রসর হয় সেখানেই যৌবনের সত্যকার পরিচয়—ইহা নবীনের আবির্ভাবেরই সূচনা করে। নবীনের বার্তা সর্বত্র ছড়াইয়া যায়। তখন বেণুবনের গানে যে নবীনের স্পর্শ—

ওগো দখিন হাওয়া, পথিক হাওয়া,
দোদুল দোলায় দাও দুলিয়ে।
নূতন পাতার পুলক-ছাওয়া
পরশখানি দাও বুলিয়ে। (পৃ-৩২)

পাখীর নীড়েও তাহারই পরিচয়ঃ প্রকৃতি উদ্বেল করিয়া তোলে পাখীর মনকেও, সেও কর্মের জগতে নামিয়া আসিবার জন্য আকুল হয়—

আকাশ আমায় ভরল আলোয,
আকাশ আমি ভরব গানে।
সুরের আবীর হানব হাওযায,
নাচের আবীর হাওযায় হানে। (পৃ-৩৩)

চারিদিকের এই সৌন্দর্য সর্বত্রই আলোড়ন তোলে। সীমার সৌন্দর্যে আজ অসীমেরও ধ্যানভঙ্গ হইতেছে—

হেরো হেরো অবনীর রঙ্গ,
গগনের করে তপোভঙ্গ। (পৃ-৩৫)

তাহা যদি সত্য হয় তবে মানুষ তাহার বয়সের সীমাকেই চূড়ান্ত বলিয়া গ্রহণ করিতে পারে না। অনন্ত যৌবন এই মানব দেহের সীমায় বারে বারেই নূতন হইয়া উঠিতেছে। বয়সের ভারে ভারাক্রান্ত সীমিত মানুষেরও সেই জন্যই অবনীর রঙ্গ দেখিয়া অনন্ত যৌবন চেতনা জাগিয়া উঠিল। এইজন্যই যাহাকে সকলে 'মান্ধাতার আমলের বুড়ো' বলে, সে নাকি গুহার ভিতরে লুকাইয়া থাকিয়া মরিবার নাম করে না, যাহার বর্ণনা দিতে গিয়া কেহ বলে, 'সে সাদা, মড়ার মাথার খুলির মতো', কেহ বলে, 'সে কালো, মড়ার চোখের কোটরের মতো' তাহাকেই একেবারে তুচ্ছ করিয়া দিয়া সর্দার বলে, "আমি তাকে বিশ্বাস করি নে"। তারপরই দেখি চন্দ্রহাসের দল বাহির হইয়া পড়িল সেই বুড়ার সন্ধানে। চিরকালীন বুড়াকে যে মানুষ চিরকালই বিশ্বাস করিয়া আসিয়াছে তাহার সম্বন্ধে সন্দেহ উদ্রেক করার পর যে সন্ধান তাহা নবীনের আবির্ভাব ব্যতীত আর কিছুই নয়।

দ্বিতীয় দৃশ্যের গীতিভূমিকা প্রবীণের দ্বিধা। সেখানে দুরন্ত প্রাণ ঘুমন্ত চেতনাকে জাগ্রত করিয়া তুলিতে চায়। প্রবীণের অন্ধকারের পথে, হতাশার পথেও দুরন্ত প্রাণ সাড়া দেয়—

আমরা তোমার মনোচোরা,
ছাড়ব না গো তোমায় মোরা,
চলেছ কোন্ আঁধার-পানে
সেথাও জ্বলে মোদের বাতি। (পৃ-৪৯)

শীতের কুহেলিকা, জড়তা জরা-মৃত্যুকেই সত্য বলিয়া মনে করায়। কিন্তু বসন্ত আসিয়া শীতের ভিতরকার প্রাণসত্তাকে তাহার জড়তা হইতে বাহিরে আকর্ষণ করিয়া আনিতে চায়। শীত পলাতক হইতে চেষ্টা করে, কিন্তু বসন্ত তাহাকে গোপন পথে পলায়ন করিতে দিবে না, তাহার ভিতরেও যে প্রাণশক্তি গুপ্ত ছিল তাহা সে আবিষ্কার করিবেই—

নিয়ে পক্ক পাতার পুঁজি
পালাবে, শীত, ভাবছ বুঝি।
ও সব কেড়ে নেব, উড়িয়ে দেব
দখিনহাওয়ার 'পর।
তোমায় বাঁধব নূতন ফুলের মালায়
বসন্তের এই বন্দীশালায়।
জীর্ণ জরার ছদ্মরূপে
এড়িয়ে যাবে চুপে চুপে ?
তোমার সকল ভূষণ ঢাকা আছে,
নাই যে অগোচর গো॥ (পৃ-৫১)

তথাপি জরা জীবনকে এড়াইয়া চলিতে চায়—উদ্‌ভ্রান্ত শীতের গানে তাহারই পরিচয়—

তোমাদের ঐ সবুজ ফাগে
চক্ষে আমার ধাঁদা লাগে,
আমায় তোদের প্রাণের দাগে
দাগিস নে, ভাই, আর গো॥ (পৃ-৫২)

মূল নাটকেও সেই কথাই বলা হইয়াছে। নবীন জরাকে অনুসন্ধান করিবার জন্য পথে বাহির হইয়াছে। যেমন করিয়া বসন্ত শীতের অবগুণ্ঠন উন্মুক্ত করিয়া তাহার ভিতরেও প্রাণের প্রবাহকে আবিষ্কার করিতে চায় ঠিক সেইরূপই চন্দ্রহাসের দল আদ্যিকালের বুড়ার সন্ধানে বাহির হইয়াছে, তাহার স্বরূপ উদ্ঘাটন করিবেই। সেই বুড়ার অন্তরালেও চির নবীন গুপ্ত

হইয়া আছে। চন্দ্রহাসের দল তাহা সঠিক না জানিলেও সর্দার তাহা জানে। সেই জন্যই সর্দার তাহাকে লইয়া বসন্ত উৎসব করিবার আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করিয়াছে। সর্দারকে বিশ্বাস করিয়া চন্দ্রহাসের দল তাই বুড়ার সত্য আবিষ্কার করিতে বাহির হইয়াছে—

ওগো ঘাটের মাঝি, ঘাটের মাঝি, দরজা খোলো।

মাঝি ॥ কেন গো, তোমরা কাকে চাও।

আমরা বুড়োকে খুঁজতে বেরিয়েছি।

মাঝি ॥ কোন্ বুড়োকে।

চন্দ্রহাস ॥ কোন্-বুড়োকে না। বুড়োকে।

মাঝি ॥ তিনি কে।

চন্দ্রহাস ॥ আহা, আদ্যিকালের বুড়ো।

মাঝি ॥ ওঃ, বুঝেছি। তাকে নিয়ে করবে কী।

বসন্ত-উৎসব করব। (পৃ-৫৩)

কিন্তু এই আদ্যিকালের বুড়াকে ধরা বড় সহজ কথা নয়। সেই শীতেরই মত সে পলাইয়া বেড়াইতে চায়—

বালক ॥ আমি পারলুম না। কিছুতে তাকে ধরতে পারলুম না।

কাকে ভাই।

বালক ॥ ওই তোমরা যে বুড়োর খোঁজ করছিলে তাকে।

তাকে দেখেছ নাকি।

বালক ॥ সে বোধ হয় রথে চড়ে গেল।

কোন্ দিকে।

বালক ॥ কিছুই ঠাওরাতে পারলুম না। কিন্তু, তার চাকার ঘূর্ণিহাওয়ায় এখনও ধুলো উড়ছে।

চল্ তবে চল্।

শুকনো পাতায় আকাশ ছেয়ে দিয়ে গেছে। (পৃঃ ৬৬-৬৭)

শীতকে রঙ্গের খেলায় রাঙ্গাইয়া তুলিতে চায় বসন্ত ঃ বুড়াকেও টানিয়া আনিয়া বসন্ত উৎসব করিতে চায় চন্দ্রহাসের দল। সুতরাং ইহা সন্ধান পর্ব নিশ্চয়ই।

তৃতীয় দৃশ্যের গীতিভূমিকা 'প্রবীণের পরাভব'। প্রবীণ ছদ্ম বেশে আর নিজেকে লুকাইয়া রাখিতে পারিল না। সে যে নবীনেরই সন্ন্যাসী রূপ।

এইবার মিলনের সময় আসিয়াছে, সন্ধানী দৃষ্টির সম্মুখে সত্য আর গোপন থাকিবে না—

আর   নাই যে দেরি, নাই যে দেরি।
সামনে সবার পড়ল ধরা
তুমি যে, ভাই, আমাদেরি। (পৃ-৬৯)

কেবল তাহাই নহে, শীতের অন্তরস্থিত সংগুপ্ত শ্যামলিমা তাহার শ্বেত বরণকে পুনরায় রাঙাইয়া তাহার সত্যরূপকে প্রকাশ করিয়া দিবেই—

সাদা তোমার শ্যামল হবে
ফিরব মোরা তাই যে হেরি॥ (পৃ-৬৯)

শীতের প্রবীণ বেশ যে সন্দেহ জাগায় তাহা ব্যর্থ হইয়া যাইবে। চন্দ্রহাসের অবর্তমানে তাহার দলের অন্যান্যদের মনে সন্দেহ জাগিয়াছিল। প্রবীণ-প্রাচীন বেশই কি সত্য? কিন্তু 'বসন্তের হাসির গান' যেমন করিয়া শীতের প্রবীণ-প্রাচীন বেশকে নবীন রূপের সন্ন্যাসীর মূর্তিতে সাজাইয়া দেয় সেইরূপ চন্দ্রহাসের হাসিও তাহার দলের অন্যান্য সকলের মনের সন্দেহ রূপ কালো পাথরটাকে ঠেলিয়া লইয়া যায়। সেই হাসি সূর্যের আলোকের ন্যায় কুয়াশার তাড়কারাক্ষসীকে তলোয়ার দিয়া টুকরা টুকরা করিয়া কাটে—চৌপদীর তত্ত্বের বোঝা হইতে মুক্তি দেয়। সেই জন্যই নাটকের দৃশ্যভাগের নাম সন্দেহ হইলেও ইহা সন্দেহ এবং সন্দেহ ভঞ্জন উভয়ই বটে।

শেষ দৃশ্যের গীতিভূমিকা নবীনের জয়। নাটকের দৃশ্যভাগের নাম প্রকাশ। নবীনের জয়ের অর্থই আদ্যিকালের বুড়ার সত্যরূপের প্রকাশ। বুড়া বলিয়া কিছু নাই—জীবন যৌবনই বার বার ফিরিয়া ফিরিয়া আসিতেছে—

এবার তো যৌবনের কাছে
মেনেছ, হার মেনেছ?
—মেনেছি।
আপন মাঝে নূতনকে আজ জেনেছ?
—জেনেছি।
আবরণকে বরণ করে
ছিলে কাহার জীর্ণ ঘরে।

আপনাকে আজ বাহির করে এনেছ ?
—এনেছি।

... ...

মরণ মাঝে অমৃতকে জেনেছ ?
—জেনেছি। (পৃ-৮০)

নাটকেও সেই বৃদ্ধের ছদ্মবেশ ছিন্ন হইয়াছে—পুরাতনের মধ্যে যে নূতনই রহিয়াছে তাহা আজ প্রকাশিত হইল। মৃত্যুতেই মৃত্যুর শেষ নয়, তাহারই মধ্যে অমৃতের সন্ধান পাওয়া গিযাছে। যে বিদায় লইয়া গিয়াছে বলিয়া মনে হইয়াছিল সে পুনরায় ফিরিয়া আসিয়াছে। জীবন-যৌবন অমৃত পান করিয়া অমর—

ওই-যে কে গুহা থেকে বেরিয়ে এল।
আশ্চর্য! আশ্চর্য!
চন্দ্রহাস॥ এ কী, এ যে তুমি।
তুমি। সেই আমাদের সর্দার।
আমাদের সর্দার রে!
বুড়ো কোথায়।
সর্দার॥ কোথাও তো নেই।
কোথাও না ?
সর্দাব॥ না।
তবে সে কী।
সর্দার॥ সে স্বপ্ন।
চন্দ্রহাস॥ তবে তুমিই চিরকালের?
সর্দার॥ হাঁ।
চন্দ্রহাস॥ আর, আমরাই চিরকালের ?
সর্দার॥ হাঁ।

পিছন থেকে যারা তোমাকে দেখলে তারা যে তোমাকে কত লোকে কতরকম মনে করলে তার ঠিক নেই।

সেই ধুলোব ভিতর থেকে আমরা তো তোমাকে চিনতে পারি নি।

তখন তোমাকে হঠাৎ বুড়ো বলে মনে হল।

তারপর গুহার মধ্যে থেকে বেরিয়ে এলে। এখন মনে হচ্ছে, যেন তুমি বালক।

যেন তোমাকে এই প্রথম দেখলুম।

চন্দ্রহাস॥ এ তো বড় আশ্চর্য। তুমি বারে বারেই প্রথম, তুমি ফিরে ফিরেই প্রথম! (পৃঃ ৯৯-১০০)

চন্দ্রহাসেরই হার হইল। বুড়াকে সে ধরিতে পারিল না। বুড়ার অস্তিত্বই যে নাই। দূর হইতে যাহাকে জরা মৃত্যু বলিয়া মনে হয় নিকটে গিয়া দাঁড়াইলে তাহার বালকরূপ চোখে ধরা পড়ে। তাই এই পালার গানের বিষয়ের নাম শীতের বস্ত্রহরণ। বস্ত্রহরণ করিয়া দেখা গেল শীতের ভিতর হইতে বাহির হইয়া আসিল বসন্ত: জরার বস্ত্রহরণ করিতেই বাহির হইয়া আসিল নবীন: জরা-মৃত্যু জীবন-যৌবন রূপে ফুটিয়া উঠিল। ইহারই নাম প্রকাশ। বুড়ার রহস্যই কেবল নাটকে উদ্ঘাটিত হইল তাহাই নহে: নাটকের তত্ত্বটুকুও প্রকাশিত হইল। প্রাণশক্তি অমর, জীবন অমৃত পান করিয়াছে তাহাকে জানিবার জন্য পথে নামিয়া আসিলে আর তাহা অজানা থাকে না—"জীবনকে সত্য বলে জানতে গেলে মৃত্যুর মধ্যে দিয়ে তার পরিচয় চাই। যে মানুষ ভয় পেয়ে মৃত্যুকে এড়িয়ে জীবনকে আঁকড়ে রয়েছে, জীবনের 'পরে তার যথার্থ শ্রদ্ধা নেই বলে জীবনকে সে পায় নি। তাই সে জীবনের মধ্যে বাস করেও মৃত্যুর বিভীষিকায় প্রতিদিন মরে। যে লোক নিজে এগিয়ে গিয়ে মৃত্যুকে বন্দী করতে ছুটেছে, সে দেখতে পায়, যাকে সে ধরেছে সে মৃত্যুই নয়, সে জীবন" (আত্মপরিচয় : পৃ-৫৯)॥

এই নাটকে যে চিরযৌবনের কথা বলা হইয়াছে কর্মের জগতে থাকিলেই তাহাকে জানা যায় এমন কথা বলা হয় নাই। কর্মের মধ্যে থাকিলেই সত্য দৃষ্টি লাভ হয় তাহাও নহে। অচলায়তন-এর শোণপাংশুরা কর্মকেই জীবন বলিয়া মনে করিয়াছিল কিন্তু তাহা সত্ত্বেও জীবন যৌবন যে বারে বারেই নূতন রূপে আসে সে বোধ তাহাদের হয় নাই, হইবার কথাও নয়, কারণ সত্যকে তাহারা চেনে নাই। জীবনের সেই সত্যরূপ জানিতে হইলে ভোগবতী পার হইতে হইবে। ইউরোপ কর্মে লিপ্ত, কর্মের ঘূর্ণিচক্রে সে কেবলি পাক খাইয়া ফিরিতেছে: তাহার কর্মের মূল প্রেরণা ভোগের জগৎ হইতেই। সুতরাং জীবনের মূল সত্যকে তাহারা ধরিতে পারিবে না। বর্তমান ভারতবর্ষ কর্ম প্রেরণাই হারাইয়াছে,

ভোগবতী অতিক্রম করার শিক্ষা তাহারও হয় নাই, তাই জীবন-যৌবনের সত্যরূপ তাহারও জানা হয় নাই। কর্মকে কর্তব্য মাত্র মনে না করিয়া আনন্দের উৎস বলিয়া যদি মনে করা যায়, প্রাণকে ভালবাসিয়া যদি কর্মকে স্বাভাবিক বলিয়াই গ্রহণ করি তখনই কেবল ভোগবতী অতিক্রম করিয়া যাই।

নাটকের প্রধান পাত্রদের মধ্যে সর্বপ্রথম হইল সর্দার। এই সর্দারটি কে কবিশেখর তাহার পরিচয় দিয়াছেন, "যে আমাদের কেবলই চালিয়ে নিয়ে যাচ্ছে" (পৃ-৩০)। রবীন্দ্রনাথ 'ফাল্গুনী'র ভূমিকায় বলিয়াছেন, "ইহারা যাকে সর্দার বলিয়া ডাকে সর্দার ছাড়া তার অন্য কোনো পরিচয় খুঁজিয়া পাওয়া গেল না। আমার ভয় হইতেছে তত্ত্বজ্ঞানীরা ইহাকে কোনো একটা তত্ত্বের দলে ফেলিয়া ইহার পঞ্চত্ব ঘটাইতে পারেন। কিন্তু, আমার বিশ্বাস, লোকটা তত্ত্বকথা নহে, সত্যকারই সর্দার। এই লোকটির কাজ চালাইয়া লওয়া—পথ হইতে পথে, লক্ষ্য হইতে লক্ষ্যে, খেলা হইতে খেলায়। কেহ যে চুপ করিয়া বসিয়া থাকিবে সেটা তার অভিপ্রায় নয়। কিন্তু, যেহেতু সত্যকার সর্দার মাত্রেই বাহিরে হাঙ্গামা করে না ভিতরে কথা কয়, এই লোকটিকে রঙ্গমঞ্চে না দেখা গেলেই ইহার পরিচয় সুস্পষ্ট হইবে (পৃঃ ১০৮-১০৯)।

এই সর্দারই বুড়ার অস্তিত্বে অবিশ্বাস জানাইয়াছে, চন্দ্রহাসদের বিশ্বাস আছে দেখিয়া তাহাকে খুঁজিয়া বাহির করিতে বলিয়াছে। জরা মৃত্যুরূপ বুড়াকে দূর হইতে দেখি বলিয়া তাহাকে নানা বীভৎসরূপে দেখি—"বুকে দুটো চক্ষু জোনাক-পোকার মতো জ্বলছে" (পৃ-৬৩)। নিকট হইতে দেখিলে তাহাকে যৌবনশ্রী মণ্ডিত দেখা যায়। জীবনের স্বরূপই তাই। খণ্ডজীবনকে দেখিলে মৃত্যুকে সত্য বলিয়া মনে হয়, আবার ইহাই যুগযুগান্তরের ভিতর দিয়া নবরূপ লাভ করিয়া চলিয়াছে। এই জীবনের সত্যরূপকে বাহির হইতে দেখা যায় না, তাই রবীন্দ্রনাথ তাহাকে রঙ্গমঞ্চে না আনিবার কথাই বলিয়াছেন। বস্তুতঃ রঙ্গমঞ্চে প্রথম দৃশ্যে এবং শেষ দৃশ্যের শেষের দিকে সামান্য ক্ষণের জন্য তাহাকে দেখা গিয়াছে। প্রথম দৃশ্যে সর্দার অনেকটা স্থান জুড়িয়াছে, এইখানে জীবনের সূত্রপাত। শিশুর জন্মের পর তাহার সেই জীবনের রঙ্গ পরিবেশকে আলোড়িত করেঃ সে যে আসিয়াছে তাহা বুঝাইয়া দেয়—এই জীবন

মানব হৃদয়ের অনেকটা স্থানই জুড়িয়া থাকে। তখনও শিশুর ভোগবতী জীবন আরম্ভ হয় নাই, তাই তাহার পরিচয় সম্পূর্ণ আড়ালে পড়িয়া থাকে না। তারপর বাস্তব জগতে যখন সেই শিশুর যৌবনকে দেখি, তখন সে ভোগের জগতে আবদ্ধ। তাহার চিরন্তন জীবন-যৌবনের পরিচয় তখন সংগুপ্ত থাকিয়া যায়। জীবন যে গতিশীল, সেই যে নব নব রূপে প্রবাহিত হইয়া চলিয়াছে তাহা আর তখন আমাদের চেতন মনে স্পষ্ট হয় না—তাই সর্দার তখন আর রঙ্গমঞ্চে নাই। আবার জীবনের সায়াহ্নে মৃত্যুর পূর্বে জীবনের কথা, যৌবনের কথা মানুষের বড় বেশী মনে পড়ে। সেই সময় ভোগবতীকে অতিক্রম করিতে পারিলে অন্তর্দৃষ্টি লাভ হয়। মৃত্যুতেই জীবনের শেষ বলিয়া আর তখন মনে হয় না, তাহাকে স্থানান্তরে যাত্রা বলিয়া জানি—

স্তন হতে তুলে নিলে কাঁদে শিশু ডরে,
মুহূর্তে আশ্বাস পায় গিয়ে স্তনান্তরে॥ (নৈবেদ্য : মৃত্যু)

স্তনান্তরে যাইবার কালে সন্দেহে অজ্ঞতার জন্য শিশু যেমন ক্রন্দন করে, স্থানান্তরে যাত্রা কালে মানুষও সেইরূপ ভীত হয়। স্তনান্তরে পৌঁছিয়া শিশু সত্য জ্ঞান লাভ করিয়া শান্ত হয়, মানুষেরও মৃত্যুর স্বরূপ জানা হইয়া গেলে জরা মৃত্যুর চিন্তা আর থাকিবে না, তখন সে বলিতে পারিবে—

অন্তহীন প্রাণে
নিখিল জগতে তব প্রেমের আহ্বানে
নব নব জীবনের গন্ধ যাব রেখে,
নব নব বিকাশের বর্ণ যাব এঁকে।
কে চাহে সংকীর্ণ অন্ধ অমরতাকূপে
এক ধরাতল-মাঝে শুধু এক রূপে
বাঁচিয়া থাকিতে! নব নব মৃত্যুপথে
তোমারে পূজিতে যাব জগতে জগতে॥
(উৎসর্গ : জন্ম ও মরণ)

নাটকের অন্ধ বাউল সূচনার কবিশেখর নিজেই। কবিশেখর বলিয়াছেন তাঁহার রচনায় কোন তত্ত্ব নাই, তাই তাহাকে বুদ্ধি দিয়া বুঝিবার কোন অর্থই হয় না, "আমাদের কথা তো বোঝবার জন্যে হয় নি, বাজবার জন্যে হয়েছে" (পৃ-২০)। হৃদয় প্রস্তুত থাকিলে তবেই কথা

সেখানে ঝঙ্কার তোলে। বিশ্বের সুর তাঁহার হৃদয় তন্ত্রীতে বাজিয়া উঠিয়াছে। চোখে দেখিয়াই প্রকৃতির অন্তরস্থিত অনির্বচনীয়কে চিনিয়া লওয়া যায় না ঃ অনন্ত অসীমের প্রকৃতির ভিতর দিয়া এই নানারূপে প্রকাশকে উপলব্ধি করিতে হইবে, "বিশ্বপ্রকৃতির মধ্যে প্রতি ফাল্গুনে চিরপুরাতন এই-যে চিরনূতন হয়ে জন্মাচ্ছে, মানুষপ্রকৃতির মধ্যেও পুরাতনের সেই লীলা চলছে। প্রাণশক্তিই মৃত্যুর ভিতর দিয়ে আপনাকে বারে বারে নূতন করে উপলব্ধি করছে" (পৃ-১১১)। এই উপলব্ধি বাহিরের চক্ষু দিয়া হয় না—সমস্ত দেহ মন দিয়া দেখিলে তবেই এই উপলব্ধি সম্ভব[৪]। কবিশেখরের সেই উপলব্ধি হইয়াছে। নাটকের অন্ধ বাউলের ক্ষেত্রেও তাহাই হইযাছে। অন্ধ বাউল অন্তর্দৃষ্টি সম্পন্ন মানুষের প্রতীক। সে সব দিযা শোনে—

চন্দ্রহাস॥ বুড়োর রাস্তার সন্ধান পেয়েছি।

কার কাছ থেকে।

চন্দ্রহাস॥ এই বাউলের কাছ থেকে।

ও কী। ও যে অন্ধ।

চন্দ্রহাস॥ সেইজন্যে ওকে রাস্তা খুঁজতে হয় না, ও ভিতর থেকে দেখতে পায়। (পৃঃ ৭৫-৭৬)

একদিন এই বাউলেরও বাহিরের দৃষ্টি ছিল, সে তখন ভোগের পৃথিবীকে দেখিয়াছে। তারপর সেই জগৎ অতিক্রম করিযা সে ভোগবর্তা পার হইযা সত্য দৃষ্টি লাভ করিল। তখন আর তাহার কোন ভয় ভাবনা রহিল না, "সূর্য যখন গেল তখন দেখি অন্ধকারের বুকের মধ্যে আলো। সেই অবধি অন্ধকারকে আমার আর ভয় নেই" (পৃ-৭৬)। এখন হইতে গানের সুর তুলিযা সে প্রকৃতির অন্তরস্থিত সুরকে স্পর্শ করে। বিজ্ঞানও বলে যখন দুইটি যন্ত্রে এক সুর বাঁধা থাকে তখন একটিতে ঝঙ্কার তুলিলে অপরটি আপনা হইতেই বাজিযা ওঠে। পৃথিবীর বাঁধা সুরের সহিত অন্ধ বাউল তাই সুর মিলাইবার সাধনায় সিদ্ধি লাভ করিযা তাহারই সাহায্যে পথ চিনিযা অগ্রসর হয; তাই, "গান না গাইলে আমি রাস্তা পাই নে" (পৃ-৭৭)। কবিশেখরও তাই পালা রচনা করিয়া নিজের অজ্ঞাতসারেই পথের সন্ধান পান এবং অন্যের হৃদয়তন্ত্রীতে ঝঙ্কার তুলিয়া

৪। মেটারলিঙ্কের The Intruder-এর অন্ধ ঠাকুরদাও এই প্রকার অনুভূতির পরিচয় দিয়াছেন। এই গ্রন্থের ১ম খণ্ড ঃ তৃতীয় পরিচ্ছেদ দ্রষ্টব্য।

তাহাদেরও পথের সন্ধান করিয়া দেন। তাই তাঁহার রচনা তার্কিকদের জন্য নয়, সহজ বিশ্বাসীদের জন্য। অন্ধ বাউলও তাই দ্বিধাগ্রস্ত চন্দ্রহাসের সঙ্গীদের পথ দেখায় নাই, বিশ্বাসী চন্দ্রহাসকেই পথ দেখাইয়াছে।

শ্রুতিভূষণকে নাটকের দর্শক শ্রেণীভুক্ত করিতে কবিশেখর চাহেন নাই। কিন্তু তিনি তাহাকে শোধন করিয়া নাটকের 'দাদা'র ভূমিকাটি দিয়াছেন। শ্রুতিভূষণ বৈরাগ্য বারিধির চৌপদীর ব্যাখ্যা শোনান আর ব্রাহ্মণীর অঙ্গে মহারাজের যশোঝংকার ধ্বনিত করিবার ব্যবস্থা করেন—সমৃদ্ধ কাঞ্চনপুর জনপদটি হস্তগত করিয়া নিশ্চিন্ত মনে বৈরাগ্য সাধনে নিযুক্ত থাকিতে চাহেন।

শ্রুতিভূষণের বাক্য শুনিতে ভাল কিন্তু তাহার সুরটা মনকে স্পর্শ করে না, দাদার কথাগুলিও গভীর জ্ঞানের পরিচয় দেয়। দাদাও নিজ রচিত চৌপদীর ব্যাখ্যা করিয়া তত্ত্বকথা শোনান তবে নিজের বৈরাগ্য সাধনের পথ উন্মুক্ত করিতে শ্রুতিভূষণের ন্যায় বিন্দুমাত্র সচেতন নহেন। এইখানেই উভয়ের মূল পার্থক্য এবং এইখানেই দাদার শুদ্ধি।* দাদার চৌপদীগুলি প্রথমদিকে কেবল প্রয়োজনের কথাই শুনাইয়াছে; কিন্তু চন্দ্রহাস তাহার তুলট কাগজের হলদে পাতাগুলি পিয়ালবনের সবুজ পাতার মধ্যে লুকাইয়া রাখিয়াছিল, সুতরাং হলুদ রঙ্গে একটা সবুজের ছাপ লাগিয়া যাওয়া আশ্চর্য নহে। চন্দ্রহাসের দলের সহিত বাহির হইয়া আসার জন্যও তাহার রঙ্গ কিছুটা বদ্‌লাইয়া থাকিবে। তাই চতুর্থ চৌপদীতে অহং-এর ত্রুটির কথা উল্লেখ করিয়া ফলের লোভ ত্যাগ করিয়া ফলিয়া ওঠার কথাই বলা হইয়াছে। এইখানে শ্রুতিভূষণের সহিত তাহার মনোভাবের সম্পূর্ণ বৈপরীত্যের পরিচয় আছে। দাদা শুষ্ক জ্ঞানের প্রতীক। শুষ্কজ্ঞানের পূর্ণতা লক্ষ্য করা যায় পঞ্চম চৌপদীটিতে, জীবন ও মৃত্যুর স্বরূপ দাদাও উপলব্ধি করিয়াছে; মৃত্যুর মধ্য দিয়াই জীবন নবরূপ লাভ করে:

> সূর্য এল পূর্বদ্বারে, তূর্য বাজে তার।
> রাত্রি বলে, ব্যর্থ নহে এ মৃত্যু আমার—
> এত বলি পদপ্রান্তে করে নমস্কার।
> ভিক্ষাঝুলি স্বর্ণে ভরি গেল অন্ধকার॥ (পৃ-১০২)।

প্রাণের স্পর্শে শুষ্ক জ্ঞানও সত্যকে জানিয়াছে। এই জ্ঞানকে সরস আনন্দপূর্ণ করিয়া তুলিতে পারিলেই পরিপূর্ণরূপে সার্থকতা অর্জন করা যায়।

তাই চন্দ্রহাস তাহাকে বলে, "তোমার চৌপদীকে আমরা এমনি রাঙিয়ে দেব যে তার অর্থ আছে কি না আছে বোঝা দায় হবে" (পৃ-১০৩)। সে আরও বলে, "আমরা তোমার মাথায় পরাব নব-পল্লবের মুকুট" (পৃ-১০৩)। তাহার সঙ্গী বলে, "তোমার গলায় পরাব নবমল্লিকার মালা" (পৃ-১০৩)। শুষ্কতা দূর হইয়া জ্ঞান আনন্দে ঝল্‌মল্‌ করিয়া উঠিবে।

নাটকের প্রধান পাত্রদের মধ্যে অবশিষ্ট রহিলেন আরও দুইজন: একজন চন্দ্রহাস, যাহাকে আমরা ভালবাসি—যে আমাদের প্রাণকে প্রিয় করিয়াছে, আর একজন মহারাজ স্বয়ং। মূল নাটকে কিন্তু মহারাজের সন্ধান পাওয়া যায় নাই। তবে কি কবিশেখর ভ্রান্ত সংবাদ দিয়াছেন? মহারাজকে যে মূল নাটকের অন্তর্ভুক্ত করিবার বিশেষ প্রয়োজন অনুভব করিয়াছিলেন কবিশেখর, "হাঁ মহারাজ, আপনি যদি এর ভিতরে না থেকে বাইরেই থাকেন তা হলে কবিকে গাল দিয়ে বিদায় ক'রে ফের শ্রুতিভূষণকে নিয়ে বৈরাগ্যবারিধির চৌপদীব্যাখ্যায় মন দেবেন" (পৃ-৩১)। সুতরাং নাটকের মধ্যে মহারাজ কোথায় গেলেন তাহা দেখা প্রয়োজন।

সূচনায় দেখা গিয়াছে যে মহারাজের কানের পাশেই মৃত্যুর ঘণ্টাধ্বনি বাজিয়া উঠিয়াছে, এখন তিনি তাই বৈরাগ্যবারিধির মধ্যে অবগাহনের উদ্যোগ করিতেছেন এমন সময় কবিশেখর আসিয়া সমস্ত ওলোট-পালোট করিয়া দিলেন। মহারাজের মনে যে মৃত্যুর চিন্তা বাসা বাঁধিতেছিল তাহা পুনরায় জীবনের সন্ধানে চঞ্চল হইয়া উঠিল—

কিন্তু, মরবই যে, কবিশেখর, আজ হোক আর কাল হোক।

কে বললে, মহারাজ। মিথ্যা কথা। যখন দেখছি বেঁচে আছি, তখন জানছি যে বাঁচবই; যে আপনার সেই বাঁচাটাকে সব দিক থেকে যাচাই করে দেখলে না সেই বলে 'মরব', সেই বলে—

নলিনীদলগত জলমতি তরলং,
তদ্‌বৎ জীবনমতিশয় চপলং।

কী বল হে, কবি, জীবন চপল নয়?

চপল বই-কি, কিন্তু অনিত্য নয়। চপল জীবনটা চিরদিন চপলতা করতে করতেই চলবে। মহারাজ, আজ তুমি তার চপলতা বন্ধ ক'রে মরবার পালা অভিনয় করতে বসেছ?

ঠিক বলছ, কবি? আমরা বাঁচবই?

বাঁচবই।

যদি বাঁচবই তবে বাঁচার মতো করেই বাঁচতে হবে—কী বল। (পৃ-২২-২৩)।

বাঁচার মত করিয়া বাঁচিবার জন্যই চন্দ্রহাসও পথে নামিয়া আসিয়াছে। প্রথমে তাহার মহারাজেরই মত মনে হইয়াছিল যে মানুষের জীবন খণ্ডিত, "আমরা যে ভারি কাঁচা, আমরা যে একেবারে নতুন, ভবের রাজ্যে আমাদের পাকা দলিল কোথায়" (পৃ-৪৪)। আবার মহারাজেরই ন্যায় সে সচেতন হইয়া উঠিল, জরা-মৃত্যু কি তাহা জানিতে হইবে, "বুড়োকে খুঁজতে বেরিয়েছি" (পৃ-৫৫)। সন্দেহের ভিতর দিয়া মহারাজের চেতনা জাগ্রত হইয়া উঠিয়াছিল, "ঠিক বলছ, কবি? আমরা বাঁচবই"—চন্দ্রহাসও পরিপূর্ণরূপে জয়লাভ করিয়াছিল, মৃত্যুর গুহার মধ্যে প্রবেশ করিয়া সে জীবনকে আবিষ্কার করিল, বুঝিল, মরণ বলিয়া কিছু নাই। মৃত্যুর ভিতর দিয়াই জীবনকে নূতনরূপে পাওয়া যায়ঃ সুতরাং বাঁচিব নিশ্চয়ই। মহারাজকে পথ দেখাইলেন কবিশেখর। কবিশেখরেরই নাটকীয় রূপ অন্ধ বাউল; সেই বাউলই পথ দেখাইল চন্দ্রহাসকে। সুতরাং মহারাজেরই নাটকীয় ভূমিকা এই চন্দ্রহাস। চন্দ্রহাস প্রেমের প্রতীক। মহারাজ মৃত্যুর চিন্তায় কর্মবিমুখ হইয়া উঠিয়াছিলেন, কবিশেখর আবার সকলের প্রতি তাঁহার প্রেম জাগ্রত করিয়া কর্মের জগতে তাহাকে টানিয়া আনিলেন, "মহারাজ, ওই-যে তোমার দরজার বাইরে কান্না উঠেছে, ওই কান্নার মাঝখান দিয়ে এখন ছুটতে হবে" (পৃ-২১)। প্রেমেরই পূর্ণ মূর্তি চন্দ্রহাস —সেই প্রেমের আলোকে জাগ্রত মহারাজ। নাটকে এই রূপটি পরিপূর্ণতা লাভ করিয়াছে।

প্রেম সুন্দর। প্রেমের বন্ধনে আবদ্ধ থাকে বলিয়াই ফুলের দলগুলি পরস্পরের সহিত দৃঢ়রূপে যুক্ত থাকে, তখনই তাহা সুন্দর দেখায়। চন্দ্রহাসও তাই সুন্দর, "সে যে কী সুন্দর ছিল যখন তাকে চোখে দেখলুম তখন সেটা চোখে পড়ে নি" (পৃ-৯৪)। প্রেমের স্পর্শ ঝরণার মত, সমস্ত মালিন্য ভাসাইয়া লইয়া যায়। প্রেম সব সময়েই উজ্জ্বল—চন্দ্রহাসের মুখেও তাই হাসি। জীবন হইতে প্রেম যদি সরিয়া যায় তাহা হইলে সবকিছুই অর্থহীন বলিয়া মনে হয়। প্রেমই মানুষকে মানুষ করিয়া তুলিয়াছে—চন্দ্রহাস

গেলেও তাই জীবনের আর কিছুই থাকে না। ইহাও দেখা গিয়াছে যে প্রেমই মানুষকে জয়ী করে। রাজ্য জয় অপেক্ষা হৃদয় রাজ্য জয় করা কঠিনতর। চণ্ডাশোক রক্তস্রোতের উপর দাঁড়াইয়া রক্তচক্ষু প্রদর্শন করিয়া মানুষকে ভীত চকিত করিতে পারে, কিন্তু মানুষকে অন্তরের ঐক্যে বিধৃত করা ধর্মাশোকের পক্ষেই কেবল সম্ভব। সুতরাং প্রেম কখনও পরাভব স্বীকার করে না, চন্দ্রহাসও তাই বলে, "আমি জয়ী হয়ে ফিরে আসব" (পৃ-৯১)। সে জয়ী হয়ও : মৃত্যুর গুহার মধ্যে প্রবেশ করিয়া প্রেম জীবনের স্বরূপ উদ্ধার করে, "প্রাণের প্রতি গভীর বিশ্বাসের জোরে চন্দ্রহাস মৃত্যুর গুহার মধ্যে প্রবেশ করে সেই প্রাণকেই নূতন করে, চিরন্তর করে দেখতে পেলো" (পৃ-১১১)। প্রেমের দৃষ্টিই কেবল সত্যকে চিনাইতে পারে।

চন্দ্রহাসের সঙ্গীর দলকে ভোগবতী পার হওয়া নাটকের দর্শকদের প্রতিভূ মনে করা চলে। তাহারা মহারাজের সঙ্গী। সন্দেহ দ্বিধার মধ্য দিয়া তাহারাও মহারাজকে ভালবাসিয়াই জীবনকে চিনিবার সুযোগ পাইবে, যেমন পাইয়াছিল চন্দ্রহাসের সঙ্গীরা তাহাকে ভালবাসিয়া, "যুবকের দল বুঝতে পারলে জীবনকে যৌবনকে বারে বারে হারাতে হবে, নইলে ফিরে পাবার উৎসব হতে পারবে না" (পৃ-১১১)। বসন্তোৎসবেরও ইহাই তো সার্থকতা।

মুক্তধারা

(১৩২৮ : ১৯২২)

মুক্তধারার পূর্বকল্পিত নাম ছিল পথ ; শ্রীমতী রাণু অধিকারীকে একটি পত্রে রবীন্দ্রনাথ লিখিতেছেন—

আমি সমস্ত সপ্তাহ ধরে একটা নাটক লিখছিলুম—শেষ হয়ে গেছে, তাই আজ আমার ছুটি। এ নাটকটা প্রায়শ্চিত্ত নয়, এর নাম পথ। এতে কেবল প্রায়শ্চিত্ত নাটকের সেই ধনঞ্জয় বৈরাগী আছে, আর কেউ নেই। সে গল্পের কিছু এতে নেই, সুরমাকে এতে পাবে না। (ভানুসিংহের পত্রাবলী : পত্র ৪৩)।

নাটকটির নামের মধ্যেও বিশেষ তাৎপর্য আছে। 'পথ' নামটি কল্পিতই হইয়াছিল কিন্তু দেওয়া হয় নাই। কিন্তু এই নামটির মধ্যেও গুরুত্বপূর্ণ সঙ্কেত আছে। পথের উপরই নাটকটি অভিনীত হইয়াছে। মানুষ পথে নামিয়া আসিযাছে ; কেহ নিজ আদর্শ মত পথে চলিতে চায়—কেহবা পথে নামিয়াও পথ হাতড়াইয়া মরিতেছে। পথের গোলোক ধাঁধায় তাহারা হতচকিত। এক পথের পথিক বিভূতি, যন্ত্র সভ্যতার রথে চড়িয়া সে পথে বাহিব হইয়াছে—অপর পথের পথিক অভিজিৎ-ধনঞ্জয় বৈরাগী, তাহারা কল্যাণের পথ আবিষ্কার করিবে। এই দুই পথের সংঘর্ষ নাটকটির সংঘাতের মূলে। পথই তো মানুষের জীবনকে নির্দিষ্ট করে। যে পথে বাহির হয় নাই সে জীবনকে জানে না পথ দিয়াই আমরা গৃহে পৌঁছাই। কেবল পথেই থাকিব মনে করিলে গৃহে পৌঁছান হইবে না—পথে চলিব না মনে করিলেও গৃহ নিকটে আসিবে না। প্রায়শ্চিত্ত নাটকে (১৯০৯) প্রতাপাদিত্য ও ধনঞ্জয় বৈরাগীর কথা এইখানে উল্লেখ করা যাইতে পারে—

প্রতাপাদিত্য। বৈরাগী, আমার এক একবার মনে হয় তোমার ওই রাস্তাই ভালো, আমার এই রাজ্যটা কিছু না।

ধনঞ্জয়। মহারাজ, রাজ্যটাও তো রাস্তা। চলতে পারলেই হল! ওটাকে যে পথ বলে জানে সেই তো পথিক···। (পৃ-৯৫)

এই নাটকেও আছে দুই পথিকের পথের সংঘর্ষ—জীবনের পথের সন্ধান

তাহাতেই পাওয়া গেল। মানুষের জীবনেরও এই পথের সংঘর্ষে একটা অর্থ দেখা গেল। সে দেহসর্বস্ব পশু মাত্র নয়—তাহার অতিরিক্ত আরও কিছু।

'মুক্তধারা' নামটি অনেকখানি কাব্যগুণ সম্পন্ন। নাটকটির উপসংহার করিয়া মানুষের জীবনের যে মূল্য রবীন্দ্রনাথ নিরূপণ করিয়াছেন তাহার সহিত এই নামটির যোগ ঘনিষ্ঠ। কিন্তু এই নামটির মধ্যে পথ-এর ন্যায় সেই সংঘাতটি স্পষ্ট হইয়া ওঠে নাই। পথ বলিলেই পথ-এর দ্বন্দ্বটি মনে জাগে—কিন্তু মুক্তধারায় ধারার মুক্তিটিই বড় হইয়া ওঠে : কিন্তু এই ধারার মুক্তির জন্য যে সংঘর্ষ হইয়াছিল তাহারই গোপন কথাটা একেবারে অন্তরালে থাকিয়া যায় তাহা অবশ্য মনে করা চলে না। প্রতীক নাটকের ক্ষেত্রে এই ধরণের নামকরণই অবশ্য অধিকতর সংকেতপূর্ণ এবং সার্থক। নাটকে যে দুইটি ভাবধারার সংঘাতের কথা প্রথমেই লক্ষ্য করা যায় তাহাতে কাহার জয় হইল এই নাম তাহার সংকেত করে এবং মানুষের মনের ভিতরে যে মানুষটি আছে তাহাকে স্বস্তির নিশ্বাস ফেলিবার অবকাশ দেয়। এই ধরণের নাটকে মনকে দোদুল্যমান রাখিয়া রক্তের মধ্যে চাঞ্চল্য সৃষ্টি করাই লক্ষ্য নয় : শঙ্কা সত্ত্বেও মনের ভিতর একটা প্রশান্তি আনিয়া দেওয়া চাই। এইসব নাটকের ট্র্যাজেডিও সেই কারণে ট্র্যাজেডি নয়, অর্থাৎ মৃত্যু এখানে ছায়া ফেলে না সে আনন্দ মধুর স্পর্শ বুলাইয়া দেয়—মৃত্যু সেখানে পরিপূর্ণতা রূপে আসে—

ওগো আমার এই জীবনের
শেষ পরিপূর্ণতা
মরণ, আমার মরণ, তুমি
কও আমারে কথা।

(গীতাঞ্জলি : ১১৬ সংখ্যক কবিতা)

সেইখানে শোক তাপে জর্জরিত হই না। পরিপূর্ণ প্রশান্তিতে, পূর্ণ হৃদয়ে বলিতে পারি, "পরিপক্ক ফল যেমন বৃন্তচ্যুত হয়ে নিজেকে সম্পূর্ণ দান করে, তেমনি মৃত্যুর দ্বারাই তিনি তাঁর জীবনকে আমাদের দান করে গেছেন। মৃত্যুর ভিতর দিয়ে না পেলে এমন সম্পূর্ণ করে পাওয়া যায় না। জীবন নানা সীমার দ্বারা আপনাকে বেষ্টিত করে রক্ষা করে, সেই সীমা কিছু-না-কিছু বাধা রচনা করে।......মৃত্যু আজ তাঁর জীবনকে আমাদের প্রত্যেকের নিকটে এনে দিয়েছে, প্রত্যেকের অন্তরে এনে দিয়েছে। এখন আমরা

যদি প্রস্তুত থাকি, যদি তাঁকে গ্রহণ করি, তবে তাঁর জীবনের সঙ্গে আমাদের জীবনের রাসায়নিক সম্মিলনের কোনো ব্যাঘাত থাকে না।···বিশ্বপাবন মৃত্যু আজ স্বয়ং সেই মহৎজীবনকে আমাদের সম্মুখে উদ্ঘাটন করে দাঁড়িয়েছেন" (শান্তিনিকেতন : ১ম খণ্ড : মৃত্যুর প্রকাশ : পৃ-১৭৮-১৭৯)।

এই মৃত্যু আমাদের জীবনের নব মূল্যায়ন করে—আমরা নিজেদের তাৎপর্য খুঁজিয়া পাই। সুতরাং এই সকল নাটকের প্রধানতম লক্ষ্য উত্তেজনা• সৃষ্টি না করিয়া প্রশান্তি আনিযা দেওযা। সেই দিক দিয়া বিচার করিলে 'পথ' অপেক্ষা 'মুক্তধারা' নাম অধিকতর তাৎপর্য পূর্ণ।

এই নাটকে ভাবজগতের সংঘাত সৃষ্টি করা হইয়াছে অপূর্ব কৌশলে। দুইটি ভাবকে রবীন্দ্রনাথ দুইটি প্রতীকের সাহায্যে প্রথমেই উপস্থিত করিয়াছেন—

"দূরে আকাশে একটা অভ্রভেদী লৌহযন্ত্রের মাথাটা দেখা যাইতেছে এবং তাহার অপর দিকে ভৈরবমন্দিরচূড়ার ত্রিশূল। ···আজ অমাবস্যায় ভৈরবের মন্দিরে আরতি" (পৃ-৭)—চারিদিকে অন্ধকার, এই অন্ধকার যন্ত্রদানবের সৃষ্ট অন্ধকারেরই প্রতীক: মানুষের মনেও সে অন্ধকার সৃষ্টি করিয়াছে। শিবতরাইয়ের মানুষ অজ্ঞানতা এবং অত্যাচারের অন্ধকারে আছে, উত্তর কূটের মানুষের মনেও আলো নাই—সেখানে লোভ হিংসা পরম অন্ধকার সৃষ্টি করিয়াছে। আবার অন্ধকার গভীর না হইলে ভৈরবও ত' জাগেন না: মানুষের মনে যখন অন্ধকার ঘনীভূত হইয়া চাপিয়া বসে, তখনই—

যদা যদা হি ধর্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত।
অভ্যুত্থানমধর্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্।
(গীতা ৪র্থ অধ্যায় : ৭ সংখ্যক শ্লোক)

হে ভারত, যখন ধর্মের গ্লানি হয় এবং অধর্ম প্রবল হয়, তখনই আমি জন্মগ্রহণ করিয়া থাকি (গান্ধীজীর ভাষ্য)।

তবে কি রবীন্দ্রনাথ বলিতে চাহেন যে যন্ত্র মাত্রই বর্জনীয়? ভৈরব-মন্দিরের পাশে লৌহযন্ত্রের মাথাটা দেখা দিলেই কি ধ্বংসের প্রতীক ত্রিশূল যন্ত্রের মাথায় আসিয়া পড়িবে! রবীন্দ্রনাথ তাহা কখনও মনে করেন নাই। যন্ত্র যে শক্তি তাহা তিনি জানিতেন। মানবতাকে, সর্বদিকে ব্যাপ্ত করিবার জন্যই শক্তি চাই—"সংযমের দ্বারা শক্তিকে আয়ত্ত করিতে

পারিলেই তবে কর্ম করা সহজ হয়" (ধর্ম : শান্তম্ শিবমদ্বৈতম্ : পৃ-১২০)। এই প্রবন্ধেই তিনি আরও স্পষ্ট করিয়া বলিয়াছেন—

"জগৎ ব্যাপারের মূলে একজন কাজ করিয়া চলিয়াছেন। অভিজ্ঞ ব্যক্তির দৃষ্টি সেইখানে থাকে বলিয়া আস্ফালনটা, জগতের বাস্তব দিকটাই তাঁহার নিকট বড় হইয়া ওঠে না। যাহারা সেই মূলকে দেখিতে পায় না যন্ত্রই তাহাদের নিকটে বড—তাহারা বস্তুকে লইয়াই বোঝা বাড়াইয়া তোলে।

"একটা বৃহৎ কারখানার মধ্যে কোনো অজ্ঞ লোক যদি প্রবেশ করে তবে সে মনে করে, এ একটা দানবীয় ব্যাপার; চাকার প্রত্যেক আবর্তন, লৌহদণ্ডের প্রত্যেক আস্ফালন, বাষ্পপুঞ্জের প্রত্যেক উচ্ছ্বাস তাহার মনকে একেবারে বিভ্রান্ত করিতে থাকে। কিন্তু অভিজ্ঞ ব্যক্তি এই সমস্ত নড়া-চড়া চলাফিরার মূলে একটি স্থির শান্তি দেখিতে পায়—সে জানে, ভয়কে অভয় করিয়াছে কে, শক্তিকে সফল করিতেছে কে, গতির মধ্যে স্থিতি কোথায়, কর্মের মধ্যে পরিণামটা কী (ধর্ম : পৃ-১১৫)।

যাহারা মূলকে দেখিতে পায়না তাহারাই যন্ত্রকে বড করিয়া বস্তুর বোঝা বাড়াইয়া তোলে—বিপদ আসে সেইখান হইতেই। তখনই যন্ত্র স্ফীত হইয়া উঠিয়া ভৈরবকে অতিক্রম করিতে চায়—ভৈরবকে বেদীচ্যুত করিবার দম্ভ হইতেই সংঘাত সৃষ্টি। তাই সেই সংঘাত বুঝাইতে রবীন্দ্রনাথ অভ্রভেদী লৌহযন্ত্রের মাথাটার অপর দিকে ভৈরব মন্দিরচূড়ার ত্রিশূল স্থাপন করিয়াই ক্ষান্ত হন নাই। যাহারা জগৎ ব্যাপারের মূলের 'একজন'কে তুচ্ছ করিয়া যন্ত্রের বোঝা সৃষ্টি করিয়া সংঘাতের পথ উন্মুক্ত করে তাহাদের দম্ভকেও স্পষ্ট করিয়া দেখাইয়াছেন—

পথিক। আকাশে ওটা কী গড়ে তুলেছে? দেখতে ভয় লাগে।

নাগরিক। জান না? বিদেশী বুঝি? ওটা যন্ত্র।

... ...

পথিক। বাবা রে! ওটাকে অসুরের মাথার মতো দেখাচ্ছে, মাংস নেই, চোয়াল ঝোলা। তোমাদের উত্তরকূটের শিয়রের কাছে অমন হাঁ করে দাঁড়িয়ে; দিনরাত্তির দেখতে দেখতে তোমাদের প্রাণপুরুষ যে শুকিয়ে কাঠ হয়ে যাবে।

নাগরিক। আমাদের প্রাণপুরুষ মজবুত আছে, ভাবনা কোরো না।

পথিক। তা হতে পারে, কিন্তু ওটা অমনতরো সূর্যতারার সামনে মেলে রাখবার জিনিস নয়, ঢাকা দিতে পারলেই ভালো হত। দেখতে পাচ্ছ না যেন দিনরাত্তির সমস্ত আকাশকে রাগিয়ে দিচ্ছে?

নাগরিক। আজ ভৈরবের আরতি দেখতে যাবে না?

পথিক। দেখব বলেই বেরিয়েছিলুম। প্রতিবৎসরই তো এই সময় আসি, কিন্তু মন্দিরের উপরের আকাশে কখনও এমনতরো বাধা দেখি নি। হঠাৎ ওইটের দিকে তাকিয়ে আজ আমার গা শিউরে উঠল—ও যে অমন করে মন্দিরের মাথা ছাড়িয়ে গেল এটা যেন স্পর্ধার মতো দেখাচ্ছে। দিয়ে আসি নৈবেদ্য, কিন্তু মন প্রসন্ন হচ্ছে না। (মুক্তধারা : পৃ-৮)

যন্ত্র মন্দিরের মাথা ছাড়াইয়া গিয়াছে বলিয়াই অসুরের মতো দেখাইতেছে—দম্ভ সমস্ত প্রকৃতিকেই ক্রুদ্ধ করিয়া তুলিয়াছে। যন্ত্র যখন যন্ত্রীকে অতিক্রম করিতে চায়, বস্তুর ভোগ যখন আত্মার দৃষ্টিকে রুদ্ধ করিতে উদ্যত হয় তখনই প্রকৃতির রূপ ভবিষ্যতের বিপদ সঙ্কেত করে। বস্তুর মর্যাদা আত্মিক শক্তিকে অতিক্রম করিলে মঙ্গল নাই : তাই বস্তু যখন প্রাধান্য পাইতে আরম্ভ করে তখন কালীয়দমন করিতেই হয় (প্রথম খণ্ড : দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ দ্রষ্টব্য)। এইখানেই এই নাটকের সংঘাতের সূত্রটি রহিয়াছে।

পথিকের শেষ কথাটি সংঘাতের সূত্রকে আরও একটু আগাইয়া দিয়াছে। নৈবেদ্য সে প্রথামত দিয়া যাইবে বটে কিন্তু তাহার মন তো তাহাতে প্রসন্ন হইতেছে না। তাহার মনে সংশয় দেখা দিয়াছে—নৈবেদ্য কি দেবতার নিকট পৌঁছাইবে : অর্থাৎ দেবতা কি তাহা গ্রহণ করিবেন! রবীন্দ্রনাথ যেন চরম সংঘর্ষের সঙ্কেত করিলেন। বস্তুর স্তূপের বোঝা চরমে পৌঁছাইলেই মানব মনে অন্ধকার নামে—'অমাবস্যার রাতে ভৈরবের আরতি'। আর তখনই ভৈরব জাগেন : তিনি নৈবেদ্য হয়তো গ্রহণ করিবেন না। তবে কি তিনি জাগিতেছেন?

পরের পৃষ্ঠায় আর একটা সম্ভাবনার সঙ্কেত করিলেন রবীন্দ্রনাথ—

অম্বা।...আমাদের পূজো বাবার কাছে পৌঁচচ্ছে না—পথের থেকে কেড়ে নিচ্ছে।

নাগরিক। কে নিচ্ছে?

অম্বা। যে আমার বুকের থেকে সুমনকে নিয়ে গেল সে। সে যে কে
এখনও তো বুঝলুম না। সুমন, আমার সুমন, বাবা সুমন!

ভৈরবের পূজাই তো হইতেছে না—ইহা যে অহংবোধের তৃপ্তি! উত্তর কূটের অহংকারী মানুষগুলিই ভৈরব মন্দিরে পূজার ব্যবস্থা করিতে চলিয়াছে। বিভূতিকে পুরস্কৃত করিবার উৎসবের অঙ্গ হিসাবেই এই ভৈরব পূজা। শ্রদ্ধার পূজা নয়। এই পূজার সার্থকতা কোথায়? নৈবেদ্য তিনি নিবেন কিনা সন্দেহ, ইহা দম্ভের পূজাই হইবে। যুদ্ধযাত্রার প্রাক্‌কালে দেবমন্দিরে যদি পূজা দেওয়া হয় তবে তাহাদের রক্ত স্নানের লোলুপতাকে আশীর্বাদ করিতে দেবতা সেই অর্ঘ্য গ্রহণ করেন না। অপূর্ব কৌশলে তিনটি পৃষ্ঠার মধ্যে রবীন্দ্রনাথ নাটকটির সংঘাতের পূর্ণ চিত্র উদ্ঘাটন করিয়াছেন।

অম্বার শেষ কথাটায় এক আশ্চর্য সংকেত আছে: যে দেবতার পূজা কাড়িয়া লইতেছে সে যে কে তাহা অম্বা জানে না কিন্তু এইটুকু জানে যে সে 'বুকের থেকে সুমনকে নিয়ে' যায়। সুন্দর মনকে নিষ্পেষণ করা: মানুষের আত্মাকে অবরুদ্ধ করাই তাহার কাজ। ইহাতে একদিকে যেমন নাটকীয়তা সৃষ্টি করা হইযাছে অপরদিকে সেইরূপ এক তাৎপর্যপূর্ণ প্রতীকিতার পরিচয়ও আছে। এইরূপ নাটকীয়তা এবং প্রতীকিতা নাটকটির অনেক স্থানেই দেখা যায়।

ভৈরবের সঙ্গে যন্ত্রের সংঘাত একেবারে মুখামুখি করিয়া দিয়াছেন অম্বার সঙ্গে উত্তর কূটের নাগরিকের কথায়। ভৈরবের মন্দিরে যখন অম্বা পূজা দিতে গিয়াছিল তখনই তাহার পুত্র সুমনকে বাঁধ বাঁধার কাজে ধরিয়া লইয়া যাওয়া হয়। মাতা যখন সন্তানের জন্য মন্দিরে আশীর্বাদ ভিক্ষা করিতেছিলেন মানুষের দম্ভ দেবতার সঙ্গে পাল্লা দিয়া সেই মুহূর্তেই সন্তানের জীবনে অভিশাপ রূপে নামিয়া আসিল। রবীন্দ্রনাথ সংঘাতও ধীরে ধীরে চরমে তুলিয়াছেন পাকা শিল্পীর ন্যায়।

নাটকীয়তা সৃষ্টি এবং শংকরের রুদ্র মূর্তিতে আবির্ভাবের সংকেত করিতে বিশেষ বিশেষ মুহূর্তে ভৈরবপন্থীদের মুখে গান দিয়াছেন। ভৈরবের বন্দনা এবং যন্ত্রের বন্দনার দ্বারাও একটা দ্বন্দ্ব সৃষ্টি করা হইয়াছে। বিভূতির দম্ভ যখন চরমে পৌঁছিয়াছে, "যন্ত্রের জোরে দেবতার পদ নিজেই নেব" (পৃ-১১) তখনই ছিদ্র পথের কথা বলিয়া তিনি পাঠকদের মনে একটা

আশা জাগ্রত করিয়াছেন। দম্ভকে মানুষ সহ্য করিতে পারে না, এমন কি তাহার সাময়িক জয়েও চিত্ত অস্থির হইয়া ওঠে। বাহিরে আমরা যাহাই বলিনা কেন আমাদের অন্তরের ভিতরে যে মানুষটি বাস করে সে আত্মবিসর্জনকারীর নিকটেই আত্মসমর্পণ করে,—ছিদ্র পথে বিভূতির দম্ভ চূর্ণ হইবার সম্ভাবনায় পাঠক যেন শান্তি পায়।

পাঠক চিত্তকে রবীন্দ্রনাথ ধীরে ধীরে পরিণতির দিকে লইয়া গিয়াছেন। ভৈরবের সঙ্গে যন্ত্রের সংঘাতের অবশ্যম্ভাবী পরিণতি যে ভৈরবের জয় সেই কথাটি নাটকীয়তা সৃষ্টি করিয়াই তিনি ক্রমে উদ্‌ঘাটিত করিয়াছেন। রাজা রণজিৎ বিভূতিকে নিজের কাজে লাগাইয়াছিলেন; অথচ তিনি যে অর্থে অম্বাকে যে কথা বলিলেন সেই অর্থকেই ব্যঙ্গ করিল সেই কথার ভিতরকার অর্থ—

রণজিৎ। (অম্বাকে) তুমি খেদ কোরো না। আমি জানি, পৃথিবীতে সকলের চেয়ে চরম যে দান তোমার ছেলে আজ তাই পেয়েছে।

অম্বা। তাই যদি সত্যি হবে তা হলে সে দান সন্ধেবেলায় সে আমার হাতে এনে দিত, আমি যে তার মা।

রণজিৎ। দেবে এনে। সেই সন্ধ্যে এখনও আসে নি।

অম্বা। তোমার কথা সত্যি হোক বাবা। ভৈরবমন্দিরের পথে পথে তামি তার জন্যে অপেক্ষা করব। সুমন! (পৃ-২০)

দেশের জন্য প্রাণ বিসর্জনকেই রণজিৎ মহিমান্বিত করিতে চাহিয়াছিলেন। কিন্তু অর্থ দাঁড়াইল বিপরীত। আত্মবিসর্জন দিয়া সে ভৈরবকে জাগাইয়া তুলিতেছে—ইহা অপেক্ষা বড দান আর কি হইতে পারে! ভৈরব জাগিবেনই—যখন অন্ধকার ঘণীভূত হইবে, বস্তু আরও জোরে চাপিয়া আসিবে তখনই ভৈরব জাগিবেন। সুন্দরের বলির ভিতর দিয়াই ভৈরব জাগেন: ইহাই তো তাঁহার আশীর্বাদ। ভেরব মন্দিরের পথে অপেক্ষা করিলে জাগ্রত ভৈরব সুমনকে অর্থাৎ সুন্দর মনকে, শুভঙ্করী চৈতন্যকে ফিরাইয়া দিবেন।

রণজিতের মনেও দ্বন্দ্বের পরিণতি সম্বন্ধে একটা ভয় দেখা দিয়াছে—"দেখেছ ওর পিছন থেকে সূর্য যেন ক্রুদ্ধ হয়ে উঠেছেন? আর ওটাকে দানবের উদ্যত মুষ্টির মতো দেখাচ্ছে। অতটা বেশি উঁচু করে তোলা

ভালো হয় নি" (পৃ-২৩)। যাহারা অভিজিৎকে বন্ধনের বেদনা দিতে চাহিয়াছে তাহারাও সচকিত হইয়া চাহিয়াছে যন্ত্রের চূড়া এবং ভৈরবমন্দিরের ত্রিশূলের দিকে—

৩। ও ভাই, ওই দেখ্। সূর্য অস্ত গেছে, আকাশ অন্ধকার হয়ে এল, কিন্তু বিভূতির যন্ত্রের ওই চূড়াটা এখনও জ্বলছে। রোদ্দুরের মদ খেয়ে যেন লাল হয়ে রয়েছে।

২। আর, ভৈরবমন্দিরের ত্রিশূলটাকে অস্তসূর্যের আলো "আঁকড়ে রয়েছে যেন ডোববার ভয়ে। কিরকম দেখাচ্ছে! (পৃ-৫৫)

বিভূতি ব্যতীত সকলেই কিছু শঙ্কিত। অভিজিতের আদর্শ আকাশে বাতাসে ছড়াইয়া আছে, তাহার স্পর্শ অজ্ঞাতসারেও লাগিয়াছে প্রায় সকলেরই মধ্যে। কেবল বিভূতি স্থির—তাহার সঙ্গেই অভিজিৎ-ধনঞ্জয়ের প্রকৃত সংগ্রাম: সংঘাত এইবার চূড়ান্ত পর্যায়ে আসিয়া পড়িতেছে। বিভূতির উপর শেষ আঘাত হানিতে হইবে। কবি সম্পূর্ণরূপে পাঠকদের প্রস্তুত করিয়া লইয়াছেন।

তারপর সংঘাতকে স্মরণ করাইয়া দিযাছে সামান্য দুই চারিটা কথা—এই কথা কযটি সামান্য হইলেও কাহিনী কত দ্রুত গতিতে পরিণতির দিকে আগাইযা চলিযাছে তাহারই দ্যোতক। যন্ত্রবাদের বিরোধী বটুকের কণ্ঠে শোনা গেল একটি আবেদন, "জাগো, ভৈরব, 'জাগো" (পৃ-৬০)—এই কথাটিই যেন কোন্ যাদুস্পর্শে আকাশে বাতাসে ছড়াইযা গেল: তাই নেপথ্য হইতেও শোনা গেল ওই একই আবেদন, "জাগো, ভৈরব, জাগো"। প্রকৃতি যেন নিজেই মর্মরিয়া উঠিতেছে, চমৎকার একটা পরিবেশ সৃষ্টি করিয়া কবি তীব্র গতি দান করিয়াছেন তাঁহার ভাব কল্পনাকে। তারপরেই বিভূতিকে শেষ আঘাত দিবার পূর্বে গভীর অন্ধকারের সৃষ্টি—'সুমন। বাবা সুমন। অন্ধকার হয়ে এল, সব অন্ধকার হয়ে এল (পৃ-৭৪)। নূতন করিয়া আবার আলোর ঝরণা নামিয়া আসিবে পৃথিবীতে পরবর্তী একটি কথা সেই সংকেত করিয়া গেল, 'জয় হোক ভৈরব'। ভৈরবের জয় হইল—দ্বন্দ্বের অবসানে নাটকের সমাপ্তি ঘটিল। নাটকীয় সংঘাতটি অতি সুকৌশলে কয়েকটি মাত্র সংকেত করিয়া রবীন্দ্রনাথ সাজাইযাছেন এবং ইহা পাঠক এবং দর্শক চিত্তকে বেশ সহজেই যে আকৃষ্ট করিতে পারিবে তাহাতেও কোন সন্দেহ নাই।

এই কাহিনীর নামগুলিও বিশেষ অর্থের সংকেত করে। রবীন্দ্রনাথ নামগুলিকে অনেকস্থলেই বিশেষ ভাবের বাহন করিয়াছেন। তিনি অত্যন্ত সচেতন ভাবেই বলিয়াছেন, "নামকে যাঁহারা নাম মাত্র মনে করেন আমি তাঁহাদের দলে নই।···একবার মনে করিয়া দেখিলেই হয়, দ্রৌপদীর নাম যদি উর্মিলা হইত তবে সেই পঞ্চবীর পতি গর্বিতা ক্ষত্র-নারীর দীপ্ত তেজ এই তরুণ কোমল নামটির দ্বারা পদে পদে খণ্ডিত হইত" (প্রাচীন সাহিত্যঃ কাব্যের উপেক্ষিতা)।

উত্তরকূটের অধিবাসীদের রবীন্দ্রনাথ মারনেওয়ালা বলিয়াছেন আর শিবতরাইয়ের লোকেরা তাঁহার মতে মারখানেওয়ালা। উত্তরকূট কথাটার অর্থ উত্তরের পাহাড় অর্থাৎ উচ্চ স্তরে যে আছে। মারনেওয়ালা বলিয়া তাহাকে অভিহিত করা চলে। ইহার একটা গভীরতর অর্থও সন্ধান করা যায়—মানুষের উপরের দিকে আছে রক্ত মাংসের দেহটা, যেখানে ভোগের রাজত্ব। উত্তরকূটের অধিবাসীর অর্থ জড়দেহটাও হইতে পারে।

শিবতরাই কথাটির অর্থ করা যাইতে পারে যূপকাষ্ঠের নীচে—ইহারা অত্যাচারিত, তাহাদের মধ্যেই স্বয়ং ভগবানের অধিষ্ঠান—

সঙ্গী হয়ে আছ যেথায় সঙ্গীহীনের ঘরে
সেথায় আমার হৃদয় নামে না যে
সবার পিছে, সবার নিচে,
সবহারাদের মাঝে।

(গীতাঞ্জলি ঃ১০৭ সংখ্যক কবিতা)

দেহের ভোগাকাঙ্ক্ষায় আত্মা সর্বদাই অত্যাচারিত হয়। যূপকাষ্ঠে আবদ্ধ আত্মা—বদ্ধ আত্মা।

রণজিৎ—চিরকাল রণে জয়ই করিয়াছেন। ন্যায় নীতি সত্য ধর্ম কি তাহা জানিবার চেষ্টাও করেন নাই—কেবল অপরের পরামর্শেই চলিয়াছেন। মন্ত্রীর পরামর্শে চলিয়াছেন অনেকদিন ; কিন্তু মন্ত্রীর মনে যখন অভিজিতের স্পর্শ লাগিল তখন তিনি স্বার্থসিদ্ধিকে লক্ষ্য করিয়া বিভূতির পরামর্শ গ্রহণ করিলেন—অত্যাচারের মাত্রা দিলেন বাড়াইয়া। অথচ এই অত্যাচারের মাত্রা বাড়াইবার প্রধানতম কারণ অভিজিতের স্পর্শ—মনের মধ্যে তাহারও একটা 'কিন্তু' দেখা দিয়াছে আর সেইটাকে গোপন করিবার জন্যই তিনি শিবতরাইয়ের তৃষ্ণার জল কাড়িয়াছেন। যে শক্তির দ্বারা

আমরা দেহ মনকে নিয়ন্ত্রণ করি তাহাই তো আমাদের রাজা, জোরকে শক্তি মনে করি বলিয়াই রাজাকে ভাবি রণজিৎ : কিন্তু প্রেমের শক্তির পরিচয় যখন পাই তখন রণজয়ের স্পৃহা আর থাকে না। নন্দিসংকটের ভাঙা দুর্গ আর তখন গড়িয়া তুলিতে ইচ্ছা করে না—

বিভূতি। মহারাজের আদেশের অপেক্ষা না করেই নন্দিসংকটের ভাঙা দুর্গ গড়ে তোলবার ভার আমরা নিজের হাতে নিয়েছি।

রণজিৎ। আমার হাতে কেন রাখতে পারলে না? (পৃ-৭৪)

রণজয় কেবল বলপ্রয়োগেই হয না—আমাদের অহং, আমাদের রাজা, সেই-কথাটা একদিন উপলব্ধি করে।

বিশ্বজিৎ—যিনি রণে জয লাভ করেন তাঁহার অপেক্ষা বিশ্বজয় যিনি করেন তিনি বড সন্দেহ নাই, তাই তিনি খুড়া মহাশয়। তিনিও রাজা, তবে মোহন গড়ের রাজা : মনোমুগ্ধকর, সুন্দর পরিখা বেষ্টিত রাজ্য অথবা দুর্গ—প্রেমের বেষ্টনীতে তিনি বাঁধেন বলিয়াই সুন্দর সেই পরিখা। আবার সুন্দর ভাবে তিনি নত হইতেও জানেন : বিনয়ী, প্রেমিক—সেইজন্যই বিশ্ব জয় করা তাঁহার পক্ষে সম্ভব। রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন,"যে মানুষ প্রেম দান করিতে পারে ক্ষমতা তাহারই···কিন্তু প্রেম অনেক সহ্য করে, অনেক ক্ষমা করে; আঘাতকে গ্রহণ করিয়াই সে আপনার মহত্ত্ব প্রকাশ করে" (আত্মপরিচয় : পৃ-২৮)। অহং-এর দম্ভকে লুপ্ত করিয়াই ইহা সম্ভব—অহংটাই তো সংসারের সবচেয়ে বড চোর—যখন আমাদের আত্মা ব্যাপ্তি লাভ করিয়া সমগ্র বিশ্বকে উপলব্ধি করে তখনই কেবল আমরা সত্য দৃষ্টি লাভ করি। এই আত্মার ব্যাপ্তি, এই উপলব্ধির ক্ষেত্রের প্রসার আমাদের অধিকার বাড়াইয়া হয না, আমাদের সাম্রাজ্য প্রসারিত করিয়াও হয় না—আমাদের সীমিত ভাব পরিত্যাগ করিয়াই উহা সম্ভব। উপনিষদও বলিয়াছেন, তুমি দান করিয়াই লাভ করিতে পার, লোভ করিও না।[১] অহংকে লুপ্ত করিলেই প্রেমের পূর্ণতা আসে। খুড়া মহাশয় সেই প্রেমের জোরেই বিশ্বজিৎ।

সুমন—সুন্দর মন অর্থাৎ শুভঙ্করী মন। সুন্দর মন না থাকিলে প্রেমের দীপ্তি দেখা যায না—বিশ্বজয় করাও সম্ভব হয় না : "সে যে আমার চোখের আলো, আমার প্রাণের বিশ্বাস, আমার সুমন" (পৃ-৯)। সুন্দর মন না

১। ঈশ।

থাকিলে সত্যকার আনন্দ পাওয়া অসম্ভব। আনন্দের জীবনেই প্রাণের নিশ্বাস বয়, সেইখানেই চোখের দৃষ্টিও হয় পবিত্র—উজ্জ্বল। সেই সুমনকেই যন্ত্রদেবতা ধ্বংস করিয়াছেন—তাহারই জন্য আকুল আহ্বান শোনা যাইতেছে। দেহের ভোগের মধ্যেও মনের যতটুকু প্রেম-প্রীতি অবশিষ্ট থাকে তাহা এইরূপই আকুল হইয়া ওঠে—ভোগের সামগ্রীকে ঠেলিয়া উঠিতে চায়। অন্ধকার যখন চারিদিকে ঘনীভূত হইয়া উঠিবে তখন দেখা দিবে কঠিন প্রতিক্রিয়া—আঘাত খাইয়া তখনই সুমন ফিরিয়া আসিবে।

কঙ্কর, নরসিং, কুন্দন—মারনেওয়ালাদের দলের লোক: বিভূতির সহযোগী। তাই তাহারা একান্ত নীরস, পাথরের টুক্‌রার মত আসিয়া বেঁধে—মানুষ হইলেও পশুত্বের ভাবই তাহাদের বেশী, সিং দিয়া গুঁতাইবার কাজেই সমধিক পটু। তবে অনেকে নিছক আস্ফালনই করে। ভোগের আকাঙ্ক্ষা থাকিলেও শক্তির দৃঢ়তা নাই—

১। ···ওহে কুন্দন, বাঁধো-না। দড়িগাছটা তো তোমার কাছেই আছে।

কুন্দন। এই নাও-না দড়ি, তুমিই বাঁধো-না। (পৃ-৬২)

কিন্তু অপরের বন্ধন খুলিয়া দিতে আবার তাহাকে ফিরিয়া আসিতে হইল—

কুন্দন। ঠাকুর, তোমার বাঁধনটা খুলে দি, অপরাধ নিয়ো না। তুমি এখনই বাড়ি পালাও। কী জানি আজ রাত্রে— (পৃ-৬৫)।

উদ্ধব—যজ্ঞাগ্নি: আহুতির জন্য অগ্নি চাই অন্যথায় যজ্ঞই হয় না: উদ্ধব রাজ প্রহরী—সে ধনঞ্জয়কে বন্দী করিয়া আনিয়াছে: বাঁধন ছিঁড়িবার জন্যই বন্ধনের প্রয়োজন, 'ওদের বাঁধন যতই শক্ত হবে মোদের বাঁধন টুটবে।' যজ্ঞকে পূর্ণ করিবার জন্যই এই বন্ধনের প্রয়োজন ছিল। অপরদিকে বন্দীশালায় আগুন লাগাইয়া সে-ই অভিজিৎকে মুক্তি দিয়াছে। যজ্ঞাগ্নি যেন এই বন্দীশালাতেই জ্বলিয়া উঠিল—অভিজিৎ মুক্তি পাইয়া যজ্ঞকে পরিপূর্ণ করিয়া তুলিল পূর্ণাহুতি দিয়া।

বটু—ব্রহ্মচারী বা ভৈরব বিশেষ। ইহাকে আঘাত দিয়াই ভৈরবকে জাগরণের কাজ অনেকটা আগাইয়া দেওয়া হইয়াছে। ব্রহ্মচারী বলিয়া কোন ভোগের বন্ধনে সে আবদ্ধ নয়: তাই বিশ্বের মূল সত্য তাহার নিকট উদ্ঘাটিত: এই অমাবস্যার রাতের ভৈরব পূজা যে দম্ভের পূজা ব্যতীত আর কিছুই নয় তাহা সে উপলব্ধি করিয়াছে—"ভৈরবকে যে আজ ওরা

মন্দির থেকে বিদায় করতে চলেছে। তৃষ্ণা বসবে বেদীতে" (পৃ-২৬)। সে-ই জানে ভৈরবের আহ্বান যে শুনিয়াছে তাহার আর নিষ্কৃতি নাই—আত্মবলি তাহাকে দিতেই হইবে।

গণেশ—জনগণের প্রধান: তাই শক্তি থাকিলেও বুদ্ধি নাই। মার খানেওয়ালারা যখন মরিয়া হইয়া ওঠে তাহারই পরিচয় আছে গণেশের মধ্যে —"আর সহ্য হয় না, হাত দুটো নিশ্‌পিশ্‌ করছে", অথবা, "ঠাকুর, একবার হুকুম করো, ওই যণ্ডামার্কা চণ্ডপালের দণ্ডটা খসিয়ে নিয়ে মার কাকে বলে একবার দেখিয়ে দিই" (পৃ-৩৫)। কিন্তু বুদ্ধি যে নাই তাহারও পরিচয় আছে, "চললুম, কিন্তু আমাদের বলবুদ্ধি রইল এইখানে পড়ে" (পৃ-৪৯)।

সঞ্জয়—সম্পূর্ণরূপে যে জয় করে: নিজের প্রেম অভিজিৎকে সম্পূর্ণরূপে দিয়াই সে সম্যকরূপে জয়ী হইয়াছে। কচি মনের কোমল অন্তরের প্রীতিতেই সে আনন্দিত। ভয়ঙ্করের মূর্তি তাহাকে শঙ্কিত করে—"দেখছ না যুবরাজ, ওই যন্ত্রের চূড়াটা সূর্যাস্তমেঘের বুক ফুঁড়ে দাঁড়িয়ে আছে? যেন উড়ন্ত পাখির বুকে বাণ বিঁধেছে, সে তার ডানা ঝুলিয়ে রাত্রির গহ্বরের দিকে পড়ে যাচ্ছে। আমার এ ভালো লাগছে না" (পৃ-২৭)। নিজের ভীরু মনের প্রীতি সে প্রকাশ করিতেও পারিত না, "সকালে যে আসনে তুমি পূজায় বস, মনে আছে তো সেদিন তার সামনে একটি শ্বেত পদ্ম দেখে তুমি অবাক হয়েছিলে? তুমি জাগবার আগেই কোন্ ভোরে ওই পদ্মটি লুকিয়ে কে তুলে এনেছে, জানতে দেয় নি সে কে। কিন্তু, এইটুকুর মধ্যে কত সুধাই আছে সে কথা কি আজ মনে করবার নেই? সেই ভীরু, যে আপনাকে গোপন করেছে, কিন্তু আপনার পূজা গোপন করতে পারে নি, তার মুখ তোমার মনে পড়ছে না" (পৃ-২৮)। এই সরলতার জন্যই একমাত্র সে-ই অভিজিৎ-এর আত্মবিসর্জনের সাক্ষী হইতে পারিয়াছিল—ভালোবাসিয়াই সে অভিজিৎকে সম্পূর্ণরূপে বুঝিয়া লইয়াছিল।

বিভূতি—ঐশ্বর্য, ভৈরবেরই ঐশ্বর্য: ঈশ্বর লাভের সাধনায় যে সাধক কিছু ঐশ্বরিক বিভূতি লাভ করিয়াই সন্তুষ্ট হয় সে মূলের সন্ধান পায় না। শক্তি লাভ করিয়া তাহারই মোহে সে একদিন সকলকে ধ্বংসের পথে লইয়া যায়। বিভূতিও ঈশ্বরেরই দান, কিন্তু ঈশ্বরের মঙ্গল সাধনের উদ্দেশ্য যদি শক্তির দম্ভ ভুলিয়া যায় তবে সেই ঐশ্বর্য হয় অন্ধ শক্তির উৎস। তখন সংঘাত অনিবার্য হইয়া ওঠে।

ধনঞ্জয় বৈরাগী—যে ঐশ্বর্যকে জয় করিয়াছে এবং ত্যাগের মন্ত্রে যে উদ্বুদ্ধ : বিভূতি ঐশ্বর্য লাভ করিয়াই থামিয়া গিয়াছে, ধনঞ্জয় ঐশ্বর্য লাভের লোভকে জয় করিয়া উচ্চতর মার্গে আরোহণ করিয়া মূলের সন্ধান পাইয়াছে। সে জ্ঞানী—তত্ত্বজ্ঞ। মুক্তির সন্ধান সে রাখে। ঐশ্বর্যের প্রয়োজন দেহের, আত্মার সত্যকার পরিচয় মুক্তি লাভে। ধনঞ্জয় সেই মুক্তির অগ্রদূত।

অভিজিৎ—বিজয়ী, নক্ষত্র এবং প্রায়শ্চিত্ত বিশেষ; এই নক্ষত্রে জন্মিলে নর ললিত কান্তি, সজ্জন, বিনীত, কীর্তিমান, সুবেশ, দেবদ্বিজভক্ত ও স্পষ্টবক্তা[2] হয়। অভিজিৎ মারনেওয়ালাদের হইয়া প্রায়শ্চিত্ত করে এবং আকাশে আলোর দ্যুতি ছড়াইয়া মারখানেওয়ালা এবং মারনেওয়ালাদের মহান আদর্শের সন্ধান দেয়। দুই দলকেই সে জয় করে—মারনেওয়ালারা থমকিয়া দাঁড়ায় আর মারখানেওয়ালাদের মারের কথাটাই আর স্মরণে থাকে না।

সুতরাং রবীন্দ্রনাথের দেওয়া নামগুলি যে বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। ইহারা সকলে মিলিয়া নাটকটির মূলভাবের সঙ্কেত বেশ সার্থক ভাবেই করিয়াছে।

'মুক্তধারা' নাটকটির প্রকাশ কাল ১৯২২ খ্রীঃ এপ্রিল মাস (বৈশাখ—১৩২৯), তবে ইহার রচনাকাল যে জানুয়ারী বা তাহার কিছু পূর্বে তাহাতে সন্দেহ নাই।[3]

এই নাটকটি লিখিবার কালে দেশে অসহযোগ আন্দোলন খুবই উচ্চ পর্যায়ে পৌঁছিয়াছিল। মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্বে বারদৌলী সত্যাগ্রহ আরম্ভ হয়। কিন্তু সত্যাগ্রহ সাফল্য মণ্ডিত করিবার জন্য যতখানি অহিংস হওয়া প্রয়োজন দেশবাসী মনে-প্রাণে সেইরকম অহিংস ছিল না। তাহার ফলে চৌরী-চৌরার দুর্ঘটনা ঘটে। ক্ষিপ্ত জনতা চৌরী-চৌরার থানার একজন দারোগা এবং ২১ জন কনেস্টবলকে দগ্ধ করিয়া হত্যা করে। গান্ধীজী বিচলিত হইয়া 'হিমালয় প্রমাণ ভুল' করিয়াছেন স্বীকার করেন এবং অসহযোগ আন্দোলন বন্ধ করিয়া দেন—তাঁহাকে গ্রেপ্তার করিয়া ছয় বৎসরের জন্য দণ্ডিত করা হয়। এই সময়ে বেঙ্গলী পত্রিকায় রবীন্দ্রনাথের একটি পত্র বাহির হয়। এই পত্রে তিনি বলেন যে যে-দৈহিক শক্তির

২। শ্রীহরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় : বঙ্গীয় শব্দকোষ

৩। প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় : রবীন্দ্রজীবনী : ৩য় খণ্ড : পৃ-৯২ : মুক্তধারা লেখা শেষ করেন পৌষসংক্রান্তির দিন ১৩ই জানুয়ারী।

উপর অধিকাংশ দেশেরই রাজনীতিক শক্তি নির্ভর করে তাহাকে জয় করিবার কার্যকরী শক্তি যে অহিংসার আছে তাহা তিনি বিশ্বাস করেন। কিন্তু এই অহিংসার বোধ আপনা হইতেই অন্তরে জাগরিত হওয়া চাই। কোন একটি বিশেষ উদ্দেশ্য সাধন করিতে কিছুকালের জন্য স্বভাবের গতিকে হয়ত রুদ্ধ করিয়া রাখা যায় কিন্তু যেখানে এক বিরাট জনতা যুক্ত এবং যখন সংঘাত অনেকদিন ধরিয়া চলে, সাধারণ মানুষের পক্ষে সেই অবস্থায়ও বিদ্বেষ চাপিয়া রাখা প্রায় অসম্ভব[৪]।

পরিবেশের কথাটি স্মরণ করিয়া মনে হইতে পারে যে নাটকটি রাজনৈতিক পটভূমিকাতেই রচিত এবং ধনঞ্জয় বৈরাগীর মধ্যে গান্ধীজীর ছায়া পড়িয়াছে। কিন্তু এই কথা মনে করিবার তেমন কোন কারণ নাই। ধনঞ্জয় বৈরাগীকে প্রায় একই মূর্তিতে ১৯০৯ খ্রীঃ প্রকাশিত প্রায়শ্চিত্ত নাটকেই পাইয়াছি, সেখানেও তাহার কণ্ঠে শোনা গিয়াছে সেই সঙ্গীতটি—

আরো আরো প্রভু, আরো আরো।
এমনি করে আমায় মারো।
লুকিয়ে থাকি আমি পালিয়ে বেড়াই—
ধরা পড়ে গেছি, আর কি এড়াই ?
যা কিছু আছে সব কাড়ো কাড়ো।

(প্রায়শ্চিত্ত : পৃ-২৬, সামান্য পরিবর্তন করিয়া মুক্তধারা : পৃ-৩৭)

তবে আফ্রিকায় গান্ধীজী যে অসহযোগ আন্দোলন করেন সে কথা প্রায়শ্চিত্ত লিখিবার কালে তাঁহার মনে হওযা স্বাভাবিক। মুক্তধারায় রাজনৈতিক পরিবেশের প্রভাব একেবারেই নাই তাহা নহে। ধনঞ্জয়ের মধ্যে যেটুকু মূলগত পরিবর্তন রবীন্দ্রনাথ করিয়াছেন প্রায়শ্চিত্ত হইতে মুক্তধারায় তাহাতে অহিংসা সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের যে মনোভাবের পরিচয় 'বেঙ্গলী পত্রিকা'য় বাহির হইয়াছিল তাহারই প্রতিচ্ছায়া আছে—"ওদের যতই মাতিয়ে তুলেছি ততই পাকিয়ে তোলা হয়নি আর-কি। দেনা যাদের অনেক বাকি শুধু কেবল দৌড় লাগিয়ে দিয়ে তাদের দেনা শোধ হয় না তো" (পৃ-৫১)। গান্ধীজী ঠেকিয়া শিখিয়াছিলেন, রবীন্দ্রনাথ নিজের বুদ্ধি দিয়াই তাহা বুঝিয়াছিলেন। কিন্তু গান্ধীজী অসহযোগ আন্দোলন মুহূর্তে বন্ধ করিয়া সমস্ত অপরাধের দায়িত্ব নিজের স্কন্ধে লইলেন। রবীন্দ্রনাথের

৪। তদেব।

বৈরাগীও সমস্ত অপরাধ স্বীকার করিয়াছেন কিন্তু দূরে সরিয়া যাইতে পারেন নাই বিশেষ কারণে, "আমি সরে দাঁড়ালেই ওরা একেবারে তোমার চণ্ডপালের ঘাড়ের উপর গিয়ে চড়াও হবে। তখন যে দণ্ড আমার পাওনা সেটা পড়বে ওদেরই মাথার খুলির উপরে। এই ভাবনায় সরতে পারি নে" (পৃ-৫২)। বৈরাগী শাস্তির জন্য অপেক্ষা করিয়া রহিলেন। সুতরাং ধনঞ্জয়কে গান্ধীজীর সহিত এক করিয়া ফেলিবার কোন কারণ নাই। ধনঞ্জয় অভিজিৎ-এর পরিপূরক অর্থাৎ দুইজনে মিলিয়া সম্পূর্ণ এক। মানবতাকেই যেন রবীন্দ্রনাথ দুইটি খণ্ডে বিভক্ত করিয়া দেখাইয়াছেন।

১৩২৪ সালের শ্রাবণ মাসে (১৯১৭) সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ হইতে কবির যে সম্বর্ধনা হয় তাহাতে শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ শীল বলেন, "এবার যে তিনি জাপানে ও আমেরিকায় গেলেন, এবারেও তিনি ভারতবর্ষ হইতে পশ্চিমের জন্য একটা বড় message লইয়া গেলেন। পশ্চিম মহাদেশে সমাজের যত কিছু সমস্যা জমিয়া উঠিয়াছে, যথা capital and labour problem (ধন ও শ্রম সমস্যা), state and individual problem (রাষ্ট্র ও ব্যক্তি সমস্যা), international problem (আন্তর্জাতিক সমস্যা), ইত্যাদি—সে-সমস্ত সমস্যা ঘনীভূতরূপ (concentrated form) লাভ করিয়াছে তাঁহার এবারকার বাণীটিতে। যে-সকল প্রচণ্ড সমস্যার আঘাতে ইউরোপীয় সমাজ আজ একেবারে বিধ্বস্ত ও অশান্তিময় হইয়া পড়িয়াছে, ভারতবর্ষের সাধন, জীবন ও কাল্চারের আদর্শ হইতে তাহার জন্য তিনি শান্তিবাণী লইয়া গেলেন।······ন্যাশন্যালিজ্‌মের যে দিক্‌টা commercialism (বণিকবৃত্তি), militarism (সৈনিকবৃত্তি) প্রভৃতির দ্বারা ব্যক্তিকে মারিয়া বৃদ্ধিলাভ করিতেছে, সেই ন্যাশন্যালিজ্‌ম ব্যাধির ঔষধ কি তাহা তিনি দেখাইয়াছেন। দুই দিক্ হইতে ইহা হইতে মুক্তিলাভ করিবার উপায় তিনি বিবৃত করিয়াছেন :—(১) ব্যক্তির যে ব্যক্তি হিসাবে একটা অসীম মূল্য আছে তাহা স্বীকার করিতে হইবে, (২) Nationalism যদি Internationalism বা আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে উত্তীর্ণ হইতে যায় তবে উহার বিশ্বমূল্য (Cosmic value) নির্ধারণ ও নিরূপণ করিতে হইবে।"[৫]

৫। শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় : রবীন্দ্রজীবনী : ২য় খণ্ড : পৃ-৪৫৫ হইতে উধৃত। রবীন্দ্রনাথ ১৯১৬ খ্রীঃ জাপান-মার্কিনমুলুক ভ্রমণ করেন : মার্কিনমুলুকে তিনি ধারাবাহিক ভাবে অনেকগুলি বক্তৃতা দেন।

সুতরাং জাতীয়তাবাদ যে মানুষকে লোভের পথে এবং তাহারই ভিতর দিয়া ধ্বংসের পথে ঠেলিয়া লইয়া চলিয়াছে এ সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ পূর্ণ সচেতন ছিলেন। বহুদিন হইতেই ভাবনাটি তাঁহার মনকে আচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছিল। জাপানে-মার্কিনমুলুকে সেই জাতীয়তার উগ্রমূর্তি তিনি স্পষ্ট করিয়া প্রত্যক্ষ করিয়াছেন, কিন্তু তাহারই মধ্যে আশার সঞ্চারও হইয়াছে মনে। উগ্র জাতীয়তা সত্ত্বেও যুবকেরা, ভাবুকেরা মন দিয়া শুনিয়াছেন তাঁহার বক্তব্য। আশাবাদী কবির আশাবৃদ্ধিই পাইয়াছে তাহাতে। সেই বিশ্বাস ধ্বনিত হইয়াছে তাঁহার বক্তব্যে, "I believe in a spiritual world—not as anything separate from this world—but as its innermost truth'. (Rabindranath : Personality : p-126).

কিন্তু ভোগের আকাঙ্ক্ষা আত্মিক জগৎকে নির্বাসিত করিতে চায়, তাহাকে অস্বীকার করিয়া বসে। যেখানে মানুষ জড় শক্তিকে আয়ত্ত করিয়াছে সেইখানেই তাহার ভোগ লালসার লেলিহান জিহ্বা বীভৎসতা সৃষ্টি করিয়াছে। ঈশ্বরের পৃথিবীকে সে সুন্দর থাকিতেও দিবে না—নিজের মনের ছাপ লাগাইয়া সে জগৎকে বিকৃত কদর্য করিয়া তোলে—"তখন দেখতে পেলুম মানুষের রিপু জগতে কি কুশ্রীতাই সৃষ্টি করছে। সমুদ্রের তীরে তীরে, বন্দরে বন্দরে, মানুষের লোভ কদর্য ভঙ্গীতে স্বর্গকে ব্যঙ্গ করছে। এমনি করেই নিজেকে স্বর্গ থেকে নির্বাসিত করে দিচ্ছে", (জাপানযাত্রী : পৃ-৩৩)। এই নাটকের মধ্যেও যন্ত্র দানবের সেই আস্ফালনের পরিচয় আছে। এখানে যন্ত্র মানুষের কল্যাণে নিয়োজিত নয়—সে শক্তির দম্ভে ফড়িং-এর মত আকাশে লাফাইয়া উঠিয়াছে—"যেন মস্ত একটা লোহার ফড়িং আকাশে লাফ মারতে যাচ্ছে" (পৃ-৪৫)। সামঞ্জস্য সাধন যেখানে হয় না সেখানে ভয়ঙ্করতা প্রকট হইয়া ওঠে, মনে আতঙ্ক জাগায়। কিন্তু সামঞ্জস্য না হইয়াও পারে না। চিরকাল দুইটি বিপরীত ব্যাপার পাশাপাশি টিঁকিয়া থাকিতে পারে না। দুইয়ের মধ্যে সংঘর্ষ হইবেই—"ওটাকে অসুরের মাথার মতো দেখাচ্ছে, মাংস নেই, চোয়াল ঝোলা। তোমাদের উত্তরকূটের শিয়রের কাছে অমন হাঁ করে দাঁড়িয়ে; দিনরাত্তির দেখতে দেখতে তোমাদের প্রাণপুরুষ যে শুকিয়ে কাঠ হয়ে যাবে" (পৃ-১০)। মানুষের ক্ষতি সাধন করিতেছে বলিয়াই ওই

যন্ত্রটি 'অসুরের মাথার' ন্যায় দেখাইতেছে—মানুষের মঙ্গলের কাজে লাগিলে ভাবদৃষ্টিতে উহা সুন্দর বলিয়াই প্রতিভাত হইত।

বার্ট্রাণ্ড রাসেল বলিয়াছেন যে তিনি যন্ত্রকে নিষিদ্ধ করিতে চাহেন না। মিশরের অধিবাসীরা ষণ্ডের আরাধনা করিত—তাহাকে তিনি ভ্রান্ত বিশ্বাস প্রসূত বলিয়া মনে করেন। কিন্তু সেই কারণে ষণ্ডকে নিষিদ্ধ করিতে চাহেন না। যন্ত্র ঈশ্বরের স্থান অধিকার করিতে চাহিলেই তাঁহার কণ্ঠে প্রতিবাদ-ধ্বনিত হয়[৬]।

পশ্চিমের সহিত ঘনিষ্ঠ হইবার ফলে বিজ্ঞানকে রবীন্দ্রনাথ অমঙ্গলের শক্তি বলিয়া মনে করেন নাই। ইহা ইউরোপের শ্রেষ্ঠতম অবদান। সেই শক্তিকে মানবতার উন্নতির কাজে প্রয়োগ করা হইতেছে না তাঁহার ক্ষোভ এইখানেই। কথাটা এই নাটকে সামান্য এক ফুলওয়ালীর মুখ দিয়া বলাইয়াছেন—

ফুলওয়ালী। বাবা, উত্তরকূটের বিভূতি মানুষটি কে?

সঞ্জয়। কেন, তাকে তোমার কী প্রয়োজন?

ফুলওয়ালী। আমি বিদেশী, দেওতলি থেকে আসছি। শুনেছি উত্তরকূটের সবাই তাঁর পথে পথে পুষ্পবৃষ্টি করছে। সাধুপুরুষ বুঝি? বাবার দর্শন করব বলে নিজের মালঞ্চের ফুল এনেছি।

সঞ্জয়। সাধুপুরুষ না হোক, বুদ্ধিমান পুরুষ বটে।

ফুলওয়ালী। কী কাজ করেছেন তিনি?

সঞ্জয়। আমাদের ঝর্নাটাকে বেঁধেছেন।

ফুলওয়ালী। তাই পুজো? বাঁধে কি দেবতার কাজ হবে? (পৃ-৩৫)

যে বিভূতি দেবতার কাজ করিবার জন্য যন্ত্র সৃষ্টি করে নাই, বরং দেবতার হাতে বেড়ি পরাইবার চেষ্টা করিয়াছে তাহাকে ফুল দিয়া যাওয়া ফুলওয়ালীর হইল না। রবীন্দ্রনাথ এই কথাটাই বলিতে চান। শক্তি দেবতারই ঐশ্বর্য, এই কথাটা ভুলিলেই অনর্থ সৃষ্টি হয়।

যন্ত্র সম্বন্ধে গান্ধীজীরও এক বিশেষ অভিমত ছিল। তিনি চরকাকে প্রতীকরূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি যেন বলিতে চাহিয়াছিলেন যে জটিল যন্ত্র পরিত্যাগ করিয়া এমন যন্ত্র গ্রহণ করিতে হইবে যাহা সাধারণ

৬। Bertrand Russel : The Impact of Science on Society : p-77

মানুষও ব্যবহার করিতে পারে, অন্যথায় শোষণ দূর হইবে না। যন্ত্র এক বিশেষ শক্তি, যে বৈজ্ঞানিক সেই যন্ত্রকে পরিচালিত করিতে জানিবেন তিনি সেই হস্তগত শক্তির জোরে তুচ্ছ করিবেন অন্য সকলকে। 'মুক্তধারা'র মধ্যেও সেই ইঙ্গিত আছে। যন্ত্র শক্তিতে শক্তিমান বিভূতি শেষ পর্যন্ত রাজাকেই (রণজিৎ) অবিশ্বাস করিয়া, তুচ্ছ করিয়া নিজের হাতে কর্তৃত্ব গ্রহণ করিল—"মহারাজের আদেশের অপেক্ষা না করেই নন্দিসংকটের ভাঙা দুর্গ গড়ে তোলবার ভার আমরা নিজের হাতে নিয়েছি" (পৃ-৭৬)। কারণ আজ বিভূতিই নাকি "দেবতাকে ছুটি দিয়ে দেবতার কাজ নিজেই চালিয়ে নেবে" (পৃ-৪৫)। বিভূতি আজ যন্ত্র শক্তির বলে শীর্ষস্থান পাইয়াছে, "না না, এই তো চাই। উত্তরকূটের কোলে তোমার জন্ম, কিন্তু তুমি আজ তার ঘাড়ে চেপেছ। তোমার মাথা সবাইকে ছাড়িয়ে গিয়েছে" (পৃ-১৫)।

অহংবোধই খণ্ডতা সৃষ্টি করে। অহংটা স্বয়ং ভগবানের সামগ্রীকেও নিজের বলিয়া দাবী করিয়া বসে। উত্তরকূট সেই কাজটিই করিয়া বসিয়াছে—দেবতার দেওয়া জল যাহা সকলেরই জন্য প্রবাহিত তাহাকেও বাঁধিয়া ফেলিয়া নিজস্ব করিয়া লইতে চাহিয়াছে, আর সেই জোরে শিবতরাইয়ের মানুষগুলির উপর রক্তচক্ষু দেখাইবার সুযোগ করিয়া লইয়াছে—"শিবতরাইয়ের প্রজাদের কিছুতেই তো বাধ্য করতে পারলে না। এতদিন পরে মুক্তধারার' জলকে আয়ত্ত করে বিভূতি ওদের বশ মানবার উপায় করে দিলে" (পৃ-১৬)। মানুষের দৃষ্টি বর্তমানের উপর এত বেশী করিয়া পড়ে যে অতীত এবং ভবিষ্যতের কথা একেবারেই ভুলিয়া যায়। তাহা যদি না হইত তবে অতীতের শিক্ষা তাহার ভবিষ্যতের ভাবনাকে বড় করিয়া তুলিয়া বর্তমানকে হয়ত সুন্দর করিয়া তুলিত। অহং যে যুগে যুগেই ধ্বংস হইয়াছে তাহার নজির আছে রামায়ণে-মহাভারতে-পুরাণে। কিন্তু মানুষ অনেক সময় দৃষ্টিকে এমনই সঙ্কুচিত করিয়া ফেলে যে তাহা একান্ত নিকট বর্তমান ব্যতীত আর কিছুই দেখিতে পায় না : যদি পাইত তবে হয়ত অনেক দুঃখই সে এড়াইতে পারিত—"স্বাতন্ত্র্য যেখানে মঙ্গলের অনুসরণ করিয়া প্রেমের দিকে না গেছে সেখানে সে বিনাশের দিকেই চলিতেছে। অতিবুদ্ধি দ্বারা সে বিকৃতি প্রাপ্ত হইলে বিশ্বপ্রকৃতি তাহার বিরুদ্ধ হইয়া উঠে; কিছুদিনের মতো উপদ্রব করিয়া তাহাকে মরিতেই হয়" (ধর্ম : স্বাতন্ত্র্যের পরিণাম : পৃ-১২৭)।

ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য আর ব্যক্তিসত্তার বিকাশ এক কথা নয়। ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য বিরোধ বাড়াইয়া তুলিয়া মৃত্যুকে ডাকিয়া আনে, আর ব্যক্তিসত্তার বিকাশে মানুষ সকলের সহিত একাত্মতা অনুভব করে, সেখানে তাহার মুক্তি। ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য বৃদ্ধির ফলে উত্তরকূটের ক্ষমতা গর্বিত মানুষগুলি পরস্পরকে পর্যন্ত সন্দেহ করিতে আরম্ভ করিল। বিশ্বাসের মূলে তখন টান পড়ে—

চর। শিবতরাই থেকে হাজার হাজার লোক চলে আসছে।

বিভূতি। সে কী কথা! আমরা হঠাৎ গিয়ে তাদের নিরস্ত্র করব এই তো ঠিক ছিল। নিশ্চয়ই তোমাদের কোনো বিশ্বাসঘাতক তাদের খবর দিয়েছে। কঙ্কর, তোমরা কযজন ছাড়া ভিতরের কথা কেউ তো জানে না। তা হলে কী করে—

কঙ্কর। কী বিভূতি! আমাদেরও সন্দেহ কর নাকি?

বিভূতি। সন্দেহ করার সীমা কোথাও নেই।

কঙ্কর। তা হলে আমরাও তোমাকে সন্দেহ করি।

বিভূতি। সে অধিকার তোমাদের আছে। যাই হোক, সময় হলে এর একটা বোঝাপড়া করতে হবে। (পৃ-৭৭)

এই বোঝাপডার অর্থ পরস্পরের সহিত সংঘাত ব্যতীত আর কিছুই নয়। সন্দেহের সীমা নাই সুতরাং সংঘাতেরও শেষ নাই। পরস্পরের স্বার্থে এবং তৃতীয় ব্যক্তির বিরুদ্ধে কিছুদিনের জন্য চুক্তিতে আবদ্ধ থাকা যায় বটে কিন্তু বেশীদিন চুক্তি টিঁকিয়া থাকিতে পারে না। সেই তৃতীয় ব্যক্তিকে ধ্বংসের পর পরস্পরের বিরুদ্ধে তাহারা সংগ্রাম করে। উত্তরকূটের ক্ষমতা গর্বিত মানুষেরা ঠিক তাহাই করিয়াছিল। নন্দিসংকটের পথ আটক করিয়া মুক্তধারাকে বাঁধিয়া তাহারা নিজেদের বাণিজ্য দানবের তৃপ্তি চাহিয়াছিল। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ মনে করেন তৃপ্তি এইভাবে আসে না, ইহা মানুষের অপমৃত্যু ঘটায়। সমগ্র মানব জাতির মধ্যে ঐক্যবোধ যতদিন না আসিবে ততদিন মানুষের মুক্তি নাই—"বাণিজ্য-দানব যদি মানুষের ঘরকরনা, স্বাধীনতা সমস্তই গ্রাস করে চল্‌তে থাকে, এবং বৃহৎ এক দাস সম্প্রদায়কে সৃষ্টি করে তোলে—তারই সাহায্যে অল্প কয়জনের আরাম এবং স্বার্থ সাধন করতে থাকে, তাহলে পৃথিবী রসাতলে যাবে।" (জাপানযাত্রী : পৃ-৭০)।

এই ব্যবস্থা যে শুধু অপরকে আঘাত করিয়াই ক্ষান্ত হয় তাহাই নহে, নিজেকেও রিক্ত করিয়া ফেলে। অপরের অন্ন কাড়িয়া লওয়ায় নিজের দীনতার পরিচয়ই তো বেশী করিয়া পাওয়া যায়।

ইহা তো ভিক্ষারই নামান্তর। ভিক্ষার দ্বারা কখনও কিছু হয় না। মর্যাদা সম্পন্ন মানুষ তাহা বোঝে। সে নিজেকে মর্যাদা দেয় সেই সঙ্গে অপরকেও মর্যাদা দেয়—জাতির মর্যাদা রক্ষার জন্যই অভিজিৎ নন্দিসংঘটের দুর্গ ভাঙিয়া ফেলিয়াছেন, "চিরদিন শিবতরাইয়ের অন্নজীবী হয়ে থাকবার দুর্গতি থেকে উত্তরকূটকে মুক্তি দিয়েছি" (পৃ-৩৩)। আপনার অন্তরস্থিত শক্তির দ্বারাই মানুষ আপনার সত্য উন্নতি করিতে পারে—ভিক্ষা করিয়া অথবা বলপ্রয়োগের দ্বারা কোনদিন স্থায়ী কল্যাণ লাভ করিতে পারে না।

একান্ত স্বাতন্ত্র্যবোধ যে অহংকে জাগায় তাহার সৃষ্টিতে কল্যাণবোধের কোন কথাই নাই। সে সৃষ্টির উদ্দেশ্য অহংবোধের তৃপ্তি মাত্র। সৃষ্টির সহিত যদি সংযমের যোগ না থাকে তবে তাহা সুন্দরও হইতে পারে না। দম্ভ অন্যের কথা মনে করে না বলিয়াই কল্যাণের কথাও স্মরণ রাখে না। তাহার সৃষ্টি অন্ধ—"বালি-পাথর-জলের ষড়যন্ত্র ভেদ করে মানুষের বুদ্ধি হবে জয়ী এই ছিল উদ্দেশ্য। কোন্ চাষির কোন্ ভুট্টার ক্ষেত মারা যাবে সে কথা ভাববার সময় ছিল না" (পৃ-১২)।

তাহা যদি হয় তবে সৃষ্টি করিবার শক্তিকে উপলব্ধি করিয়া অহং-এর তৃপ্তি তো হইয়াছে, প্রতিষ্ঠাও তো পাওয়া গেল, এইবার উহা ভাঙিয়া ফেলিবার গৌরব অর্জনে বাধা কোথায়! রবীন্দ্রনাথ এইবার এই প্রশ্নটি উত্থাপন করিয়াছেন অভিজিতের দূতকে দিয়া—"যুবরাজ বলছেন, কীর্তি গড়ে তোলবার গৌরব তো লাভ হয়েছেই, এখন কীর্তি নিজে ভাঙবার যে আরও বড়ো গৌরব তাই লাভ করো" (পৃ-১৩)। এইখানে 'ছোট আমি'কে 'বড়ো আমি'র মধ্যে প্রসারিত করিবার কথাটা উঠিয়াছে।

রাজার বিরুদ্ধে রবীন্দ্রনাথের কোন অভিযোগ নাই—অভিযোগ রাজতন্ত্রের উপর, "রাজত্ব একলা যদি রাজারই হয়, প্রজার না হয়, তা হলে সেই খোঁড়া রাজত্বের লাফানি দেখে তোরা চমকে উঠতে পারিস, কিন্তু দেবতার চোখে জল আসে" (পৃ-৪০)। সিংহাসন বুক ফুলাইয়া বসিবার স্থান নয়—সেখানে বসিতে হইলে একান্ত বিনয়ে হাত জোড় করিয়া বসা চাই। রাজা ঈশ্বরের প্রতিনিধি মাত্র, প্রজার মঙ্গল সাধন তাঁহারই ভিতর

দিয়া হইবে। রাজা যদি তাহা হইতে বিরত হন তবে প্রজাদের সেই রাজত্ব দাবি করিবার অধিকার আছে।[৭] তাই রবীন্দ্রনাথ বলেন, "রাজা হলেই রাজাসনে বসে ; রাজাসনে বসলেই রাজা হয় না" (পৃ-৪১)।

উত্তরকূট রাজা না হইয়াও রাজাসনে বসিয়া বিভ্রাট বাধাইয়াছে। এই রাজতন্ত্রের বিরুদ্ধেই কবির অভিযোগ। কারণ এই ব্যবস্থায় মানুষকে আর মানুষ বলিয়া স্বীকার করাই হয় না। সেইখানে বাল্যকাল হইতেই দেশের মানুষকে একটি ছাঁচে ঢালিবার চেষ্টা হয়। অন্যদেশ এবং অন্য জাতিকে তুচ্ছ করিবার উপযুক্ত দেশপূজার ব্যবস্থা থাকে সেইখানে। শিক্ষা যে আনন্দের ভিতর দিয়া দিতে হয়, শিক্ষার অর্থ যে মানুষের অন্তরকে মুক্তিদান, তাহার ব্যক্তিত্বের বিকাশের পথ মুক্ত করা এই কথাটা সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করা হয়। ছাঁচে ঢালিয়া তৈয়ারী করিবার জন্য তখন ইতিহাসকে বিকৃত করা হয়—মতের সঙ্গে মিলাইবার জন্য বিজ্ঞানকে পর্যন্ত ভ্রান্ত ব্যাখ্যায় প্রতিষ্ঠিত করিবার স্বেচ্ছাকৃত প্রচেষ্টা চলে। এই শিক্ষাপদ্ধতির বিরুদ্ধে রবীন্দ্রনাথের মনের ক্ষোভ অনেক স্থানেই প্রকাশিত হইয়াছে। এই নাটকেও তাহার পরিচয় আছে—"আমাদের যন্ত্ররাজ বিভূতিকে মহারাজ শিরোপা দেবেন, তাই ছেলেদের নিয়ে যাচ্ছি আনন্দ করতে। যাতে উত্তরকূটের গৌরবে এরা শিশুকাল হতেই গৌরব করতে শেখে তার কোনো উপলক্ষই বাদ দিতে চাই নে" (পৃ-২৩)। উত্তরকূটের মানুষদের নাক উঁচু এবং 'নাক উঁচু হইলেই খুব বড়ো জাত' হয়।

রাজতন্ত্রীরাজ্যের সমস্ত কাজই অহংকেন্দ্রিক। তাহাদের দেব পূজাও সত্যকার দেবতাকে লক্ষ্য করিয়া নয়—সেও অহং-এর তৃপ্তি। বিভূতিকে শিরোপা দিবার জন্যই উৎসব এবং সেই সূত্রে ভৈরব-পূজা। সুতরাং ভৈরব পূজাই লক্ষ্য নয়, লক্ষ্য বিভূতি পূজা—"কী নিয়ে মহোৎসব ? বিশ্বের সকল তৃষিতের জন্যে দেবদেবের কমণ্ডলু যে জলধারা ঢেলে দিচ্ছেন সেই মুক্ত জলকে তোমরা বন্ধ করলে কেন" (পৃ: ১৯-২০)। কিন্তু মানুষ বুদ্ধিমান জীব এই প্রশ্নের জবাব সে বুদ্ধি দিয়া পূর্ব হইতেই আবিষ্কার করিয়া রাখিয়াছে : বুদ্ধি সত্যের পথেও অগ্রসর হইতে পারে, অসত্যের অন্ধকারেও নিমজ্জিত করিতে পারে। অহংবোধ যেখানে স্বার্থের গণ্ডী টানে সেখানে অসত্যই

৭। Hobbes : Locke : Rousseau : Social Contract Theory.

সত্যের আকারে ব্যাখ্যাত হয়—"যিনি উত্তরকূটের পুরদেবতা আমাদের জয়ে তাঁরই জয়। সেইজন্যই আমাদের পক্ষ নিয়ে তিনি তাঁর নিজের দান ফিরিয়ে নিয়েছেন। তৃষ্ণার শূলে শিবতরাইকে বিদ্ধ করে তাকে তিনি উত্তরকূটের সিংহাসনের তলায় ফেলে দিয়ে যাবেন" (পৃ-২০)। এই পূজা পূজাই নয়, দেবতাকে ভৃত্যরূপে কল্পনা—"তবে তোমাদের পূজা পূজাই নয়, বেতন" (পৃ-২০)।

কিন্তু মানুষ শুধু বুদ্ধিমান জীবই নয় সে বিবেকের অধিকারীও বটে : তাহার অন্তরের নিভৃত মণিকোঠায় কোথাও একটা 'কিন্তু' থাকিয়াই যায়। অহং-এর দাপটে সে সংগুপ্ত থাকিলেও মরে না। রণজিতের মনের সেই 'কিন্তু'টা তাহার ভিতরের বাসাটা প্রসারিত করিতেছিল, এক মহৌষধির স্পর্শে সঞ্জীবিত হইয়া উঠিতেছিল তাহার মন—সেই মহৌষধি প্রেম। যদি প্রেমের স্পর্শ লাগে তবে আর ভাবনা থাকে না—দ্বন্দ্বের মধ্য দিয়া শেষ পর্যন্ত তাহার মুক্তি হয়। সেই প্রেমের বাতাস সমস্ত প্রকৃতিতে ছড়াইয়া দিল যুবরাজ অভিজিৎ।

অভিজিৎ মারনেওয়ালা বা মারখানেওয়ালা কোন দলেরই নয়। চির চঞ্চল, চির গতিশীল এক মানব আত্মা সে। জলের প্রবাহের সঙ্গেই তাহার যোগ—"তিনি হয়তো কোনো সূত্রে জানতে পেরেছেন যে তাঁর জন্ম রাজবাড়িতে নয়, তাঁকে মুক্তধারার ঝর্নাতলা থেকে কুড়িয়ে পাওয়া গেছে" (পৃ-১৭)। রবীন্দ্রনাথ প্রতীকের দ্বারা এইখানে বলিতে চাহিয়াছেন যে যে-মানুষ সকলের জন্য নিজেকে উৎসর্গ করে সে কোন ঘরের নিয়মে বাঁধা থাকে না—তা সে উত্তরকূটের ঘরই হোক্ আর শিবতরাইয়ের ঘরই হোক্। মনের দিক হইতে সে উত্তরকূটের নয়, মারনেওয়ালার যে অহংবোধ, যে ক্ষুদ্রতা তাহা অভিজিৎ দূরে ফেলিয়া তাহার ব্যক্তিত্বের বিকাশ ঘটাইয়াছে; সে শিবতরাইয়ের মারখানেওয়ালাদের ন্যায় কান ঢাকিয়াও নাই, আঘাত বরণ করে—তাহার দেহটা পশুর ন্যায় 'কেঁই কেঁই' করিয়া মরে না।

গতিশীল মানুষ সে। সমস্ত দিকের পথ কাটিয়া দিবার জন্যই তাহার জন্ম, সে জানে যে বন্ধনযুক্ত মানুষ কখনও পূর্ণ মানুষ হইয়া ওঠে না। নবযুগের সাধক রাজা রামমোহন রায় মানুষের মানুষ বলিয়াই যে একটা অধিকার আছে, ধর্মসাধনের বা সমাজশাসনের অজুহাতে কিছুতেই যে এই

অধিকারকে নষ্ট করিতে পারা যায় না, এই মহা সত্য নানাভাবে প্রচার করিয়া গিয়াছেন[৮]। রামমোহনের শিক্ষা রবীন্দ্রনাথ নিজের জীবনে গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাই অভিজিৎও সকলকে মুক্তির পথ করিয়া দিতে চায়—"আমি পৃথিবীতে এসেছি পথ কাটবার জন্যে, এই খবর আমার কাছে এসে পৌঁচেছে" (পৃ-১৮)। তিনি জানেন যে গতিই জীবন, গতিহীনতাই মৃত্যু। ঝর্ণা যখন বাঁধা হইল তখন তাহারই সঙ্গে যুক্ত অভিজিৎ নিজের প্রাণের ছন্দকেই কারারুদ্ধ বলিয়া মনে করিল। প্রাণকে ভালবাসে বলিয়াই ঝর্নার কলধ্বনি বন্ধ হইতে দেওয়া তাহার পক্ষে সম্ভব নয়, তাই কারাগার তাহাকে ভাঙিতেই হইবে। রাজবাড়ী ছাড়িয়া সেই জন্যই তাহার পথে অভিসার। রাজবাড়ী রাজতন্ত্রের দম্ভ—প্রকৃত রাজার বাড়ী তাহা নয়। পথের সন্ধান যে পায় তাহাকে কি রাজবাড়ীর ভোগের বন্ধন আটকাইয়া রাখিতে পারে—"আমার অন্তরের কথা আছে ওই মুক্তধারার মধ্যে। তারই পায়ে ওরা যখন লোহার বেড়ি পরিয়ে দিলে তখন হঠাৎ যেন চমক ভেঙে বুঝতে পারলুম উত্তরকূটের সিংহাসনই আমার জীবন স্রোতের বাঁধ। পথে বেরিয়েছি, তারই পথ খুলে দেবার জন্যে" (পৃঃ ২৯-৩০)।

যে মারনেওয়ালাও নয় মারখানেওয়ালাও নয় তাহারই কপালে রাজটীকা দিয়া মারনেওয়ালাদের যুবরাজ করিয়া দিয়াছেন কবি এক বিশেষ উদ্দেশ্যে। যে ভোগ জানে না তাহার পক্ষে ত্যাগ মহা গৌরবের না হইবারই সম্ভাবনা। বিশেষ, ভোগের মধ্যে থাকিয়াই ভোগের লোলুপতাকে যথার্থভাবে জানা যায়. মুক্ত মনের অধিকারী অভিজিৎকে তাই তিনি ভোগের রাজ্যের অভিজ্ঞতা করাইলেন। তমোগুণে আচ্ছন্ন কেহ আত্মাকে পাইতে পারে না।—নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ।

"মনু বলিয়াছেন—

ন তথৈতানি শক্যন্তে সংনিয়ন্তমসেবয়া।
বিষয়েষু প্রজুষ্টানি যথা জ্ঞানেন নিত্যশঃ।

বিষয়ের সেবা না করিয়া সেরূপ সংযম করা যায় না, বিষয়ে নিযুক্ত থাকিয়া জ্ঞানের দ্বারা যেমন করিয়া করা যায়। অর্থাৎ বিষয়ে নিযুক্ত না হইলে জ্ঞান পূর্ণতা লাভ করে না, এবং যে সংযম জ্ঞানের দ্বারা

৮। শ্রীবিপিনচন্দ্র পাল: নবযুগের বাংলা: পৃ-৩০

লব্ধ নহে তাহা পূর্ণ সংযম নহে—তাহা জড় অভ্যাস বা অনভিজ্ঞতার অন্তরাল মাত্র; তাহা প্রকৃতির মূলগত নহে, তাহা বাহ্যিক" (ধর্ম: ততঃ কিম্)। অভিজ্ঞতার দ্বারা মারনেওয়ালাদের ভয়ঙ্কর রূপ দেখিয়া তাই তাহার অন্তর পীড়িত হইয়া উঠিয়াছিল—এই অর্থেই 'অভিজিৎ হচ্ছে সেই মারনেওয়ালার ভিতরকার পীড়িত মানুষ'[১]।

যে মানুষ ব্যক্তিত্বকে বিকশিত করিতে পারিয়াছে সে ঘরে বসিয়া থাকিতে পারে না—প্রেমের মন্ত্রে সকলকে উজ্জীবিত করিতে চায়। সে টানিয়া ধরিয়া প্রেমের মন্ত্র শিখায় না, প্রেমের জীবন্ত বিগ্রহ হইয়া উঠিয়া সমস্ত আবহাওয়াটাকে স্নিগ্ধ করিয়া তোলে—"তাঁর কথা এখানকার হাওয়ায় ছড়িয়ে আছে" (পৃ-৫৯)। বিভূতির ন্যায় দুই চারিজন কঠিন হৃদয় ব্যক্তি ব্যতীত সকলেই সেই সক্রিয় প্রেমের চৌম্বকী শক্তির স্পর্শ লাভ করে: রণজিতের মনে দ্বন্দ্ব দেখা দেয়, যে মন্ত্রী একদিন বলিয়াছিল 'উপরে চড়ে বসে নীচে চাপ দেওয়া সহজ, আর বিদেশী প্রজাদের সেই চাপে রাখাই রাজনীতি' সেই মন্ত্রীর মুখেই শুনিতে পাই, 'রাজকার্যে ছোটোদের অবজ্ঞা করতে নেই। মনে রাখবেন, যখন অসহ্য হয় তখন দুঃখের জোরে ছোটোরা বড়োদের ছাড়িয়ে বড়ো হয়ে ওঠে" (পৃ: ১৪-১৫); তখন শিবতরাইয়ের লোকেরা বলে যুবরাজকে আমরা চাই, কুন্দন গোপনে আসিয়া ধনঞ্জয়ের হাতের বাঁধন খুলিয়া দিয়া যায়। বিশ্বজিৎ বলেন, "কখন ওই বালক অভিজিৎ আমার হৃদয়ের মধ্যে এল—আলোর মতো এল। অন্ধকারে না দেখতে পেয়ে যাদের আঘাত করেছিলুম তাদের আপন বলে দেখতে পেলুম" (পৃ-২০)। যখন চারিদিকে অন্ধকার নামিয়া আসে, সত্য পথ চেনা যায় না তখন প্রেমই পথের নিশানা দেখায়। প্রেমের টানে পাওয়াই যথার্থ পাওয়া—"ছেড়ে রাখলেই যাকে পাও মুঠোর মধ্যে চাপতে গেলেই দেখবে সে ফসকে গেছে" (পৃ-৫০)। প্রেম বন্ধন নয় অথচ এমনি কঠিন ইহার আকর্ষণ যে সরিয়া যাওয়া অসম্ভব—

১। রবীন্দ্রনাথের ব্যাখ্যা। কিন্তু এই কথা মনে করিবার কারণ নাই যে মারনেওয়ালাদের অত্যাচারের প্রতিবাদ করিতে মারনেওয়ালাদের মধ্য হইতেই কেহ আসেন। বুদ্ধদেব এবং মহাবীর আসিয়াছিলেন—সে ভারতীয় অধ্যাত্মসাধনার বৈশিষ্ট্য। সাধারণ জ্ঞানের আলোকে প্রদীপ্ত মধ্যবিত্ত শ্রেণী হইতেই এই সব মানুষ আসেন। মধ্যবিত্তরা মারনেওয়ালা নয়। আসল কথা হইল জ্ঞান এবং তাহা লাভ করিবার জন্য অভিজ্ঞতা।

তোমার প্রেম যে সবার বাড়া
তাই তোমারি নূতন ধারা,
বাঁধ নাকো, লুকিয়ে থাক,
ছেড়েই রাখ দাসে। (গীতাঞ্জলি : ১৫২)

একদিকে অভিজিৎ সমস্ত মানুষকে ভালবাসিয়া কাজের জগতে নামিয়া আসিয়াছে, আর একদিকে ধনঞ্জয় বৈরাগী শিবতরাইয়ের অন্তরাত্মাকে প্রস্তুতির কাজে লাগিয়াছে। যাহাদের শিক্ষা নাই, জ্ঞান নাই তাহাদের প্রস্তুত করিয়া তোলা একরকম অসম্ভব। শিবতরাইয়ের মানুষ এখনও মার খাইয়া বেদনা অনুভব করে, এখনও তাহারা হিংসাকে ভুলিতে পারে নাই—নিজেদের বুদ্ধিকে ধনঞ্জয়ের দায়িত্বে ছাড়িয়া দিয়া কুসংস্কারের মধ্যেই আবদ্ধ হইয়া আছে।

ধনঞ্জয় বৈরাগীর আদর্শ উজ্জ্বল কিন্তু শিবতরাইয়ের মানুষের সেই আদর্শ জীবনে প্রয়োগ করিবার শক্তি ছিল না। সমস্ত তত্ত্ব না জানিয়াও প্রেমের আবেগে কর্মক্ষেত্রে নামিয়া অভিজিৎ সেই আদর্শই অনুসরণ করিয়াছে। উভয়েই ক্ষেত্র প্রস্তুত করিতেছিল, একজন কর্মের মধ্যে নামিয়া আর একজন জ্ঞানের দ্বারা। এই উভয়ের মিলনেই পূর্ণতা। যখন আঘাত নামিয়া আসিল অভিজিৎ-এর উপর ঠিক সেই সময়ে নাটকে প্রথম প্রবেশ করিল ধনঞ্জয় বৈরাগী, মুখে তাহার গান…

আমি মারের সাগর পাড়ি দেব
বিষম ঝড়ের বায়ে
আমার ভয়-ভাঙা এই নায়ে। (পৃ-৩৬).

কেবল মারের সাগর পাড়ি দিলেই হইবে না, এই বিশ্বাসও থাকা চাই—

পথ আমারে সেই দেখাবে
যে আমারে চায়—

পথ তিনিই দেখাইয়া দেন সত্য কিন্তু তাহার জন্য মানুষেরও কর্তব্য করিতে হয়। যে নিজে কোন দায়িত্ব গ্রহণ করে না তাহাকে পথ দেখাইবার দায়িত্বও কাহারও নাই—

আমি অভয়মনে ছাড়ব তরী
এই শুধু মোর দায়।

বন্দিশালায় হয়ত অভিজিতের মনে এই কথাটাই জাগিয়াছিল।

কেবল যে বিশেষ এক নাটকীয় মুহূর্তেই তাহার আগমন তাহা নহে। অভিজিতের মহত্তম জীবনের পরিচয় যেন তাহার কাছেই পাই। মারকে তুচ্ছ করিতে পারে কয়জন! শিবতরাইয়ের লোকগুলি তো আজিও আদর্শে পৌঁছায় নাই। অথচ অভিজিৎ কেমন করিয়া যেন সব শক্তি আহরণ করিয়াছে। এতটুকু বিচলিত না হইয়া অভিজিৎ যে পথে চলিয়াছে তাহাকেই মহান রূপ দিবার জন্যই যেন বৈরাগীর আগমন। অভিজিৎ তো তাহার দায় পালন করিয়াছে—অভয়মনে সে তরী ছাড়িয়াছে। এইবার বন্দিশালায় উভয়ের মিলন। সেই মিলনের পরই বন্দিশালায় আগুন লাগিল উদ্ধব এবং বিশ্বজিতের মিলিত চেষ্টায়। মুক্ত অভিজিৎ বাহিরে আসিয়া গভীর বিশ্বাসে বলিল, "আমাকে আজ কিছুতেই বন্দী করতে পারবে না—না ক্রোধে, না স্নেহে। তোমরা ভাবছ তোমরাই আগুন লাগিয়েছ? না, এ আগুন যেমন করেই হোক লাগত। আজ আমার বন্দী থাকবার অবকাশ নেই" (পৃ-৬০)। যে তাহাকে চায় সেই তো পথ দেখাইতে আসিয়াছে। বন্দী হইবার পর ধনঞ্জয়কে পাইয়া হয়তো তাহার এই জ্ঞান হইয়াছে—নিজেকে প্রস্তুত রাখার দায়িত্বই শুধু মানুষের আর সকল কিছুই তিনি করিয়া দিবেন। রবীন্দ্রনাথের নিজের মনের গভীর বিশ্বাস এখানে প্রোজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে।

ইভলিন আণ্ডারহীল তাঁহার 'মিস্টিসিজ্‌ম্' গ্রন্থে কবি আত্তার (Attar) এর যে মতটির কথা উল্লেখ করিয়াছেন তাহার সহিত রবীন্দ্রনাথের এই মনোভাবের বিশেষ মিল আছে—

"The sufi poet" Attar, in his mystical poem, "The colloquy of the Birds", has described the stages of this same spiritual pilgrimage with greater psychological insight, as the journey through "seven valleys" :—

"(1) The first valley is the Velley of Quest. It is long and toilsome: and there the traveller must strip himself of all earthly things, becoming poor, bare and desolute : and so stay till the Supernal Light casts a ray on his desolution.

"(2) When the ray of Supernal Light has touched the pilgrim he enters the limitless Valley of Love.

"(3) Hence he passes to the Valley of Knowledge or Enlightenment—the contemplative state···The mystery of Being

is now revealed to the traveller. He sees Nature's secret, and God in all things. It is the height of illumination.

"(4) The next stage is the Valley of Detachment, of utter absorption in Divine love.

"(5) The Valley of Unity, where the naked Godhead is the one object of contemplation.

"(6). The Valley of Amazement : where the Vision, for transcending the pilgrim's receptive power, appears to be taken from him and he is plunged in darkness and bewilderment.

"(7) The Valley of Annihilation of Self : the supreme degree of Union in which the self is utterly merged "like a fish in the sea" in the Ocean of "Divine love." " (Ch. on—Mysticism and Symbolism).

অভিজিৎ-এর ক্ষেত্রেও কতকটা ইহাই হইয়াছিল। সত্য অনুসন্ধানে বাহির হইয়া ক্রমে সে সকলের প্রতি প্রেম অনুভব করিয়াছিল। তারপর ধনঞ্জয় বৈরাগীর সংস্পর্শে আসিয়া সে জ্ঞান লাভ করে। তবে জ্ঞান ও প্রেমের সম্মিলন যাহার মধ্যে হইয়াছে তাহাকে কবি আত্তারের ষষ্ঠ স্তরটি অতিক্রম করিতে হয় বলিয়া রবীন্দ্রনাথ মনে করেন না। সুতরাং অভিজিৎকে এই স্তরটির ভিতর দিয়া যাইতে হয় নাই—একেবারে সপ্তম স্তরে পৌঁছিয়া সে স্বর্গীয় সত্তার মধ্যে নিজেকে মিশাইয়া দেয়। তাহার মৃত্যু পরম সত্তার মধ্যে গভীর প্রে. নিমজ্জন ব্যতীত আর কিছুই নহে।

অভিজিৎ এবং ধনঞ্জয় বৈরাগী উভয়েই সাধারণ মানুষের মধ্যেই তাহাদের কর্মক্ষেত্রের সন্ধান পাইয়াছে। মরমীদের গভীর বিশ্বাস এই যে সৃষ্টি ক্রিয়ার মধ্যে এক গভীর বেদনা বোধ আছে। কি জড় জগতে, কি আত্মিক জগতে, এই উভয় ক্ষেত্রেই সৃষ্টির বেদনা সহ্য করিতে হয়। সুতরাং অবিনশ্বর অনন্ত সত্তার সন্ধানের ইচ্ছা মরমীদের বেদনা ও আনন্দের সহিত শক্তি ও আগ্রহ সহকারে মিলিত হইবার প্রেরণা দেয়—সাধারণ মানুষের মধ্যে নামিয়া বেদনা স্বীকার করিয়া লইয়াই অসীমের সহিত মিলিত হইতে হয়—

"In whom can I better work in accordance with my true nobility than in those who are most like Me? They are the men who suffer...Learn that My divine nature never worked so nobly in human nature as by suffering, and because suffering is

so efficacious, it is sent out of great love...He who desires to be wholly immersed in the fathomless sea of My Godhead must also be deeply immersed in the deep sea of bitter sorrow." (Tauler, Sermon on St. Paul : "The Inner way" : E. Underhill : Mysticism : Ch. Purification of the Self).

মরমী রবীন্দ্রনাথেরও সেই বিশ্বাস, নিপীড়িত সাধারণ মানুষের মধ্যেই ভগবানের অস্তিত্ব : তাঁহাকে পাইতে হইলে জীবনের শেষে গিয়া আরাধনা করিলেই চলিবে না, জীবনের যাত্রাপথের দুই পাশেই সাধারণ মানুষের মধ্যে তাঁহাকে পাওয়া যাইবে—

যেথায় থাকে সবার অধম দীনের হতে দীন
সেইখানে যে চরণ তোমার রাজে
সবার পিছে, সবার নিচে,
সবহারাদের মাঝে।
(গীতাঞ্জলি : ১০৭ সংখ্যক কবিতা)

ঈশ্বরকে যাঁহারা চাহেন এবং তাঁহার বিধানকে যাঁহারা জয়যুক্ত করিতে ইচ্ছা করেন সবহারাদের মধ্যেই তাঁহাদের কাজের ক্ষেত্র। তাহাদের অন্তর জাগ্রত করাই হইবে তাঁহাদের একমাত্র কাজ। কোন নির্দেশ তাহাদের দিয়া পালন করাইবার প্রয়োজন নাই কেবল তাহাদের ব্যক্তিত্বের বিকাশ সাধনের পথগুলি উন্মুক্ত করিয়া দিতে হইবে। স্বামী বিবেকানন্দও এই প্রকার কথা বলিয়াছেন, "অল্প কয়েকজন লোকের কতকগুলি বিষয় দোষ বোধ হইলেই তাহাতে সমগ্র জাতির হৃদয়কে স্পর্শ করে না। সমগ্র জাতি নড়ে চড়ে না কেন? প্রথম সমগ্র জাতিকে শিক্ষা দাও···সুতরাং সমাজ সংস্কারের জন্য প্রথম কর্তব্য—লোকশিক্ষা। এই শিক্ষা সম্পূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করিতে হইবে"। ইবসেনও তাঁহার 'পিলারস্ অব সোসাইটি'তে (Pillars of Society : ১৮৭৭) বলিয়াছেন যে, নেতার উপর নির্ভর না করিয়া ব্যষ্টির কর্তব্য আত্মোন্নতির চেষ্টা করা। ব্যষ্টির উন্নতির দ্বারাই সমাজের স্থায়ী উন্নতি হইতে পারে।

সাধারণ মানুষের অন্তরকে জাগ্রত করিতে গিয়াও অনেক সময় অনর্থপাত করা হয়। রবীন্দ্রনাথ সেইখানে সাবধান বাণী উচ্চারণ করিয়াছেন। বাঁধন সৃষ্টি করার গুরু যেন আমরা না হইয়া বসি। সাধারণ মানুষ যখন গুরুকে

মানে তখন অনেক সময়েই সে সেই গুরুকেই মানে সত্যকে নয়। গুরু তখন সত্যকে আড়াল করিয়া ফেলে, তত্ত্বজ্ঞ ধনঞ্জয় এই সত্যটা জানে।

ধনঞ্জয়। আমার জোরেই কি তোদের জোর? এ কথা যদি বলিস তা হলে যে আমাকে সুদ্ধ দুর্বল করবি।

গণেশ। ও কথা বলে আজ ফাঁকি দিয়ো না। আমাদের সকলের জোর একা তোমারই মধ্যে।

ধনঞ্জয়। তবে আমার হার হয়েছে। আমাকে সরে দাঁড়াতে হল।

সকলে। কেন ঠাকুর?

ধনঞ্জয়। আমাকে পেতে আপনাকে হারাবি! এত বড়ো লোকসান মেটাতে পারি এমন সাধ্য কি আমার আছে! বড় লজ্জা পেলুম। (পৃ-৫০)।

'জগৎটা বাণী ময়'—সমস্ত ইন্দ্রিয় দ্বার উন্মুক্ত করিয়া সেখান হইতে নিজের শিক্ষা নিজেই আহরণ করিতে হইবে। ফাঁকি দিয়া অজ্ঞতা-দীনতা-অপরাধের শেষ করা যায় না। অনেকের চেষ্টাতেও তাহা দূরীভূত করিবার জো নাই। তাহার জন্য উপযুক্ত মূল্য দিতে হয়—দুঃখ বরণই সেই মূল্য দান। রবীন্দ্রনাথ এই কথাটা বেশ দৃঢ়তার সহিতই বলিতে চাহিয়াছেন যে যাহারা বাহিরের জগতে বাঁধ বাঁধিয়া মানুষের তৃষ্ণার জল অপহরণ করে এবং তাহাদের মঙ্গলের পথ আটকায় তাহাদের অপেক্ষা কম অপরাধী নয় সেই সব ব্যক্তি যাহারা অন্তরকে অন্ধ বিশ্বাসের দড়িতে বাঁধিয়া বিকাশের পথটি বন্ধ করে। তাই প্রতিনিয়ত তাহাকে পথের নির্দেশ দিয়া তাহার ব্যক্তিত্বকে খর্ব না করিয়া তাহাকে ভালবাসিতে হইবে এবং তাহারই সাহায্যে তাহার ভালবাসাকেও জাগ্রত করিতে হইবে—"মাতাকে যদি কেবলই উপদেশ দিতে হয় যে, তুমি ছেলের কাছে অনবধান হইও না, তোমাকে এই করিতে হইবে, তোমাকে এই করিতে হইবে না, তবে উপদেশের আর অন্ত থাকে না—কিন্তু যদি বলি ছেলেকে ভালবাসো, তবে দ্বিতীয় কোন কথাই বলিতে হয় না, সমস্তই সরল হইয়া আসে' (ধর্ম : ধর্মের সরল আদর্শ : পৃ-৩৮)।

যদি মানুষের ভিতরকার অসীমের নিদ্রা ভঙ্গ হয়, যদি সে অসীমকে পাইবার তীব্র আকাঙ্ক্ষা অনুভব করে তাহা হইলে আর ভাবনা থাকে না। তখন সম্মুখে, নেপথ্যে ধ্বনিত হইতে থাকে—"জাগো, ভৈরব জাগো"। সেই সময় হইতেই সমস্ত বাধা দূরীভূত হইবার মুহূর্ত আগাইয়া আসিতে

থাকে। তখন সেই আহ্বানকে আরও আন্তরিক করিয়া তুলিতে হইবে। বস্তুর স্তূপে যখন চারিদিক অন্ধকার হইয়া আসিবে ঠিক সেই মুহূর্তে ভৈরব জাগিয়া উঠিবেন : অহং রূপ অপদেবতার সমস্ত বাধা চূর্ণবিচূর্ণ হইয়া যাইবে। অত্যাচারের আঘাতে বোবা মানুষও কথা বলে, পাষাণ ভৈরবও জাগে—

নিশিদিন ভরসা রাখিস্
ওরে মন হবেই হবে
যদি পণ করে থাকিস্
সে পণ তোমার রবেই রবে।
ওরে মন হবেই হবে।
পাষাণ সমান আছে পড়ে
প্রাণ পেয়ে সে উঠ্‌বে ওরে
আছে যারা বোবার মতন
তারাও কথা কবেই কবে।
ওরে মন হবেই হবে। (বাউল : হবেই হবে)

মানুষ দেখিতে চায় রুদ্রের মঙ্গল মূর্তি, প্রসন্ন মুখ—রুদ্র যত্তে দক্ষিণং মুখং তেন মাং পাহি নিত্যম্।[১০] পরম সত্য হইতেছে রুদ্রের ওই প্রসন্ন মুখ। কিন্তু ওই প্রসন্নতাকে উদ্বুদ্ধ করিতে হইলে রুদ্রের ভয়ঙ্করতাকে স্পর্শ না করিয়া উপায় নাই। অশান্তিকে অস্বীকার করিযা শান্তি লাভের কল্পনা স্বপ্ন মাত্র—

বজ্রে তোমার বাজে বাঁশি,
সে কি সহজ গান।
সেই সুরেতে জাগব আমি
দাও মোরে সেই কান।
... ...
আরাম হতে ছিন্ন ক'রে
সেই গভীরে লও গো মোরে
অশান্তির অন্তরে যেথায়
শান্তি সুমহান। (গীতাঞ্জলি : ৭৪ সংখ্যক কবিতা)

১০। শ্বেতাশ্বতর : ৪র্থ অধ্যায়

অভিজিৎ সেইজন্যই দুঃখকে বরণ করিতে পারিয়াছিল। এই সীমিত দেহের মধ্যে যে অসীম মানুষটির বাস সে যখন বিকাশ লাভ করে তখন ক্ষুদ্রতার আবেষ্টনী তাহাকে ধরিয়া রাখিতে পারে না। এই যে ক্ষুদ্রতাকে কেবলই অতিক্রম করিয়া যাইবার আকাঙ্ক্ষা—এইখানেই মানুষের সত্যকার পরিচয়। বাধা বিপদের ভয়ঙ্কর মুখভঙ্গী সত্ত্বেও সেই দিন সে চিরন্তন মঙ্গলকেই আপনার বলিয়া বরণ করিয়া লয়, "সকল জীবের মধ্যে মানুষই কেবল অমিতাচারী। তাকে পেতে হবে অমিত, তাকে দিতে হবে অমিত, কেননা তার মধ্যে আছে অমিতমানব। সেই অমিতমানব সুখের কাঙাল নয়, দুঃখভীরু নয়। সেই অমিতমানব আরামের দ্বার ভেঙে কেবলই মানুষকে বের করে নিয়ে চলেছে কঠোর অধ্যবসায়ে। আমাদের ভিতরকার ছোটো মানুষটি তা নিয়ে বিদ্রূপ ক'রে থাকে; বলে, ঘরের খেয়ে বনের মোষ তাড়ানো। উপায় নেই। বিশ্বের মানুষটি ঘরের মানুষকে পাঠিয়ে দেন বুনো মোষটাকে দাবিয়ে রাখতে, এমন কি, ঘরের খাওয়া যথেষ্ট না জুটলেও (মানুষের ধর্ম: পৃ-১৭-১৮)। নাটকে সেই কথাটাই সঙ্কেত করা হইয়াছে—

বটু। ...মনে করেছিলুম পাপের বেদী আপনি ভেঙে পড়ে যাবে। কিন্তু, এখনও তো ভাঙল না, ভৈরব তো জাগলেন না!

অভিজিৎ। ভাঙবে। সময় এসেছে।

বটু। (কাছে আসিয়া চুপে-চুপে) তবে শুনেছ বুঝি? ভৈরবের আহ্বান শুনেছ?

অভিজিৎ। শুনেছি।

বটু। সর্বনাশ! তবে তো তোমার নিষ্কৃতি নেই?

অভিজিৎ। না, নেই।

বটু। এই দেখছ না আমার মাথা দিয়ে রক্ত পড়ছে, সর্বাঙ্গে ধুলো? সইতে পারবে কি যুবরাজ, যখন বক্ষ বিদীর্ণ হয়ে যাবে?

অভিজিৎ। ভৈরবের প্রসাদে সইতে পারব। (পৃ-২৯-৩০)

ভৈরব যাহাকে আহ্বান করেন তাহার আর নিজের বলিতে কিছু থাকে না। সে তখন মঙ্গল প্রতিষ্ঠার কাজে আত্মাহুতি দেয়। অন্যায়কে দূর করিতে হইলে কঠিন মূল্য দিতে হয়। দুঃখের ভিতর দিয়াই পথ: দুর্গং পথস্তৎ কবয়ো বদন্তি[১১]—

[১১] কঠ: ১ম অধ্যায়

শক্ত যা তাই সাধ্‌তে হবে,
মাথা তুলে রইব ভবে,
সহজ পথে চল্‌ব ভেবে
পাঁকের 'পরে পড়্‌ব না ॥ (বাউল : অভয়)

কিন্তু যাহাকে রুদ্র আহ্বান করেন তাহাকে নিজের হাতে প্রস্তুত করিয়াও লন—সে জীবনকে নীরস মনে করে বলিয়াই আত্মাহুতি দেয় তাহা নয়। পৃথিবীর বিকৃতি দূর করিয়া তাহাকে সুন্দর করিতে সে চায়। সে চায় সমস্ত প্রকৃতিতে ধ্বনিত হউক আনন্দ কলতান—কোনো বিভূতিই যেন ফড়িং এর মত পা বাড়াইয়া নীল আকাশের সৌন্দর্যকে বীভৎস করিয়া তুলিতে না পারে—"সেইজন্যেই সইতে পারছি নে ওই বীভৎসটাকে যা এই ধরণীর সংগীত রোধ করে দিয়ে আকাশে লোহার দাঁত মেলে অট্টহাস্য করছে। স্বর্গকে ভালো লেগেছে বলেই দৈত্যের সঙ্গে লড়াই করতে যেতে দ্বিধা করি নে" (পৃ-৩০-৩১)। এই লড়াই করিবার শক্তি ভৈরবই তাহাকে দেন, ভৈরবের নিজের যুদ্ধই তো সে করিয়া দেয়—

তোমার পতাকা যারে দাও
তারে বহিবারে দাও শকতি।

কিন্তু এই কথাটা ভুলিলে চলিবে না যে ভৈরবকে জাগাইবার কাজে বিভূতিদের হাতই বেশী। আমাদের দেশে একটা কথা চলিত আছে যে ভগবানের মিত্ররূপে মুক্তি পাওয়া যায় সাত জন্মে আর শত্রুরূপে তিন জন্মে। ভগবানের ঐশ্বর্যের জোরে যখন শত্রুরূপী বিভূতির দল অতি দম্ভে পৃথিবীকে শুষ্ক করিয়া তুলিতে থাকে তখন নিজের ঐশ্বর্যের শক্তিকে নিরস্ত করা স্বয়ং ভগবানের জাগরণ ব্যতীত সম্ভব নয়। তিনিই তখন কোন মহান প্রাণবন্ত মানুষের মধ্য দিয়া কাজ করেন। হিংসায় যখন পৃথিবী উন্মত্ত হইয়া ওঠে তখনই ঈশ্বরের রোষ নামিয়া আসে : যখন অত্যাচারীর অত্যাচারে বায়ু বিষাক্ত হইয়া ওঠে তখন আর ভৈরব ক্ষমা করেন না—

বিভূতি। বৈরাগী, তোমাদের মতো সাধুরা ভৈরবকে এ পর্যন্ত জাগাতে পারলে না, আর যাকে পাষণ্ড বল সেই আমিই ভৈরবকে জাগাতে চলেছি।

ধনঞ্জয়। সে কথা মানি, জাগাবার ভার তোমাদের উপরেই।

বিভূতি। এ কিন্তু তোমাদের ঘণ্টা নেড়ে আরতির দীপ জ্বালিয়ে জাগানো নয়।

ধনঞ্জয়। না, তোমরা শিকল দিয়ে তাঁকে বাঁধবে, তিনি শিকল ছেঁড়বার জন্যে জাগবেন।

বিভূতি। সহজ শিকল আমাদের নয়, পাকের পর পাক, গ্রন্থির পর গ্রন্থি।

ধনঞ্জয়। সবচেয়ে দুঃসাধ্য যখন হয় তখনই তাঁর সময় আসে। (পৃ-৭২-৭৩)

ভৈরবের জাগ্রত হইবার সময় কখন হয় তাহাই রবীন্দ্রনাথ এইখানে দেখাইয়াছেন। একদিকে চাই বিভূতিদের কঠিন পেষণঃ ভোগের আকাঙ্ক্ষার কঠিন শৃঙ্খলে মানবত্মাকে পাকের পর পাক দিয়া তাহার মুক্তির পথ সম্পূর্ণ রোধ করিয়া রাখার চেষ্টা—অপরদিকে চাই মানবাত্মার জাগরণের আকাঙ্ক্ষা। সেই মানবাত্মাকে জাগ্রত করিলে কর্ম-জ্ঞান-প্রেমের সমন্বয় সাধন করিতে হয়। এই নাটকে সেই সমন্বয় সাধিত হইয়াছে অভিজিৎ-ধনঞ্জয়ের মিলনে। আকাশে বাতাসে মুক্তির আকাঙ্ক্ষা লাগিয়াছে, কিন্তু মুক্তির ভিতরকার কথাটি কি তাহা তখনও সাধারণের বোধগম্য হয় নাই। সেই বোধজাগরণের জন্য চাই মহৎ প্রাণের বলি। একের আত্মবিসর্জন অন্যের চেতনা আনে। এইরূপ মহৎ প্রাণের বলি বিভূতিদের ব্যবস্থাকে বিপর্যস্ত করিয়া দেয়। এই বলি সামান্য মৃত্যু নয়, ইহাই মানবের পূর্ণতা লাভ। নবজীবন সৃষ্টির জন্যই অভিজিৎ-এর মৃত্যু বরণ—“প্রাণের বদলে প্রাণ যদি না মেলে, মৃত্যু দিয়ে যদি মৃত্যুকেই ডাকা হয়, তবে ভৈরব এত বড়ো ক্ষতি সইবেন কেন’? (পৃ-২৮)

ভৈরবকে ক্ষতি স্বীকার করিতে হয় নাই। অভিজিৎ-এর এই মৃত্যু মৃত্যু মাত্র নয়—ইহা অসীমে নিমজ্জন। ইহা সমাজের প্রাণকে জাগ্রত করিয়া দিয়া গেল। রাজচক্রবর্তীর লক্ষণ লইয়া অভিজিৎ জন্মগ্রহণ করিয়াছে, তাহাকে ধরিয়া রাখিবার শক্তি উত্তরকূটের সিংহাসনের নাই। মানুষের সজীব হৃদয়-সিংহাসনই তাহার উপযুক্ত স্থান। ফুলওয়ালীর শ্বেতপদ্ম তাহার নিকট পৌঁছিয়াছে, অম্বার চিরজীবী হইবার আশীর্বাদ, নাম-না-জানা উত্তরকূটের একরত্তি মেয়ের অন্তরের বিশ্বাস ‘উনি তো সবারই হৃদয় জয় করে নিয়েছেন’ বিফল হয় নাই। গণেশ সর্দারের দল

তাহাকে চিরকালের মতো পাইয়া গেল এবং ইহারই ভিতর দিয়া উত্তরকূট-শিবতরাইয়ের মিলনের সূত্র গ্রথিত হইবার সুযোগও ঘটিল। প্রেমিকের জীবন মৃত্যুর ভিতর দিয়াই পূর্ণতা পায়—

জীবনে ফুল ফোটা হলে
মরণে ফল ফলবে। (গীতাঞ্জলি)

মুক্তধারার বাঁধ ভাঙিয়া প্রাণশক্তি 'গতি'কে সমাজে ফিরাইয়া আনিল। কোন বন্ধনই আত্মাকে আবদ্ধ করিয়া রাখিতে পারে না ইহাতে তাহাও সূচিত হইল। কৌশলে রবীন্দ্রনাথ আত্মার জাগরণ দেখাইয়াছেন। বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার প্রচুর ভোগ্য বস্তুর ব্যবস্থা করিয়া লোভের মুখটা রাক্ষসীর ন্যায় বিরাট করিয়া তোলে। এই সময় পীড়িত আত্মা মুক্তির পথ বন্ধ হয় দেখিয়া আকুল হইয়া ওঠে: সরলতা, সৌন্দর্য-চেতনা, প্রীতি-প্রেম আত্মার জাগরণের অপেক্ষায় অর্ঘ্য সাজাইয়া রাখে। তারপর ধীরে ধীরে প্রজ্ঞায় সমুদ্ভাসিত হয় আত্মা: মগ্ন চৈতন্যে মঙ্গলের দেবতা ভৈরবের আহ্বান শোনা যায়। তখনই আসে শেষ পালা: ভোগের তৃষ্ণাকে ধ্বংস করিয়া আত্মা মুক্তি লাভ করে; স্বচ্ছন্দ প্রাণের কলধ্বনি শোনা যায় ওই ঝর্ণায়, সেই তো আত্মার মহত্তর জীবনে প্রয়াণ।

রক্তকরবী

(১৩৩০ : ১৯২৩)

১৩৩০ সালে শিলঙে অবস্থানকালে রবীন্দ্রনাথ নাটকটি 'যক্ষপুরী' নামে প্রথম রচনা করেন (বৈশাখ, ১৩৩০)। পাণ্ডুলিপি আকারেই পরে এই নাটকের নাম দেন 'নন্দিনী'। ১৩৩১ সালের আশ্বিন মাসের 'প্রবাসী' পত্রিকায় সেই 'নন্দিনী'ই কিছু পরিবর্তিত হইয়া 'রক্তকরবী' নামে আত্মপ্রকাশ করে। নাটকটি ১৩৩৩ সালে, ডিসেম্বর ১৯২৬, গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়।

নন্দিনী-অধ্যাপক এবং নন্দিনী-নেপথ্য রাজার কথাবার্তার ভিতর দিয়াই নাটকের দ্বন্দ্বটির আভাস দেওয়া হইয়াছে। এই দ্বন্দ্বটি বুঝিবার জন্য বেশী কথার প্রয়োজন হয় না। অধ্যাপকের উদ্দেশ্যে বলা নন্দিনীর কথার মধ্যেই ইঙ্গিতটি পরিস্ফুট, "......তোমাদের রাজাকে এই একটা অদ্ভুত জালের দেয়ালের আড়ালে ঢাকা দিয়ে রেখেছ, সে যে মানুষ পাছে সে কথা ধরা পড়ে। তোমাদের ওই সুড়ঙ্গের অন্ধকার-ডালাটা খুলে ফেলে তার মধ্যে আলো ঢেলে দিতে ইচ্ছে করে তেমনি ইচ্ছে করে ওই বিশ্রী জালটাকে ছিঁড়ে ফেলে মানুষটাকে উদ্ধার করি"। (পৃ-৫)।

সুতরাং স্পষ্টই বোধগম্য হয় যে এই নাটকে একদিকে আছে এক অদ্ভুত আবরণ সৃষ্টিকারী সমাজ ব্যবস্থা অপরদিকে আছে তাহাকে চূর্ণ করিবার আকাঙ্ক্ষা। কিছু পরে নন্দিনী-রাজার কথায়ও সেই ভাবটি প্রকাশিত হইয়াছে।

নন্দিনী

আজ খুশিতে আমার মন ভরে আছে। সেই খুশি নিয়ে তোমার ঘরের মধ্যে যেতে চাই।

নেপথ্যে

না, ঘরের মধ্যে না, যা বলতে হয় বাইরে থেকে বলো। (পৃ-১১)।

মনে হয়, রাজাকে বাহিরে আনিবার চেষ্টা আছে নন্দিনীর মধ্যে—একবার তাহাকে বাহিরে আনিতে পারিলেই হয়ত সংঘাতের অবসান হইবে। নন্দিনীর সেই প্রার্থনাই শুনি, "তুমিও বেরিয়ে এসো রাজা, তোমাকে মাঠে নিয়ে যাই" (পৃ-১৩)।

নাটকের দ্বন্দ্ব পরিস্ফুট করিবার জন্য রবীন্দ্রনাথ একটি নেপথ্য সঙ্গীতের ব্যবস্থা করিয়াছেন। 'মুক্তধারা' নাটকেও এইরূপ একটি নেপথ্য সঙ্গীত আছে—তাহা ভৈরবপন্থীদের গান। এই সঙ্গীত নাটকের দ্বন্দ্ব এবং তত্ত্ব উভয়কেই তাৎপর্য মণ্ডিত করিয়া তুলিয়াছে। 'রক্তকরবী' নাটকে নেপথ্য সঙ্গীত পাকা ফসলের গান—পৌষের ডাক। এই গান মরা সোনার রাজ্য হইতে রাজাকে পাকা সোনার দেশে আকর্ষণ করিতে চায়।

নন্দিনী ও নেপথ্য রাজার কথোপকথনের সময় গানটির কয়েক পংক্তি শ্রুত হয়। গানটির এই কয় পংক্তি যেন বদ্ধ আত্মাকে অসীমের আহ্বান শুনাইল—

মাঠের বাঁশি শুনে শুনে আকাশ খুশি হল—
ঘরেতে আজ কে রবে গো ? খোলো দুয়ার খোলো (পৃ-১৩)

অসীমের আহ্বানে বাহির হইয়া আসার জন্য তাহার সৌন্দর্য চেতনা জাগ্রত করার চেষ্টাও হইয়াছে—

আলোর খুশি উঠল জেগে
ধানের শিষে শিশির লেগে,
ধরার খুশি ধরে না গো, ওই-যে উথলে,
মরি, হায় হায় হায়। (পৃ-১৪)

গানের পরবর্তী কয়েকটি পংক্তি রবীন্দ্রনাথ দিয়াছেন বিশুর কণ্ঠে। অনেক মূল্য দিয়া তবে ফল পাইতে হয়। আত্মার মুক্তির জন্য দুঃখের মূল্য দিতে হয়। কোন কিছুতে প্রতিফলিত করিয়া তবেই মানুষ নিজের মুখ দেখিতে পায়। সেইজন্য দুঃখ-স্বরূপ বিশুর কণ্ঠে গানটির এই ইঙ্গিতপূর্ণ পংক্তি কয়টি রবীন্দ্রনাথ দিয়াছেন—

শেষ ফলনের ফসল এবার
কেটে লও, বাঁধো আঁটি—
বাকি যা নয় গো নেবার
মাটিতে হোক তা মাটি। (পৃ-৮১)

অনেক কিছুই মাটিতে মাটি হইয়া যাইবে—তাহা না হইলে ফসলের আঁটি বাঁধা সম্ভব নয়।

গানের শেষ পংক্তি কয়টি একেবারে শেষের পৃষ্ঠায় দেওয়া হইয়াছে।

আত্মা তখন সম্পূর্ণ মুক্ত। গানের এই পংক্তি কয়টিও তাহা বুঝাইয়া দিয়াছে—

ধুলার আঁচল ভরেছে আজ পাকা ফসলে,
মরি হায় হায় হায়। (পৃ-১০৫)

অসীমের আহ্বান শুনিয়া আত্মা বাহির হইয়া আসিয়াছিল বলিয়াই 'ধুলার আঁচল'ও 'পাকা ফসলে' পরিপূর্ণ হইয়া গেল। কি নাট্যকলা, কি তত্ত্বের দিক দিয়া এই পাকা ফসলের গানটি অপূর্ব।

একটি দৃশ্যেই সমস্ত নাটকটি অভিনীত হইবে। রূপক নাটক অভিনয়ে ইহাই প্রায়াজন, রবীন্দ্রনাথ সার্থকরূপেই সেই প্রয়োজন সাধন করিয়াছেন— "ঘটনাস্থলটির প্রকৃত নামটি কী সে সম্বন্ধে ভৌগোলিকদের মতভেদ থাকা সম্ভব। কিন্তু সকলেই জানেন, এর ডাকনাম যক্ষপুরী। পণ্ডিতরা বলেন, পৌরাণিক যক্ষপুরীতে ধনদেবতা কুবেরের স্বর্ণসিংহাসন। কিন্তু এ নাটকটি একেবারেই পৌরাণিক কালের নয়, একে রূপকও বলা যায় না। যে জায়গাটার কথা হচ্ছে সেখানে মাটির নীচে যক্ষের ধন পোঁতা আছে" (নাট্যপরিচয়)। সুতরাং নাটকের একটিমাত্র দৃশ্য যক্ষপুরীতেই উদ্‌ঘাটিত। এই যক্ষপুরীর সামাজিক ব্যবস্থা অর্থাৎ এই ব্যবস্থার মানসিক অবস্থার বিরোধী ভাবকে কেন্দ্রীভূত করিবার জন্য অন্য কোন দৃশ্যের অবতারণা করা যায় নাই। একটি দৃশ্যের মধ্যেই যক্ষপুরীর বিরোধী ভাবটিকে লেখক স্থাপন করিতে বাধ্য হইয়াছেন। চন্দ্রা-ফাগুলাল-বিশুর কথায় এই বিরোধী ভাবের আভাস আছে কিন্তু তাহাতে দৃঢ়তা নাই, যক্ষপুরীর ব্যবস্থার প্রতিদ্বন্দ্বী তাহা হইতে পারে না। আকাশে-বাতাসে রঞ্জনের বার্তা, নন্দিনীর প্রশান্ত দৃঢ়তা এবং এই পৌষের নেপথ্য সঙ্গীত সেই বিরোধকে সংহত করিয়াছে।

নাটকের দ্বন্দ্বের ইঙ্গিত দিতে গিয়া রবীন্দ্রনাথ 'প্রস্তাবনায়' বলিয়াছেন, "কর্ষণজীবী এবং আকর্ষণজীবী এই দুই-জাতীয় সভ্যতার মধ্যে একটা বিষম দ্বন্দ্ব আছে, এ সম্বন্ধে বন্ধুমহলে আমি প্রায়ই আলাপ করে থাকি। কৃষিকাজ থেকে হরণের কাজে মানুষকে টেনে নিয়ে কলিযুগ কৃষিপল্লীকে কেবলই উজাড় করে দিচ্ছে। তা ছাড়া শোষণজীবী সভ্যতার ক্ষুধাতৃষ্ণা দ্বেষহিংসা বিলাসবিভ্রম সুশিক্ষিত রাক্ষসেরই মতো।" নাটকে সেই আকর্ষণজীবী মকররাজের যক্ষপুরীকেই দেখান হইয়াছে, অপরদিকে কর্ষণজীবীদের প্রতিভূ

করা হইয়াছে নন্দিনীকে। নন্দিনীর পরণে সেইজন্যই ধানী রঙের সাড়ী—মরা সোনার তালের প্রতিদ্বন্দ্বী পাকা সোনার ধান। এই দ্বন্দ্ব সৃষ্টিতেই পৌষের গানটি বিশেষ স্থান পাইয়াছে। তাহা অনুপস্থিত কর্ষণজীবীদের এবং যক্ষপুরীর সংখ্যায় পরিণত হওয়া মানুষগুলির অবচেতন মনের দীর্ঘনিঃশ্বাস ব্যতীত আর কিছুই নয়—বেদনাদীর্ণ দীর্ঘনিঃশ্বাস মাটি হইতে উঠিয়া আসা সঙ্গীতরূপে উৎসারিত হইয়াছে। অতি সুকৌশলে রবীন্দ্রনাথ নাটকের দ্বন্দ্বটি ফুটাইয়া তুলিয়াছেন।

এইখানে একটি কথা স্মরণ রাখিতে হইবে। আকর্ষণজীবী এবং কর্ষণজীবীদের সংঘাত সৃষ্টি করিয়া ইহাদেরই কোন একটির জয় ঘোষণা করার উদ্দেশ্যে এই নাটক রচনা নয়। সমাজে আজ যে দুইটি ব্যবস্থা দৃষ্টিগোচর হয় তাহাদের মধ্যে সংঘর্ষ সৃষ্টি করিয়া সমস্যা সমাধানের জন্য কোথায় 'হাত লাগাইতে' হইবে তাহা তিনি দেখাইয়াছেন। বিজ্ঞান বলে, যদি একটি বস্তুকে দুইটি শক্তি দুই দিকে আকর্ষণ করে (যদি ঠিক বিপরীতমুখী আকর্ষণ না হয়) তবে বস্তুটি একটি তৃতীয় পথে চলে। রবীন্দ্রনাথ যেন কতকটা তাহাই বলিয়াছেন এই নাটকে। নাটকের পটভূমিকায় আছে দুইদিকের আকর্ষণ—আর সমস্যার সমাধান অন্যত্র। সমাধানের যে ইঙ্গিত তিনি করিয়াছেন তাহা অবশ্য সর্বকালের সর্বসমস্যাই সমাধান করিতে পারে। তত্ত্ব আলোচনা কালে তাহা আমরা দেখিব।

এই সূত্রে নাটকের নামের পরিবর্তনের ধারাটি একবার বিচার করিয়া দেখা যাইতে পারে। 'যক্ষপুরী' নামটি যে কেবল কবির রহস্যময় মনকে তৃপ্তি দিতে পারে নাই তাহাই নহে, তত্ত্বের দিক দিয়াও এই নামটি অসার্থক। নাটকের পটভূমিকায় আছে যক্ষপুরী—যক্ষপুরীতে মানুষ তাহার মানবত্ব হারাইয়া সংখ্যায় পরিণত হয়। কিন্তু ইহা দেখানই লেখকের উদ্দেশ্য নয়। রবীন্দ্রনাথ বরং এখানে বিপরীত কথাই বলিয়াছেন: সর্দাররা যাহাদের পিঠের কাপড়ে দাগিয়া দিয়া সংখ্যায় পরিণত করিতে চলিয়াছে রবীন্দ্রনাথ তাহাদেরই নামগুলি যত্নের সঙ্গে বসাইয়াছেন; আর যাহারা দাগিয়াছে তাহারাই কেবল 'সর্দার' আর 'মোড়ল' হইয়াই রহিয়াছে। সুতরাং নাটকের পটভূমিকায় যক্ষপুরী থাকিলেও লেখকের বক্তব্য তাহাকে ছাড়াইয়া গিয়াছে। তাই এই নামটি অচল বুঝিয়া তিনি নাটকের নাম রাখেন 'নন্দিনী'। কিন্তু এই নামটির জীবনী শক্তিও বেশী ছিল না, ছাপার

অক্ষরে এই নামটি আত্মপ্রকাশের সুযোগ পায় নাই। 'নন্দিনী' নামটি 'যক্ষপুরী' নাম অপেক্ষা অধিকতর সার্থক সন্দেহ নাই। নন্দিনী চরিত্রে একটা রহস্যময়তা আছে, যক্ষপুরী নামটিতে তাহা নাই। আকর্ষণ-জীবীদের সৃষ্ট এই যক্ষপুরী, নন্দিনী সৌন্দর্য স্বরূপিণী এবং কর্ষণজীবীদের প্রতিনিধিত্বও কিছুটা করিয়াছে। এই নাটকে আকর্ষণজীবী অপেক্ষা কর্ষণজীবীদের প্রতিই রবীন্দ্রনাথের মনের টান বেশী তাহাও অনুভূত হইয়াছে। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও কর্ষণজীবীদের জয় ঘোষণা করাই এই নাটকের উদ্দেশ্য নয়। সুতরাং নন্দিনী নামটি যক্ষপুরী নাম অপেক্ষা সার্থকতর হইলেও রবীন্দ্রনাথের মূল বক্তব্যের দ্যোতনা করে না।

নন্দিনীর আর একটি রূপ আছে—সেই রূপের সহিত রক্তকরবীর ঘনিষ্ঠ যোগ। সেই রূপটির সঙ্কেত করাই নাটকের উদ্দেশ্য। 'রক্তকরবী' সংগ্রামশীল জীবনের পরিচায়ক। প্রাণশক্তি কখনো মরে না—'হাজার বাঁধনে বেঁধেও, শত চাপা দিয়েও প্রাণকে কে কবে মারতে পেরেছে? আমার ঘরের কাছে একটি লোহালক্কড়-জাতীয় আবর্জনার স্তূপ ছিল। তার নীচে একটা ছোট্ট করবীগাছ চাপা পড়েছিল। ওটা চাপা দেবার সময়ে দেখতে পাইনি, পরে লোহাগুলি সরিয়ে আর চারাটুকুর খোঁজ পাওয়া গেল না। কিছুকাল পরে হঠাৎ একদিন দেখি ঐ লোহার জালজঞ্জাল ভেদ ক'রে একটি সুকুমার করবীশাখা উঠেছে একটি লাল ফুল বুকে করে। নিষ্ঠুর আঘাতে যেন তার বুকের রক্ত দেখিয়ে সে মধুর হেসে প্রীতির সম্ভাষণ জানাতে এল। সে বললে, ভাই মরি নি তো, আমাকে মারতে পারলে কই? তখন আমার মনের মধ্যে এই বিষয়ের প্রকাশ বেদনা দিল! নাটকটাকে তাই 'যক্ষপুরী' 'নন্দিনী' প্রভৃতি বলে আমার মন তৃপ্ত হয়নি, তাই নাম দিলাম 'রক্তকরবী' (প্রমথনাথ বিশী: রবীন্দ্র নাট্যপ্রবাহ: ২য় খণ্ড: পৃ-১৮০)। অমর প্রাণশক্তির পরিচয়ই দেওয়া হইয়াছে এই নাটকে; বলা হইয়াছে, নানা বাঁধনে বাঁধিয়াও আত্মার স্বাধীনতা অপহরণ করা যায় না, সে নিজের পরিচয় দিবেই। সেই জন্যই 'রক্তকরবী' নাম সার্থক। রবীন্দ্রনাথের এই নাম পরিবর্তনের মনোভাবটি বুঝিলেই 'রক্তকরবী'র তত্ত্বটিও সহজে বোধগম্য হইবে।

যন্ত্রদানবকে আঘাত দিবার জন্য রবীন্দ্রনাথ যাহাদের সৃষ্টি করিয়াছেন

তাহাদের মধ্যে নন্দিনীই প্রধান। সমস্ত বাধার মধ্যে একক একটি নারীকে দুর্জয় শক্তির বিরোধী করিয়া দাঁড় করান খুবই আশ্চর্য ব্যাপার সন্দেহ নাই। নারীকে রবীন্দ্রনাথ কিরূপে দেখিয়াছেন তাহা বুঝিলে অবশ্য ইহাকে আর আশ্চর্য ব্যাপার বলিয়া মনে হইবে না। নন্দিনী ব্যতীত এই নাটকে আর যে সব নারী আছে তাহাদের মধ্যে চন্দ্রাকে কিছু স্পষ্ট করিয়া জানার সুবিধা হইয়াছে। সর্দারনীদের পরিচয় সঠিক না পাইলেও তাহাদের জীবনের মূল আকাঙ্ক্ষার পরিচয়টি রবীন্দ্রনাথ দিয়াছেন। আর একটি অপরিচিতার কথাও আছে যে বিশুকে টানিয়া আনিয়াছে যক্ষপুরীতে। অধিকতর পরিচিত চন্দ্রার পরিচয়টি প্রথমে গ্রহণ করা যাক—

চন্দ্রা

যাই বল বিশুবেয়াই, যক্ষপুরীতে এসে তোমরাই মজেছ।—আমাদের মেয়েদের তো কিছু বদল হয় নি।

বিশু

হয় নি তো কী? তোমাদের ফুল গেছে শুকিয়ে, এখন 'সোনা' 'সোনা' করে প্রাণটা খাবি খাচ্ছে।

চন্দ্রা

কখ্‌খনো না।

বিশু

আমি বলছি—হাঁ। ওই-যে ফাগু হতভাগা বারো ঘণ্টার পরে আরো চার ঘণ্টা যোগ ক'রে খেটে মরে, তার কারণটা ফাগুও জানে না তুমিও জান না। অন্তর্যামী জানেন। তোমার সোনার স্বপ্ন ভিতরে-ভিতরে ওকে চাবুক মারে, সে চাবুক সর্দারের চাবুকের চেয়েও কড়া।

চন্দ্রা

আচ্ছা বেশ, তা, চলো-না কেন, এখান থেকে দেশে ফিরে যাই।

বিশু

সর্দার কেবল যে ফেরবার পথ বন্ধ করেছে তা নয়, ইচ্ছেটা-সুদ্ধ আটকেছে। আজ যদি বা দেশে যাও টিকতে পারবে না, কালই সোনার নেশায় ছুটে ফিরে আসবে, আফিম-খোর পাখি যেমন ছাড়া পেলেও খাঁচায় ফেরে। (পৃ-২৭)।

রবীন্দ্রনাথের দুঃখ এইখানেই বেশী। নারী যদি নিজেকে ভোলে তাহা হইলে সংসারের কল কিছুতেই সুষ্ঠুভাবে চলিতে পারে না। নারীর কাজই হইল পুরুষের কাজের মধ্যে আনন্দ ঢালিয়া দেওয়া, "নারীর ভিতর দিয়ে বিচিত্র রসময় প্রাণের প্রবর্তনা যদি পুরুষের উদ্যমের মধ্যে সঞ্চারিত হবার বাধা পায় তা হলেই তার সৃষ্টিতে যন্ত্রের প্রাধান্য ঘটে। তখন মানুষ আপনার সৃষ্ট যন্ত্রের আঘাতে কেবলই পীড়া দেয়, পীড়িত হয়" (যাত্রী : পশ্চিমযাত্রীর ডায়ারি)। ইউরোপে নারীর রূপ দেখিয়া রবীন্দ্রনাথ চিন্তিত হইয়াছিলেন,—

"...in the woman of the Western world a certain restlessness is noticed which cannot be the normal aspect of her nature. For women who want something special and violent in their surroundings to keep their interests active only prove that they have lost touch with their own true world". (Personality : Woman : p-174). নারীই সামাজিক ভারসাম্য রক্ষা করিতে পারে : পুরুষের কাজের মধ্যে তাই তাহারও করণীয় কিছু আছে—

"She must restore the lost social balance by putting the full weight of the woman into the creation of the human world... woman must come into the bruised and maimed world of the individual" (Ibid : p-181).

কারণ আত্মিক জগতের সৃষ্টি কার্যে তাহারই দক্ষ : প্রেমের মন্ত্রে সঞ্জীবিত তাহারাই কাৎতে পারে—

"Woman can bring he- fresh mind and all her power of sympathy to this new task of building up a spiritual civilization, if she will be conscious of her responsibilities" (Ibid : p-183).

যক্ষপুরীতে যে বিপর্যয় তাহার মূলে কেবল যন্ত্রের দাপটই নয়—নারীর অক্ষমতাও কাজ করিয়াছে। চন্দ্রা এমন কি সর্দারনীরা পর্যন্ত কেহ যক্ষপুরীর ব্যবস্থার প্রতিবাদ করে না। শিশুর ন্যায় মানুষকেও যক্ষপুরীর সুড়ঙ্গ খোদার কাজে টানিয়া আনিয়াছে একজন মেয়ে, "একজন মেয়ে। হঠাৎ তীর খেয়ে উড়ন্ত পাখি যেমন মাটিতে প'ড়ে যায়, সে আমাকে তেমনি করে এই ধুলোর মধ্যে এনে ফেলেছে" (পৃ-৪১)। সর্দারনীরা চেহারার চাকচিক্য আর সাজ লইয়াই ব্যস্ত। এই অবস্থায় সমাজে অভিশাপ লাগিবেই।

নারী যখন তাহার কল্যাণী মূর্তি হারায় তখন মানুষ তাহার সত্য পরিচয় ভোলে—তখনই সমাজে ভেদ দেখা যায়; শ্রেণীতে শ্রেণীতে মানুষ বিভক্ত হইয়া পড়ে। অত্যাচারীর রক্ত চক্ষুর মত্ততায় এবং অত্যাচারিতের অশ্রুজলে তখন পৃথিবী পরিপূর্ণ হইয়া ওঠে। রবীন্দ্রনাথ এই কথাটাই জোর দিয়া বলিতে চাহিয়াছেন যে কেবল যন্ত্রের সাধ্য নাই সমাজকে বিকৃত করিয়া তোলে।

নারীর দুর্বলতার সুযোগে সমাজে বিকৃতি আসে আবার 'তাহারই প্রেরণায় সমাজ নূতন রূপ পাইবার জন্য দুঃখ বরণ করিয়া লয়। সেই সত্যও রবীন্দ্রনাথ উদ্‌ঘাটিত করিয়াছেন এই নাটকে। নন্দিনী সেই নারী যে তাহার সৌন্দর্যের দ্বারা, সহনশীলতার দ্বারা পুরুষকে ধীরে ধীরে আকর্ষণ করিয়া সত্য পথ দেখাইয়াছে। রবীন্দ্রনাথ সেইজন্যই বলিয়াছেন, "এমন সময়ে সেখানে নারী এল, নন্দিনী এল; প্রাণের বেগ এসে পড়ল যন্ত্রের উপর, প্রেমের আবেগ আঘাত করতে লাগল লুব্ধ দুশ্চেষ্টার বন্ধনজালকে। তখন সেই নারীশক্তির নিগূঢ় প্রবর্তনায় কী করে পুরুষ নিজের রচিত কারাগারকে ভেঙে ফেলে প্রাণের প্রবাহকে বাধামুক্ত করবার চেষ্টায় প্রবৃত্ত হল এই নাটকে তাই বর্ণিত আছে"। (যাত্রী : পশ্চিম যাত্রীর ডায়ারি)। সমাজকে সুস্থ করিবার জন্যই নন্দিনীর সৃষ্টি। তাই নন্দিনী চরিত্রই এখানে প্রধান। লেখকের কথায় বলা যায়, "রক্তকরবীর সমস্ত পালাটি নন্দিনী ব'লে একটি মানবীর ছবি। চারি দিকের পীডনের ভিতর দিয়ে তার আত্মপ্রকাশ" (প্রস্তাবনা : রক্তকরবী : পৃ-১১০)।

'রক্তকরবী' নাটকে নানাভাবে একটি সত্য উদ্‌ঘাটিত করা হইয়াছে। ইহার মূল কথা, মানুষের মুক্তি চাই। পুরুষের শক্তি যেখানে যন্ত্রের সৌধ তৈয়ারী করে সেখানে সমস্ত ব্যবস্থার পতন অবশ্যম্ভাবী,—

"The masculine creations of intellectual civilization are towers of Babel, they dare to defy their foundations and therefore topple down over and over again." (Personality : Woman ; p-171).

যে যন্ত্র মানুষকে যন্ত্র মাত্র করে তাহার ধ্বংস হইবেই। সুতরাং সামগ্রিক-ভাবে মানুষের অন্তর বিশুষ্ক হইলেও তাহার মুক্তি অবশ্যই মিলিবে। নারীর বিকৃতির পথেও সেই একইরূপ অনাচার সমাজে দেখা দেয় : আবার

সচেতন নারী শক্তিই সমাজকে সুন্দর করিয়া তোলে। নন্দিনী সেই নারী। রবীন্দ্রনাথ নারীর এই রূপের সম্বন্ধেই বলিয়াছেন—

"Woman's function is the passive function of the soil, which not only helps the tree to grow but keeps its growth within limits." (Ibid : p-172).

নারী বসুন্ধরারই ন্যায়ঃ লেখকের সেই উদ্দেশ্যকে তাৎপর্যমণ্ডিত করিয়া তুলিয়াছে নাটকটির নেপথ্য সঙ্গীত—পাকা ফসলের গান, পৌষের ডাক। নন্দিনী ধানী রঙের সাড়ী পরে—নন্দিনী মূর্তিমতী সৌন্দর্য।

নন্দিনী কথাটি আসিয়াছে 'নন্দ্' হইতে। কন্যা আনন্দ দেয় বলিয়াই নন্দিনী। আমাদের স্নেহ-প্রীতির দৃষ্টিতে কন্যা সুন্দর বলিয়াই আনন্দ দেয়। আবার নন্দনতত্ত্ব বলিতে সৌন্দর্যতত্ত্বই বোঝায়। সুতরাং নন্দিনী সৌন্দর্যের প্রতীক। সৌন্দর্য সকল মানুষের মনকেই স্পর্শ করে। রবীন্দ্রনাথ প্রথম হইতেই তাহা 'রক্তকরবীর' পাঠকদের বুঝাইয়া দিয়াছেন।

নাটকের আরম্ভ কিশোর ও নন্দিনীকে লইয়া। কিশোর মন সুন্দরকে জানে, কারণ সুন্দরকে চিনাইয়া দিবার জন্য কোন জ্ঞানের আলোকের প্রয়োজন হয় না। সহজ সরল মন থাকিলেই সৌন্দর্য চেতনা হয়—অশুচি মন লইয়া সুন্দরকে দেখা যায় না—"পৌষ্যরাজা ঋষিকুমার উতঙ্ককে কহিলেন, "যাও অন্তঃপুরে যাও, সেখানে মহিষীকে দেখিতে পাইবে। উতঙ্ক অন্তঃপুরে গেলেন, কিন্তু মহিষীকে দেখিতে পাইলেন না। অশুচি হইয়া কেহ সতীকে দেখিতে পাইত না; উতঙ্ক তখন অশুচি ছিলেন।" (সাহিত্য : সৌন্দর্যবোধ)। প্লটিনাশও বলিয়াছেন—

"The soul must purify itself, in order to perceive the beautiful" (Plotinus).

কিশোরের সুন্দর মন তাই সে সুন্দরকে বুকের মধ্যে পাইয়াছে। সেইজন্য বারবার সে নন্দিনীকে ডাকে, বলে, "শুনতে পাস জানি, কিন্তু আমার যে ডাকতে ভাল লাগে" (পৃ-১)। সোনার তাল দেখিয়া তাহার লোভ হয় না। যে সৌন্দর্যের সন্ধান পাইয়াছে সে বিশ্বের অখণ্ড স্বরূপকে বুঝিয়াছে, সুতরাং খণ্ড বস্তুর উপর তাহার লোভ থাকিতেই পারে না। কিশোর তাই যৌবনের পূর্ববর্তী কৈশোরেরই প্রতীক। সেই জন্যই তো যৌবন এবং আনন্দের স্বরূপ রঞ্জনকে সন্ধান করিয়া বাহির করিবার ভার তাহাকেই

দেওয়া হয়, "না কিশোর, এখনো ধরা পড়লে চলবে না। একটা বিপদের কাজ করবার আছে। রঞ্জন এখানে এসেছে, যেমন করে পারিস তাকে বের করতে হবে। সহজ নয়। (পৃ-৮০)। কৈশোরই যৌবনের সন্ধান রাখে। কিন্তু কিশোরের পক্ষে যৌবনের সন্ধান সহজও নয়—কারণ কৈশোরের মৃত্যুর ভিতর দিয়াই যৌবনের আগমন হয়, যৌবনের হাতে জয় পতাকা দিয়া তবেই সে মৃত্যু বরণ করে—

নন্দিনী

আহা, এই-যে ওর হাতে সেই আমার রক্ত করবীর মঞ্জরী! তবে তো কিশোর ওকে দেখেছিল। সে কোথায় গেল? রাজা, কোথায় সেই বালক?

রাজা

কোন্ বালক?

নন্দিনী

যে বালক এই ফুলের মঞ্জরি রঞ্জনকে এনে দিয়েছিল।

রাজা

সে যে অদ্ভুত ছেলে। বালিকার মতো তার কচি মুখ, কিন্তু উদ্ধত তার বাক্য। সে স্পর্ধা করে আমাকে আক্রমণ করতে এসেছিল।

নন্দিনী

তার পরে? কী হল তার? বলো, কী হল? বলতেই হবে, চুপ ক'রে থেকো না।

রাজা

বুদ্‌বুদের মতো সে লুপ্ত হয়ে গেছে। (পৃ-৯৭-৯৮)

কৈশোরের শুভ্রতার প্রতীক কিশোব সেই জন্যই সৌন্দর্যের ধ্যানে আত্ম সমাহিত। তাই দেখি যে দেহবোধ তাহার অনেকটাই কমিয়া আসিয়াছে—যক্ষপুরীর জানোয়ারদের দেওয়া শাস্তি তাহার লাগে না। আর বেদনা বোধের জন্য দুঃখই বা কি? সে তো সুখের অভিলাষী নয়—সে আনন্দের পূজারী। দুঃখের তাপ না লাগিলে আনন্দের সোনা কি উজ্জ্বল হয়! তাই সে শাস্তির কথা শুনিয়া অনায়াসেই বলে, "সেই ব্যথায় আমার ফুল আরো বেশি করে আমারই হয়ে ফোটে। ওরা হয় আমার দুঃখের ধন" (পৃ-২)। সৌন্দর্য সাধনার জন্য পূজা দিতে হইবে, নিজের হাতে সৌন্দর্যলক্ষ্মীর প্রিয়

জিনিসটি দিতে হয়। এই নাটকে যে সৌন্দর্যলক্ষ্মীকে রবীন্দ্রনাথ সৃষ্টি করিয়াছেন তাহার ভূষণ রক্তকরবী ফুল। কিশোর যক্ষপুরীতে একটি রক্তকরবী গাছের সন্ধান পাইয়াছে। যক্ষপুরীর ইট-পাথর লোহা-লক্কড়ের মধ্যেও এই গাছটির না ফুটিয়া উপায় ছিল না। কিশোরের সৌন্দর্য সাধনা এই গাছটির জন্ম দিয়াছে। সেই পরম সত্তার আনন্দ হইতেই পৃথিবীর যাবতীয় কিছু সৃষ্টি হইয়াছে, "আনন্দাদ্ধ্যের খল্লিমানি ভূতানি জায়ন্তে"—কিশোরের আনন্দ হইতেও সেইরূপ রক্তকরবী গাছটির জন্ম হইয়াছে: একমাত্র সে-ই তাহার সন্ধান রাখে, "তুমি যে বলেছিলে, রক্তকরবী তোমার চাই-ই চাই। আমার আনন্দ এই যে, রক্তকরবী এখানে সহজে মেলে না। অনেক খুঁজে পেতে এক জায়গায় এখানকার জঞ্জালের পিছনে একটিমাত্র গাছ পেয়েছি" (পৃ-২)। এই গাছের ফুল তাহার নিজস্ব। নিজের হাতে তাহা তুলিয়া আনিয়া সে তাহার অন্তরের পূজা সমাধা করে। সাধারণ মানুষ বুঝিতেও পারে না কিশোর-জাতীয় মানুষেরা কিসের বিনিময়ে আত্মবিসর্জন দিয়া এইরূপ পূজা করে: ভোগের সমস্ত উপকরণ তুচ্ছ করিয়া কিসের প্রেরণায় স্বেচ্ছায় দুঃখ বরণ করিয়া ইহারা হাস্যমুখে সৌন্দর্যের পূজারী হয়। সাধারণ মানুষের সেই প্রশ্নটিই রবীন্দ্রনাথ নন্দিনীর মুখে বসাইয়াছেন—

নন্দিনী

তুই তো আমাকে এত দিলি, তোকে আমি কী ফিরিয়ে দেব বল্ তো কিশোর!

কিশোর

এই সত্যটি কর্ নন্দিনী, আমার হাত থেকেই রোজ সকালে ফুল নিবি।

নন্দিনী

আচ্ছা, তাই সই। কিন্তু তুই একটু সামলে চলিস।

কিশোর

না, আমি সামলে চলব না, চলব না। ওদের মারের মুখের উপর দিয়েই রোজ তোমাকে ফুল এনে দেব। (পৃ-৩)।

আত্মবিসর্জনের আকাঙ্ক্ষাটিকে বাহির হইতে বুঝিবার উপায় নাই। ইহা অন্তরের জিনিস। পরিপূর্ণতার প্রতি মানুষের যে আকাঙ্ক্ষা আছে এখানে তাহারই পরিচয় পাই। সৌন্দর্যের মধ্যে বিষম কিছুই নাই—

"Beauty consisted in relation ; relation of tone, colour, line, thought and will" (Herbert : ১৫৮৩-১৮৪৮).

অথবা এরিস্টোট্‌ল্-এর কথায়—

"Beautiful is the good ; it is in bigness and order".

কিশোরের সংযত সামঞ্জস্য পূর্ণ মন সৌন্দর্যের ভিতরকার সামঞ্জস্যের প্রতি স্বাভাবিক ভাবেই আকৃষ্ট হইয়াছিল। সুতরাং কিশোর চরিত্রের আলোকে আমরা নন্দিনীর স্বরূপটিও দেখিয়া লইলাম। সে সৌন্দর্য এবং জীবনের প্রতীক।

অধ্যাপকও এই দিকেই ইঙ্গিত করেন, "ক্ষণে ক্ষণে অমন চমক লাগিয়ে চলে যাও কেন?" (পৃ-৩)। বস্তুতত্ত্ববিদ্ অধ্যাপকের নীরস জ্ঞানের মধ্যেও সৌন্দর্যের স্পর্শ আসিয়া লাগিতেছে, তাই পাণ্ডিত্যের জালের পিছনে থাকিয়াও তিনি বলেন, "এসো আমার ঘরে, তোমাকে নিয়ে একটু সময় নষ্ট করতে দাও" (পৃ-৫)। চন্দ্রা বিশুর সম্পর্কে হতাশ হইয়া বলে, "ওকে নন্দিনীতে পেয়েছে—সে ওর প্রাণ টেনেছে, গানও টেনেছে" (পৃ-২২)। ফাগুলালকেও সে সাবধান করিয়া দেয়, "আমি বেশ দেখতে পাচ্ছি, তোমাদের উপরে ওই নন্দিনীর হাওয়া লেগেছে" (পৃ-৩৩)। সর্দারদের অবস্থাও প্রায় একই—

সর্দার

তোমাকে বিশ্বাস করিনে ; আমি জানি, তোমার চোখে নন্দিনীর ঘোর লেগেছে।

মেজো সর্দার

কিন্তু তুমি জানো না যে, তোমার চোখেও কর্তব্যের রঙের সঙ্গে রক্ত করবীর রংও কিছু যেন মিশেছে—তাতেই রক্তিমা এতটা ভয়ংকর হয়ে উঠল।

সর্দার

তা হবে, মনের কথা মন নিজেও জানে না। তুমি চলে এসো আমার সঙ্গে। (পৃ-৮৮)

স্বয়ং রাজাও জালের অন্তরালে অবস্থান করা সত্ত্বেও নিস্পৃহ থাকিতে পারেন নাই। তিনি হাত বাড়াইয়া নন্দিনীকে স্পর্শ করিতে চাহেন। নন্দিনীর চুলের রাশি স্পর্শ করিয়া তিনি অভিভূত হইয়াছিলেন, "সামনে তোমার মুখে চোখে প্রাণের লীলা, আর পিছনে তোমার কালো চুলের

ধারা। মৃত্যুর নিস্তব্ধ ঝর্না। আমার এই হাতদুটো সেদিন তার মধ্যে ডুব দিয়ে, মরবার আরাম পেয়েছিল। মরণের মাধুর্য আর কখনো এমন করে ভাবি নি। সেই গুচ্ছ গুচ্ছ কালো চুলের নীচে মুখ ঢেকে ঘুমোতে ভারী ইচ্ছে করছে" (পৃ ঃ ৫৩-৫৪)।

সৌন্দর্যের সাধনায় মৃত্যুর দুঃখকে বরণ করিতে হইতে পারে এবং ভোগের জগতে মৃত্যু ভিন্ন সৌন্দর্য সাধনায় সিদ্ধিলাভ সম্ভব নহে—তাই নন্দিনীর মুখে চোখে প্রাণের লীলা, আর কালো চুলের ধারায় মৃত্যুর ঝরণা। সুতরাং রবীন্দ্রনাথ স্পষ্টরূপেই দেখাইয়াছেন যে সকলকেই, এমন কি,আকর্ষণজীবীদেরও নন্দিনীতে পাইয়াছে। যে গোকুল মানুষের স্তর হইতে নামিয়া আসিয়াছে সেও বলে, "একটা কী মন্তর তোমার আছে। ফাঁদে ফেলছ সবাইকে। সর্বনাশী তুমি! তোমার ওই সুন্দর মুখ দেখে যারা ভুলবে তারা মরবে" (পৃ-১০)। সুন্দরের এমনি শক্তি ; সে সংযমের দিকে টানে। মানুষের ভিতরের পশুটাকে সে নাড়া দেয়—"সৌন্দর্যই তাঁহার আহ্বান গান। সৌন্দর্যই সেই দৈববানী।—সে কেবল বলিতেছে, "রাধে, তুমি আমার"—আর কিছুই না। আমরা শুনিতেছি, সেই অসীম সৌন্দর্য অব্যক্ত কণ্ঠে আমাদেরই নাম ধরিয়া ডাকিতেছিল। তিনি বলিতেছেন—"তুমি আমার, তুমি আমার কাছে আইস। এইজন্য আমাদের চারিদিকে যখন সৌন্দর্য বিকশিত হইয়া উঠে, তখন আমরা যেন একজন-কাহার-বিরহে কাতর হই, যেন একজন-কাহার-সহিত মিলনের জন্য উৎসুক হই" (আলোচনা ঃ বাঁশীর স্বর ঃ পৃ ঃ ১৩০-১৩১)। এইখানেই সৌন্দর্যের শক্তি। অসীম অনন্ত তাহারই মাধ্যমে যক্ষপুরীর বিকৃত নিয়মকে অস্বীকার করিয়া আঘাত হানিয়াছে। যক্ষপুরীর এই নিয়ম বিকাশের নিয়ম নয়—এই নিয়ম বিনষ্টির জন্য। ইহা সৌন্দর্যের লীলা ভূমিকে ধ্বংস করিয়া যন্ত্রের সমৃদ্ধি করে ঃ মানুষের জগৎকেও খণ্ডিত করিয়া অল্প সংখ্যকের ভোগের বিলাস ভূমিতে পরিণত করে—

অধ্যাপক

রাজাকে তো দেখেছ? তার মূর্তি দেখে শুনছি নাকি তোমার মন মুগ্ধ হয়েছে?

নন্দিনী

হয়েছে বৈকি। সে যে অদ্ভুত শক্তির চেহারা।

অধ্যাপক

সেই অদ্ভুতটি হল যার জমা, এই কিম্ভূতটা হল তার খরচ।, ওই ছোটোগুলো হতে থাকে ছাই, আর ওই বড়োটা জ্বলতে থাকে শিখা। এই হচ্ছে বড়ো হবার তত্ত্ব।

নন্দিনী

ওতো রাক্ষসের তত্ত্ব। (পৃ-৬৭)

এই রাক্ষসের তত্ত্বের বিরুদ্ধেই নন্দিনীর সংগ্রাম। কারণ মানুষ তো রাক্ষস নয়।

একদিন যখন মানুষ সভ্যতার আলোক পায় নাই তখন তাহার মনোভাব হয়ত' রাক্ষসের ন্যায়ই ছিল। সে অবস্থা হইতে তাহাকে উচ্চতর সভ্যতার জগতে টানিয়া তুলিয়াছে তাহার ক্রম জাগ্রত সৌন্দর্যবোধ। কলকারখানাই তাহাকে সভ্য করে নাই, সভ্য করিয়াছে তাহার সৌন্দর্য-চেতনা এবং শুচিবোধ—"আর সকলে বলের দ্বারা অবিলম্বে নিজের ক্ষমতা বিস্তার করিতে চায়, সৌন্দর্য কেবল চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া থাকে আর কিছুই করে না। সৌন্দর্যের কি অসামান্য ধৈর্য। এমন কতকাল ধরিয়া প্রভাতের পরে প্রভাত আসিয়াছে, পাখীর পরে পাখী গাহিয়াছে, ফুলের পরে ফুল ফুটিয়াছে, কেহ দেখে নাই; কেহ শোনে নাই। যাহাদের ইন্দ্রিয় ছিল কিন্তু অতীন্দ্রিয় ছিল না, তাহাদের সম্মুখেও জগতের সৌন্দর্য উপেক্ষিত হইয়াও প্রতিদিন হাসিমুখে আবির্ভূত হইত। তাহারা গানের শব্দ শুনিত মাত্র, ফুলের ফোটা দেখিত মাত্র। সমস্তই তাহাদের নিকটে ঘটনামাত্র ছিল। কিন্তু প্রতিদিন অবিশ্রাম দেখিতে দেখিতে, অবিশ্রাম শুনিতে শুনিতে ক্রমে তাহাদের চক্ষুর পশ্চাতে আরেক চক্ষু বিকশিত হইল, তাহাদের কর্ণের পশ্চাতে আর এক কর্ণ উদ্ঘাটিত হইল। ক্রমে তাহারা ফুল দেখিতে পাইল, গান শুনিতে পাইল। ধৈর্যই সৌন্দর্যের অস্ত্র। পুরুষদের ক্ষমতা আছে, তাই এতকাল ধরিয়া রমণীদের উপরে অনিয়ন্ত্রিত কর্তৃত্ব করিয়া আসিতেছিল। রমণীরা আর কিছুই করে নাই, প্রতিদিন তাহাদের সৌন্দর্যখানি লইয়া ধৈর্য সহকারে সহিয়া আসিতেছিল। অতি ধীরে ধীরে প্রতিদিন সেই সৌন্দর্য জয়ী হইতে লাগিল। এখন দানব-বল সৌন্দর্য-সীতার গায়ে হাত তুলিতে শিহরিয়া উঠে (আলোচনা: সৌন্দর্যের ধৈর্য: পৃ: ১২৭-১২৮)।

সৌন্দর্য ও রমণীর কাজ একই। তাই এই নাটকে নারী নন্দিনী হইয়াছে সৌন্দর্যের প্রতীক। আবার এই কথাও মনে রাখিতে হইবে যে সৌন্দর্যের মধ্যে থাকে এক গভীর ভাব। এই ভাবের দ্যুতি না থাকিলে সৌন্দর্যের প্রকাশই হইতে পারে না—

"The matter is beautiful, not in itself, but only when it is illuminated by the Idea." (Plotinus)

নন্দিনীর সিঁথিতে এবং আভরণে দোদুল্যমান রক্তকরবীর গুচ্ছ সেইরূপ ভাবেরই সঙ্কেত করে। ইহা জীবনের পরিচায়ক। প্রাণরসে ভরপুর সৌন্দর্য, ইহার ধ্বংস নাই। রক্তকরবী তাহারই রূপক। প্রয়োজন হইলে দুঃখের ভিতর দিয়া, নানা বাধার ভিতর দিয়াও ইহার জয়যাত্রা হয়। নানাবাধা অতিক্রম করিয়া নন্দিনী রাজাকে উদ্ধার করিয়াছিল।

অধ্যাপকের কথায় নন্দিনী আলোর সোনা। এটা কুবেরের ভাণ্ডারের কথা নয়, লক্ষ্মীর ঝাঁপির বিষয়। সেই জন্যই নন্দিনী লক্ষ্মীর পদ্ম এবং শ্রী। সে মনকে আলোকিত করে, কুবেরের ভাণ্ডারে লইয়া গিয়া বিভ্রান্ত করে না। যক্ষপুরীতে এই আলোর স্থান হইবার কথা নয়, সেখানে মানুষ অন্ধকারের মধ্যে হাতড়াইয়া বেড়ায়, মরা ধনের সন্ধান করে। যক্ষপুরীর এই মৃত আবহাওয়ার মধ্যে নন্দিনী বেমানান, বেখাপ। এই জন্যই অধ্যাপক বলেন, "সকালে ফুলের বনে যে আলো আসে তাতে বিস্ময় নেই, কিন্তু পাকা দেয়ালের ফাটল দিয়ে যে আলো আসে সে আর-এক কথা। যক্ষপুরে তুমি সেই আচমকা আলো" (পৃ-৪)। সোনার মতই সে আলোর রঙ তাই বোধ হয় এক মুহূর্তে সে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে। সে পাকা সোনা, প্রাণরসে ভরপুর[১]। তাই সকলের মনেই একটা আলোড়ন তোলে। যাহারা অবিদ্যায় আচ্ছন্ন তাহাদের মনেও সে জাদু স্পর্শ দিতে জানে। একমাত্র সৌন্দর্য চেতনাই মানুষের মনে প্রেম জাগাইয়া তুলিতে পারে—তখন সমস্ত ভেদ লোপ পায়—"পণ্ডিতেরা বলেন, যে সুন্দর তাহার মধ্যে বিষম কিছুই নাই, তাহার আপনার মধ্যে আপনার পরিপূর্ণ সামঞ্জস্য। তাহার কোন একটি অংশ অপর একটি অংশের সহিত বিবাদ

১। বস্তু সুন্দর হইতে হইলে তাহাতে রস থাকা আবশ্যক। রসই সৌন্দর্যের জীবন।
—সাহিত্য দর্পণ

করে না;…তাহার প্রত্যেক অংশ সমগ্রের সুখে সুখী; তাহারা ভাবে আমরা যে আপনারা সুন্দর সে কেবল সমগ্রকে সুন্দর করিয়া তুলিবার জন্য। …অতএব দেখা যাইতেছে, যথার্থ যে সুন্দর সে প্রেমের আদর্শ। সে প্রেমের প্রভাবেই সুন্দর হইয়াছে, তাহার আদ্যন্ত মধ্য প্রেমের সূত্রে গাঁথা; এই জন্যই সৌন্দর্য মনের মধ্যে প্রেম জন্মাইয়া দেয়, সে আপনার প্রেমে অন্যকে প্রেমিক করিয়া তুলে, সে আপনি সুন্দর হইয়া অন্যকে সুন্দর করে" (আলোচনা: সৌন্দর্যের কারণ: পৃ: ৬৪-৬৭)। সেই প্রেমের জোরেই নন্দিনী সাহস করিয়া বলিতে পারে, "আমি জালের বাধা মানি নে, আমি এসেছি ঘরের মধ্যে ঢুকতে" (পৃ-৬)। কেহ তাহাকে চিরকালের মত বাহিরে দাঁড় করাইয়া রাখিতে পারে না—রাজাও পারে নাই। যে ফাগুলাল বার ঘণ্টার উপর আরো চার ঘণ্টা যোগ করিযাছিল সোনার সন্ধানে সে তাহার দলবল লইয়া নন্দিনীর প্রেরণায সর্দারদের সহিত লডাই করিতে গেল। নীরস পুঁথির কীট বস্তুতত্ত্বজ্ঞ অধ্যাপকের জীবনেও সৌন্দর্যের আকর্ষণে প্রেমের স্পর্শ ঘটিযাছে, তিনিও চলিলেন নন্দিনীর সন্ধানে যুদ্ধক্ষেত্রের দিকে—জ্ঞানের সহিত মিলন হইল প্রেমের।

নন্দিনীর সহিত রঞ্জনের যোগ ঘনিষ্ঠ। সে নন্দিনীকে রক্তকরবী বলিযা ডাকিত। রক্তকববীর মালা কেবল রঞ্জনের জন্য—সেটা হৃদযের দান। রঞ্জনের পরিচয়টা কি? রঞ্জন অর্থাৎ যাহা রঞ্জিত করে, রাঙায়। আনন্দ মনকে রাঙায়। সুতরাং রঞ্জন আনন্দের প্রতীক। রঞ্জন সনাথা নন্দিনী, আনন্দ সনাথা সৌন্দর্য জানে যে আনন্দের শক্তিকে কেহ রোধ করিতে পারে না। আনন্দের স্পর্শ যখন লাগে তখন কোন বন্ধনকেই আর স্বীকার করা সম্ভব নয়, সীমার প্রাচীর তখন ভগ্ন হইয়া যায়। তাহার শক্তি শাঙ্খিনীনদীর মতো। সকলকেই নাচাইয়া তুলিতে সে পারে, "আমার রঞ্জনকে এখানে আনলে এদের মরা পাঁজরের ভিতর প্রাণ নেচে উঠবে" (পৃ-৬)। রঞ্জন বিধাতার হাসি, "ওই নদীর মতোই সে যেমন হাসতেও পারে তেমনি ভাঙতেও পারে" (পৃ-৭)। প্রাণচঞ্চল শক্তিতেই আনন্দের পরিচয়। সেখানে বিদ্রোহের ভাবও আছে আবার ব্যথার কথাও আছে—রক্তকরবীর সঙ্গে তাই রঞ্জনেরও যোগ আছে। সুতরাং দেখা গেল যে রক্তকরবীর রঞ্জনের সঙ্গেও যেরূপ সম্বন্ধ নন্দিনীর সঙ্গেও সেইরূপ—ইহা এই দুইটি নরনারীকে একসূত্রে আবদ্ধ করিয়াছে। যাহা সুন্দর তাহাই আনন্দ

দেয়, আবার আনন্দের উপলব্ধি সৌন্দর্যকে চিনাইয়া দেয়। সুতরাং নন্দিনী এবং রঞ্জনের মিলন চিরকালীন। তত্ত্বের দিক দিয়া ইহা যেমন সার্থক, মানবিকতার দিক দিয়াও উহা মর্যাদা লাভের যোগ্য। নরনারীর গভীর প্রেমকে ইহা সূচিত করে। রঞ্জন এবং নন্দিনী কেহই ছায়া মাত্র হইয়া উঠে নাই; তত্ত্বের প্রয়োজন সাধন করিয়াও তাহারা রক্ত মাংসের মানুষের ন্যায়ই প্রাণচঞ্চল হইয়াছে। রঞ্জন নাটকে উপস্থিত হয় নাই, কিন্তু মাঝে মাঝে তাহার পরিচয় পাইয়াছি। আনন্দের যোগে কাজ যেখানে হয় না সেখানে মানুষ নিম্নগামী হয়। যন্ত্র সভ্যতা কাজকে নিছক কাজ করিয়া রাখিয়াছে বলিয়াই মানুষ এখানে মুক্তির আনন্দ লাভ করে না। কাজ যে মানুষের প্রয়োজনেই সাধিত হয়, কাজের ভিতর দিয়াই যে মানুষ লক্ষ্যে গিয়া পৌঁছায়, সে লক্ষ্য বস্তুজগৎ সম্বন্ধেই হউক অথবা পরমার্থ সম্বন্ধেই হউক। এই উপলব্ধিটুকু থাকিলেই কাজ আনন্দপূর্ণ হইয়া উঠে। যন্ত্রসভ্যতা কেবল কর্ম বিভাগই করে তাহাই নহে, সেই সূত্রে শ্রেণী বিভাগও করে বলিয়াই কাজের আনন্দ নষ্ট করিয়া দেয়। তাহার মানুষ বলি চাই, তাহার যূপকাষ্ঠে অনুপ-উপমন্যু-শকুলুরা নিঃশোষিত হইবে, লাজুক, শঙ্কুরাও বাদ পড়িবে না—গজ্জুর মতো পালোয়ানেরাও হইবে 'রাজার এঁটো'।

কিন্তু আনন্দের প্রতীক রঞ্জন সেই কাজের মধ্যেও আনে আনন্দ। সর্দার-মোড়লদের যান্ত্রিক ব্যবস্থা সে মুহূর্তে উল্টাইয়া দেয়—

সর্দার

ওকে সুড়ঙ্গের মধ্যে দলে ভিড়িয়ে দিলে না কেন?

মোড়ল

দিয়েছিলুম, ভাবলুম চাপে পড়ে বশ মানবে। উল্টো হল—খোদাইকরদের উপর থেকেও যেন চাপ নেমে গেল। তাদের মাতিয়ে তুললে; বললে, 'আজ আমাদের খোদাই-নৃত্য হবে।'

সর্দার

খোদাই-নৃত্য? তার মানে কী?

মোড়ল

রঞ্জন ধরলে গান। ওরা বললে, 'মাদল পাই কোথায়?' ও বললে, 'মাদল না থাকে, কোদাল আছে'। তালে তালে কোদাল পড়তে লাগল; সোনার পিণ্ড নিয়ে সে কী লোফালুফি। বড়ো মোড়ল স্বয়ং এসে বললে,

'এ কেমন তোমার কাজের ধারা?' রঞ্জন বললে, 'কাজের রশি খুলে দিয়েছি, তাকে টেনে চালাতে হবে না, নেচে চলবে।' (পৃঃ ৫৮-৫৯)।

কাজকে এইরূপে নাচাইয়া চালাইবার সন্ধান যন্ত্র সভ্যতা জানে না, জানিতে চায়ও না। কৃত্রিম অভাব সৃষ্টি করিয়া রাখিয়া এই ব্যবস্থা মানুষের জীবনকে মূল্যহীন করিয়া রাখিয়াছে। যাহারা যন্ত্রকে অধিকার করিয়া রাখিয়াছে তাহাদের কাজও চাই আবার মানুষ বলি দেওয়াও চাই। এই ব্যবস্থায় ত্রুটি এইখানেই। রঞ্জন তাহার শক্তি লইয়া যন্ত্রকে আঘাত করে নাই, সে কাজকে আনন্দময় করিয়া তুলিতে চাহিয়াছে। মানব সমাজের প্রয়োজনেই কাজ চাই কিন্তু ছন্দহীন কাজের গতি রুদ্ধ হইয়া যায়। সুতরাং একথা মনে করা যায় না যে রবীন্দ্রনাথ যন্ত্রকে বর্জন করিতে চাহিয়াছেন। মানুষকে যন্ত্রের ইন্ধন করার যে ব্যবস্থা হইয়াছে তিনি তাহারই বিরোধী।

তাঁহারই আনন্দে জগৎ সংসার বিধৃত—"জগতের আনন্দ যজ্ঞে আমার নিমন্ত্রণ" (গীতাঞ্জলি)। এই আনন্দযজ্ঞকে পরিপূর্ণ করিবার জন্যই যক্ষপুরীতে রঞ্জনের আগমন। কাজ যদি আনন্দময় বলিয়া স্বীকৃত হয় তাহা হইলেই মানুষের মুক্তি নিশ্চিত। এই আনন্দকে হৃদয়ে উপলব্ধি করিতে হয়, ইহা হাতে করিয়া পাইবার জিনিস নয়, তাহাকে বাঁধিয়া রাখা যায় না, "শিকল দিয়ে তো ওকে কষে বাঁধা গেল। খানিক বাদে দেখি, কেমন করে পিছলে বেরিয়ে এসেছে—ওর গায়ে কিছু চেপে ধরে না" (পৃ-৫৯)। কেবল তাহাই নহে, আনন্দের গতি পথেরও হিসাব রাখা সম্ভব নয়, তাহার রূপটিও ধরা যায় না। কোন্ দিক দিযা যে আনন্দের ছোঁয়া লাগে, কোন্ জিনিস যে কখন আনন্দ দেয় তাহা বুঝিবারও কোন উপায় নাই। সেইজন্যই, "ও কথায় কথায় সাজ বদল ক'রে চেহারা বদল করে" (পৃ-৫৯)।

প্রতিদিনই তাঁহার আনন্দ নানাভাবে জগৎকে প্লাবিত করিতেছে। আকাশে-বাতাসে সর্বত্রই তাহার পরিচয় ছড়াইয়া আছে—

সেই আনন্দ-চরণপাতে
ছয় ঋতু যে নৃত্যে মাতে,
প্লাবন বহে যায় ধরাতে
বরন-গীতে গন্ধে রে।

(গীতাঞ্জলি : ৩৬ সংখ্যক কবিতা)।

তাই আনন্দের আগমনের পথ কখনও রুদ্ধ করা যায় না। সর্দার-মোড়লরা যে ব্যবস্থাই করুক না কেন, তাহারা মানুষকে মানুষ বলিয়া স্বীকার করুক আর নাই করুক, চারিদিকের পথ যে ভাবেই তাহারা বন্ধ করুক না কেন আনন্দকে বাধা দেওয়ার সাধ্য তাহাদের নাই—

অধ্যাপক

সর্দারের চোখ এড়িয়ে কোন্ পথ দিয়ে খবর আসবে!

নন্দিনী

যে পথে বসন্ত আসবার খবর আসে সেই পথ দিয়ে। তাতে লেগে আছে আকাশের রঙ, বাতাসের লীলা। (পৃ-৭)

সুতরাং আনন্দের আগমন রোধ করিবার উপায় নাই, তাহার আগমন সংবাদ গোপন করিয়াও রাখা যায় না। সর্দার-মোড়লরা রঞ্জনকে বাধা দিতে পারে নাই।

আলোচনার পূর্বে আলোচনার সুবিধার জন্যই রবীন্দ্রনাথের একটি বাণী আমাদের স্মরণ করিতে হইবে। ১৯৩১ সালে বর্ধমান সমবায় বিভাগ 'উপায়' নামে একটি মাসিক পত্রিকা প্রকাশ করে।[২] তাহার ভূমিকা স্বরূপ রবীন্দ্রনাথের কিছু লিখিয়া দিতে হয়। ভূমিকা স্বরূপ তিনি যে বাণী প্রেরণ করিয়াছিলেন তাহার কিয়দংশ এইখানে উদ্ধৃত করা হইল—

"উপায় এই শব্দটি শুনিলেই প্রথমেই মনে হয় বাহিরের পন্থা। ছেলে পড়াশুনায় কাঁচা, পাস করে কী উপায়ে! নোট মুখস্থ করাও। মনে লোভ আছে, দ্বেষ আছে, শান্তি পাব কী উপায়ে। লোভীরা, দ্বেষীরা একত্রে মিলে লীগ্-অফ্-নেশনস ফাঁদলে শান্তি পাওয়া যাবে।...আসল উপায় পথে নয়, পথে যে মানুষ চলবে তার নিজের মধ্যে। যে মানুষ চলতেই পারে না, পথ তাকে চালায় না। আমাদের দেশে যত কিছু দুর্গতি আছে তার মূলগত কারণ হচ্ছে এখানে মানুষ মানুষের সঙ্গে মিলিতে পারে না।"

সুতরাং সহজেই বুঝিতে পারা যায় যে রবীন্দ্রনাথের মনে এই ধারণাই বদ্ধমূল হইয়াছিল যে সমস্যা নানা রূপ আছে সত্য কিন্তু সকল সমস্যারই সমাধান ওই এক পথে—'আসল উপায় পথে নয়, পথে যে মানুষ চলবে তার নিজের মধ্যে'। আকর্ষণজীবী এবং কর্ষণজীবীর সংঘর্ষই বলি, ধর্মের

২। প্রভাত কুমার মুখোপাধ্যায় : রবীন্দ্রজীবনী : ৩য় খণ্ড : পৃ-১৪৩

গোঁড়ামির ফলে মতবিরোধের কথাই বলি : সমাধান মানুষের অন্তর পরিবর্তনে, তাহার সৎ হইয়া ওঠায়। 'উপায় এই শব্দটি শুনিলেই প্রথমেই মনে হয় বাহিরের পন্থা'—সুতরাং আকর্ষণজীবী এবং কর্ষণজীবীর সংঘর্ষে একপক্ষের জয় হইলেই সমস্যার সমাধান হইল বলিয়া মনে হইতে পারে বটে, কিন্তু তাহা বাহিরের পন্থা মাত্র। এই জন্যই রবীন্দ্রনাথ দুই পক্ষের সংগ্রামের পরিবেশে গভীরতর একটি বিষয়ের দিকে পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন। নাটকে তিনি কোন পক্ষের জয় ঘোষণা করেন নাই—

রাজা

হাঁ, আমারই বন্দীশালা। তোমাতে আমাতে দুজনে মিলে কাজ করতে হবে। একলা তোমার কাজ নয়।

ফাগুলাল

সর্দাররা খবর পেলেই ঠেকাতে আসবে।

রাজা

তাদের সঙ্গে আমার লড়াই।

ফাগুলাল

সৈন্যরা তো তোমাকে মানবে না।

রাজা

একলা লড়ব, সঙ্গে তোমরা আছ।

ফাগুলাল

জিততে পারবে ?

রাজা

মরতে তো পারব। এত দিনে মরবার অর্থ দেখতে পেয়েছি—বেঁচেছি। (পৃ-১০১)

কোন পক্ষের জয়ের মধ্যেই অন্তর পরিবর্তনের বীজ নিহিত নাই—সত্যকার মঙ্গলের কথা আছে আরও গভীরে। মানুষ কোন্ অবস্থায় আসিলে কর্ষণজীবী বা আকর্ষণজীবী যাহাই হউক না কেন, কোন ভেদ থাকিবে না, কোন অশান্তির কারণ ঘটিবে না ইহাই তিনি এই নাটকে দেখাইতে চাহিয়াছেন। সভ্যতার এই দুই রূপই তিনি দেখিয়াছেন, কর্ষণজীবী সভ্যতা মানুষের মুক্তি দিতে পারিয়াছিল মনে করিবার কোন সঙ্গত কারণ নাই। কর্ষণজীবী সভ্যতায় জমিদার থাকে, মহাজনরূপী রক্তশোষকের অভাব দেখা

যায় না। চাষীতে চাষীতে পার্থক্যও কম নয় এবং এই সমাজব্যবস্থায় ভূমিহীন দিন মজুরের অভাবও বাঙ্গলা দেশে দেখা যায় নাই। নানা কুসংস্কারেও আচ্ছন্ন এই কর্ষণজীবীরা। সুতরাং সেই ব্যবস্থাকে রবীন্দ্রনাথ চূড়ান্ত মঙ্গলের উপায় বলিয়া কিছুতেই মনে করেন না। যদি তাহা করিতেন তবে তিনি কিছুতেই 'চিত্রা' কাব্যগ্রন্থের 'দুইবিঘা জমি' কবিতাটি লিখিতেন না—

> শুধু বিঘে-দুই ছিল মোর ভুঁই, আর সবি গেছে ঋণে।
> বাবু বলিলেন, 'বুঝেছ উপেন, এ জমি লইব কিনে।'
> কহিলাম আমি, 'তুমি ভূস্বামী, ভূমির অন্ত নাই,
> চেয়ে দেখো মোর আছে বড়ো জোর মরিবার মত ঠাঁই।'
> শুনি রাজা কহে, 'বাপু, জান তো হে, করেছি বাগানখানা,
> পেলে দুই বিঘে প্রস্থে ও দিঘে সমান হইবে টানা—
> ওটা দিতে হবে।'

রবীন্দ্রনাথ মনে করেন, সমাজব্যবস্থা মঙ্গলপ্রদ হইয়া উঠিবে যদি মানুষ সত্য পথের সন্ধান পায়। মানুষ যতক্ষণ পরস্পর হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া থাকিবে, যতক্ষণ তাহারা অহং-এর গণ্ডীতে আবদ্ধ থাকে ততক্ষণ তাহাদের জগৎ হইতে সমস্যা দূর হইবে না—

"All our egoistic impulses, our selfish desires, obscure our true vision of the soul. For they only indicate our own narrow self. When we are conscious of our soul, we perceive the inner being that transcends our ego and has its deeper affinity with the All". (Sādhanā : p-27)

বাহিরের জগতের আকর্ষণজীবী এবং কর্ষণজীবীদেব সংঘর্ষের পটভূমিকায় অবিদ্যার ঘোর হইতে 'মানুষটাকে উদ্ধারে'র কথাই রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন। ধানী রঙের সাড়ী পরিয়া কর্ষণজীবী আসিয়াছে বটে, কিন্তু সে তো মূলতঃ সৌন্দর্য, মানুষটাকে উদ্ধার করাই তাহার কাজ, "...তোমাদের রাজাকে এই একটা অদ্ভুত জালের দেয়ালের আড়ালে ঢাকা দিয়ে রেখেছ, সে যে মানুষ পাছে সে কথা ধরা পড়ে। তোমাদের ওই সুড়ঙ্গের অন্ধকার-ডালাটা খুলে ফেলে তার মধ্যে আলো ঢেলে দিতে ইচ্ছে করে, তেমনি ইচ্ছে করে ওই বিশ্রী জালটাকে ছিঁড়ে ফেলে মানুষটাকে উদ্ধার করি" (পৃ-৫)। অন্ধকার ডালাটা খুলিয়া জ্ঞানের আলো ঢালিয়া দেওয়ার অর্থ ই অবিদ্যার জালটা

ছিঁড়িয়া ফেলা—অবিদ্যাই মিথ্যা সৃষ্টি করে, মানুষে মানুষে ভেদের রেখা টানিয়া দেয়—

অধ্যাপক

আমাদের মরা ধনের প্রেতের যেমন ভয়ংকর শক্তি, আমাদের মানুষ-ছাঁকা রাজার তেমনি ভয়ংকর প্রতাপ।

নন্দিনী

এ-সব তোমাদের বানিয়ে-তোলা কথা।

অধ্যাপক

বানিয়ে-তোলাই তো। উলঙ্গের কোনো পরিচয় নাই, বানিয়ে-তোলা কাপড়েই কেউ বা রাজা, কেউ বা ভিখিরি। (পৃ-৫)।

অবিদ্যায় আচ্ছন্ন মানুষ অহং-এর মত্ততায় নিমজ্জিত থাকে, জ্ঞানের আলোকেই সে তাহার নিজের সত্য রূপ জানিতে পারে—তখনই সে বিশ্বের সকল কিছুর সহিত নিজের একাত্মতা অনুভব করে—

"The lamp contains its oil, which it holds securely in its close grasp and guards from the least loss. Thus is it separate from all other objects around it and is miserly. But when lighted it finds its meaning at once . its relation with all things far and near is established, and it freely sacrifices its fund of oil to feed the flame".

"Such a lamp is our self. So long as it hoards its possessions it keeps itself dark, its conduct contradicts its true purpose. When it finds illumination it forgets itself in a moment, holds the light high, and serves it with everything it has ; for therein is his revelation" (Sādhanā : p-76).

সুতরাং ইহা স্পষ্টই বোধগম্য হয় যে মানুষের জগৎকে শোভন-সুন্দর করিয়া তুলিবার একমাত্র উপায় আত্মার বিকাশ লাভ ইহাই রবীন্দ্রনাথ মনে করিতেন। তথাপি ইহাও সত্য যে আকর্ষণজীবী সভ্যতা অপেক্ষা কর্ষণজীবী সভ্যতার দিকে তাঁহার মনের টান ছিল বেশী। তাহার কারণ এই যে পাশ্চাত্য দেশ ভ্রমণ করিয়া এবং জাপানে পাশ্চাত্য যান্ত্রিক সভ্যতার পরিচয় পাইয়া তিনি আকর্ষণজীবী সভ্যতার ভয়াবহ রূপটা খুব ভাল করিয়াই দেখিবার সুযোগ পাইয়াছিলেন। আকর্ষণজীবী সভ্যতা যেন পণ করিয়া

বসিয়াছে যে মানুষকে দলিত-পিষ্ট করিতে পারিলেই সভ্যতার অগ্রগতি হইবে। কর্ষণজীবী সভ্যতায় এত উগ্ররূপে এই মনোভাবের পরিচয় নাই। কর্ষণজীবী সভ্যতায় কলের ধোঁয়া আকাশকে আচ্ছন্ন করে না, যন্ত্রের পেষণে কলে-কারখানায়-জলে-স্থলে মানুষের মৃত্যু ঘটাইয়া প্রমাণ করে না যে যন্ত্রের তুলনায় মানুষের প্রাণের মূল্য নগণ্য। সেখানে উন্মুক্ত মাঠের মধ্যে প্রকৃতির সহিত মিলন হয়—সুতরাং 'মানুষটা'র মুক্তির সম্ভাবনা সেখানে অধিক। যন্ত্রসভ্যতা কোন কিছুকেই সম্পূর্ণ করিয়া দেখে না, দেখিতে পারেই না। খণ্ডকে লইয়াই তাহার কারবার। তাই নন্দিনীকে আনিবে কিন্তু সেই সঙ্গে রঞ্জনকে আনিবে না—"সব জিনিসকে টুকরো করে আনাই এদের পদ্ধতি (পৃ-৬)। কিন্তু কর্ষণজীবী সভ্যতা পাকা ধানের সৌন্দর্য স্থষ্টি করে—অসীমের সহিত যুক্ত হইতে বাধা স্থষ্টি করে না। আকর্ষণজীবী সভ্যতা অপেক্ষা কর্ষণজীবী সভ্যতায় সৌন্দর্য চেতনা অধিক। এই সভ্যতায় আত্মার মুক্তির সম্ভাবনা অধিক বলিয়াই রবীন্দ্রনাথ ইঁহার সমর্থক। কিন্তু এই সভ্যতার পত্তন হইলেই মানুষের মুক্তি হইবে তাহা তিনি মনে করেন না। আকর্ষণজীবী সভ্যতার আগমনের পূর্বে কর্ষণজীবী সভ্যতাই তো ছিল। তাহা মানুষকে যদি মুক্তি দিতেই পারিত তবে আকর্ষণজীবী সভ্যতার বিকৃত দিকটা প্রতিষ্ঠা লাভের সুযোগ কিছুতেই পাইত না। এই উভয় সভ্যতার ভালটুকু লইয়া সামঞ্জস্য দেওয়া কঠিন কিছু নয়—তবে তাহার পূর্বে সামঞ্জস্য সাধনকারী মানুষটির মুক্তি চাই।

এইবার রাজার পরিচয় গ্রহণ করা যাইতে পারে। তিনি আছেন জালের অন্তরালে—লক্ষ্য রাখিতে হইবে যে রবীন্দ্রনাথ লৌহকপাট বা কাঁচের অন্তরালে রাজাকে স্থাপন করেন নাই। লৌহ কপাটের অন্তরালে যদি তিনি থাকিতেন তবে বহির্জগৎ তাঁহার চক্ষুর অন্তরালেই থাকিয়া যাইত, সেই জগৎ সম্বন্ধে তিনি সম্পূর্ণ অচেতন থাকিয়া যাইতেন—সেই জগতের সহিত তাঁহার যোগাযোগের সমস্ত পথও রুদ্ধ হইয়া যাইত। আবার ব্যবধান যদি কাঁচের দ্বারা স্থষ্টি করা হইত তবে বহির্জগতের সকল কিছুই তিনি স্পষ্ট করিয়া দেখিতে পাইতেন। একমাত্র জালের অন্তরাল হইতেই আধা অস্পষ্টরূপে দেখা যায়। জালের তাৎপর্য এইখানেই। রাজা বহির্জগতের দিকে চাহিয়া আছেন কিন্তু তাহার সম্পূর্ণরূপ, সত্যরূপ তিনি দেখিতে পাইতেছেন না। অবিদ্যার ঘোর দূর হইলে তবেই জগৎ সম্বন্ধে

সত্য জ্ঞান লাভ সম্ভব। অবিদ্যায় আচ্ছন্ন আত্মা অহং বোধের দ্বারা বদ্ধ— তখন তাহার জগৎ সম্বন্ধে বোধ সত্য-মিথ্যায়, আলো-আঁধারে জড়িত হইয়া থাকে : জালের অন্তরাল হইতে যাহাই দেখি তাহাই এইরূপ আলো-আঁধারী মনে হয়। এখানে 'জাল' অবিদ্যার প্রতীক : রাজা আত্মার প্রতীক। অবিদ্যায় আচ্ছন্ন রাজার দৃষ্টি জালের অন্তরাল হইতে দেখার মতোই।

অবিদ্যায় আচ্ছন্ন আত্মা সৌন্দর্যের আকর্ষণ অনুভব করে, কিন্তু ভোগকে পরিত্যাগ করিতে সহসা তাহার মন চায় না। ইন্দ্রিয়গুলি অত্যন্ত বলবান থাকিয়া তখন তাহাকে তাহার স্বরূপ উপলব্ধি করিতে দেয় না—

ইন্দ্রিয়াণাং হি চরতাং যন্মনোঽনুবিধীয়তে।
তদস্য হরতি প্রজ্ঞাং বায়ুর্নাবমিবাম্ভসি॥ (গীতা : ২য় অ: ৬৭)

আবার ইহাও সত্য যে ইন্দ্রিয়ের সাহায্যেই মানুষের সৌন্দর্য উপলব্ধি হয়। ইন্দ্রিয়গুলি যখন আত্মার বশে আসে তখন তাহাদের অসংযম দূর হয় : সংযত ইন্দ্রিয় সৌন্দর্য উপলব্ধির সহায়ক হয়। সুতরাং একদিকে যেমন ইন্দ্রিয়গুলিই সৌন্দর্য চেতনা আনে, অপরদিকে সেইরূপ ইন্দ্রিয়ই যত কিছু বিভ্রান্তি সৃষ্টি করে। রাজা সৌন্দর্যের আহ্বান শুনিতে পান, কিন্তু তাহা এড়াইতেও চাহেন, "নন্দা, শুনতে পাচ্ছি। কিন্তু বারে বারে ডেকো না, আমার সময় নেই, একটুও না" (পৃ-১১)। কুঁদ ফুলের মালা রাজা গ্রহণ করিতে পারেন না, কারণ ওই মালায় যে প্রশান্তির কথা আছে রাজার মনে তাহার অভাব। খোলা মাঠে গিয়া অনন্তের পরিচয় লওয়া তাঁহার পক্ষে এখনও সম্ভব নয় : ভোগের জগতে যে আবদ্ধ অসীমের মুখোমুখি হইতে সে ভয় পায়। পৌষের ধান কাটার গানকে তাই রাজা উপেক্ষা করেন।

রাজার শক্তি দেখিয়া নন্দিনী বিস্মিত হয়। অবিদ্যায় আচ্ছন্ন মানুষের শক্তির মধ্যে মঙ্গলের মহান পরিচয় যদি না-ও থাকে তথাপি কোন দীপ্তি নাই তাহা বলা চলে না। শক্তির মধ্যেও একটা সৌন্দর্যের প্রকাশ আছে, আবার সৌন্দর্যের শক্তি কম নয়—তাহা প্রতিনিয়ত আমাদের আকর্ষণ করে। সৌন্দর্যকে ধ্বংস করা যায় না, তাহা জীবনী শক্তিতে ভরপুর। সিংহ-ব্যাঘ্র যখন তাহাদের তেজোময় দৃপ্ত ভঙ্গী প্রকাশ করে তখন সেই শক্তিতে প্রদীপ্ত দেহখানি সুন্দর বলিয়া নিশ্চয়ই মনে হয়। রাজার মধ্যেও সেই শক্তি রহিয়াছে তাই সেই প্রদীপ্ত সৌন্দর্যটুকু সৌন্দর্যের প্রতীক

নন্দিনীকে সহজেই আকর্ষণ করে, "অদ্ভুত তোমার শক্তি। যে দিন আমাকে তোমার ভাণ্ডারে ঢুকতে দিয়েছিলে, তোমার সোনার তাল দেখে কিছু আশ্চর্য হই নি, কিন্তু যে বিপুল শক্তি দিয়ে অনায়াসে সেইগুলোকে নিয়ে চুড়ো করে সাজাচ্ছিলে তাই দেখে মুগ্ধ হয়েছিলুম" (পৃ-১৩)। স্বার্থসর্বস্বতা, হিংস্রতা দূর হইলেই রাজা পরিশুদ্ধ হইতে পারিবেন—আত্মা মুক্তিলাভ করিবে। সেই জন্যই সৌন্দর্য তাহাকে ক্ষুদ্রতার গণ্ডী হইতে উন্মুক্ত প্রান্তরে লইয়া যাইতে চায়। ঘরের কোণ হইতে বাহিরে আসার অর্থই অন্ধকার হইতে আলোকে বাহির হওয়া। নন্দিনী সেই জন্যই রাজাকে বলে, "আলোতে বেরিয়ে এসো, মাটির উপর পা দাও, পৃথিবী খুশি হয়ে উঠুক" (পৃ-১৪)। ভারতবর্ষের ঋষিদের বাণী স্মরণীয়, "তমসো মা জ্যোতির্গময়"।

শক্তির সঙ্গে সৌন্দর্যের যোগ আছে বলিয়াই রাজার শক্তি দেখিয়া নন্দিনীর মন নাচে, আবার আনন্দের শক্তি দেখিয়াও তাহার মনে সেই একই নাচন আরম্ভ হয়। তবে দুইটি নাচের তাল আলাদা। রাজার শক্তি অহংবোধের দ্বারা আবৃত, উহা ভেদ সৃষ্টি করে। রাজার সেই শক্তি নন্দিনীর মনকে নাচাইলেও উহার রূপটা তাহাকে বেদনা দেয়। তাই তো বার বার সে রাজাকে ক্ষুদ্রতার জগৎ হইতে অসীমের জগতে নামিয়া আসিতে বলে। রঞ্জনের শক্তি, আনন্দের শক্তি—মিলনের অগ্রদূত: উহা মানুষের মনকে মুহূর্তে অসীমের দ্বারে পৌঁছাইয়া দেয়। সেই জন্যই রঞ্জন নন্দিনীর বুকে যে নাচের তাল জাগায় তাহাকে বুঝিয়া লওয়া ভেদ সৃষ্টি-কারী শক্তির পক্ষে অসম্ভব, "সে নাচের তাল আলাদা, তুমি বুঝবে না (পৃ-১৫)।

অবিদ্যায় আবৃত আত্মা জগৎটাকে কেবল ভোগের সামগ্রী বলিয়াই মনে করে। সৌন্দর্যকেও সোনার তালের মতো করিয়াই মুঠা ভরিয়া পাইতে চায়। মরা সোনা আর আলোর সোনার রঙ একই—বস্তুবাদী তাই দুইটিকে এক করিয়া ফেলিতে চায়। রাজা জালের অন্তরাল হইতে তাই মনে করিতেও চাহেন না যে বস্তুর অতিরিক্ত আরও কিছু আছে। তাই সোনার তালের মতো করিয়া নন্দিনাকে তিনি উলটাইয়া পালটাইয়া দেখিতে চাহেন। অধ্যাপকের বস্তুতত্ত্ববিদ্যা তিনি আয়ত্ত করিয়াছেন, তাহারই মাপকাঠিতে তিনি সকল কিছু বিচার করেন। যাহা হৃদয় দিয়া স্পর্শ করিবার তাহাকে দুই হাতে পিষ্ট করিতে চাহিলে ব্যর্থ হহতেই হইবে।

বস্তু শক্তি কখনও প্রাণের সঞ্চার করিতে পারে না। মৃত্যুর সাধনা করে যে শক্তি সে জীবন দিতে পারে না। আনন্দের জীবনী শক্তি কাঁচা মাটিতে ঘাসের জন্ম দেয়, ফুল ফোটায়। বিরাট যন্ত্র সৃষ্টির শক্তি থাকা সত্ত্বেও বস্তু বিদ্যা প্রাণ প্রতিষ্ঠার শক্তি অর্জন করিতে পারে নাই। রাজার নিজেরই কথায়, "আমি যমের কাছে জাদু শিখেছি, জাগাতে পারি নে। জাগরণ ঘুচিয়ে দিতেই পারি" (পৃ-৯৭)।

ভোগের জগতে চলিতে চলিতে যখন মানুষ প্রাণের লীলায়িত ছন্দটুকু দেখে তখন বিস্মিত হয়। যখন সে দেখে যে বস্তু বিদ্যার সমস্ত শক্তি প্রয়োগ করিয়াও সামান্য একটি তৃণের জন্ম দেওয়া তাহার পক্ষে সম্ভব নহে তখন তাহার বস্তু বিদ্যার উপর একটা সন্দেহও জাগে। নাটকে নন্দিনীর সঙ্গে যখন রাজার প্রথম সাক্ষাৎ হয় তাহার পূর্ব হইতেই রাজার মনে একটা দ্বন্দ্ব দেখা দিয়াছিল তাহাব পরিচয় রবীন্দ্রনাথ বেশ পরিষ্কার রূপেই দিয়াছেন—

নন্দিনী

তুমি তো নিজেকেই জালে বেঁধেছ, তার পরে কেন এমন ছট্‌ফট্‌ করছ বুঝতে পারি নে।

নেপথ্যে

বুঝতে পারবে না। আমি প্রকাণ্ড মরুভূমি—তোমার মতো একটি ছোট্ট ঘাসের দিকে হাত বাড়িয়ে বলছি—আমি তপ্ত. আমি রিক্ত, আমি ক্লান্ত। তৃষ্ণার দাহে এই মরুটা কত উর্বরা ভূমিকে লেহন করে নিয়েছে, তাতে মরুর পরিসরই বাড়ছে, ওই একটুখানি দুর্বল ঘাসের মধ্যে যে প্রাণ আছে তাকে আপন করতে পারছে না।

নন্দিনী

তুমি যে এত ক্লান্ত তোমাকে দেখে তো তা মনেই হয় না। আমি তো তোমার মস্ত জোরটাই দেখতে পাচ্ছি।

নেপথ্যে

নন্দিন, এক দিন দূরদেশে আমারই মতো একটা ক্লান্ত পাহাড় দেখেছিলুম। বাইরে থেকে বুঝতেই পারি নি তার সমস্ত পাথর ভিতরে ভিতরে ব্যথিয়ে উঠেছে। এক দিন গভীর রাতে ভী:ণ শব্দ শুনলুম, যেন কোন্ দৈত্যের দুঃস্বপ্ন গুম্‌রে গুম্‌রে হঠাৎ ভেঙে গেল। সকালে দেখি

পাহাড়টা ভূমিকম্পের টানে মাটির নীচে তলিয়ে গেছে। শক্তির তার নিজের অগোচরে কেমন ক'রে নিজেকে পিষে ফেলে সেই পাহাড়টাকে দেখে তাই বুঝেছিলুম। আর তোমার মধ্যে একটা জিনিস দেখছি—সে এর উল্টো।

নন্দিনী

আমার মধ্যে কী দেখছ?

নেপথ্যে

বিশ্বের বাঁশীতে নাচের যে ছন্দ বাজে সেই ছন্দ। (পৃঃ ১৭-১৮)।

রাজার মনে যে দ্বন্দ্ব দেখা দিয়াছে তাহা প্রতিটি মানুষের মনেরই দ্বন্দ্ব। একদিকে বস্তু জগতের ভোগের আকাঙ্ক্ষা, অপরদিকে বস্তুকে অতিক্রম করিয়া যাওয়া প্রাণের জগতে প্রকাশিত হইবার ইচ্ছা, এই দুইয়ের সংঘাতে যে দ্বন্দ্ব সৃষ্টি হয় তাহা প্রত্যেকটি মানুষকেই আলোড়িত করে। আলোড়িত করে তাহার কারণ মানুষ কেবল পশু নয়, মানুষও—"আমরা জানি না আমাদের অন্তরে এক উপবাসী পুরুষ সমস্ত পদমর্যাদার মধ্যে ক্ষুধিত হয়ে রয়েছে" (শান্তিনিকেতন : ২য় খণ্ড : প্রতীক্ষা)। মানুষের ভিতরকার সেই উপবাসী পুরুষটি তাই বাহিরের জড় শক্তিকে ঠেলিয়া আত্মপ্রকাশ করিতে চায়—"সেইজন্যে যতক্ষণ স্বার্থের নাড়ীর বন্ধন ছিন্ন করে মানুষ এই মঙ্গললোকের মধ্যে জন্মলাভ না করে ততক্ষণ তার বেদনার অন্ত নেই। কারণ, যেখানে তার চরম স্থিতি নয়, যেখানে সে অসম্পূর্ণ, সেখানেই চিরদিন স্থিতির চেষ্টা করতে গেলেই তাকে কেবলই টানাটানির মধ্যে থাকতে হবে। সেখানে সে যা গড়ে তুলবে তা ভেঙে পড়বে, যা সংগ্রহ করবে তা হারাবে, এবং যাকে সে সকলের চেয়ে লোভনীয় বলে কামনা করবে তাই তাকে আবদ্ধ করে ফেলবে" (শান্তিনিকেতন : ২য় খণ্ড : দ্বিধা)।

মকর রাজের মনে দ্বিধা দেখা দিয়াছে। 'মকর' কথাটির অনেক অর্থের মধ্যে একটি হইতেছে কামদেবের পতাকার চিহ্ন। সুতরাং মকররাজ বলিতে রবীন্দ্রনাথ কামদেবকেই বুঝাইয়াছেন। অবিদ্যায় আছন্ন আত্মা কেবল কামনাই করে। কিন্তু প্রাণের পরিচয় পাইয়া কিরূপে তাহার অন্তর্দ্বন্দ্ব জাগে তাহার পরিচয় আমরা পূর্বেই পাইয়াছি। অন্তর্দ্বন্দ্বের ফলে রাজা অস্থির হইয়া উঠিয়াছেন—তিনি বুঝিয়াছেন যে তাঁহার সবই বোঝা হইয়া আছে, জানেন যে সোনাকে জমাইয়া তুলিয়া পরশমণি করা যায় না।

১৬

কিন্তু তথাপি ইন্দ্রিয়ের ভোগাকাঙ্ক্ষা তাহাকে নিবৃত্তির পথে চলিতে দেয় না—অবিদ্যা হইতে তাই সম্পূর্ণ মুক্তিও হয় না। কিন্তু মনের মধ্যে এই দ্বন্দ্বের ফলে যে অশান্তি জাগ্রত হয় তাহার প্রয়োজন আছে। ইহাকে মহত্তর লোকে প্রয়াণের প্রস্তুতি পর্ব বলা চলে। অবিদ্যা দূর করিতে হইলে মানুষকে তাহার জন্য মূল্য দিতে হয়। সহজে কিছুই হইবার জো নাই। এতদিনের এত সঞ্চয় যে অর্থহীন এই বোধ রাজাকে আজ আকুল করিয়া তুলিয়াছে। সঞ্চয় করিতে করিতেও মানুষ একদিন নীরসতা অনুভব করে—"আসক্তি যাকে মাকড়ষার মতো জালে জড়ায় তাকে জীর্ণ করে দেয়; তাতে গ্লানি আসে, ক্লান্তি আনে। কেননা আসক্তি তাকে সমগ্র থেকে উৎপাটন করে নিজের সীমার মধ্যে বাঁধে; তার পরে তোলা ফুলের মতো অল্পক্ষণেই সে ম্লান হয়" (আত্মপরিচয় : পৃ-৮৭)। সেইজন্যই মানুষকে মুক্তি পিয়াসী হইতেই হয়। যাহারা অত্যন্ত ভোগে জীবন কাটায় তাহাদের অনেকে মৃত্যুর পূর্বে যথাসর্বস্ব দান করিয়া গিয়াছেন এইরূপ দৃষ্টান্ত পৃথিবীতে বিরল নহে। নিজেরা সংকীর্ণ জীবনযাপন করিলেও ত্যাগীকে সকলেই শ্রদ্ধা করে: ক্ষুদ্রতার গণ্ডীতে স্বার্থের ডোরে বাঁধা থাকিয়া কেহই মনে করে না যে তাহার জীবন সার্থক হইয়াছে। রবীন্দ্রনাথ তাই বলিয়াছেন, "আমাদের অন্তর-প্রকৃতির মধ্যে একটি নারী রয়েছেন। আমরা তাঁর কাছে আমাদের সমুদয় সঞ্চয় এনে দিই। আমরা ধন এনে বলি, এই নাও। খ্যাতি এনে বলি, এই তুমি জমিয়ে রাখো। আমাদের পুরুষ সমস্ত জীবন প্রাণপণ পরিশ্রম করে কত দিক থেকে কত কী যে আনছে তার ঠিক নেই; স্ত্রীটিকে বলছে, এই নিয়ে তুমি ঘর ফাঁদো, বেশ গুছিয়ে ঘরকন্না করো, এই নিয়ে তুমি সুখে থাকো। আমাদের অন্তরের তপস্বিনী এখনও স্পষ্ট করে বলতে পারছে না যে এ-সবে আমার কোনো ফল হবে না। সে মনে করছে, হয়তো আমি যা চাচ্ছি তা বুঝি এইই। কিন্তু তবু সব নিয়েও, 'সব পেলুম' ব'লে তার মন মানছে না। সে ভাবছে, হয়তো পাওয়ার পরিমাণটা আরও বাড়াতে হবে—টাকা আরও চাই, খ্যাতি আরও দরকার, ক্ষমতা আরও না হলে চলছে না। কিন্তু সেই আরও-র শেষ হয় না। বস্তুত সে যে অমৃতই চায় এবং এই উপকরণগুলো যে অমৃত নয়, এটা একদিন তাকে বুঝতেই হবে। একদিন এক মুহূর্তে সমস্ত জীবনের স্তূপাকার সঞ্চয়কে এক পাশে আবর্জনার মতো ঠেলে দিয়ে তাকে বলে উঠতেই হবে:

যেনাহং নামৃতা স্যাম্ কিমহং তেন কুর্যাম্!" (শান্তিনিকেতন : ১ম খণ্ড প্রার্থনা)।

প্রতিটি মানুষের মনের মধ্যেই এই তপস্বিনী আছে। সে তাহাকে প্রেমের সন্ধান দেয়, ভূমার দিকে আকর্ষণ করে। মানুষের ভিতরকার দ্বন্দ্ব—অহংবোধের এবং মুক্তি পিয়াসী আত্মার সংঘাত। একদিকে ক্ষুদ্রতার আকর্ষণ, অপরদিকে তাহা অতিক্রম করিবার প্রেরণা। আশাবাদী রবীন্দ্রনাথ মানুষের মুক্তিতেই একান্ত বিশ্বাসী। ক্রমবিবর্তনের ফলে দেহের দিক দিয়া পশু জগৎকে অতিক্রম করিয়া আসিয়া মনের ভিতরকার পশুটার নিকট মানুষ পরাভূত হইবে ইহা তিনি কিছুতেই বিশ্বাস করেন না। তিনি বিশ্বাস করেন যে মানুষ যাত্রী, সে প্রতিনিয়তই পরিপূর্ণতার পথে অগ্রসর হইতেছে; তাহার ভিতরকার অমানুষটা একদিন ভিতরের মানুষটার নিকট নিশ্চয় পরাজিত হইবে, "আদিকবির সাত কাণ্ডে স্থানাভাব ছিল না, এই কারণে লঙ্কাপুরীতে তিনি রাবণ ও বিভীষণকে স্বতন্ত্র স্থান দিয়েছিলেন। কিন্তু আভাস দিয়েছিলেন যে, তারা একই, তারা সহোদর ভাই। একই নীড়ে পাপ ও সেই পাপের মৃত্যুবাণ লালিত হয়েছে। আমার স্বল্পায়তন নাটকে রাবণের বর্তমান প্রতিনিধিটি এক দেহেই রাবণ ও বিভীষণ; সে আপনাকেই আপনি পরাস্ত করে" (রক্তকরবী : প্রস্তাবনা : পৃ-১০৮)।

সুতরাং রবীন্দ্রনাথের কথায় প্রতিটি মানুষের ভিতরকার রাবণের উপর তাহারই ভিতরের বিভীষণের জয়ের কথাই এই নাটকে প্রদর্শিত হইয়াছে। ভোগের উপর ত্যাগের, সঙ্কীর্ণতার উপর ভূমার জয় ঘোষণা করিয়াছে 'রক্তকরবী'। ইহাই তো বদ্ধ আত্মার মুক্তি। মানুষের সত্যরূপ প্রকাশিত হইবেই, তাহার পথে কোন বাধাই চিরস্থায়ী হইতে পারে না—"মানুষের ইতিহাসের ক্ষেত্রে মাঝে মাঝে মহাপুরুষদের দেখি। তাঁদের থেকে এই কথাই বুঝি যে সমস্ত মানুষের অন্তরেই কাজ করছে অভিব্যক্তির প্রেরণা। সে ভূমার অভিব্যক্তি। জীবমানব কেবলই তার অহং-আবরণ মোচন ক'রে আপনাকে উপলব্ধি করতে চাচ্ছে বিশ্বমানবে" (মানুষের ধর্ম : পৃঃ ৭০-৭১)। 'সাধনা'তেও এই কথাটাই আরও একটু স্পষ্ট করিয়া বলিয়াছেন—

"We have seen the great purpose in us taking shape in the lives of our greatest men, and have felt certain that though

there are numerous individual lives that seem ineffectual still it is not their dharma to remain barren ; but it is for them to burst their cover and transform themselves into a vigorous spiritual shoot, growing up into the air and light, and branching out in all directions." (p-75).

ব্যক্তি বিশেষের শক্তির দীনতা থাকিতে পারে, কিন্তু তাই বলিয়া তাহারও প্রেরণার অভাব হয় না। প্রকৃতি জগতের উন্মুক্ত প্রাঙ্গন আছে, মহাপুরুষদের জীবনের দৃষ্টান্ত আছে, "নিজের রচিত জটিল জাল ছেদন করে চিরন্তন আকাশ—চিরন্তন আলোকের অধিকার আবার ফিরে পাবার জন্য মানুষকে চিরকালই এইরকম মহাপুরুষদের মুখ তাকাতে হয়েছে" (শান্তিনিকেতন : ২য় খণ্ড : ভক্ত)।

রাজার ভিতরেও সেই অহং-এর আবরণ মোচন করিয়া চিরন্তন আকাশ, চিরন্তন আলোক লাভের সংগ্রাম আরম্ভ হইয়াছে। একদিকে দেখা দিয়াছে সঞ্চয়ের প্রকাণ্ড ভাণ্ডারের নীরসতার আঘাত অপরদিকে তাহার ভিতরকার মানুষটিকে উদ্ধারের জন্য সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে সৌন্দর্যের প্রতীক নন্দিনী। একদিকে জড়ের পর জড়ের স্তূপ সংগ্রহ করার ফলে ভিতরের প্রতিক্রিয়া আর একদিকে হৃদয়কে প্রেমপূর্ণ করিবার জন্য সৌন্দর্য প্রতিমা নন্দিনীর আকর্ষণ। এই প্রতিক্রিয়ার পরিচয় আছে পুরাণবাগীশের কথায়, "ভিতরে এ কী প্রলয়কাণ্ড হচ্ছে বলো তো—ভয়ংকর শব্দ যে" (পৃ-৬১)।

রাজার জীবন-চেতনা জাগ্রত হইয়া উঠিতেছে ; তিনি এখন অনুভব করেন যে বস্তু লইয়াই জীবনকে সার্থক করা যায় না—বস্তুর অতীত কোন কিছুর সহিত সম্পর্কহীন হইলে বস্তুরও কোন তাৎপর্য থাকে না। তাই অভ্যাস মতো হাত দিয়া ধরিতে গিয়াও তিনি বোঝেন সে সৌন্দর্যকে বস্তুর মতো করিয়া পাইবার উপায় নাই : উহা হৃদয়ের জিনিস—

নেপথ্যে

কেবল একখানা হাত দিয়ে ধরতে চাই ব'লেই সবাই আমার কাছ থেকে পালিয়ে যায়। কিন্তু সব দিয়ে যদি তোমাকে ধরতে চাই, ধরা দেবে কি নন্দিন ?

নন্দিনী

তুমি তো আমাকে ঘরে যেতে দিলে না, তবে কেন এ-সব বলছ ?

নেপথ্যে

আমার অনবকাশের উজান ঠেলে তোমাকে ঘরে আনতে চাই নে। যে দিন পালের হাওয়ায় তুমি অনায়াসে আসবে সেই দিন আগমনীর লগ্ন লাগবে। সে হাওয়া যদি ঝড়ের হাওয়া হয় সেও ভালো। এখনও সময় হয় নি। (পৃ-১৯)।

রবীন্দ্রনাথ বিশ্বাস করেন যে পালের হাওয়া একদিন বহিবেই। আত্মার অবিদ্যার ঘোর কাটিয়া যাইবেই; সৌন্দর্যের সহিত মিলনের লগ্ন একদিন আসিবেই। রাজার কথায় প্রেমের সুর ধ্বনিত হইয়াছে, সুতরাং তাহার মুক্তি যে আসন্ন তাহাতে সন্দেহ নাই।

সেইদিন মিলনের লগ্ন আসে যেদিন প্রতিক্রিয়া চরমে পৌঁছায়; যেদিন হৃদয়ের আনন্দ সম্পূর্ণরূপে নিঃশেষিত হয় সেদিন বেত্রাহত জীবের ন্যায় সহসা আত্মার নিদ্রাভঙ্গ হয়। মকররাজের সেই নিদ্রাভঙ্গ হইল রঞ্জনের মৃত্যুতে। রঞ্জন যৌবন এবং আনন্দের প্রতীক। নিজের অজ্ঞাতসারে নিজের যৌবন এবং জীবনের আনন্দকে ধ্বংস করিয়া তাঁহার চেতনা হইল। তিনি বুঝিলেন, যে আনন্দ রহিয়াছে সৃষ্টির মূলে—যে আনন্দ তাঁহাকেও সৃষ্টি করিয়া তুলিয়া সর্বদিকে বিকশিত করিতে পারিত, যে আনন্দের সৃষ্টি শক্তিকে যৌবন বলিয়া চিহ্নিত করা যাইতে পারে তাহাকে তিনি বহুদিন ধরিয়া তিলে তিলে হত্যা করিয়া নিজেকে বঞ্চিত করিয়াছেন আনন্দের জগৎ হইতে, সৃষ্টির জগৎ হইতে। টিঁকিয়া থাকাই যে প্রাণের সার্থকতা নয়, জীবনের যে একটা মহৎ উদ্দেশ্য আছে তাহা তিনি একটু একটু করিয়া বুঝিতেছিলেন, "এই ব্যাঙ একদিন একটা পাথরের কোটরের মধ্যে ঢুকেছিল। তারই আড়ালে তিন হাজার বছর ছিল টিঁকে। এইভাবে কী করে টিঁকে থাকতে হয় তারই রহস্য ওর কাছ থেকে শিখছিলুম; কী করে বেঁচে থাকতে হয় তা ও জানে না। আজ আর ভালো লাগল না; পাথরের আড়াল ভেঙে ফেললুম, নিরন্তর টিঁকে-থাকার থেকে ওকে দিলুম মুক্তি। ভালো খবর নয়?" (পৃঃ ৪৮-৪৯)। সংবাদটি ভালো সন্দেহ নাই। এই সংবাদটি দিয়া রবীন্দ্রনাথ মানুষের ক্রম পরিবর্তনটি দেখাইয়াছেন। টিঁকিয়া থাকাই যে জীবন নয় এই কথাটা যে উপলব্ধি করে তাহাকে জীবনের সন্ধানে বাহির হইতেই হয় এবং তাহারই ফলে তাহার সম্পূর্ণ জাগরণ হয়। রঞ্জনের মৃত্যুতে যখন আনন্দ রাজার

জীবন হইতে নিঃশেষিত হইল তখনই তাহার পূর্ণ জাগরণ সম্ভবপর হইল। কিছু না হারাইলে তাহা পাইবার আকাঙ্ক্ষা হয় না। আনন্দ হারাইয়া রাজাকে অর্থাৎ আত্মাকে আনন্দের সন্ধানে বাহির হইতে হইল। সকল মানবাত্মার জাগরণ অবশ্যম্ভাবী। রূপ-রূপান্তর, জন্ম-জন্মান্তরের ভিতর দিয়া আমরা সকলেই মহৎ হইয়া উঠিতেছি: সুন্দরের পথেই মানবাত্মার যাত্রা। ভারতের সর্বত্রই এই ধরণের বিশ্বাস ছড়াইয়া আছে,—"আমি জিজ্ঞাসা করলুম, 'তোমাদের এই ধর্মের কথা পৃথিবীর লোককে, সবাইকে, শোনাও না কেন?' সে বললে, 'যার পিপাসা হবে সে গঙ্গার কাছে আপনি আসবে।' আমি জিজ্ঞাসা করলুম, 'তাই কি দেখতে পাচ্ছ? কেউ কি আসছে?' সে লোকটি অত্যন্ত প্রশান্ত হাসি হেসে বললে, 'সবাই আসবে। সবাইকে আসতে হবে'।" (শান্তিনিকেতন: ২য় খণ্ড: আত্মবোধ)। রবীন্দ্রনাথেরও তাহাই বিশ্বাস, সমস্ত মানুষ পৃথিবীর সত্য উত্তরাধিকারের পথে চলিয়াছে। তাহারা প্রতি মুহূর্তেই তাহাদের চেতনাকে বিস্তৃত করিতেছে, উচ্চ হইতে উচ্চতর ঐক্যের সন্ধান করিতেছে। সুতরাং রাজাকেও বাহির হইয়া আসিতেই হইল।

আত্মা অবিনশ্বর, অসীম। বাহিরের জগৎ নানা ছলে তাহাকে যত বন্ধনেই আবদ্ধ করিবার চেষ্টা করুক না কেন মূলতঃ সে স্বাধীন বলিয়াই একদিন সে অবিদ্যার জাল ছিন্ন করিয়া বাহির হইয়া আসে। 'রক্তকরবী'র রাজা অর্থাৎ মানবাত্মাও অবিদ্যারূপ জালের আবরণ ভেদ করিয়া বহির্জগতে আসিয়া দাঁড়াইলেন। তাঁহার পালেও হাওয়া লাগিল কিন্তু তাহা ঝড়ের হাওয়া। তাহাই হয়, দুঃখের ভিতর দিয়াই সত্য উপলব্ধি করিতে হয়—"মনুষ্যত্ব আমাদের পরম দুঃখের ধন, তাহা বীর্যের দ্বারাই লভ্য।......তাহা দুঃখের দ্বারা দুর্লভ, তাহা মৃত্যুর দ্বারা দুর্লভ, তাহা ভয় বিপদের দ্বারা দুর্লভ, তাহা নানাভিমুখী প্রবৃত্তির সংক্ষোভের দ্বারা দুর্লভ। এই দুর্লভ মনুষ্যত্বকে অর্জন করিবার চেষ্টায় আত্মা আপনার সমস্ত শক্তি অনুভব করিতে থাকে। সেই অনুভূতিতেই তাহার প্রকৃত আনন্দ।...সংসারের বিচিত্র অভিঘাতে, দুঃখ বাধার সহিত নিরন্তর সংগ্রামে যে আত্মার সমস্ত শক্তি জাগ্রত, সমস্ত তেজ উদ্দীপ্ত হইয়া উঠিয়াছে, সেই আত্মাই ব্রহ্মকে যথার্থভাবে লাভ করিবার উদ্যম প্রাপ্ত হয়—ক্ষুদ্র আরামের মধ্যে, ভোগবিলাসের মধ্যে যে আত্মা জড়ত্বে আবিষ্ট হইয়া আছে, ব্রহ্মের আনন্দ তাহার নহে, সেইজন্য উপনিষদ্

বলিয়াছেন, "নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ এই আত্মা জীবাত্মাই বল, পরমাত্মাই বল, ইনি বলহীনের দ্বারা লভ্য নহেন।" (ধর্ম : মনুষ্যত্ব)।

রাজাকে বাহির হইয়া আসিয়া তাই সংগ্রাম করিতে হইল। প্রথমেই তিনি তাঁহার ধ্বজা ভাঙিয়া ফেলিলেন। জালের অন্তরালে অবিদ্যায় আবৃত থাকিয়া যিনি ছিলেন কামদেব জালের বাহিরে আসিয়া অবিদ্যা ভেদ করিয়া তিনি ভোগের হাত হইতে মুক্তি পাইয়াছেন। সুতরাং ভোগের প্রতীক ধ্বজাটার আর কোনই সার্থকতা নাই। প্রতি বৎসরই এই ধ্বজা পূজা করিয়া ভোগের আকাঙ্ক্ষাকে নূতন নূতন পথে পরিচালিত করা হইত। স্বর্গের মহান ভাবকেও কামনার প্রতীক পতাকা বিদ্ধ করিয়া মর্তের ভোগাকাঙ্ক্ষার সহিত গ্রথিত করিয়া রাখিয়াছিল। কামনাকে আকাশ স্পর্শী করিযাছিল। রাজা জালের অন্তরাল হইতে বাহির হইয়া আসিয়া প্রথমেই সেই ধ্বজা ভাঙিলেন—রবীন্দ্রনাথ বুঝাইয়া দিলেন যে আত্মা ভোগমুক্ত হইল। প্রজ্ঞায় প্রতিষ্ঠিত হইল। কাহারা তাহাকে প্রতারিত করিয়াছিল তাহাও সে বুঝিয়া লইয়াছে, "ঠকিয়েছে। আমাকে ঠকিয়েছে এরা। সর্বনাশ! আমার নিজের যন্ত্র আমাকে মানছে না (পৃ-৯৬)। তাই রাজাকে সংগ্রাম করিতে হইল নিজের যান্ত্রিক সংগঠনের সর্দার-মোড়ল-কেনারাম গোঁসাইদের সহিত। জয়পরাজযের কথায় রবীন্দ্রনাথ যান নাই তাহা পূর্বেই দেখা গিয়াছে। আত্মা মুক্ত হইয়াছে ইহাই যথেষ্ট, ইহার অতিরিক্ত আর কোন কিছুর প্রয়োজন নাই—"রাজা এত দিন পরে চরম প্রাণের সন্ধান পেয়ে বেরিয়েছে" (পৃ-১০৩)। মানুষের জীবনকে সুন্দর করিয়া তুলিবার উপায় এইখানেই।

এই সর্দার-মোড়লের দল মানুষের ইন্দ্রিয়গুলির প্রতীক, কেনারাম গোঁসাই—ভ্রান্ত ধর্মবোধ যাহা কেবলই মানুষকে কুসংস্কারের অপদেবতার কুক্ষিগত করিয়া রাখে। সুতরাং 'রক্তকবরী' নাটকে অসংযত ইন্দ্রিয় প্রদর্শিত ভ্রান্ত পথে না চলিবার জন্য আত্মার বিরোধিতার চিত্র অঙ্কন করা হইয়াছে। ভোগ আকাঙ্ক্ষা জিনিসটা এমনই যে আত্মার মুক্ত স্বভাবকেও বহুদিন পর্যন্ত আচ্ছন্ন করিয়া রাখে। আত্মাকে আচ্ছন্ন করিয়া রাখার, তাহাকে নিয়ন্ত্রণ করার যে প্রচেষ্টা ইন্দ্রিয়গুলি করে তাহা বেশীদিন সম্ভব হয় না—মুক্ত আত্মা অধিক দিন অবিদ্যায় আবদ্ধ থাকে না—

Man's cry is to reach his fullest expression It is this desire

for self-expression that leads him to seek wealth and power. But he has to discover that accumulation is not realisation. It is the inner light that reveals him, not outer things, when this light is lighted, then in a moment he knows that Man's highest revelation is God's own revelation in him. And his cry is for this—the manifestation of his soul, which is the manifestation of God in his soul. Man becomes perfect man, he attains his fullest expression, when his soul realises itself in the Infinite being who is Āvih whose very essence is expression". (Sādhanā : p-40).

এই নাটকে আত্মাকে শেষ সংগ্রাম করিতে হইযাছে সর্দারের দলের সঙ্গে। বড সর্দার হইতেছে 'মন'। বিশুর মুখ দিযা রবীন্দ্রনাথ তাহার পরিচয় দিয়াছেন—

বিশু

স্ত্রীবুদ্ধিতে সর্দারকে এখনো চেন নি বুঝি ?

চন্দ্রা

কেন, ওকে দেখে তো আমার বেশ—

বিশু

হাঁ, বেশ ঝক্‌ঝকে। মকরের দাঁত, খাঁজে খাঁজে বড়ো পরিপাটি করে কামড়ে ধরে। মকররাজ স্বযং ইচ্ছে করলেও আলগা করতে পারে না। (পৃ-৩০)।

যতক্ষণ আত্মা মকররাজ, অর্থাৎ অবিদ্যায় আবদ্ধ ততক্ষণ মনই তাহাকে নিয়ন্ত্রণ করে। নিজের সত্য স্বরূপ না জানিয়া আত্মা যতদিন মেঘাচ্ছন্ন থাকে ততদিন মনের মোড়লি যায় না। ততদিন সে-ই মানুষটার স্থান অধিকার করিয়া থাকে। গজ্জুপালোয়ানও বলিয়াছে, "সমস্তই সেই তো ঘটিয়েছে" (পৃ-৭০)। মনই তখন সকল কিছু ঘটায়। আত্মাকে ঘুম পাডাইয়া রাখিবার জন্য এই সমাজ ব্যবস্থায় মারণ চণ্ডীর ব্রত হয় এবং তাহার পরই হয় ধ্বজা পূজা এবং অস্ত্র পূজা। অর্থাৎ প্রথমে সৃষ্টি করা হয উন্মাদনা, তাহার পর জাগ্রত করা হয় ভোগের আকাঙ্ক্ষা এবং শেষে সেই ভোগের প্রতিষ্ঠার জন্য করা হয় যুদ্ধ সজ্জা। মানুষের অখণ্ডবোধকে নষ্ট করিবার জন্য নানা প্রকারের ফাঁদ পাতা থাকে এই ব্যবস্থায়। মদের ভাণ্ডারের

পাশেই থাকে অস্ত্রশালা এবং তাহার পাশেই মন্দির। ইহাদের ধর্মাচরণ মিথ্যা ফাঁদ মাত্র। কেনারাম গোঁসাইও সর্দার ব্যতীত আর কিছুই নয়, "এ ছাড়া একজন গোঁসাইজি আছেন, তিনি নাম গ্রহণ করেন ভগবানের কিন্তু অন্ন গ্রহণ করেন সর্দারের। তাঁর দ্বারা যক্ষপুরীর অনেক উপকার ঘটে" (রক্তকবরী : নাট্যপরিচয়)। এখানে মানুষ মদের নেশা করিয়া ঘৃণিত, জীবন, অস্ত্রপূজার দ্বারা ভীতিপূর্ণ জীবন এবং তথাকথিত ঈশ্বর প্রতিনিধির পেষণে দীন এবং মিথ্যায় পরিপূর্ণ জীবন যাপন করিতে অভ্যস্ত হয়। মানুষ যতদিন এইরূপ জীবন কাটায় ততদিন আর তাহাকে মানুষ বলা যায় না। সেইজন্য মানুষের আত্মাকে উদ্ধার করিতে নন্দিনী রাজাকে বলে, "তোমাকে তাই তারা জাল দিয়ে ঘিরে অদ্ভুত সাজিয়ে রেখেছে। এই জুজুর পুতুল সেজে থাকতে লজ্জা করে না (পৃ-৫১)। আত্মার সত্যরূপ তাহার প্রেমিক রূপ। কিন্তু তাহাকে যখন ইন্দ্রিয়গুলি ভোগের জাল দিয়া ঘেরে তখন তাহার হিংস্ররূপটিই প্রকাশিত হয়। ভোগের রাজ্যের যে হাওয়া যক্ষপুরীতে প্রবাহিত হয় তাহা মানুষকে সর্বনাশের পথে লইয়া যায়। সেইখানেই বিশুর ভয়, "যক্ষপুরীর হাওয়ায় সুন্দরের 'পরে অবজ্ঞা ঘটিয়ে দেয়, এইটেই সর্বনেশে। নরকেও সুন্দর আছে, কিন্তু সুন্দরকে কেউ সেখানে বুঝতেই পারে না, নরকবাসীর সব চেয়ে বড়ো সাজা তাই" (পৃ-২৪)। ইন্দ্রিয় যখন আত্মার সত্যবোধের সাহায্যকারী না হইয়া তাহার পরিপন্থী হয় তখন এইরূপই হইয়া থাকে। ভোগলিপ্সু মন কেবল যে সৌন্দর্যের উপলব্ধিতেই বাধা সৃষ্টি করে তাহাই নহে, সে সৌন্দর্যকেও চূর্ণ করিতে চায়, "তার পরে শেষ বোঝাপড়া হবে তোমাতে আমাতে। বেশি দেরি নেই" (পৃ-৭৬)। এই বোঝাপড়াই কিন্তু মনকেও সচেতন করে। কারণ সৌন্দর্যের আকর্ষণ এড়াইবার সাধ্য কাহারও নাই, "সুন্দর আপনি সুন্দর এবং অন্যকে সুন্দর করে। কারণ, সৌন্দর্য হৃদয়ে প্রেম জাগ্রত করিয়া দেয়, এবং প্রেমই মানুষকে সুন্দর করিয়া তুলে" (আলোচনা : সুন্দর সুন্দর করে : পৃ-৭২)। তাই একদিকে যে সর্দার বলে যে রাজার প্রতি কর্তব্যের অনুরোধেই রাজাকে ঠকাইতে হয় এবং ঠেকাইতেও হয় অর্থাৎ রাজাকে বিশুদ্ধ আনন্দের সন্ধান হইতে আড়ালে রাখিয়া, ভোগের জগতে টানিয়া রাখিয়া সংসারের ক্ষুদ্র দিকটাতে যে আবদ্ধ রাখিতে চায় এবং তাহার সমস্ত দায় যে নিজের স্কন্ধে গ্রহণ করে, সেই আবার তাহার চোখেও কর্তব্যের

রঙের সঙ্গে রক্তকরবীর রঙ মিশিয়াছে শুনিয়া স্বীকার করে যে মনের কথা মন নিজেও জানে না। সেইজন্য শেষ সংগ্রামের সময় সর্দার নন্দিনীর দেওয়া কুন্দ ফুলের মালা বর্শার ফলকে ঝুলাইয়া দিয়াছে। মন সর্দারি বজায় রাখিবার জন্য শেষ চেষ্টা করিতে আসিয়াও শুভ্রতার স্পর্শ আর ভুলিয়া থাকিতে পারিতেছে না। কিন্তু সেই পবিত্রতাকেও জীবনের রঙে রঞ্জিত করা চাই। মনে সেই জীবন সঞ্চার করিবার জন্যই নন্দিনী বলে, "ওই মালাকে আমার বুকের রক্তে রক্তকরবীর রঙ করে দিয়ে যাব" (পৃ-১০২)।

মনের সঙ্গেই আত্মার সংগ্রাম। মন চায় আত্মাকে মায়ায় আবদ্ধ করিয়া রাখিতে, আত্মা চায় মনের প্রলোভনকে তুচ্ছ করিয়া মুক্তিলাভ করিতে। নিজের আনন্দ পরিপূর্ণরূপে ধ্বংস হইবার পর আত্মা বুঝিতে পারে যে ইন্দ্রিয়রা তাহাকে ঠকাইয়াছে। ইন্দ্রিয়গুলি আত্মারই যন্ত্রস্বরূপ—সংযত ইন্দ্রিয় আত্মাকে সত্য উপলব্ধি করায়, অসংযত ইন্দ্রিয় আত্মাকে ভ্রান্ত পথে আকর্ষণ করিবার চেষ্টা করে। রাজা জালের অন্তরাল হইতে বাহির হইয়া আসিয়া সেইজন্যই বলিয়াছিলেন, "ঠকিয়েছে। আমাকে ঠকিয়েছে এরা। সর্বনাশ। আমার নিজের যন্ত্র আমাকে মানছে না" (পৃ-৯৬)। অসংযত ইন্দ্রিয়ের শক্তি অপরিসীম, "পথঘাট আটক করতে সর্দারের মতো কাউকে দেখি নি" (পৃ-১০২)। তাই আত্মা মনের সঙ্গে শেষ সংগ্রামে বাহির হইয়াছে—

ফাগুলাল

সর্দাররা খবর পেলেই ঠেকাতে আসবে।

রাজা

তাদের সঙ্গে আমার লড়াই। (পৃ-১০১)

সর্দারকে যেমন মন বলা যায়, মেজো সর্দারকে তেমনি বলা যায় চক্ষু। চক্ষুই প্রথমে সুন্দরকে দেখে, আনন্দের লীলায়িত ছন্দের পরিচয় পায়—

ছোটো সর্দার

রঞ্জনকে বাঁধতে চলেছি।

সর্দার

তুমি কেন? মেজো সর্দার কোথায়?

ছোটো সর্দার

ওকে দেখে তাঁর এত মজা লেগেছে, তিনি ওর গায়ে হাত দিতেই চান না। বলেন, 'আমরা সর্দাররা কিরকম অদ্ভুত হয়ে উঠেছি, সে ওর হাসি দেখলে বুঝতে পারি।' (পৃ-৬০)।

মোড়ল মেজো সর্দার সম্বন্ধে সর্দারকে বলে, "মেজো সর্দার-বাহাদুর ওই আসছেন। ওঁকে আমার হয়ে দুটো কথা বললেন। আমার উপর ওঁর ভালো নজর নেই" (পৃ-৮৪)। তাই সর্দারদের মধ্যে সর্বপ্রথম তাহাকেই নন্দিনীতে পাইয়াছিল। সর্দার, ছোটো সর্দার অথবা কেনারাম গোঁসাই যে কাজ সহজেই করিতে পারে সে কাজ মেজো সর্দারের পক্ষে অসম্ভব হইয়া উঠিয়াছিল।

বিশু আনন্দের অপর পিঠ দুঃখ। দুঃখ আনন্দের বিপরীত নয়। উহারা উভয়ে মিলিয়া জীবনের অখণ্ড রূপ। বিশু নিজেই বলিয়াছে, "আমি রঞ্জনের ও-পিঠ, যে পিঠে আলো পড়ে না --আমি অমাবস্যা" (পৃ-৪৭)। আনন্দ লাভের জন্যই দুঃখ বরণ। সুন্দরের চেতনা দুঃখকে বরণ করিতে প্রেরণা দেয়।

চন্দ্রা

তোমার বিশুদাদার আশা আর রেখো না। কোন্ সুখে ও তোমাকে ভুলিয়েছে বলো দেখি বেয়াই।

বিশু

ভুলিয়েছে দুঃখে। (পৃ-৩৭)

নন্দিনীকে সেই জন্যই সে 'দুখজাগানিয়া' বলে। বিশু যক্ষপুরীতে আসিয়া চরের কাজে লাগিয়াছিল—যক্ষপুরীর মানুষগুলির গোপন দুঃখের পরিচয় গ্রহণ করার সুযোগ তাহার ছিল কিন্তু দুঃখকে এইরূপ গোপনে রাখিয়া দিবার কাজটা তাহার বেশীদিন ভাল লাগে নাই—সে চরের কাজ ছাড়িয়া বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইল। রবীন্দ্রনাথ ইহার দ্বারা বুঝাইয়াছেন যে, যক্ষপুরীর যে মানুষগুলির দুঃখ ছিল গুপ্ত তাহা কিছুদিনের মধ্যেই প্রকাশ পাইল। সর্দাররা তাহাকে এইবার বন্দী করিল, কিন্তু বন্দীশালা ভাঙিয়া যক্ষপুরীর মানুষগুলি তাহাকে উদ্ধার করিল। সকলে মিলিয়া দুঃখকে স্বীকার করিয়া মুক্তি সংগ্রামে আত্মার সহিত ঝাঁপাইয়া পড়িল। আত্মা মুক্তির জন্য যখন সংগ্রামে অবতীর্ণ হয় তখন আর কোন চিন্তা থাকে

না। মুক্তির আগ্রহ জাগিলে কোন এক সময় নিশ্চয়ই বন্ধন ছিন্ন করিয়া সে আনন্দের জগতে আসিয়া দাঁড়ায়। মুক্ত আত্মার মনের মধ্যে রঞ্জন পুনরায় বাঁচিয়া ওঠে : আনন্দের মৃত্যু নাই—

ফাগুলাল

সর্বনাশ! ওই কি রঞ্জন! নিঃশব্দ পড়ে আছে!

নন্দিনী

নিঃশব্দ নয়। মৃত্যুর মধ্যে তার অপরাজিত কণ্ঠস্বর আমি যে এই শুনতে পাচ্ছি। রঞ্জন বেঁচে উঠবে—ও কখনো মরতে পারে না।

ফাগুলাল

হায় রে নন্দিনী, সুন্দরী আমার! এইজন্যই কি তুমি এতদিন অপেক্ষা করে ছিলে আমাদের এই অন্ধ নরকে!

নন্দিনী

ও আসবে বলে অপেক্ষা করে ছিলুম, ও তো এল। ও আবার আসার জন্যে প্রস্তুত হব, ও আবার আসবে। (পৃঃ ১০০-১০১)।

বারবার মানুষের আত্মা মায়াচ্ছন্ন হইতে পারে কিন্তু বার বারই সে মুক্তির জন্য সংগ্রাম করিয়া আনন্দের জগৎ সৃষ্টি করিবে। সেইজন্য নন্দিনী রক্তকরবীর কঙ্কণটি ফেলিয়া গিয়াছে। যুগে যুগে সংগ্রাম করিয়া প্রাণের জীবনী শক্তির পরিচয় দিতে হইবে দুঃখের ভিতর দিয়া—তাই বিশুকেই, দুঃখকেই সেই রক্তকরবীর কঙ্কণ তুলিয়া লইতে হইল।

মানুষের পরিবর্তন না হইলে সমাজের সর্বাঙ্গীন মুক্তি অসম্ভব রবীন্দ্রনাথের তাহাই ছিল অন্তরের গভীর বিশ্বাস—'উপায়' নামক পত্রিকার ভূমিকায় তিনি সেকথা স্পষ্ট করিয়াই বলিয়াছেন। উপনিষদের পরিবেশে বর্ধিত রবীন্দ্রনাথ জগতের সামঞ্জস্যেই একান্ত বিশ্বাসী ছিলেন। যদি সমস্ত জগৎ ব্রহ্মের দ্বারা আবৃত হয় তবে শেষ পর্যন্ত জগতের সামঞ্জস্য নষ্ট হইতেই পারে না, ভারসাম্য থাকিবেই। সুতরাং আত্মার মুক্তি এবং তাহার অখণ্ডতার উপলব্ধি হইবেই। এই গভীর বিশ্বাস তাঁহাকে পৃথিবীর ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে আশান্বিত করিয়াই রাখিয়াছিল। যুক্তি দিয়া হয়ত ইহাকে প্রতিষ্ঠিত করা যায় না কিন্তু বিশ্বাস দিয়া পুষ্ট করা যায়। রবীন্দ্রনাথের এই আশাবাদী মনের পরিচয় সর্বত্রই পাওয়া যায়—

"We must know with absolute certainty that essentially we are spirit. This we can do by winning mastery over self, by rising above all pride and greed and fear, by knowing that worldly losses and physical death can take nothing away from the truth and the greatness of our soul. The chick knows when it breaks through the self centred isolation of its egg that the hard shell which covered it so long was not really a part of its life. That shell is a dead thing, it has no growth; it affords no glimpse whatever of the vast beyond that lies outside it. However pleasantly perfect and rounded it may be, it must be given a blow to, it must be burst through and thereby the freedom of light and air be won, and the complete purpose of bird life be achieved". (Sādhanā-p-30).

আত্মার জাগরণও এইরূপেই হয়। ইন্দ্রিয়গুলিকে বশীভূত করিয়া, নিয়ন্ত্রণ করিয়া তবেই সে মুক্ত হয়। জাগ্রত আত্মার উজ্জ্বল আলোক অবিদ্যার অন্ধকার দূরীভূত করে।

রথের রশি

১৩৩৯ : ১৯৩২

'রথের রশি' এবং 'কবির দীক্ষা' নামক রচনা মিলিয়া 'কালের যাত্রা'। রবীন্দ্রনাথ 'কালের যাত্রা' শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের ৫৭তম জন্মোৎসব উপলক্ষে তাঁহার নামে উৎসর্গ করেন। "১৩৩০ সালের অগ্রহায়ণ সংখ্যা প্রবাসীতে (পৃ: ২১৬-২২৫) রথযাত্রা নামে রবীন্দ্রনাথের একটি 'নাটিকা প্রকাশিত হয়। 'রথের রশি' তাহারই পরিবর্তিত ও আগাগোড়া পুনর্লিখিত রূপ" (রবীন্দ্র রচনাবলী : ২২শ খণ্ড : গ্রন্থপরিচয়)।

'রথযাত্রা' রচনার কিছু পরে 'রক্তকরবী' লেখা হইয়াছিল। 'রক্তকরবী' নাটকের নামকরণে পরিবর্তন সাধনে রবীন্দ্রমানসের যে পরিচয় পাওয়া গিয়াছে, সেই পরিচয়ই লক্ষিত হয় 'রথযাত্রা' নামটির পরিবর্তনের মধ্যে। 'রথযাত্রা' নামটি বিশেষ করিয়া রথের যাত্রার দিকেই দৃষ্টি আকর্ষণ করে। 'রথের রশি' নামটি অধিকতর সঙ্কেত পূর্ণ—রথ যে রশির টানে চলে তাহার দিকেই ইহা দৃষ্টি ফিরায়। দৃষ্টি বাহিরের দিক হইতে অন্তর্মুখী হয়। গ্রন্থখানি উৎসর্গ করিয়া তিনি শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়কে যাহা লেখেন তাহাতে তাঁহার সেই উদ্দেশ্য স্পষ্ট হইয়াছে—"রথযাত্রার উৎসবে নরনারী সবাই হঠাৎ দেখতে পেলে, মহাকালের রথ অচল। মানবসমাজের সকলের চেয়ে বড়ো দুর্গতি কালের এই গতিহীনতা। মানুষে মানুষে যে সম্বন্ধবন্ধন দেশে দেশে যুগে যুগে প্রসারিত, সেই বন্ধনই এই রথ টানার রশি। সেই বন্ধনে অনেক গ্রন্থি পড়ে গিয়ে মানবসম্বন্ধ অসত্য ও অসমান হয়ে গেছে, তাই চলছে না রথ। এই সম্বন্ধের অসত্য এতকাল যাদের বিশেষভাবে পীড়িত করেছে, অবমানিত করেছে, মনুষ্যত্বের শ্রেষ্ঠ অধিকার থেকে বঞ্চিত করেছে, আজ মহাকাল তাদেরই আহ্বান করছেন তাঁর রথের বাহনরূপে, তাদের অসম্মান ঘুচলে তবেই সম্বন্ধের অসাম্য দূর হযে রথ সম্মুখের দিকে চলবে।" (বিচিত্রা ১৩৩৯ কার্তিক : পৃ-৪৯২)।[১]

এই রথ মানব সমাজের প্রতীক। সমাজ বহুদিন হইতে চলিয়াছে, তাহার সেই চলাতেই সৃষ্টি হইয়াছে মানব সভ্যতার ইতিহাস। সমাজের

১। প্রভাত কুমার মুখোপাধ্যায় : রবীন্দ্র জীবনী : ৩য় খণ্ড : পৃ-৪৪৩।

আদি যুগে তাহাকে নিয়ন্ত্রণ করিয়াছেন পুরোহিতেরা : তাঁহাদের ঈশ্বর ও মানুষের মধ্যকার যোগসূত্র বলিয়া একদিন মনে করা হইত। গোষ্ঠীবদ্ধ জীবনের দিনে এবং তাহারও পরে যাঁহারা মন্ত্রতন্ত্রের দ্বারা রহস্যময়তা সৃষ্টি করিতেন তাঁহারই ছিলেন সমাজের উচ্চস্তরে। জ্ঞানের ক্ষেত্রেও তাঁহারা অনেক উঁচুতে উঠিয়াছিলেন। তারপর চক্র আবর্তিত হইল—তাঁহাদের মনে জ্ঞানের সাধনার পরিবর্তে দেখা দিল অহংবোধের খণ্ড দৃষ্টি। ফলে সংঘাত দেখা দিল অপর শ্রেণীর সহিত—সমাজ পরিচালনার অধিকার আর তাঁহাদের হাতে থাকিল না—

সেদিন নেই রে
যেদিন পুরুতের মন্তর-পড়া হাতের টানে চলত রথ।
ওরা ছিল কালের প্রথম বাহন। (পৃ-৫)

গোষ্ঠী তথা রাজ্য রক্ষার জন্য সৃষ্টি হইল যোদ্ধার দল। জ্ঞানের দ্বারাই কেবল রাজ্য রক্ষা সম্ভব হইল না। যেখানে সত্য জ্ঞানের আলোক সর্বত্র ছড়াইয়া না পড়ে সেখানে অস্ত্র ব্যবসায়ীকে ঠেকাইয়া রাখা যায় না। সেও সমাজের শক্তি অধিকার করে। একদিন অস্ত্রশক্তির জোরে তাহারাও সমাজে মর্যাদা আদায় করিয়া লয়। পুরোহিতদের সঙ্গে রাজশক্তির সংঘাত পৃথিবীর সর্বত্রই হইয়াছে। ভারতবর্ষেও ব্রাহ্মণ এবং ক্ষত্রিয়ের মধ্যে এক সময় শক্তির পরীক্ষা হইয়াছে। পরবর্তীকালে পরস্পরের মধ্যে সামঞ্জস্য করিয়া তাহারা উভয়েই সমাজের উপর কর্তৃত্ব করিত। কিন্তু রক্তলোলুপ মানুষের পক্ষে মহাকালের রথ টানা বেশী দিন সম্ভব নয়। মানুষকে শঙ্কিত রাখিয়া অধিক দিন মর্যাদা বজায় রাখা কাহারও পক্ষে সম্ভব নয়। অস্ত্র ব্যবসায়ীদের ক্ষেত্রেও তাহাই হইল : সমাজরথের নিয়ন্ত্রণের প্রধান শক্তি হইয়া আর তাহারা থাকিতে পারিল না—

স্বয়ং রাজা লাগালেন হাত, আমরাও ছিলুম পিছনে।
একটু ক্যাঁচ্‌কোচও করলে না চাকাটা। (পৃ-১১)

সমাজ নিয়ন্ত্রণের অক্ষমতা দেখিয়া সৈনিক বিস্মিত হয়—সন্নাসী বুঝাইয়া দেয় যে রক্ত-চক্ষুর দাপট অধিক দিন থাকে না—

প্রথম সৈনিক

এই-যে সন্ন্যাসী, রথ চলে না কেন আমাদের হাতে।

সন্ন্যাসী

তোমরা দড়িটাকে করেছ জর্জর।
যেখানে যত তীর ছুঁড়েছ, বিঁধেছে ওর গায়ে।
ভিতরে ভিতরে ফাঁক হয়ে গেছে, আলগা হয়েছে বাঁধনের জোর।
তোমরা কেবল ওর ক্ষত বাড়িয়েই চলবে,
বলের মাৎলামিতে দুর্বল করবে কালকে।
সরে যাও, সরে যাও ওর পথ থেকে। (পৃঃ ১৩-১৪)

একদিন তাই ইহাদেরও সরিয়া দাঁড়াইতে হইল।

সমাজ বিবর্তন এইখানেই থামিয়া যায় নাই। দেশের বিভিন্ন ভোগ্য সামগ্রীর উৎপাদন যখন উদ্বৃত্ত হইতে লাগিল তখন সমাজে স্থান পাইল আর একটি শ্রেণী—ইহারা শিল্পপতি, ব্যবসায়ী। রবীন্দ্রনাথ তাহাদের পরিচয় দিয়াছেন 'ধনিক' বলিয়া, ইহাদের দলপতি শেঠজি। ভারতবর্ষে ইহাদের বৈশ্য বলা হয়। আজিকার দিনে বৈশ্যের শক্তিই প্রধান: শিল্পপতিরাই আজ করে সমাজে কর্তৃত্ব—রাজশক্তি পর্যন্ত তাহাদের ইঙ্গিতেই পরিচালিত হয়।

দ্বিতীয় নাগরিক

এদিকে আবার কোন্ বুদ্ধিমান বলেছে রাজাকে,—
কলিযুগে না চলে শাস্ত্র, না চলে শস্ত্র,
চলে কেবল স্বর্ণচক্র। তিনি ডাক দিয়েছেন শেঠজিকে।

প্রথম সৈনিক

রথ যদি চলে বেনের টানে
তবে গলায় অস্ত্র বেঁধে জলে দেব ডুব।

দ্বিতীয় সৈনিক

দাদা, রাগ কর মিছে, সময় হয়েছে বাঁকা।
এযুগে পুষ্পধনুর ছিলেটাও
বেনের টানেই দেয় মিঠে সুরে টঙ্কার।
তার তীরগুলোর ফলা বেনের ঘরে শানিয়ে না আনলে
ঠিক জায়গায় বাজে না বুকে।

তৃতীয় সৈনিক

তা সত্যি। একালের রাজত্বে রাজা থাকেন সামনে,

পিছনে থাকে বেনে। যাকে বলে অর্ধ-বেনে-রাজেশ্বর মূর্তি।

(পৃঃ ১২-১৩)

কিন্তু ইহাদের টানেও আর সমাজ-রথ চলিতে চাহে না। ক্ষমতা হস্তান্তরের প্রয়োজন হইয়াছে তাহা বেশ বোঝা যাইতেছে। তৃতীয় ধনিকের কণ্ঠে তাহাই শোনা যায়—

মন্ত্রীমশায়, রশিটা যেন আরও আড়ষ্ট হয়ে উঠল,

আর আমাদের হাতে হল যেন পক্ষাঘাত। (পৃ-১৯)

ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়-বৈশ্য এই তিন শ্রেণী পরস্পরের মধ্যে বোঝাপড়া করিয়া সমাজ নিয়ন্ত্রণকারীর আসন অধিকার করিয়াছিল। অথচ ইহাদের পরস্পরের মধ্যেও বিন্দুমাত্র সদ্ভাব ছিল না। আবার ইহাদের বাহিরে পড়িয়া রহিল বিপুল সংখ্যক মানুষ—সমাজের বোঝা তাহারাই বহিয়া বেড়ায়—

চাষী ক্ষেতে চালাইছে হাল,

তাঁতি ব'সে তাঁত বোনে, জেলে ফেলে জাল ;

বহুদূর-প্রসারিত এদের বিচিত্র কর্মভার,

তারি 'পরে ভর দিয়ে চলিতেছে সমস্ত সংসার।

(জন্মদিনে : ঐকতান)।

আজ এই নিপীড়িত মানুষের অভ্যুত্থানের সময় আসিয়াছে। তাই পৃথিবী-ব্যাপী আন্দোলন দেখা দিয়াছে সাধারণ মানুষের মধ্যে। শ্রেণী সংগ্রাম আসন্ন : সমাজ-রথ এইবার শ্রমিকের হাতের টানে চলিবে –নূতন যুগের সারথির আসন গ্রহণ করিবে তাহারা। দেওয়ালের লিখনের ন্যায় অদৃশ্য লিখন পড়িবার দৃষ্টি যাহার আছে সেই নূতন যুগের বার্তা পড়িতে পারে। শ্রমিক দলপতির মুখে তাই শুনি—

কেমন করে জানা গেল সে তো কেউ জানে না।

ভোরবেলায় উঠেই সবাই বললে সবাইকে,

ডাক দিয়েছেন বাবা। কথাটা ছড়িয়ে গেল পাড়ায় পাড়ায়,

পেরিয়ে গেল মাঠ, পেরিয়ে গেল নদী,

পাহাড় ডিঙিয়ে গেল খবর—
ডাক দিয়েছেন বাবা। (পৃ-২৫)

রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিতে নূতন যুগের লিখন স্পষ্ট হইয়া উঠি াছে। তিনি বুঝিয়াছেন যে সাধারণ মানুষের দিন আসিয়াছে। অহংবোধের আঘাত খাইয়া মহাকাল আজ আহ্বান করিয়াছেন নীচের মানুষকে: এইবার সমাজ মঞ্চের নায়ক হইবে শূদ্র। তাহার স্পর্শে সমাজ-রথে প্রাণ সঞ্চার হইল—

আয় ভাই, দেখছিস রথচূড়ায় কেতনটা উঠছে দুলে।
বাবার ইশারা। ভয় নেই আর, ভয় নেই।
ঐ চেয়ে দেখ্‌রে ভাই,
মরা নদীতে যেমন বান আসে
দড়ির মধ্যে তেমনি প্রাণ এসে পৌঁছেচে। (পৃ-২৭)

স্বামী বিবেকানন্দও বলিযাছেন, "ব্রাহ্মণ, ক্ষত্র, বৈশ্য, শূদ্র চারিবর্ণ পর্যায়ক্রমে পৃথিবী ভোগ করে" [২]। সমাজের ইতিহাস এই রূপেই সৃষ্টি হইতেছে সত্য। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ ইহাকেই চূড়ান্ত বলিয়া স্বীকার করেন না। যাহা ঘটিয়াছে এবং যাহা ঘটিতে চলিয়াছে তাহারই ভিত্তিতে তিনি সমাধান করিতে চাহিয়াছেন মূল সমস্যার। ব্রাহ্মণ. ক্ষত্রিয়, বৈশ্য সমাজ পরিচালনা করিতে পারিল না কেন তাহা বিশ্লেষণ করিলেই সমাধানের সূত্রের সন্ধান পাওয়া যাইবে। অহংবোধে আচ্ছন্ন হইয়া ব্রাহ্মণ পরবর্তীকালে শুচিতা হারাইয়া ফেলিয়াছিল। তাই তাহার মন্ত্রে আব কোন কাজই হয় না। যে মন্ত্র ছিল সংযমের উপায় স্বরূপ তাহাকে নানা লাভের কাজে প্রয়োগ করিয়া সে পতিত হইয়াছে। একদিন যে ছিল ত্যাগী সেই পরবর্তী কালে ভোগের উপাসক হইয়া মানুষে মানুষে দুস্তর ব্যবধান সৃষ্টি করিয়াছে। তাই সমাজ-রথের দড়ি আকর্ষণ করিতে পুরোহিত, মহাকালের পাণ্ডা আজ অক্ষম।

অহংবোধ, লোভ, রক্তলোলুপতা এবং অর্থগৃধ্নুতা তাই তিনি ত্যাগ করিতে বলিয়াছেন। এই দুর্বলতাই পাইয়া বসিয়াছে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্যকে। এই পথে মানুষের তথা সমাজের উদ্ধার নাই। অন্তরের শুচিতা

২। বর্তমান ভারত: পৃ-১৮

হারায় বলিয়া মিলনের কথা তাহারা ভাবিতেও পারে না। রবীন্দ্রনাথ সেইজন্যই শুচিশুদ্ধ মনের উদ্বোধন কামনা করিয়াছেন—

এসো ব্রাহ্মণ, শুচি করি মন
ধরো হাত সবাকার,
এসো হে পতিত, করো অপনীত
সব অপমানভার। (গীতাঞ্জলি : ১০৬ সংখ্যক কবিতা)।

সমাজের যে বিবর্তন হইতেছে, শূদ্র অর্থাৎ যাহারা সেবা করে, শ্রম করে তাহাদের হাতে যে সমাজের পরিচালনার ভার ধীরে ধীরে আসিতেছে স্বামী বিবেকানন্দও তাহা বিশেষভাবে লক্ষ্য করিয়াছিলেন. "…এ মায়ার সংসারের আসল প্রহেলিকা, আসল মরু-মরীচিকা, তোমরা-ভারতের উচ্চ বর্ণেরা।… তোমরা শূন্যে বিলীন হও। আর নূতন ভারত বেরুক। বেরুক লাঙ্গল ধরে, চাষার কুটীর ভেদ করে, জেলে, মালা, মুচি, মেথরের ঝুপ্‌ড়ির মধ্য হতে। বেরুক মুদির দোকান থেকে, ভুনাওয়ালার উনুনের পাশ থেকে। বেরুক কারখানা থেকে, হাট থেকে, বাজার থেকে। বেরুক ঝোড, জঙ্গল, পাহাড়, পর্বত থেকে। এরা সহস্র সহস্র বৎসর অত্যাচার সয়েচে, নীরবে সয়েচে, তাতে পেয়েচে অপূর্ব সহিষ্ণুতা। সনাতন দুঃখ ভোগ করেচে—তাতে পেযেচে অটল জীবনী-শক্তি। ……অতীতের কঙ্কালচয়—এই সামনে তোমার উত্তরাধিকারী ভবিষ্যৎ ভারত।……তুমি যাও হাওয়ায় বিলীন হয়ে, অদৃশ্য হয়ে যাও, কেবল কাণ খাডা রেখো; তোমার চাই বিলীন হওয়া, অমনি শুনবে কোটি জীমূত স্যন্দী ত্রৈলোক্য কম্পনকারী ভবিষ্যৎ ভারতে উদ্বোধন ধ্বনি 'ওয়াহ গুরু কি ফতে'।" (পরিব্রাজক : পৃ : ৪২-৪৪)

স্বামীজী শ্রমিক-চাষী-নিপীড়িত মানবের জাগরণের কথাই বলিয়াছেন। মনে হয় যে তিনি মনে করিতেন এই জাগরণের ফলেই সমাজে পূর্ণতা আসিবে। সমাজ-রথ আর থামিয়া থাকিবে না। রবীন্দ্রনাথ কিন্তু তাহা মনে করিতেন না। জাগরণ তো অবশ্যই চাই। কিন্তু কেবল শ্রমিক-চাষী-নিপীড়িত মানবের জাগরণ হইলেই তো হইবে না—সমাজে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্যেরাও তো আছে। তাহারাও সমাজেরই মানুষ। সমাজ-রথে তাহাদেরও একটা স্থান আছে। সেই জন্যই সমস্যার সমাধানকে তিনি

বাহিরের বিষয় বলিয়া কখনও মনে করেন নাই[৩]। তিনি নিপীড়িত মানবের নব জাগরণকে অভিনন্দন করিয়াছেন সন্দেহ নাই—

আজকের মতো বলো সবাই মিলে—
যারা এতদিন মরেছিল তারা উঠুক বেঁচে,
যারা যুগে যুগে ছিল খাটো হয়ে
তারা দাঁড়াক একবার মাথা তুলে। (পৃ-৩৮)

একদল মানুষ নীচে পড়িয়া থাকিলে সমাজের প্রগতি অসম্ভব, কিন্তু এই নবজাগরণের ফলেই যে সমস্যার চূড়ান্ত সমাধান হইবে তাহাও নয। তিনি কেবল 'আজকের মতো' নবজাগরণকে অভিনন্দন করিতে বলিয়াছেন—উহার মধ্যে যে একটা 'কল্যকার' কথাও আছে সেই ইঙ্গিত তিনি দিয়াছেন 'আজকের মতো' কথাটির মধ্যেই। শ্রমিক-চাষী-নিপীড়িত মানবের জাগরণের পরবর্তী কথাটা 'রথের রাশি'র কবির মুখ দিয়া রবীন্দ্রনাথ ঘোষণা করিয়াছেন—

তার পরে কোন্-এক যুগে কোন্-একদিন
আসবে উল্‌টোরথের পালা। (পৃ-৩৭)

ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়-বৈশ্যের মনে যদি শক্তির মত্ততা প্রবেশ করিয়া রথের রশিকে আলগা করিয়া দিয়া তাহাদের টানিবার শক্তিই নষ্ট করিযা দেয় তবে নিপীড়িত মানুষের ক্ষেত্রেও যে একদিন এইরূপ হইতে পারে তাহাতে আশ্চর্য কিছুই নাই। জাগরণের পর তাহারা নিজেদের শক্তি উপলব্ধি করে, স্পষ্ট লক্ষ্য করে যে তাহাদের আকর্ষণে রথ সোজা চলে ধনিকের ধন ভাণ্ডারের দিকে, সৈনিকের অস্ত্রশালার দিকে। সুতরাং সমাজ চক্রের ঘূর্ণয়ণ নিপীড়িত মানবের জয় লাভেই শেষ না হইবারই সম্ভাবনা। নিজেদের শক্তির পরিচয় পাইয়া ইহারাও সম্ভবত একদিন অহংবোধে উদ্দীপ্ত হইয়া উঠিবে—

পুরোহিত

তোমার শূদ্রগুলোই কি এত বুদ্ধিমান—
ওরাই কি দড়ির নিয়ম মেনে চলতে পারবে।

৩। রক্তকরবীর আলোচনা দ্রষ্টব্য।

কবি

পারবে না হয়তো।

একদিন ওরা ভাববে, রথী কেউ নেই, রথের সর্বময় কর্তা ওরাই।

দেখো, কাল থেকেই সুরু করবে চেঁচাতে—

জয় আমাদের হাল লাঙল চরকা তাঁতের। (পৃ: ৩৩-৩৪)।

রবীন্দ্রনাথ জানেন যে শক্তির সংঘর্ষের ভিতর দিয়া যাহা অর্জিত হয় তাহা সত্যের সন্ধান দেয় না—তাহা অহংবোধকেই প্রদীপ্ত করে মাত্র। সমাজের রথের সত্যকার রথা যিনি তাঁহাকে অস্বীকার করিয়া তাহাদের অহংবোধ যদি একদিন প্রচণ্ড হইয়া ওঠে তবে "তখন আবার নতুন যুগের উঁচুতে নিচুতে হবে বোঝাপড়া" (পৃ-৩৭)। সেই নূতন যুগের উঁচুতে থাকিবে শূদ্র—বর্তমান যুগের নিপীড়িত জনগণ।

এইরূপ শক্তির হাত বদল অসীমকাল ধরিয়া চলিবে রবীন্দ্রনাথ তাহা মনে করেন না। সমাজ যেমন বিবর্তিত হইতেছে মানুষের মনও নিশ্চয়ই সেইরূপ বিবর্তিত হইয়া চলিয়াছে। একদিন শক্তির দম্ভ বা অহংবোধের চৌর্য বৃত্তিও আর মানুষের থাকিবে না। সকলে মিলিয়াই সমাজ এই বোধটি জাগ্রত হইলেই সমস্ত দ্বন্দ্বের অবসান হইবে। তাই মন্ত্রী পরামর্শ দেন—

ওদের সঙ্গে মিলে ধরো-সে রশি।

বাঁচবার দিকে ফিরিয়ে আনো রথটাকে—

দো-মনা করবার সময় নেই। (পৃ-৩১)।

যেদিন এইরূপে সকলে মিলিয়া সমাজ-রথের রাশি ধরিবে সেইদিন সমাজ আগাইয়া চলিবে পরিপূর্ণতার পথে। তাই 'রথের রশির' কবি বলিলেন—

এই বেলা থেকে বাঁধনটাতে দাও মন—

রথের দড়িটাকে নাও বুকে তুলে, ধুলোয় ফেলো না;

রাস্তাটাকে ভক্তি রসে দিয়ো না কাদা করে। (পৃ: ৩৭-৩৮)।

রথের দড়ি বাহিরের সামান্য একটা দড়িমাত্র নয়। ইহা সমাজের মানুষের হৃদয়গুলিকে পরস্পরের সহিত যুক্ত করার সূত্র ব্যতীত আর কিছুই নয়। এতদিনের বিদ্বেষে জর্জরিত মানুষের মন হৃদয় বন্ধনের যোগসূত্রটিকে বিষ জর্জরিত করিয়াছে, তাই "দড়িটার রং যেন এল নীল হয়ে" (পৃ-৭)

বিষের স্পর্শ লাগিয়াছে মনে, স্বার্থ সাধনের বিষ, প্রতারণার বিষ অথচ এই দড়ি অসীমেরই প্রতীক। কারণ অতীত-বর্তমান-ভবিষ্যৎ-এর লক্ষ কোটি মানুষের হৃদয় ঐক্য সূত্রে আবদ্ধ করিবার জন্যই ইহা সৃষ্ট, "যুগযুগান্তরের দড়ি, দেশদেশান্তরের হাত পড়েছে ঐ দড়িতে" (পৃ-৪)। দড়ির এই নীল রং দুইটি বিপরীত ভাবের সঙ্কেত করিতেছে—একদিকে ইহা সীমাহীন কালের সংখ্যাহীন মানুষের হৃদয় বন্ধনের প্রতীক রূপে অসীমের ইঙ্গিত করে, অপরদিকে ইহাই বর্তমান মানুষের বিদ্বিষ্ট-বিষ-জর্জরিত মনের পরিচয় বহন করে। সীমাহীন বলিয়া নীল, আবার বিষ-জর্জরিত বলিয়াও নীল। একদিকে ইহা মানুষের মন যাহা হইয়াছে তাহার পরিচয় দেয়, আর একদিকে ইহা মানুষের হৃদয়-ভাব যেরূপ হওয়া কর্তব্য তাহার সঙ্কেত করে। বর্তমানে নারীরা ইহাকে সাপের সহিত তুলনা করে, নাগরিকেরা বলে, "মনে হচ্ছে ওটা এখনি ধরবে ফণা, মারবে ছোবল" (পৃ-৪)। সৈনিকরা ইহাকে বলে, "একজটা ডাকিনীর জটা" (পৃ-১১)। ধনিক শ্রেণী মনে করে, "বাসুকি মরে উঠল ফুলে" (পৃ-১৪)। সাপ এবং একজটা ডাকিনীর জটা মানুষগুলির বিষাক্ত, বীভৎস মনের প্রতীক।

রবীন্দ্রনাথ সেই কথা স্মরণ করিয়াই রথের রাশিটি বুকে তুলিয়া লইতে বলিয়াছেন—ইহা সমস্ত মানুষের হৃদয় ঐক্যসূত্রে আবদ্ধ করিয়া যেন অসীমের প্রতীক হইয়া উঠিতে পারে। অন্ধ কুসংস্কারগ্রস্ত ভক্তির দ্বারা এই কার্য সাধন সম্ভব নয়। বাহিরের 'রাশি' বা রাস্তা-দেবতার পূজা দিয়া লাভ নাই অন্তরে রাশির প্রতিষ্ঠা হইলেই রাস্তা সরল হইয়া যাইবে। প্রমত্ত ভক্তি জীবনের চলার পথটাকে কেবল কর্দমাক্তই করে। 'রথের রশি' নাটকের নারীর দল দড়িকে, রাস্তাকেই দেবতা বলিয়া পূজা দিয়াছে, দড়ি-দেবতাকে শান্ত করিবার জন্য বাতাস করিয়াছে—রাস্তা বা দড়ির প্রকৃত তাৎপর্য বোঝে নাই। নারী যেখানে অন্ধকারে থাকে সেখানে মানুষের মুক্তি হয় না--'রক্তকরবী'র সেই বক্তব্যটি 'রথের রশি'তেও স্থান পাইয়াছে।

সমস্যার শেষ সমাধান হইবে সেইদিন যেদিন যাহারা রথ টানে তাহারা জীবনের ছন্দের পরিচয় পাইবে। কারণ—

আমরা মানি ছন্দ, জানি একঝোঁকা হলেই তাল কাটে।

মরে মানুষ সেই অসুন্দরের হাতে
চালচলন যার একপাশে বাঁকা ;

... ...

... ...

আমরা মানি সুন্দরকে। তোমরা মান কঠোরকে—
অস্ত্রের কঠোরকে, শাস্ত্রের কঠোরকে।
বাইরে ঠেলা-মারার উপর বিশ্বাস,
অন্তরের তালমানের উপর নয়। (পৃঃ ৩৪-৩৫)।

সুন্দরের মধ্যে বিষম কিছুই নাই। মানুষে মানুষে ভেদ অর্থই সামঞ্জস্য হীনতা—অসুন্দর। যতদিন এই অসুন্দর টি কিয়া থাকিবে ততদিন সমাজে শক্তির হাত ফের চলিতে থাকিবে। সৌন্দর্যবোধ হইলেই আসিবে কল্যাণ। সেই জন্যই কোন শ্রেণীকে বাদ দিয়া সমাজ সম্পূর্ণ হয় না—"যখন কোনো অংশকে বাদ দিয়ে তবে সত্যকে সত্য বলি তখন তাকে অস্বীকার করি। সত্যের লক্ষণই এই যে, সমস্তই তার মধ্যে এসে মেলে। সেই মেলার মধ্যে আপাতত যতই অসামঞ্জস্য প্রতীয়মান হোক তার মূলে একটা গভীর সামঞ্জস্য আছে······সত্যের একটি সুষমা আছে—সেই সুষমা না থাকলে সত্য আপনাকে আপনি ধারণ করে রাখতে পারে না। এ কথাটা যথার্থ। কিন্তু এই সুষমাটা বৈষম্যকে বাদ দিয়ে নয়—বৈষম্যকে গ্রহণ করে এবং অতিক্রম করে" (আত্মপরিচয় : পৃ-৩৯)। সমাজেও তাই বিভিন্ন শ্রেণীর মানুষ থাকিবেই এমন কি বিভিন্ন প্রকার ভাবধারাও থাকিবে। অতএব মিথ্যা সংঘাত সৃষ্টি না করিয়া যদি সকলে প্রেমের বন্ধনে আবদ্ধ হয় তবে মত-পার্থক্য সত্ত্বেও সমাজের অগ্রগমন অব্যাহতই থাকিবে।

সেইজন্যই 'রথের রশি'র কবি বলেন, ছন্দ চাই জীবনে। ছন্দই সমস্ত অসামঞ্জস্য, অসাম্য দূর করে—সমাজজীবনের ভারসাম্য রক্ষা করে—

যারা টানছে রথ তারা পা ফেলবে তালে তালে।
পা যখন হয় বেতালা
তখন খুদে খুদে খালখন্দগুলো মারমূর্তি ধরে। (পৃ-৩৬)।

কবির এই কথায় রবীন্দ্রনাথের একটি বিশেষ মনোভাবের পরিচয় আছে। 'রক্তকরবী'তে দেখা গিয়াছে যে রবীন্দ্রনাথ বলিতে চাহিয়াছেন যে সমাজ

ব্যবস্থাটাই বড় কিছু নয় আসলে মানুষটাকে উদ্ধার করা চাই, এখানেও যেন তিনি কতকটা তাহাই বলিতে চাহেন। রথটানার ভার যাহার উপরই থাকুক না কেন অর্থাৎ সমাজের নেতৃত্ব যে শ্রেণীই করুক না কেন তাহাদের মন যেন সুষমা, সুন্দর, সাম্যকে না ভোলে। সকল শ্রেণীর সম্মিলিত নেতৃত্ব হইলেও যেমন ছন্দ রক্ষা করা চাই, মনের মিল চাই—ঠিক সেইরূপ কোন এক শ্রেণীর হাতে সমাজের নেতৃত্ব থাকিলেও সমাজের সর্বাঙ্গীন সুষমা যেন বজায় থাকে। তাহা যদি না হয়, যদি শ্রেণীতে শ্রেণীতে বৈষম্য দেখা দেয়, যদি সংঘাত হয় তবে পৃথিবীর কবি নিজের হাতে সমাজের ছন্দ ঠিক করিয়া লন: বেশীদিন তিনি ছন্দ পতন সহ্য করেন না—

> ওদের দিকেই ঠাকুর পাশ ফিরলেন—
> নইলে ছন্দ মেলে না। একদিকটা উঁচু হয়েছিল অতিশয় বেশি,
> ঠাকুর নিচে দাঁড়ালেন ছোটোর দিকে,
> সেইখান থেকে মারলেন টান, বড়োটাকে দিলেন কাত করে।
> সমান করে নিলেন তাঁর আসনটা। (পৃ-৩৭)।

মানুষ কবি সেই পৃথিবীর কবিরই অংশ—তিনিই জানেন কখন ছন্দ পতন হয়। তাই বারে বারে সমাজের ছন্দ মিল করিবার কাজে তাঁহারা আগাইয়া আসিয়াছেন: সুন্দর সৃষ্টি করিয়া মানুষের মনে সুন্দরের চেতনা জাগ্রত করিবার চেষ্টা করিয়াছেন; কারণ তিনিই কেবল জানেন, "প্রাণপদার্থ তো বাষ্পবিদ্যুতের ভূতে-তাড়া-করা লোহার এঞ্জিন নয়। তার একটি আপন ছন্দ আছে। সেই ছন্দে দুই-এক মাত্রা টান সয় তার বেশি নয়। মিনিট কয়েক ডিগবাজি খেয়ে চলা সাধ্য হতে পারে কিন্তু দশ মিনিট যেতে না যেতে প্রমাণ হবে যে মানুষ বাইসিক্লের চাকা নয়, তার পদাতিকের চাল পদাবলীর ছন্দে" (আত্মপরিচয়: পৃ-৮০)।

কবির সেই ছন্দ বোধ এখনও মানুষের হয় নাই এবং হয় নাই বলিয়াই সমাজ-রথ মাঝে মাঝে টাল খাইয়া পড়ে—

> রথযাত্রায় কবির ডাক পড়েছে বারে বারে।
> কাজের লোকের ভিড় ঠেলে পারেনি সে পৌঁছতে। (পৃ-৩৪)।

তাই যুগে যুগে ক্ষমতার হাত বদল হইতেছে। যাহা ছাই হইবার তাহা

হইবেই—নবযুগের জন্য যাহা থাকিবার তাহা সেই বিপ্লবাগ্নিতে পরিশুদ্ধ হইয়া উঠিবে। এই সংঘর্ষের ভিতর দিয়াও কিন্তু একদিন মানব সমাজের ছন্দচেতনা জাগিবে; না জাগিয়াই পারে না। বিশ্বসৃষ্টিতে রহিয়াছে বিশ্বকবির মহান উদ্দেশ্য, তাহা ব্যর্থ হইতেই পারে না। 'অচলায়তন'-এও তাহার পরিচয় আছে। স্থবিরক এবং শোণপাংশুদের সৃষ্ট মন্দিরে দর্ভকদেরও স্থান হওয়া চাই। না যদি হয় তবে গুরুকে পুনরায় আসিয়া নব মন্দির রচনার ব্যবস্থা করিতে হইবে। এখানেও রথের ভারসাম্য বজায় রাখিবার জন্য পৃথিবীর কবিকে বার বার হাত লাগাইতে হইয়াছে। কবি সেই ভারসাম্য রক্ষার উপায় স্বরূপ 'রথের রশি'টি তুলিয়া লইতে বলিয়াছেন অন্তরে : বাঁধা পড়ুক তাহাতে সমস্ত মানব হৃদয়—

রথের দড়ি কি পড়ে থাকে বাইরে।
সে থাকে মানুষে মানুষে বাঁধা; দেহে দেহে প্রাণে প্রাণে।
সেইখানে জমেছে অপরাধ, বাঁধন হয়েছে দুর্বল। (পৃ-৩৭)।

রথের রশি হৃদয় বন্ধনের সূত্র। দার্শনিক ট্রাইন-এর লেখনীতেও এই সূত্রটির কথা ধ্বনিত হইয়াছে—

There is a golden thread that runs through every religion in the world. There is a golden thread that runs through the lives and the teachings of all the prophets, seers, sages, and saviours in the world's history, through the lives of all men and women of truly great and lasting power. All that they have ever done or attained to has been done in full accordance with law. What one has done, all may do.

This same golden thread must enter into the lives of all..................................

(Ralph Waldo Trine : In Tune with the Infinite : Preface to First Edition).

সেই সোনার সূতার বাঁধন আল্‌গা হইয়াছে বলিয়াই প্রেম-প্রীতি নষ্ট হইয়াছে। তথাপি আশাবাদী রবীন্দ্রনাথের বিশ্বাস, হারানো প্রেম মানুষ পুনরায় ফিরিয়া পাইবে. বিশ্বসমাজেও সামঞ্জস্য সাধিত হইবে। কর্ম্মবিভাগ সত্ত্বেও হৃদয়ের ঐক্য প্রতিষ্ঠিত হইবে। মানুষ উপলব্ধি করিবেই যে সেই

একই আছেন সর্বত্র, সেই একেই জগৎ বিধৃত—বৈচিত্র্য অর্থ বিভেদ নয়। সেদিন আসিবেই যেদিন মানুষের হৃদয় বলিয়া উঠিবে—

বাতাস জল আকাশ আলো
সবারে কবে বাসিব ভালো,
হৃদয়সভা জুড়িয়া তারা
বসিবে নানা সাজে।

(গীতাঞ্জলি : ১৫ সংখ্যক কবিতা)।

সমাজের রথ সেদিন সহজ পথে স্বচ্ছন্দে আপনা হইতেই প্রাণের স্পর্শ পাইয়া চলিবে: তাহার অচল হইয়া পড়িবার আর কোন কারণই থাকিবে না।

তাসের দেশ

(১৩৪০—১৯৩৩)

গল্পগুচ্ছের 'একটা আষাঢ়ে গল্প'[১] নামক গল্প অবলম্বনে 'তাসের দেশ' লিখিত হয়। ইহা রূপকথা জাতীয় রচনা। কিন্তু রূপকথার ছদ্মবেশটি উন্মোচন করিলে ইহার কাহিনীর সহিত আমাদের মানব জীবনের যোগসূত্রটি আবিষ্কার করা কিছুমাত্র দুরূহ হইবে না—"পৃথিবীর চিরপরিচিত মূর্তিগুলিই একটু অতিরঞ্জনের রাগে রঞ্জিত হইয়া, কল্পনার দ্বারা সামান্যমাত্র রূপান্তরিত হইয়া রূপকথার রাজ্যের অলিতে গলিতে ঘুরিয়া বেড়ায়" (শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ঃ বাঙ্গলা সাহিত্যের কথা ঃ রূপকথা)। এই নাটকটির মধ্যেও একটি অবিশ্বাস্য কাহিনীর অন্তরালে আমাদেরই জীবনকথা উদ্‌ঘাটিত করা হইয়াছে। রূপকথার রহস্যময় স্পর্শ ব্যতীত ভাবাদর্শের দ্বন্দ্ব ইহাতে এমন করিয়া ফুটাইয়া তোলা হয় নাই যাহা মনকে আকর্ষণ করিতে পারে। ভাবধারার যে পরিবর্তন দেখান হইয়াছে তাহা আকস্মিক। রবীন্দ্রনাথ যেন দেখাইতে চাহিয়াছেন যে চারিদিকের পেষণে পিষ্ট প্রাণশক্তি আত্মপ্রকাশের জন্য অস্থির হইয়াই থাকে, তাহাকে জাগ্রত করিবার জন্য কোন সংঘাতের প্রয়োজন হয় না, একটা জীবন্ত দৃষ্টান্ত সম্মুখে তুলিয়া ধরাই যথেষ্ট। সেই সজীব দৃষ্টান্ত রাজপুত্র তাহারই স্পর্শে তাসের দেশে প্রাণ সঞ্চার হইয়াছিল।

রবীন্দ্রনাথ নাটকটি সুভাষচন্দ্র বসুকে উৎসর্গ করেন—সুভাষচন্দ্র অন্তরীনে ছিলেন। তাঁহাকে উৎসর্গ করায় নাটকের তাৎপর্য বুঝিবার পক্ষে বিশেষ সুবিধা হইয়াছে। উৎসর্গ পত্রটিও লক্ষণীয়—"স্বদেশের চিত্তে নূতন প্রাণ-সঞ্চার করবার পুণ্যব্রত তুমি গ্রহণ করেছ, সেই কথা স্মরণ ক'রে, তোমার নামে 'তাসের দেশ' নাটিকা উৎসর্গ করলুম।" এইখানে ১৫ই আশ্বিন ১৩৩৮ সালে গান্ধীজীর জন্মোৎসব উপলক্ষে শান্তিনিকেতনের মন্দিরে রবীন্দ্রনাথ যে ভাষণ দেন তাহা স্মরণ করা প্রয়োজন—"কেবলমাত্র রাষ্ট্র-নৈতিক প্রয়োজন সিদ্ধির মূল্য আরোপ করে তাঁকে আমরা দেখব না। যে দৃঢ় শক্তির বলে

১। রবীন্দ্র রচনাবলী ঃ ১৭শ খণ্ড ঃ গল্পগুচ্ছ ঃ পৃ-১৭২।

তিনি আজ সমগ্র ভারতবর্ষকে প্রবলভাবে সচেতন করেছেন, সেই শক্তির মহিমাকে আমরা উপলব্ধি করব। প্রচণ্ড এই শক্তি, সমস্ত দেশের বুক জোড়া জড়ত্বের জগদ্দল পাথরকে আজ নাড়িয়ে দিয়েছে। কয়েক বৎসরের মধ্যে ভারতবর্ষের যেন রূপান্তর জন্মান্তর ঘটে গেল। দেশ ভয়ে আচ্ছন্ন, সংকোচে অভিভূত ছিল। ······আমাদের আত্মকৃত পরাভব থেকে মুক্তি দিলেন মহাত্মাজি।" (প্রভাত কুমার মুখোপাধ্যায়: রবীন্দ্র জীবনী: ৩য় খণ্ড: পৃ-৩০৭)।

ভারতবর্ষে মানুষকে কর্মের ভিত্তিতে একদিন চারিবর্ণে বিভক্ত করা হইয়াছিল। এই নাটকে সেই চারি বর্ণের কথাও বলা হইয়াছে। তাসের চারিটি রঙের ভিত্তিতেই সেই বর্ণ বিভাগ হইয়াছে—

ছক্কা। শুভ গোধূলিলগ্নে পিতামহ চার মুখে একসঙ্গে তুললেন চার হাই।

সদাগর। বাস্ রে। ফল হল কী।

ছক্কা। বেরিয়ে পড়ল ফস্ ফস্ করে ইস্কাবন, রুইতন, হরতন, চিঁড়েতন। এঁরা সকলেই প্রণম্য। (প্রণাম)।

রাজপুত্র। সকলেই কুলীন?

ছক্কা। কুলীন বইকি। মুখ্য কুলীন। মুখ থেকে উৎপত্তি (পৃ-১৭)।

গান্ধীজী সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের বক্তব্য, ভারতীয় রাজনীতিক্ষেত্রের অন্যতম নেতা সুভাষচন্দ্র বসুকে স্মরণ করিয়া লিখিত উৎসর্গপত্র এবং নাটকে চারিবর্ণের সমাবেশ—নাটকটি রচনাকালে ভারতবর্ষের সমাজের দিকে রবীন্দ্রনাথের যে লক্ষ্য ছিল তাহা স্বাভাবিক ভাবেই পাঠকদের মনে করাইয়া দেয়। কিন্তু চারিবর্ণের সকলকেই কুলীন করিয়া দিয়া রবীন্দ্রনাথ জটিলতা সৃষ্টি করিয়াছেন। এইখানে রবীন্দ্রনাথের আর একটি বক্তব্যও প্রণিধান করা প্রয়োজন। ইউরোপেও চারিবর্ণের অস্তিত্ব আছে বলিয়া তিনি মনে করিতেন। 'রথের রশি'তেও সেই চারিবর্ণের কথা আছে—চারি-বর্ণের বিভাগ ভারতবর্ষেরই বৈশিষ্ট্য তাহা নহে, ইউরোপেও তাহার পরিচয় আছে—

"য়ুরোপে যে চার বর্ণ আছে তার মধ্যে ব্রাহ্মণটি তাঁর যজন যাজন ছাড়িয়া দিয়া প্রায় সরিয়া পড়িয়াছেন। যে খৃষ্টসংঘ বর্তমান য়ুরোপের শিশু বয়সে উঁচু চৌকিতে বসিয়া বেত হাতে গুরুমহাশয়গিরি করিয়াছে আজ সে তার বয়ঃপ্রাপ্ত শিষ্যের দেউড়ির কাছে বসিয়া থাকে—সাবেক্ কালের খাতিরে

কিছু তার বরাদ্দ বাঁধা আছে কিন্তু তার সেই চৌকিও নাই, তার সেই বেতগাছটাও নাই।.........................

"এদিকে ক্ষত্রিয়ের তলোয়ার প্রায় বেবাক গলাইয়া ফেলিয়া লাঙলের ফলা তৈরি হইল। তাই ক্ষত্রিয়ের দল বেকার বসিয়া বৃথা গোঁপে চাড়া দিতেছে। তাহারা শেঠজির মালখানার দ্বারে দারোয়ানগিরি করিতেছে মাত্র। বৈশ্যই সবচেয়ে মাথা তুলিয়া উঠিল।......................

"ইহার পরে আর একটা লড়াই সামনে রহিল, সে বৈশ্যে শূদ্রে মহাজনে মজুরে—কিছুদিন হইতে তার আয়োজন চলিতেছে। সেইটে চুকিলেই বর্তমান মনুর পালা শেষ হইয়া নূতন মন্বন্তর পড়িবে।" (রবীন্দ্র রচনাবলী : ২৪ খণ্ড : কালান্তর : লড়াইয়ের মূল : পৃঃ ২৬৯-২৭০)।

সুতরাং নাটকের পটভূমিকায় রবীন্দ্রনাথ ভারতবর্ষকেই স্থাপন করিয়াছেন এই কথাটা জোর করিয়া বলিবার কোন কারণ নাই। আরও দেখা গেল তাসমহাসভার জাতীয় সংগীতে রুইতনের নামটি বাদ পড়িয়াছে। হয়ত' রুইতনকেই রবীন্দ্রনাথ শূদ্র বা দাস জাতি করিতে চাহিয়াছিলেন এবং সেই জন্যই রুইতনের সাহেবের সহিত হরতনীর প্রেম চিত্রটি বিশেষভাবে চিত্রিত করিয়া নবজাগরণের বৈপ্লবিক স্বরূপটি স্পষ্ট করিয়া তুলিয়াছেন। আবার জাতীয় সংগীতে রুইতনের কথা না থাকিলেও ছক্কার বক্তব্যে ইস্কাবনের পরেই রুইতনের নাম করা হইয়াছে এবং তাহার পরে আসিয়াছে হরতন এবং সর্বশেষ চিঁড়েতন[২]: জাতীয় সংগীতে চিঁড়েতনের নামই প্রথম। এই ব্যাপারেও তিনি ইচ্ছা করিয়াই জটিলতা বৃদ্ধি করিয়াছেন।

অন্যত্র দেখাইয়াছেন যে সমস্ত বর্ণেরই দুরি-তিরির দল মর্যাদাহীন অর্থাৎ নিম্নশ্রেণীর—

ছক্কা। আমরা ভুবনবিখ্যাত তাসবংশীয়। আমি ছক্কা শর্মণ।

পঞ্জা। আমি পঞ্জা বর্মণ।

রাজপুত্র। ঐ যারা সংকোচে দূরে দাঁড়িয়ে?

ছক্কা। কালো-হানো, ঐ তিরি ঘোষ।

পঞ্জা। আর, রাঙা-মতো এই দুরি দাস। (পৃঃ ১৬-১৭)

২। 'একটা আষাঢ়ে গল্প'-এ রুহিতনের নাম করা হইয়াছে সর্বশেষে।

তাসের চারিবর্ণের ছুরি তিরির মধ্যে লাল-কালো সব রকমই আছে। তাই বিশেষ করিয়া কালো-রাঙার কথা স্মরণ করাইয়া দিয়া রবীন্দ্রনাথ সম্ভবত এশিয়া-আফ্রিকার পরাধীন কালো মানুষগুলিকে এবং আমেরিকার রেড ইণ্ডিয়ানদের কথা বুঝাইতে চাহিয়াছেন—"তাই একদিন কামানের গোলা আর আফিমের পিণ্ড একসঙ্গে বর্ষিত হল চীনের মর্মস্থানের উপর। ইতিহাসে আজ পর্যন্ত এমন সর্বনাশ আর কোনোদিন কোথাও হয় নি—এক হয়েছিল য়ুরোপীয় সভ্যজাতি যখন নবাবিষ্কৃত আমেরিকায় স্বর্ণপিণ্ডের লোভে ছলে বলে সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত করে দিয়েছে 'মায়া' জাতির অপূর্ব সভ্যতাকে।…আজও আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে নিগ্রোজাতি সামাজিক অসম্মানে লাঞ্ছিত…।" (কালান্তর : কালান্তর)।

এই সব কারণে মনে হয় যে রবীন্দ্রনাথ নাটকের স্থানটি অর্থাৎ 'তাসের দেশ' পৃথিবীর যে-কোন স্থানই হইতে পারে বলিয়া বুঝাইতে চাহিয়াছেন। ভারতবর্ষ হইতে বাধা নাই—আমেরিকা বা ইউরোপ হইতে পারিবে না এমন কোন কথাও নাই।[৩] ভারতবর্ষ এবং য়ুরোপ সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের যে মনোভাব 'কালান্তর'-এর 'কালান্তর' প্রবন্ধেই প্রকাশ পাইয়াছে তাহা এইখানে উল্লেখ করা যাইতে পারে—"যদিও আমাদের চারিদিকে আজও পঞ্জিকার প্রাচীর খোলা আলোর প্রতি সন্দেহ উদ্যত করে আছে, তবু তার মধ্যে ফাঁক করে য়ুরোপের চিত্ত আমাদের প্রাঙ্গণে প্রবেশ করেছে, আমাদের সামনে এনেছে জ্ঞানের বিশ্বরূপ, মানুষের বুদ্ধির এমন একটা সর্বব্যাপী ঔৎসুক্য আমাদের কাছে প্রকাশ করেছে, যা অহৈতুক আগ্রহে নিকটতম দূরতম অনুতম বৃহত্তম প্রয়োজনীয় অপ্রয়োজনীয় সমস্তকেই সন্ধান সমস্তকেই অধিকার করতে চায়" (রবীন্দ্র রচনাবলী : ২৪শ খণ্ড : পৃ-২৪৫) এবং "একদিন জেনেছিলুম আত্মপ্রকাশের স্বাধীনতা য়ুরোপের একটা শ্রেষ্ঠ সাধনা, আজ দেখছি য়ুরোপে এবং আমেরিকায় সেই স্বাধীনতার কণ্ঠরোধ প্রতিদিন প্রবল হয়ে উঠছে" (তদেব : পৃ-২৫১)। নাটকের রাজপুত্র-সদাগরপুত্রও অনির্দেশ যাত্রা করিয়াছিলেন, কোন্ রাজ্যে গিয়া তাঁহারা উঠিয়াছেন তাহাও তাঁহারা জানেন না, জানিবার সম্ভাবনাও

৩। তাসের দেশের ভাবটি—"must surely have grown out of impressions of England" (Manchester Guardian) : মৈত্রেয়ী দেবী : বিশ্বসভায় রবীন্দ্রনাথ : পৃ-৩৬।

ছিল না কারণ তরী ডুবিয়া যাওয়ায় তাঁহারা ভাসিয়া উঠিয়াছেন কোন এক ডাঙ্গায়—"এক ডাঙ্গা থেকে দিলেন পাড়ি, তরী ডুবল মাঝ-সমুদ্রে, ভেসে উঠলেন আর-এক ডাঙ্গায়" (পৃ-১৪)।

পৃথিবীর কোন দেশেই প্রাণশক্তির সত্য পরিচয় গ্রহণ করার স্বাধীনতা নাই। ভারতের জড়তা আসিয়াছে যেমন শাস্ত্রীয় আচার নিয়ম পালনের জন্য এবং রাষ্ট্রক্ষেত্রে বহুদিন পরাধীন হইয়া থাকিবার জন্য, য়ুরোপ-আমেরিকাও সেইরূপ প্রাণের সত্যরূপকে আবৃত করিয়াছে বিজ্ঞানের পশ্চাতে ভূতে পাওয়া জীবের ন্যায় তাড়া করিয়া এবং রাষ্ট্রের বিধি-বিধানের পায়ে আত্মবিসর্জন দিয়া। ভারতে শাস্ত্রের নিয়ম—য়ুরোপে শস্ত্রের নিয়ম, বিধি-বিধানের নিয়ম—"দেশের সম্বল সমস্তই তলিয়ে গেল ল এবং অর্ডারের প্রকাণ্ড কবলের মধ্যে" (কালান্তর ঃ কালান্তর)। সর্বত্রই আজ রাজপুত্রের আগমনের প্রয়োজন। তিনি আসিয়া সকল জড়তা দূর করিয়া দিবেন। শাস্ত্রের বন্ধনকে ছিন্ন করিয়া অচলায়তনের গুরুর ন্যায় তিনিই অন্ধতমসা দূর করিয়া আনিবেন বাহিরের আলো। 'ল এবং অর্ডার' মানুষকে যখন যন্ত্রে পরিণত করে তখন তাহাকেও আলোড়িত করিবেন রাজপুত্র। সমস্ত প্রকার অচলতাকে চঞ্চল করা, অটলতাকে টলাইয়া দেওয়াই হইবে তাঁহার কাজ। তিনি আসিয়া মানব হৃদয়কে কিভাবে আলোড়িত করিবেন তাহার পরিচয় আছে 'তাসের দেশ'-এর সূচনার সংগীতটিতে—

> সংশয়পারাবার অন্তরে হব পার,
> উদবেগে তাকায়ো না বাইরে।
> যদি মাতে মহাকাল, উদ্দাম জটাজাল
> ঝড়ে হয় লুণ্ঠিত, ঢেউ উঠে উত্তাল,
> হোয়ো নাকো কুণ্ঠিত, তালে তার দিয়ো তাল,
> জয়-জয় জয়গান গাইয়ো।
> হাঁই মারো, মারো টান হাঁইয়ো॥

রাজপুত্র তাঁহার বাঁধা নৈবেদ্যের বরাদ্দ ছাড়িয়া বাহিরের পথে যাত্রা করিলেন। নিয়মের বাঁধনে চলে যে জীবন, যে জীবনে বাহিরে পা ফেলিবার উপায় নাই সেখানে জীবনের স্বরূপ জানা কখনও সম্ভব নয়। উত্তাল তরঙ্গের সহিত সংগ্রাম করিয়া, কঠিন শক্তির সহিত সংঘর্ষের ভিতর দিয়া তবেই আত্মোপলব্ধি হয়। চারিদিকের বেড়ার মধ্যে থাকিয়া প্রাণের স্বচ্ছন্দ

লীলায় বাড়িয়া উঠা যায় না—"আমরা পড়েছি অসত্যের বেড়াজালে। নিরাপদের খাঁচায় থেকে থেকে আমাদের ডানা আড়ষ্ট হয়ে গেল্। আগাগোড়া সবই অভিনয়" (পৃ-৮)। বুলি চাপা দেওয়া মন কখনও নূতনকে লাভ করিতে পারে না—নিজেকে প্রকাশ করিতেও পারে না।

তাসের দেশের পরিচয় দিয়া রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন, "যেন ছুতোরের তৈরি কাঠের কুঞ্জবন। দেখলুম, ওরা চৌকো চৌকো কেঠো চালে চলেছে, বুকে পিঠে চ্যাপটা। পা ফেলেছে খিট্‌খুট্ খিট্‌খুট্ শব্দে, বোধ করি চৌকুনি নূপুর পরেছে পায়ে, তৈরি সেটা তেঁতুল-কাঠে। এই মরা দেশকে কি বলে নতুন দেশ" (পৃ-১৫)।

মানুষগুলি কিসের চাপে বুকে পিঠে চ্যাপটা হইয়া যায় তাহার উত্তর রবীন্দ্রনাথ দিয়াছেন রাজপুত্রের জবানিতে—"এর থেকেই বুঝবে, জিনিসটা সত্যি নয়, এটা বানানো, এটা উপর থেকে চাপানো, এদের দেশের পণ্ডিতদের হাতে-গড়া খোলোস। আমরা এসেছি কী করতে—খসিয়ে দেব। ভিতর থেকে প্রাণের কাঁচা রূপ যখন বেরিয়ে পড়বে, আশ্চর্য করে দেবে" (পৃ-১৫)। ধর্মীয় খোলোস, রাষ্ট্রীয় খোলোস—নানা প্রকারের খোলোস আজ পৃথিবীময় আধিপত্য করিতেছে। এই খোলোসগুলিই মানুষকে দিয়াছে খণ্ডতার ছাপ, বিচ্ছিন্ন করিয়া রাখিয়াছে পরস্পরের সহিত। এই খোলোস যদি ভাঙিয়া ফেলা যায় তবে আত্মার দীপ্তিতে প্রোজ্জ্বল প্রাণের কাঁচারূপ দেখা যাইবে।

খোলোস ভাঙিবার উপায়ও রবীন্দ্রনাথ দেখাইয়াছেন, বলিয়াছেন, গতিই খোলোস ভাঙিতে পারে। জীবনে গতি যদি আসে তবে আর চিন্তার কারণ থাকিবে না। খানা-ডোবার ভয়ে যাহারা চলা বন্ধ করে তাহারাই জীবনকে হারায়। জীবনে গতি আসে তখন যখন 'ইচ্ছা শক্তি' জাগ্রত হয়। রাজপুত্র এই ইচ্ছামন্ত্রে সঞ্জীবিত করিলেন তাসের দেশকে। ইচ্ছা হইতেই সব : সৃষ্টিও হয় ইচ্ছায়, "Let there be light and there was light." ইচ্ছায় মানুষকে বাঁধন ভাঙিতে শেখায় আবার তাহারই জোরে মানুষ সংযত হয়—

ইচ্ছে! ইচ্ছে!
সেই তো ভাঙছে, সেই তো গড়ছে,
সেই তো দিচ্ছে নিচ্ছে।

সেই তো আঘাত করছে তালায়,
সেই তো বাঁধন ছিঁড়ে পালায়,
বাঁধন পরতে সেই তো আবার ফিরছে ॥ (পৃ-৩৯)

তাই রাজপুত্র তাসবংশের রাজাকে যে 'উৎপাত' ভেট দিতে চাহিলেন তাহা নিতান্ত ধ্বংস মুলকই নয়। রবীন্দ্রনাথের পক্ষে সেইরূপ ভেট দেওয়া কখনও সম্ভবও নয়। নবীনের সংগীত গাহিবার জন্য সমস্ত কিছুই তিনি ভাঙিতে বলেন না। তিনি জানেন যে-মানুষ সংযত সে যে উৎপাত আনে তাহা মহৎ সৃষ্টি প্রেরণা হইতে জাত।

প্রাণের সহিত পরিচয় লাভ করিতে হইলে দুঃখবরণ করিতে হয় এই নাটকে সেই কথাটাও আছে। দুঃখের মর্যাদা রবীন্দ্রনাথ সর্বত্রই প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন, এখানেও—

ইস্কাবনী। দুঃখের কথা বলছিস ভাই? দুঃখ যে এখনি শুরু করেছে তার নৃত্য বুকের মধ্যে।

টেক্কানি। কিন্তু সেই দুঃখের নেশা ছাড়তে চাই নে। থেকে থেকে চোখ জলে ভেসে যায, কেন যে ভেবেই পাই নে। (পৃ-৩৬)।

এই নাটকে যে কেবল ধর্মীয় এবং রাষ্ট্রীয় বিধানের নিষেধ হইতে মুক্তির কথাই বলা হইয়াছে তাহাই নয়—মানুষ ভ্রান্তি বশত যে মোহপাশে আপনা আপনি আবদ্ধ হয় তাহা হইতেও মুক্তির কথা রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন। মানুষ নিজের ব্যক্তিত্বকে কেন যে মিথ্যা দিয়া আবৃত করে তাহা তিনি ভাবিয়া পান না—

দহলানী। আমাদের কাকে কিরকম দেখতে হয়েছে নিজেরা বুঝতেই পারি নে। গাছের আড়াল থেকে কাল শুনলুম, সদাগরের পুত্তুর বলছিল, এরা যে মানুষের সঙ সাজছে।

টেক্কানী। ওমা, কী লজ্জা! রাজপুত্তুর কী বললেন।

দহলানী। তিনি রেগে উঠে বললেন, সে তো ভালোই—সাজের ভিতর দিয়ে রুচি দেখা দিল। তিনি বললেন, এ দেখে হেসো না, হাসতে চাও তো যাও তাদের কাছে মানুষের মধ্যে যারা তাসের সঙ সেজে বেড়ায়। (পৃ-৩৫)।

সমস্ত প্রকার বন্ধন হইতেই মানুষের মুক্তি চাই। আপন ইচ্ছার বাঁধনেই কেবল সে বাঁধা থাকিবে। সেইখানেই তাহার বন্ধন এবং মুক্তি। ইচ্ছার মুক্তি হওয়ায় তাস-তাসীদের মধ্যেকার যান্ত্রিক ভাব দূর হইয়া গেল—মনের জাগরণ হইল প্রেম-মন্ত্রে।

মানুষের মুক্তির জন্য নারীর একটা বড় প্রয়োজন আছে 'রক্তকরবী'তে রবীন্দ্রনাথ তাহা দেখাইয়াছেন। এই নাটকেও নারীর মনের জাগরণই ঘটাইলেন প্রথমে। নারী যদি তাহার সত্য স্বরূপ জানে তবে তাহার নিজ শক্তির দ্বারা পুরুষকেও জাগ্রত করিতে পারে—

She has been an inspiration to man, guiding, most often unconsciously, his restless energy into an immense variety of creations in literature, art, music and religion. This is why, in India, woman has been described as the symbol of shakti, the creative power. (Creative Unity : p-157).

নাটকে সর্বপ্রথম রানীই বলেন, "জয় ইচ্ছার জয়" (পৃ-৪০)। সেইজন্য রাজা তাঁহাকে নির্বাসন দণ্ড দেন—

রাজা। রানীবিবি, তোমার বনবাস।

রানী। বাঁচি তা হলে।

রাজা। নিবাসন। —ও কী, চললে যে। কোথায় চললে।

রানী। নির্বাসনে।

রাজা। আমাকে ফেলে রেখে যাবে?

রানী। ফেলে রেখে যাব কেন।

রাজা। তবে?

রানী। সঙ্গে নিয়ে যাব তোমাকে।

রাজা। কোথায়।

রানী। নির্বাসনে।

রাজা। আর এরা, আমার প্রজারা?

সকলে। যাব নির্বাসনে।

সকলেই নির্বাসনে যাইবার জন্য প্রস্তুত—ছবির জীবন হইতে প্রাণের জগতে নির্বাসন। সেই জগতে লইয়া যাইবার প্রধান বাহক নারী। তখন ধর্মীয়

শাসন থাকিবে না—পুঁথিগুলি জলে ভাসাইয়া দেওয়া হইবে। রাষ্ট্রীয় শাসনও থাকিবে না—বাধ্যতামূলক আইন আর চলিবে না। এই উপর হইতে চাপান বিকৃতকারী বাঁধনগুলি দূর হইলে সকলেই সত্যকার মানুষ হইয়া উঠিতে পারিবে। রাজারও ভাবনা নাই কারণ রানী তাঁহার সহায়। শেষ গানটিতে প্রাণের সেই সঙ্গীতই ধ্বনিত হইয়াছে—বন্দীর শুষ্ক প্রাণে জীবনের বন্যা প্রবাহিত হউক—

ভাঙো বাঁধ ভেঙে দাও, বাঁধ ভেঙে দাও,
বাঁধ ভেঙে দাও।
বন্দী প্রাণমন হোক উধাও।
শুকনো গাঙে আসুক
জীবনের বন্যার-উদ্দাম কৌতুক
ভাঙনের জয়গান গাও।
জীর্ণ পুরাতন যাক ভেসে যাক,
যাক ভেসে যাক, যাক ভেসে যাক।

এইবার নূতনের আহ্বান ধ্বনিত হইবে সকলের মনে—

আমরা শুনেছি ওই
'মাভৈঃ মাভৈঃ মাভৈঃ'
কোন্ নূতনেরই ডাক।

তৃতীয় খণ্ড

প্রথম পরিচ্ছেদ

প্রতীক নাটকে রবীন্দ্রমানস

এক গৌরবোজ্জ্বল স্বর্ণময় যুগে ভারতবর্ষে আধ্যাত্মিক চেতনা জাগ্রত হইয়াছিল। এই আধ্যাত্মিকতাই এক স্বর্ণসূত্রে জীবজন্তু প্রকৃতিকে একত্রে গ্রথিত করিয়া বিভেদ বিচ্ছেদ হইতে রক্ষা করিয়াছিল। আশ্রমিক জীবনের যে পরিচয় সংস্কৃত কাব্যে-নাটকে আছে তাহাতে দেখা যায় যে সিংহ ও হরিণশাবক, সর্প ও শিখী একত্র জীবন নির্বাহ করিতেছে। জ্ঞানের আলোক নিভিয়া যাওয়ায় মধ্যযুগে ভারতবাসীরা অভ্যাসের দাস হইয়া পড়ে। চৈতন্যের সমসাময়িক কাল হইতে পুনরায় নব চেতনার সূত্রপাত হয়। ইংরাজ আমলে বর্তমান কালের অন্যতম শ্রেষ্ঠ মনীষী রামমোহন রায় (১৭৭৪-১৮৬৩) হইতেই বাংলা দেশে তথা ভারতবর্ষে নবজাগরণের পরিচয় স্পষ্ট হইয়া ওঠে। জাতির চিত্ত অতীতের দিকে চাহিয়া দেখিল এবং বর্তমান কালের জ্ঞান ও ধারণার ভিত্তিতে তাহাকে নূতন করিয়া ঢালিয়া সাজাইবার চেষ্টা করিল।

উপনিষদ আশ্রয়ী পরিবারে রবীন্দ্রনাথের জন্ম, "উপনিষদের ভিতর দিয়ে প্রাক্‌পৌরাণিক যুগের ভারতের সঙ্গে এই পরিবারের ছিল ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ। অতি বাল্যকালেই প্রায় প্রতিদিনই বিশুদ্ধ উচ্চারণে অনর্গল আবৃত্তি করেছি উপনিষদের শ্লোক (আত্মপরিচয় : পৃ-৭২)। সেই উপনিষদ জানাইয়াছেন, আনন্দরূপমমৃতম্ যদ্বিভাতি[১]। এই যুগের নবজাগরণের হোতা রামমোহন রায়ও বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে ঈশ্বরকে প্রত্যক্ষ করিতে বলিয়াছেন। তিনি মনে করিতেন, ঈশ্বরকে অন্যবস্তুর ন্যায় প্রত্যক্ষ করা যায় না। সৃষ্টির দিকে চাহিয়াই স্রষ্টাকে চিনিতে হইবে, তবে তাহার জন্য কামনা বাসনা সংযত করা চাই। তাঁহার মতে মানুষের সর্বাপেক্ষা বড় শত্রু তাহার গর্ব বা অহংবোধ—

মনে কর শেষের সে দিন ভয়ঙ্কর ;
... ...
অতএব সাবধান, ত্যজ দম্ভ অভিমান,

১। মুণ্ডকোপনিষদ্—দ্বিতীয় মুণ্ডকে ২য় খণ্ড—শ্লোক সংখ্যা ৭

বৈরাগ্য অভ্যাস কর', সত্যেতে নির্ভর। (ব্রহ্মসঙ্গীত : ১৬৪৬ সংখ্যক কবিতা); কবীর এবং নানকের সঙ্গীতেও এই সুরই ধ্বনিত হইয়াছিল রামমোহনেরও বহু পূর্বে—

জুঁ্য জানো তূঁ্য তার স্বামী, কুটিল কঠোর মঁ্যয়্ কাপট কামী।
তু সমর্থ, শরণকে যোগ্য হুয়, তু রখ অপনী, কলাধার স্বামী॥

হে স্বামী, তুমি যেমন করিয়া জান, তেমনি করিয়া আমায় ত্রাণ কর। আমি কুটিল, কঠোর, কপট, কামনার দাস। তুমি শক্তিমান্, তুমিই আশ্রয় গ্রহণের উপযুক্ত পাত্র। তুমি আপনার জনকে রক্ষা কর, হে সর্বগুণাধার স্বামী। (ব্রহ্মসঙ্গীত : নানক : ১৯৫৩ সংখ্যক কবিতা)।

ইঁহারা কেহই এই পৃথিবীকে মায়া বলিয়া মনে করেন নাই। এইখানে থাকিয়াই সেই পরম আকাঙ্ক্ষিতকে পাওয়া যায়। তাহার জন্য নিশ্চয়ই মানুষকেও কিছু করিতে হইবে। কবীর ও নানক ঈশ্বরের নিকট আত্ম-সমর্পনের নির্দেশ দিয়াছেন। রামমোহন কর্ম ও বৈরাগ্য অবলম্বন করিতে বলিয়াছেন। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (১৮৩৮-১৮৯৪) ভোগ ও ত্যাগ, কর্ম ও সন্ন্যাসকে একসূত্রে গ্রথিত করিতে চাহিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথের পিতৃদেব দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের (১৮১৭-১৯০৫) সাধনার ইতিহাসে উপনিষদের 'তেন তক্তেন ভুঞ্জীথা'র[২] প্রভাবই প্রধান। রবীন্দ্রনাথও সেইরূপ পৃথিবীকে স্বীকৃতি দিয়া অহংকে সংযত করিতে বলিয়াছেন। তাঁহার বিশ্বাস প্রকৃতিতে সর্বত্রই তাঁহার আহ্বান ধ্বনিত হইতেছে। ঋতু উৎসবকে কেন্দ্র করিয়া যে নাটকগুলি তিনি রচনা করিয়াছেন তাহাতে তাঁহারই আহ্বানের বিচিত্র পরিচয় পাওয়া যায়। শরতে, বর্ষায়, বসন্তে, শীতে নানাভাবে তিনি নিজেকে উদ্ঘাটিত করিতেছেন; তাঁহারই বিচিত্র রূপ ঋতু বৈচিত্র্যের মধ্য দিয়া আমাদের স্পর্শ করিতেছে—

আজ ধানের খেতে রৌদ্র ছায়ায়
লুকোচুরি খেলা।
নীল আকাশে কে ভাসালে
সাদা মেঘের ভেলা—(শারদোৎসব : পৃ-১৫)।

ধানের ক্ষেতে রৌদ্রের লুকোচুরি খেলার ভিতর তাঁহার পরিচয় লাভ করি।

২। ঈশোপনিষৎ

বসন্তে হৃদয়ে যে দোলা লাগে তাহা কি কেবল কতকগুলি গাছ পালার দোল খাওয়ারই ফল! ইহারই ভিতর দিয়া আমরা অনির্বচনীয়কে লাভ করি—

মৃদু মধুর মদির হেসে
এসো পাগল হাওয়ার দেশে,
তোমার উতলা উত্তরীয়
তুমি আকাশে উড়ায়ে দিয়ো,
এসো হে, এসো হে, এসো হে, আমার
বসন্ত এসো। (রাজা: পৃ-২২)

বর্ষায় বজ্র-বিদ্যুৎ-বৃষ্টি-ঝড়ের মধ্যে তাঁহারই ভিন্ন রূপের প্রকাশ—

সজল হাওয়া বহে বেগে,
পাগল নদী উঠে জেগে,
আকাশ ঘেরে কাজল মেঘে,
তমালবনে আঁধার করে।
ওগো বঁধু, দিনের শেষে
এলে তুমি কেমন বেশে। (অচলায়তন: পৃ-৮০)

শীতে পৌষের আহ্বান আমাদের আকর্ষণ করে; বদ্ধ অবস্থা হইতে তখন মুক্ত হইবার আহ্বান শ্রুত হয়। পরিপূর্ণতা লাভ করিবার জন্য মানুষকে অনন্ত তখন জড়তা কাটাইতে বলে…

পৌষ তোদের ডাক দিয়েছে, আয় রে চলে,
আয় আয় আয়।
ধুলার আঁচল ভরেছে আজ পাকা ফসলে,
মরি হায় হায় হায়। (রক্তকরবী: পৃ-১০৫)

নিজেকে নানা রূপে প্রকাশ করিয়া তিনি আমাদের আকর্ষণ করিতেছেন। বিচিত্র রূপের বাঁশীর ধ্বনিতে তিনি সর্বত্রই তাঁহার আহ্বান লিপি পাঠাইতেছেন। আমরা তাহা শুনি আর নাই শুনি সেই পথেই চলিয়াছি, "আমরা যে যাহা মনে করিয়া আসিনা কেন, তিনিই ডাকিতেছেন এবং সে ডাক এক মুহূর্তের জন্য থামিয়া নাই। আমরা কোন কলরবে সেই অনবচ্ছিন্ন মঙ্গল শঙ্খধ্বনিকে ঢাকিয়া ফেলিতে পারিতেছি না—তাহা সকলের উচ্চে

বাজিতেছে। তাহার সুগভীর সুরতরঙ্গ সেখানকার তরুশ্রেণীর পল্লবে পল্লবে স্পন্দিত হইতেছে, এবং সেখানকার নির্মল আকাশের রন্ধ্রে রন্ধ্রে প্রবেশ করিয়া তাহার আলোককে পুলকিত ও অন্ধকারকে নিস্তব্ধ পরিপূর্ণ করিয়া তুলিতেছে" (সঞ্চয় : ধর্মশিক্ষা : পৃ : ৮১-৮২)। সেই আহ্বান যাঁহার কর্ণ স্পর্শ করিবে তাঁহাকে বাহির হইয়া আসিতেই হইবে—এইরূপেই তো মুক্তি আসে। বিচিত্র রূপে মানুষ মুক্তি লাভ করে তাহাই বুঝাইবার জন্য কবি বিভিন্ন ঋতুতে মানুষের বিভিন্ন প্রকারের মুক্তির রূপ প্রদর্শন করিয়াছেন। শরতের হাস্যোজ্জল প্রকৃতি, উন্মুক্ত উদার আকাশ মানুষের মনকে পরিচ্ছন্ন করিয়া তুলিবার সুযোগ দেয় তাই সম্রাট বিজয়াদিত্য আর ঘরে বসিয়া থাকিতে পারিলেন না—প্রকৃতির মত করিয়াই নিজেকে ঢালিয়া দিলেন : এই মুক্তি শরতের প্রকৃতির মতই সহজ। বসন্তে মধুর রসের আস্বাদন করিবার সুযোগটাই অধিক তাই তো সুদর্শনার প্রিয়া রূপে মুক্তি : বর-বধূর মিলন রূপে পরমাত্মা ও আত্মার সাযুজ্য। বর্ষার প্রকৃতি ঝড়-ঝঞ্ঝায় উদ্দাম : তাই নাটকে পাই সংগ্রামের পরিচয়। ঝড় সবলে আক্রমণ করিয়া গ্রীষ্মের প্রকৃতিকে পরাভূত করিয়া বৃষ্টির জলে তাহাকে বিধৌত করে—শস্যে পরিপূর্ণ হইবার সুযোগ দেয় ধরণীকে। ঠিক সেইরূপেই মুক্তিদাতা গুরু আসিয়া অচলায়তন ধ্বংস করেন—মুক্তির পথ স্বরূপ প্রতিষ্ঠিত করেন নূতন মন্দির। শীতের প্রকৃতি জড়তায় আচ্ছন্ন—তাই জড়তা হইতে মুক্ত লাভ করিতে হয় রাজার, বদ্ধ আত্মার। সৌন্দর্য চেতনা এবং আনন্দবোধই তখন জড়তা হইতে মুক্ত করিতে পারে। নন্দিনী-রঞ্জন রাজাকে মুক্তির সন্ধান দেয়।

প্রকৃতি জগতের মধ্যে অনন্ত সত্তাকে উপলব্ধি করিতে হইলে অহং বোধকে সংযত করিতে হইবে কারণ অহংবোধের দ্বারা দৃষ্টি খণ্ডিত হয় : সমস্ত বিশ্বচরাচরকে ঐক্য সূত্রে বিধৃত বলিয়া তখন উপলব্ধি করা যায় না। নাগরিক সভ্যতার উন্মত্ততা, জাতি পূজার দম্ভ দৃষ্টিকে খণ্ডিত করিয়াছে বলিয়া তিনি মনে করেন। সেই জন্যই আশ্রমিক জীবনের আদর্শকে তিনি এত অধিক মর্যাদা দিয়াছেন—

দাও ফিরে সে অরণ্য লও এ নগর,
লহ যত লৌহ কাষ্ঠ ইষ্টক ও প্রস্তর!

আশ্রমিক জীবনে বৃক্ষলতা, পশুপক্ষী এবং মানুষ যেন একই মায়ের কোলে ক্রীড়ারত। বর্তমান নাগরিক জীবন ব্যক্তির স্বাতন্ত্র্যবোধকে এমন প্রাধান্য দিয়াছে যে প্রত্যেকেই পৃথক হইয়া উঠিয়াছে। আপন গণ্ডী হইতে বাহির হইয়া পড়িতে না পারিলে মুক্তি নাই। রবীন্দ্রনাথ তাঁহার নাটকে নানাভাবে এই কথাটা বলিয়াছেন। ঋণশোধ-এ তিনি রাজাকে সিংহাসন হইতে মাটিতে নামিয়া আসিতে বলিয়াছেন। সিংহাসনে বসিলেই রাজা, স্বতন্ত্র, মাটিতে নামিলে সকলের মধ্যে একজন। প্রকৃতি সকলের জন্য নিজেকে উজাড় করিয়া দিয়াছে, মানুষকেও তাহাই করিতে হইবে। 'রাজা'য় কাঞ্চীরাজ এবং সুদর্শনাকে পথে বাহির করিলেন, 'অচলায়তন'-এর শাস্ত্রীয় বিধানে গণ্ডী বাঁধা মানুষগুলিকে বদ্ধ থাকিতে দিলেন না—'রক্তকরবী'র রাজাকে সোনার ফসলের গান শুনাইয়া জালের বন্ধন ছিঁড়িয়া বাহির জগতে দাঁড় করাইলেন। আকর্ষণজীবী এবং কর্ষণজীবীদের সংঘাতের পটভূমিকায় তিনি দেখাইয়াছেন যে কর্ষণ-জীবীদের গ্রামকেন্দ্রিক সভ্যতার মধ্যেই মুক্তির সম্ভাবনা অধিক।

অহংকে সংযত করিতে পারিলে বুদ্ধির ক্ষেত্রকে অতিক্রম করিয়া মানুষ স্বজ্ঞার ক্ষেত্রে উপনীত হয়। স্বজ্ঞার দ্বারাই বিশ্বের ঐক্য উপলব্ধি করা সম্ভব। ঐক্যের আধ্যাত্মিক উপলব্ধি হইতেই মরমী দৃষ্টিভঙ্গীর জন্ম। রবীন্দ্রনাথের মধ্যে বাল্যকাল হইতেই মরমী ভাবকল্পনা ছিল। প্রকৃতি জগৎ এবং জীব জগৎ যে এক ঐক্যে বিধৃত তিনি তাহা উপলব্ধি করিয়াছিলেন। ২৫ বৎসর বয়সে তিনি বলিতেছেন, "জগতের সমস্ত দৃশ্যের মধ্যে অনন্ত অদৃশ্য বর্তমান" (আলোচনা : পৃ-১৩) এবং "জড়ই বল আর প্রাণীই বল সকলেরই মধ্যে এক মহা চৈতন্যের নিয়ম কার্য করিতেছে, যাহাতে করিয়া উত্তরোত্তর প্রাণ অভিব্যক্ত হইয়া উঠিতেছে" (আলোচনা : পথ : পৃ-৩৯)। 'ডাকঘর', 'রাজা' প্রভৃতি নাটকে সেই মরমী উপলব্ধির পরিচয় আছে। ঘরের বাহিরে বৈচিত্র্যের মধ্যে যিনি ঘরের মধ্যেও তাঁহারই প্রকাশ। অন্ধকারেও যিনি আলোকেও তিনি। যুক্তি তর্কের দ্বারা তাঁহাকে বুঝিয়া লওয়া সম্ভব নয় : আত্মিক দৃষ্টি বা স্বজ্ঞার সাহায্যেই কেবল তাঁহাকে উপলব্ধি করা যায়।

জগৎকে যে কতকগুলি গাছ-পালা, পাহাড়-পর্বত রূপে দেখে সে তাহার জন্য কখনও প্রাণ দিতে পারে না। ভাবরূপে দেখাই যথার্থ দেখা—নিজের

করিয়া দেখিলেই নিজেকে দেওয়া যায়। ভাবরূপে দেখার অর্থই অনির্বচনীয়কে বস্তুর মধ্যে দেখা—অসীমকে সীমার মধ্যে উপলব্ধি করা। ইহাকেই প্রতীকী দৃষ্টি বলা চলে। বস্তুর মধ্যে অন্তর নির্দেশে রবীন্দ্রনাথ অনির্বচনীয়কে দেখিয়াছেন। এইজন্য তাঁহাকে মূলতঃ প্রতীকধর্মী বলিতে চাই। প্রেমের দৃষ্টি ব্যতীত এইরূপ উপলব্ধি হয় না, "জগৎকে যে যথার্থ ভালবাসে সে কখনও মনে করিতেও পারে না, জগৎ একটা নিরর্থক জড়পিণ্ড। সে ইহারই মধ্যে অসীমের ও চিরজীবনের আভাস দেখিতে পায়।...প্রেমেই যথার্থ স্বাধীনতা। কারণ যতটা দেখা যায় প্রেমে তার চেয়ে ঢের বেশী দেখাইয়া দেয়" (আলোচনা : প্রেমের শিক্ষা : পৃ-৩৬)।

জীবনে প্রেমকে তাই তিনি সর্বাপেক্ষা বড় করিয়া দেখিয়াছেন। প্রেমই যথার্থ স্বাধীনতা। বৈষ্ণব কবি যখন বলেন, "জনম অবধি হম রূপ নেহারনু নয়ন না তিরপিত ভেল" (বিদ্যাপতি), তখন তিনি প্রেমেরই জয় ঘোষণা করেন, "ইহার অর্থ আর কিছুই নহে, অনুরাগের প্রভাবে প্রেমিক একজন মানুষের অন্তরস্থিত অসীমের মধ্যে প্রবেশাধিকার পাইয়াছেন, সেখানে, সে মানুষের আর অন্ত পাওয়া যায় না" (আলোচনা : ডুবিবার স্থান : পৃ-১১)।

মানবাত্মার এবং বিশ্বাত্মার সহিত ঐক্যবদ্ধ জীবনই আদর্শ। রবীন্দ্রনাথের মতে ক্রমান্বয়ে জ্ঞান বৃদ্ধির দ্বারাই যে আমরা পরমাত্মাকে জানিতে পারি তাহা নহে। প্রেমের দ্বারাই তাঁহাকে অন্তরতর রূপে, আত্মার আত্মীয় রূপে জানা যায়। বৈষ্ণবরা মনে করেন, সৃষ্টির মূলে রহিয়াছে লীলাময়ের গভীর প্রেম। সেইজন্যই তো মানুষ কেবল প্রেমের পথেই মানুষ ও প্রকৃতির মধ্য দিয়া নিজেকে জানিতে পারে। প্রেমের শিক্ষাই মানুষের প্রকৃত শিক্ষা, ইহার সহিত প্রয়োজন বোধের কোন যোগ নাই। অন্তরে প্রেম থাকিলে সুন্দরকে, শিবকে, সত্যকে উপলব্ধি করিতে বিলম্ব হয় না, "প্রেম নেই বলেই তাঁর দিকে আমাদের সমস্ত চোখ চায় না, আমাদের সমস্ত কান যায় না, আমাদের সমস্ত মন খোলে না" (শান্তিনিকেতন : ১ম খণ্ড : সংশয় : পৃ-৬)। আর যাহার প্রেম দৃষ্টি খুলিয়া যায়—

শক্তি যারে দাও বহিতে
অসীম প্রেমের ভার
একেবারে সকল পর্দা
ঘুচায়ে দাও তার।

না রাখ তার ঘরের আড়াল,
না রাখ তার ধন,
পথে এনে নিঃশেষে তায়
কর অকিঞ্চন। (গীতাঞ্জলি : ৬৬ সংখ্যক কবিতা)

এই শক্তি তিনি দিয়াছেন 'মুক্তধারা'র অভিজিৎকে। প্রেমের দৃষ্টিতে তিনি চাহিয়াছেন পৃথিবীর দিকে। ভেদ-বিদ্বেষে ছিন্ন খণ্ডিত পৃথিবী তাহাকে ব্যথিত করিয়াছে। উত্তরকূটের মানুষগুলির সহিত শিবতরাইয়ের মানুষগুলির মিলন সাধন করিতে হইলে 'মুক্তধারা'কে যে দানব বাঁধিয়াছে তাহাকে অপসারিত করিতে হইবে। বাধাটা দূর হইলেই প্রাণের প্রবাহ স্বচ্ছন্দ হইবে। আত্মাহুতি দিয়া প্রাণ-প্রবাহের বাধা রূপী দানবকে অপসারিত করিবার শক্তি অভিজিৎ লাভ করিয়াছিল।

মরমী বলিয়াই রবীন্দ্রনাথ প্রেমকে জগৎ ব্যাপারের মূল বলিয়া ধরিয়াছেন—প্রেম যেন বৈজ্ঞানিকের মাধ্যাকর্ষণ। সৌন্দর্যের মূলেও সেই প্রেম। সুন্দরের মধ্যে বিষম কিছুই নাই, তাহার প্রত্যেক অংশ সমগ্রের সুখে সুখী। প্রেমের টানেই উহার বিভিন্ন অংশ যথাযথভাবে পরস্পরের সহিত মিলিয়াছে। নিজেরাই কেবল তাহারা আনন্দে ভরপুর নয়—তাহারা অপরকেও আনন্দ দেয়। 'ডাকঘর'-এর অমল, 'মুক্তধারা'র অভিজিৎ, 'রক্তকরবী'র নন্দিনী নিজেদের অন্তরের প্রেমের জোরেই অনেকের প্রেম আকর্ষণ করিতে পারিয়াছিল।

মরমী অভিজ্ঞতা নানা প্রকারে হইতে পারে। রবীন্দ্র সাহিত্যে সেই নানা অভিজ্ঞতার পরিচয় আছে। তাহারা কখন কখন পরমাত্মার সহিত মানবীয় সম্পর্ক স্থাপন করেন, বধূরূপে নিজেদের কল্পনা করিয়া স্বামীরূপ পরমাত্মার সহিত মিলিতে চান—

"হ্মারে জনম-মরণকে সাথী,
থানে নহীঁ বিসরূঁ দিনরাতি।

হে আমার জন্ম-মরণের সাথী, তোমাকে যেন দিবারাত্রিতে কখনও বিস্মৃত না হই।" (মীরা : ব্রহ্মসঙ্গীত : ১৯৬৬ সংখ্যক কবিতা)। কবীরের কণ্ঠেও শোনা যায়—

আজ মেরে প্রীতম ঘর আয়ে।
... ...

কন্নু আরতি প্রেম-নিছাবর, পল পল বলি বলি জাউঁ,
কহৈঁ কবীর, ধন্য ভাগ হমারা, পরম পুরুখ বর পাউঁ।

আজ আমার প্রিয়তম আমার ঘরে আসিযাছেন।...প্রেমের অর্ঘ্য লইযা আমি তাঁহার আরতি করি; পলে পলে আমি তাঁহার কাছে আপনাকে উৎসর্গ করি। কবীর বলেন, ধন্য আমাব ভাগ্য; আজ আমি আমার পরমপুরুষ স্বামীকে পাইযাছি (কবীর: ব্রহ্মসঙ্গীত: ১৯৬০ সংখ্যক কবিতা)। এই উপলব্ধি রবীন্দ্রনাথেরও হইযাছে। বৈষ্ণবের মধুর রসের আস্বাদন তিনিও করিযাছেন—

ওগো বর, ওগো বঁধু,
জান জান তুমি, ধুলায বসিযা এবালা তোমারি বধূ।
রতন-আসন তুমি এরই তরে
রেখেছ সাজাযে নির্জন ঘরে—
সোনার পাত্রে ভরিযা রেখেছ নন্দন বন মধু—
ওগো বর, ওগো বঁধু॥ (খেযা: বালিকাবধূ)

রাজা (অরূপরতন) নাটকের স্বদর্শনাও সেই অরূপের বধূরূপেই সার্থক হইল। কত ঘাত প্রতিঘাতের মধ্য দিযাই না বধূ তাহার অপরিচিত স্বামীকে একান্তরূপে আপনার করিযা লয।

মরমী কখনও আবার ঈশ্বরের গৌরব এবং মহিমা দেখিযা চকিত হন। তিনি কেবল কুসুমের ন্যায কোমলই নহেন। 'রাজায', 'অচলাযতন'-এ তাঁহার সেই পরিচয আছে। প্রকৃতিতে কেবল শরতের হাল্কা মেঘ আর বসন্তের আবেশই আছে তাহা নহে, সেখানে ঝড-ঝঞ্ঝা, বজ্র-বিদ্যুৎও আছে। মানুষকে বিপর্যস্ত করিযা সে জীবনের পরিচয দিযা যায। মরমী তাই তাঁহার দুঃখ-মূর্তিও দেখেন—

উডিযে ধ্বজা অভ্রভেদী রথে
ঐ যে তিনি, ঐ যে বাহির পথে।
(গীতাঞ্জলি: ১১৮ সংখ্যক কবিতা)

অথবা, বজ্রডাকে শূন্যতলে বিদ্যুতেরি ঝিলিক ঝলে,
ছিন্ন শযন টেনে এনে আঙিনা তোর সাজা—
ঝডের সাথে হঠাৎ এল দুঃখরাতের রাজা॥
(খেয়া: আগমন)

তিনি কোমল হইলেও কঠিন, 'এক হাতে ওর কৃপাণ আছে, আর এক হাতে হার' (গীতালি) তাই তাঁহাকে পাইতে হইলে দুশ্চর তপস্যা করিতে হয়। যাহার আত্মবিশ্বাস নাই, যে শক্তি হীন, দুর্বল তাহার আত্মোপলব্ধি সম্ভব নয়। উপনিষদ বলিয়াছেন, নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ।[৩] শ্বেতাশ্বতর বলিয়াছেন, "মানুষের ভিতরকার অনন্ত বীজের মধ্যকার তেলের মত, অথবা দধির মধ্যকার, মাখনের মত, নদীর জলের মত, অথবা কাষ্ঠদ্বয়ের মধ্যকার অগ্নির মত" (১ : ১৫)। তেল পাইতে হইলে কঠিন চাপ দেওয়া চাই, মাখনের জন্য দধিমন্থনের প্রয়োজন, জল পাইতে হইলে মাটি খুঁড়িতে হইবে এবং অগ্নির জন্য কাঠ দুইটিকে ঘষিতে হয়। সহজে বড় জিনিস পাইবার উপায় নাই, তাহার জন্য বড় দুঃখ বরণ করিতে হয়। সন্তানের জন্মমুহূর্তে বেদনা বোধ না থাকিলে চলে না। সমুদ্র মন্থনের ক্লেশ স্বীকার না করিলে অমৃত লাভ সম্ভব হইত না। দুঃখকে এড়াইয়া আনন্দ পাইবার জো নাই। তাই শারদোৎসব-এ (ঋণশোধ), রাজা-য় (অরূপরতন), অচলায়তন-এ (গুরু) দুঃখের ভিতর দিয়া সত্যের পরিচয় দিয়াছেন রবীন্দ্রনাথ। জগতের মধ্যে বিপরীত ধর্মী শক্তি কাজ করিতেছে ইহা কাহারও দৃষ্টি এড়াইয়া যাইবার কথা নয়। সুতরাং এই বিপরীত শক্তির কোনটিকে এড়াইয়া সত্যে উপনীত হওয়া সম্ভব নয়। রবীন্দ্রনাথ বুঝিয়াছিলেন, 'সুখ দুখ দুটি ভাই' (চণ্ডিদাস)। জীবনে এই উভয়ের সমন্বয় চাই : প্রকৃতি তাহার মধ্যে সেই সামঞ্জস্য দান করিয়াছে—

"We have what we call in Sanskrit 'dvandva', a series of opposites in creation ; such as, the positive pole and the negative, the centripetal force and the centrifugal, attraction and repulsion ···they are only different ways of asserting that the world in its essence is a reconciliation of pairs of opposing forces ; like the left and the right hands of the creator, are acting in absolute harmony, yet acting from opposite directions···these opposites do not bring confusion in the universe, but harmony" (Sādhanā : p-96).

তাই জীবনে চলার পথে বিপদ-বিপর্যয়-আঘাতকে তিনি সর্বদা মর্যাদা দিয়াছেন—

৩। মুণ্ডকোপনিষৎ : ৩য় মুণ্ডকে : ২য় খণ্ড

তরিখানা বাইতে গেলে
মাঝে মাঝে তুফান মেলে
তাই বলে হাল ছেড়ে দিয়ে—
কান্নাকাটি ধরব না। (বাউল : অভয়)

সাধারণ মানুষ দুঃখ ভীরু, বেদনা কাতর। তাহারা দুঃখের আঘাত সহিতে পারে না—উহাকে তাহারা একান্ত করিয়া দেখে। চিত্তের জাগরণের জন্য যে আঘাত একান্ত আবশ্যক এই কথাটা তাহারা ভাবিতেও পারে না। বলহীন বলিয়াই তাহারা বোঝে না যে—

যখন থাকে অচেতনে
এ চিত্ত আমার
আঘাত সে যে পরশ তব,
সেই তো পুরস্কার।
(গীতাঞ্জলি : ৯১ সংখ্যক কবিতা)

সেই জন্যই এই সব মানুষ নানা আবরণ রচনা করিয়া নিজেদের গোপন করিবার চেষ্টা করে। এ যেন শত্রুর হাত হইতে আত্মরক্ষার জন্য উটপাখীর বালুস্তরে নিজের মুখ লুকাইয়া ফেলিবার মত, 'অচলায়তন' নাটকে উত্তর দিকের জানালাটা ছিল একজটা দেবীর এবং সেই দিক হইতে একটু বাতাস আয়তনে প্রবেশ করিলেই সর্বনাশ। কিন্তু এইরূপ এড়াইয়া চলিবার ফলে সত্যের পূর্ণরূপ আমাদের দৃষ্টির বাহিরে থাকিয়া যায়। ইহারা জীবনকে সম্পূর্ণরূপে জানিতেও পারে না। দুঃখের মুখোমুখী দাঁড়াইয়াই মানুষ নিজের শক্তি সম্বন্ধে সচেতন হইতে পারে। দুঃখের সহিত সংঘাত ব্যতীত আমরা আমাদের মধ্যে যাহা শ্রেষ্ঠ এবং মহৎ এবং যাহা আনন্দ তাহাকে উপলব্ধি করিতে পারি না। তাই দুঃখকে যাহারা এড়াইয়া চলে তাহারা নিজেদের শক্তিকেই খর্ব করিয়া রাখে, "পৃথিবীতে এসে যে ব্যক্তি দুঃখ পেলে না সে লোক ঈশ্বরের কাছ থেকে তার সব পাওনা পেলে না—তার পাথেয় কম পড়ে গেল" (শান্তিনিকেতন ১ম খণ্ড : দুঃখ : পৃ-১৬)। সুতরাং "দুঃখ এবং আঘাত ন্যায্য হোক বা অন্যায্য হোক তার সংস্পর্শ থেকে নিজেকে নিঃশেষে বাঁচিয়ে চলবার অতিচেষ্টায় আমাদের মনুষ্যত্বকে দুর্বল ও ব্যাধিগ্রস্ত করে তোলে" (তদেব : দুঃখ : পৃ-১৮)।

দুঃখের আগুনে পুড়াইয়াই তিনি মানুষকে পরিশুদ্ধ করেন। বিপদের মধ্য দিয়াই মানুষের সত্য উপলব্ধি হয়। 'শারদোৎসব' নাটকে দুঃখকে বরণ করিয়াই উপনন্দ আনন্দ পাইয়াছে। 'রাজা'য় কাঞ্চীরাজ-সুবঙ্গমা-সুদর্শনা দুঃখের পথেই সত্যকে জানিয়াছে। 'অচলায়তন'কে গুরু আসিয়া চূর্ণ করিয়াছেন। সেখানে ভিতের উপর স্থবিরকের রক্তের সঙ্গে শোণ-পাংশুদের রক্ত মিশিয়াছে। 'রক্তকরবী'তেও রাজাকে সংগ্রামে অবতীর্ণ হইতে হইয়াছে সত্য উপলব্ধির জন্য।

রবীন্দ্রনাথ কেবল যে বিপদ এড়াইতে চাহেন নাই তাহাই নহে তিনি বিপদ আহ্বান করিয়াছেন। বিপদ যত বড় হইয়া আসে তত বেশী করিয়া আমরা নিজেদের চিনি। সেই জন্যই 'রক্তকরবী'তে সংঘাত চরম হইয়া দেখা দিয়াছে। 'শারদোৎসব'-এ চক্রবর্তী রাজার বিশ্ববোধ বহু পূর্বেই হইয়াছিল বলিয়া নাটকে সংঘাত বিশেষ নাই। সেখানে জীবনকে উপলব্ধির জন্য বিশেষ মূল্য দিতে হয় নাই : সেই জন্যই সোমপাল-এর পরিবর্তন উপলব্ধির গভীরতা হইতে আসা কি না সে বিষয়ে সন্দেহ থাকিয়া যায়। কিন্তু 'রক্তকরবী'তে রাজাকে সত্য উপলব্ধির জন্য অনেক মূল্য দিতে হইয়াছে। নাটকীয় সংঘাতও যেমন তাহাতে সৃষ্ট হইয়াছে, আত্মোপলব্ধির আনন্দও তাহাতে অনেকগুণ বৃদ্ধি পাইয়াছে। তাই রবীন্দ্রনাথ আঘাতকে বরণ করিতে চান। বেদনা ব্যতীত সুন্দর সৃষ্টি হয় না। রবীন্দ্রনাথ পৃথিবীকে ভালবাসেন বলিয়াই বেদনা চান—

করো মোরে সম্মানিত নব বীর বেশে,
দুরূহ কর্তব্যভারে, দুঃসহ কঠোর
বেদনায়। পরাইয়া দাও অঙ্গে মোর—
ক্ষতচিহ্ন-অলঙ্কার। (নৈবেদ্য)

চুপ করিয়া ঘরে বসিয়া বেদনা বরণ করা যায় না, পৃথিবীকে সুন্দর করাও যায় না। তাই তিনি কর্মের জগতের মাঝখানে আসিয়া দাঁড়াইতে বলিয়াছেন। পিতৃদেব মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের আদর্শ ছিল তাঁহার সম্মুখে। মহর্ষিদেব তাঁহার দীর্ঘ জীবন ধর্মসাধনায় কাটাইয়াছেন, কিন্তু পার্থিব কর্তব্য হইতে কখনও বিচ্যুত হন নাই। রবীন্দ্রনাথও উপলব্ধি করিয়াছেন যে ব্রহ্মলাভের আকাঙ্ক্ষার সহিত কর্মত্যাগের কোন সম্পর্ক নাই। এই সংসার যে তাঁহারই প্রেমের দান

এই তো তোমার প্রেম, ওগো
হৃদয়হরণ।
এই যে পাতায় আলো নাচে
সোনার বরণ। (গীতাঞ্জলি : ৩০ সংখ্যক কবিতা)

জগৎকে তুচ্ছ করিলে যে তাঁহাকেই তাচ্ছিল্য করা হয়। ঈশোপনিষদ বলিয়াছেন

অন্ধংতমঃ প্রবিশন্তি যে অবিদ্যামুপাসতে।
ততো ভূয় ইব তে তমো য উ বিদ্যায়াং রতা॥

যাহারা কেবল অবিদ্যা অর্থাৎ সংসার কর্মেরই উপাসনা করে তাহারা অন্ধকারের মধ্যে প্রবেশ করে তদপেক্ষা অধিক অন্ধকারে প্রবেশ করে তাহারা যাহারা কেবল ব্রহ্ম বিদ্যায় নিরত। রবীন্দ্রনাথও এইরূপ অন্তরবাণী শুনিয়াছেন : কর্মের ভিতর দিযাই কর্মক্ষয় করিতে হয় "কর্ম সাধনাই একমাত্র সাধনা। সংসারের উপযোগিতা সংসারের তাৎপর্যই তাই। মঙ্গলকর্ম সাধনেই আমাদের স্বার্থ প্রবৃত্তি সকল ক্ষয় হইয়া আমাদের লোভ মোহ আমাদের হৃদগত বন্ধন সকলের মোচন হইয়া থাকে। ...ইহাই সংসার ধর্মের মূল মন্ত্র—কর্ম এবং ব্রহ্ম ; জীবনে উভয়ের সামঞ্জস্য সাধন। কর্মের দ্বারা আমরা ব্রহ্মের অভ্রভেদী মন্দির নির্মাণ করিতে থাকিব" (ঔপনিষদ ব্রহ্ম : পৃ-১৪)। মরমী একহার্টও (Eckhart, Johannes : ১২৬০ ?-১৩২৭) কর্ম এবং ত্যাগকে সমন্বিত করিয়াছেন, বরং কর্মকেই অধিকতর মর্যাদা দিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন—

"If a man were in rapture such as Paul[8] experienced, and if he knew of a person who needed something of him. I think it would be far better out of love to leave the rapture and serve the needy man." (K. S. Ramaswami Sastri : The Evolu-

৪। St. Paul (A. D. 3-67) ইঁহার পূর্বতন নাম ছিল সল (Saul) ; তিনি রোমের নাগরিক ছিলেন এবং গোঁড়া ইহুদী ছিলেন। কথিত আছে খ্রীষ্ট ভক্তদের বন্দী করিতে যাইবার কালে তিনি আকাশে এক উজ্জ্বল আলোক দেখেন এবং খ্রীষ্টের বাণী শোনেন। সেই সময় হইতেই তিনি খ্রীষ্ট ধর্ম গ্রহণ করেন এবং সেই ধর্ম প্রচার করিতে থাকেন। তিনিই প্রথম বুঝিয়াছিলেন যে খ্রীষ্টধর্ম বিশ্বেরই ধর্ম। কথিত আছে যে রোমের নিকটে তাঁহার মুণ্ডচ্ছেদ করা হয়। নব অনুশাসনে (New Testament) তাঁহার অনেক বাণী আছে। (The Book of Knowledge : Ed. John Hammerton).

tion of Indian Mysticism : p-60). বুদ্ধ কর্মত্যাগের নির্দেশ দিয়াছেন অনেকের এইরূপ বিশ্বাস, কিন্তু রবীন্দ্রনাথ তাহা স্বীকার করেন না—

"In his sermon to Sa'dhu Sinha Budha says, "It is true, Sinha, that I denounce activities, but only the activities that lead to the evil in words, thoughts, or deeds. It is true, Sinha, that I preach extinction, but only the extinction of pride, lust, evil thoughts, and ignorance, not that of forgiveness, love, charity and truth."..." (Sādhanā : p : 31-32).

বুদ্ধ যদি কর্ম বিরতিই চাহিবেন তবে নিজে পরিনির্বাণ লাভ করিয়া সংসারের মধ্যে আসিবেন কি প্রকারে এবং ধর্মোপদেশ দিয়া কর্মই বা করিলেন কেন? বুদ্ধের অপার করুণাবোধ বিশ্বের প্রতি একান্ত প্রেম ব্যতীত আর কিছুই নহে।

কর্মের দ্বারাই কর্মকে অতিক্রম করিতে হইবে। 'ন কর্মণামনারম্ভান্নৈ-ষ্কর্ম্যং পুরুষোঽশ্নুতে'—কর্মের আরম্ভ না করিলে মানুষ নৈষ্কর্ম অনুভব করিতে পারে না (গীতা : ৩য় অধ্যায়)। সুতরাং—

তস্মাদসক্তঃ সততং কার্যং কর্ম সমাচর।
অসক্তো হ্যাচরন্ কর্ম পরমাপ্নোতি পুরুষঃ॥

(গীতা : ৩য় অধ্যায় : শ্লোক-১৯)

তুমি সঙ্গ-রহিত হইয়া নিরন্তর কর্তব্য কর্ম কর। অসঙ্গ থাকিয়া যে পুরুষ কর্ম করে সে মোক্ষ পায় (গান্ধীজীর ভাষ্য)।

উপনিষদও বলিয়াছেন, ত্যাগেনৈকং অমৃতত্বমনাস্থঃ—একমাত্র ত্যাগের দ্বারাই অমৃতত্ব লাভ হয়। ত্যাগের পথ তো কর্মহীনতার পথ নয়—কর্মেরই পথ। কর্মকে পথের সহিত তুলনা করা যায়। পথ দিয়াই আমরা গৃহে পৌঁছাই। কেবল পথেই থাকিব মনে করিলে গৃহে পৌঁছান হইবে না—পথে চলিব না মনে করিলেও গৃহ নিকটে আসিবে না। আত্মার গৃহে যাইবার একমাত্র পথ কর্ম—"যেমন শক্তিহীনতার মধ্যে শান্তি নাই, তেমনি কর্মহীনতার মধ্যে মঙ্গলকে কেহ পাইতে পারে না। ঔদাসীন্যে মঙ্গল নাই। কর্মক্ষেত্র মন্থন করিয়াই মঙ্গলের অমৃত লাভ করা যায়" (ধর্ম : শান্তং শিবম-দ্বৈতম্ : পৃ-১১৭)। প্রায়শ্চিত্ত নাটকে প্রতাপাদিত্য ও ধনঞ্জয়ের কথা স্মরণীয়—

প্রতাপাদিত্য। বৈরাগী, আমার এক একবার মনে হয় তোমার ওই রাস্তাই ভালো, আমার এই রাজ্যটা কিছু না।

ধনঞ্জয়। মহারাজ, রাজ্যটাও রাস্তা। চলতে পারলেই হল! ওটাকে যে পথ বলে জানে সেই তো পথিক…। (পৃ-৯৫)।

কর্মে লিপ্ত না হইয়াও উপায় নাই। আমাদের স্বার্থপরতা আত্মাব সত্য দৃষ্টিকে আচ্ছন্ন করে, "কর্তব্য কর্মের সাধনাই স্বার্থপাশ হইতে মুক্তির সাধনা, এবং ত্বয়ি নান্যথেতোঽস্তি ন কর্ম লিপ্যতে নরে"[৫]—ইহার অন্যথা নাই—কর্মে লিপ্ত হইবে না এমন পথ নাই (ঔপনিষদ ব্রহ্ম: পৃ-১৪)।

গীতায় স্বয়ং ভগবান বলিয়াছেন:

> ন মে পার্থাস্তি কর্তব্যং ত্রিষু লোকেষু কিঞ্চন।
> নানবাপ্তমবাপ্তব্যং বর্ত এব চ কর্মণি॥ (৩য় অধ্যায়: ২২)

হে পার্থ, আমার ত্রিলোকে কিছুই করিবার নাই। পাওয়ার যোগ্য কিছুই পাই নাই, এমন নাই। তথাপি আমি কর্মে নিযুক্ত রহিয়াছি (গান্ধীজীর ভাষ্য)। সুতরাং কর্মচক্র হইতে কাহারও মুক্তি নাই—

> মুক্তি? ওরে, মুক্তি কোথায় পাবি,
> মুক্তি কোথায় আছে।
> আপনি প্রভু সৃষ্টি বাঁধন প'রে
> বাঁধা সবার কাছে।

(গীতাঞ্জলি: ১১৯ সংখ্যক কবিতা)

রবীন্দ্রনাথ গভীরভাবে বিশ্বাস করেন যে আমাদের অন্তর্যামী আমাদেরই মঙ্গলের জন্য প্রতিনিয়ত কাজ করিয়া চলিয়াছেন। আমরা যত তুচ্ছতার মধ্যেই নিমজ্জিত হইনা কেন তিনি আমাদের বন্ধন ছিন্ন করিবার কাজেই লিপ্ত রহিয়াছেন, 'রক্তকরবী', 'ডাকঘরে' তাহার পরিচয় আছে। কর্ম করিতে করিতেই এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডও অনন্তের পথে চলিয়াছে—'জগৎ' কথাটাই তাঁহার সাক্ষ্য দেয়—

কর্ম অওর ভর্ম সংসার সব্ করত হ্যয় (কবীর: ব্রহ্মসঙ্গীত: ১৯৫৭ সংখ্যক কবিতা), সব সংসার কর্ম করিয়া ও ভ্রমণ করিয়া চলিয়াছে।

৫। ঈশোপনিষদ।

উপনিষদের বাণী 'চরৈ বেতি, চরৈ বেতি' বাল্যকাল হইতেই কবির মনে 'গতি'র বিশ্বাস আনিয়া দিয়াছিল। কালের কাঠামোতে যে রূপের প্রকাশ তাহা কালের বিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গেই রূপ পরিবর্তন করে—

ধ্বনিয়া উঠিছে শূন্য নিখিলের পাখার এ গানে—
'হেথা নয়, অন্য কোথা, অন্য কোথা, অন্য কোন্ খানে'। (বলাকা)

কাজেই খণ্ড আকারে দেখিলে যাহাকে মৃত্যু বলিয়া মনে হয়, ব্যাপক আকারে দেখিলে তাহা একটি গতিশীল বস্তুর বড় রকমের পরিবর্তন ব্যতীত আর কিছুই নহে—

ফুরায় যা তা ফুরায় শুধু চোখে
অন্ধকারের পেরিয়ে দুয়ার
যায় চলে আলোকে।
পুরাতনের হৃদয় টুটে
আপনি নূতন উঠবে ফুটে
জীবনে ফুল ফোটা হলে
মরণে ফল ফলবে।

কঠ উপনিষদ বলিয়াছেন, 'শস্যমিভ মর্তেয়ঃ পচ্যতে শস্যমিভ জায়তে পুনঃ' (অঃ ৬ শ্লোঃ ৬)—শস্য জন্মায এবং পুনরায় আবির্ভূত হইবার জন্য মৃত্যু বরণ করে। নূতন জীবনের জন্যই মৃত্যুর প্রয়োজন—বৃক্ষের পুরাতন পাতা ঝরিয়া না গেলে তো নূতন পাতা জন্মাইতে পারিত না: নূতনের জন্যই পুরাতনের ঝরিয়া পড়া চাই—'উড়ে যাক, দূরে যাক বিবর্ণ বিশীর্ণ জীর্ণ পাতা বিপুল নিশ্বাসে' (কল্পনা: বর্ষশেষ)। মৃত্যু তাই ভয়ের নহে, ইহা নবরূপ লাভের জন্যই। পূর্ণতার জন্যই মৃত্যু চাই—

ওগো আমার এই জীবনের
শেষ পরিপূর্ণতা
মরণ, আমার মরণ, তুমি
কও আমারে কথা।

(গীতাঞ্জলি: ১১৬ সংখ্যক কবিতা)

বিবর্তনবাদ যেমন পৃথিবীর প্রগতিতে বিশ্বাসী রবীন্দ্রনাথেরও সেইরূপ বিশ্বাস যে মানুষ পরম সুন্দরের সহিত মিলিবার জন্য প্রতিনিয়তই সুন্দর হইয়া

উঠিতেছে এবং একদিন সে পরিপূর্ণতা লাভ করিয়া সেই পরমসুন্দরের সহিত মিলিত হইবেই। তাই বিভিন্ন নাটকে মহৎ প্রাণ মৃত্যুর মধ্য দিয়াই পরিপূর্ণতা লাভ করিয়াছে। অভিজিৎ মৃত্যুবরণ করিয়া মানুষের মধ্যে মিলনের সেতু রচনা করিবার উপায় করিয়া দিয়া যায়। রঞ্জনের মৃত্যু রাজার পূর্ণ জাগরণ ঘটাইল। রবীন্দ্রনাথ হিংসাকে স্বীকার করেন নাই, কিন্তু জগৎ যে হিংস্র তাহাও অস্বীকার করেন নাই। সেই হিংস্রতা দূর করিতে হইলে মূল্য দিতে হইবে। মহতের বলি সেই কারণেই প্রয়োজন; ইহা অজ্ঞ মানুষের চেতনা জাগ্রত করে। অভিজিৎ-রঞ্জন পরিপূর্ণতার পথে অগ্রসর হইল এবং যাইবার কালে সাধারণ মানুষগুলিকে মহত্বের প্রতি আকৃষ্ট করিয়া গেল। ইহা একান্তই সত্য যে যত ক্ষুদ্রতার মধ্যেই মানুষ নিমজ্জিত থাকুক না কেন, মহৎ কিছু দেখিলে তাহার প্রাণে আলোড়ন উপস্থিত হইবেই। আমাদের ভিতরকার ছোট মানুষটি যত ঘরকুণোই হউক না কেন কোথাও কাহাকেও মহৎ দুঃখ বরণ করিতে দেখিলে শ্রদ্ধায় আপ্লুত না হইয়া পারে না। প্রাণ তুচ্ছ করিয়া কেহ কাহাকেও রক্ষা করিয়াছে শুনিলে সে কখনও রক্ষা কর্তাকে ধিক্কার দেয় না। রাজার সন্তান বুদ্ধদেব মানব কল্যাণে পথে নামিয়া আসিয়াছিলেন জানিয়াও সে রাজৈশ্বর্যের পরিমাপ করিয়া বুদ্ধদেবকে অজ্ঞ বলিতে পারে না। আরামকে যে মানুষ সত্যই পূজা করে না তাহার প্রমাণ তাহার ইতিহাস, "জগতের ইতিহাসে মানুষের পরমপূজ্যগণ দুঃখেরই অবতার, আরামে লালিত লক্ষ্মীর ক্রীতদাস নহে" (ধর্ম : দুঃখ : পৃ-১০৩)।

ক্ষুদ্রতাকে অতিক্রম করিবার উপায়টিও রবীন্দ্রনাথ দেখাইয়াছেন। যে নূতনকে বরণ করে, যে প্রতি মুহূর্তের পরিবর্তনকে স্বীকার করে, সেই অন্ধকার ছিন্ন করতে পারে। পৃথিবীর অভিযাত্রীর বেশ সে তখন দেখিয়া লয়। জীবনের জন্যই বন্ধনের সমস্ত অর্গল চূর্ণ করিতে হইবে। পূর্ণতার অখণ্ড রূপের উদ্ঘাটনের জন্য গতিহীনতা রূপ অপদেবতার ধ্বংস চাই। শ্রীঅরবিন্দ ভারতের আত্মাকে তাই স্মরণ করাইয়া দিয়াছেন—

"......the fences which she created to protect the outer growth of the spiritual ideal and which afterwards became barriers to its expansion and further application, she can now break down and give her spirit a freer field and 'an ampler flight" (The Renaissance in India : p : 81-82).

জীবনের বড় সত্য যে স্বীকার করে সে নূতকে গ্রহণ না করিয়া পারে না, আর যে নূতনকে আহ্বান জানায় সে ভাঙনকে ভয় পায় না। সে তখন নিশ্চিন্ত মনে 'কেবলই উত্তর দক্ষিণ পূর্ব পশ্চিমের সমস্ত দরজা-জানলাগুলো খুলে খুলে' (অচলায়তন : পৃ-১০৩) বেড়ায়। এই উপায়েই অহং-এর ক্ষুদ্রতার গণ্ডী ছিন্ন হয়। 'অচলায়তন'-এর পঞ্চক নূতনকে স্বীকার কবিয়া মুক্তির উপায়কে সহজ করিয়া তুলিয়াছিল। আচার্য-মহাপঞ্চক গতিকে অস্বীকার করিযা মুক্তি সাধনার জন্য গুরুর প্রতিষ্ঠিত আয়তনকে অচলায়তনে পরিণত করিয়া মুক্তির পথটাই রুদ্ধ করিযা ফেলিয়াছিলেন।

রবীন্দ্রনাথ জানিতেন যে ক্ষুদ্রতম মানুষকেও তাচ্ছিল্য করিলে চলিবে না, পরমাত্মার লীলা তাহার মধ্যেও চলিতেছে—

আমার মাঝে তোমার লীলা হবে,
তাই তো আমি এসেছি এই ভবে।

(গীতাঞ্জলি : ১৩০ সংখ্যক কবিতা)

সেই মানুষের মুক্তির কথাই বর্তমান যুগের বাণী। মানুষের মঙ্গলের দিকে লক্ষ্য রাখিয়াই সমাজ সংস্কারের প্রেরণা জাগিয়া উঠিয়াছিল নব্য বাংলার চিত্তে। শান্তিনিকেতনের বিদ্যালযেও একসময়ে জাতি বিচার মানা হইত। ব্রাহ্মণ ও অন্য জাতির ছেলেরা সেই সময় বিভিন্ন পংক্তিতে আহার করিতে বসিত। তারপর এখানে আসিলেন পিয়ারসন (Pearson) এবং এণ্ডরুজ (C. F. Andrews)। একটি মুসলমান ছাত্রও ভর্তি হইল বিদ্যালয়ে। রবীন্দ্রনাথ বলিলেন, আমরা কোন সাম্প্রদায়িক মনোভাব লইয়া সত্যে পৌঁছাইতে পারিব না। সত্যের নামে আমরা কারাপ্রাচীর ভাঙিব, ইহার নূতন নামকরণ করিব…এইখানে আমরা যে ধর্মের দীক্ষা লইব তাহা মানবতার দীক্ষা[৬]।

মানুষকে মর্যাদা দেওয়ার অর্থ তাহার শক্তিকে শ্রদ্ধা করা, তাহার স্বাধীনতাকে স্বীকার করিয়া লওয়া। রবীন্দ্রনাথ ইহা সমস্ত অন্তর দিয়া স্বীকার করিয়া লইয়াছিলেন। বাড়ীর আবহাওয়াই তাঁহাকে এই শিক্ষায় প্রথম দীক্ষা দেয়—"আমাদের পরিবার আমার জন্মের পূর্বেই সমাজের নোঙর

৬। Dr. Surendranath Dasgupta: Rabindranath; Poet and Philosopher: P-164

তুলে দূরে বাঁধা-ঘাটের বাইরে এসে ভিড়েছিল। আচার অনুশাসন ক্রিয়াকর্ম সেখানে সমস্তই বিরল" (আত্মপরিচয় : পৃ-৭১)। স্বাধীনতা স্পৃহা বাঙ্গালীর চরিত্রের মধ্যেই রহিয়াছে—ইতিহাস তাহার সাক্ষ্য দিবে। মানুষকেও সে কম মর্যাদা দেয় নাই, তাহার প্রমাণ রহিয়াছে মনসার কাহিনীতে; চণ্ডীদাসের পদে, 'সবার উপরে মানুষ সত্য, তাহার উপরে নাই'। নিজের জীবনেও রবীন্দ্রনাথ তাহা উপলব্ধি করিয়াছেন। তাঁহার জ্যোতিদাদা তাঁহাকে স্বাধীনতা দিয়াছিলেন বলিয়াই ছোট্ট রবি রবীন্দ্রনাথ হইয়া উঠিয়াছিলেন—"জ্যোতিদাদা, যাঁকে আমি সকলের চেয়ে মানতুম, বাইরে থেকে তিনি আমাকে কোনো বাঁধন পরান নি। তাঁর সঙ্গে তর্ক করেছি, নানা বিষয়ে আলোচনা করেছি বয়স্যের মতো। তিনি বালককেও শ্রদ্ধা করতে জানতেন। আমার আপন মনের স্বাধীনতার দ্বারাই তিনি আমার চিত্ত বিকাশের সহায়তা করেছেন। তিনি আমার 'পরে কর্তৃত্ব করবার ঔৎসুক্যে যদি দৌরাত্ম্য করতেন তা হলে ভেঙেচুরে তেড়েবেঁকে যা-হয় একটা কিছু হতুম, সেটা হয়তো ভদ্রসমাজের সন্তোষজনকও হত, কিন্তু আমার মতো একেবারেই হত না" (আত্মপরিচয় : পৃ-৭৪)।

একান্ত স্বাধীনতা পিয়াসী ছিলেন বলিয়াই তিনি শান্তিনিকেতনের বিদ্যালয়ে কঠিন শৃঙ্খলা স্থাপনের বিরোধী ছিলেন। তিনি মনে মনে অবশ্যই চাহিতেন যে বিদ্যালয় এক বিশেষ লক্ষ্য লইয়া চলিবে, আদর্শ স্থানীয় হইয়া উঠিবে। কিন্তু তাই বলিয়া তিনি উপর হইতে ছাত্রদের উপর কোন বিধান চাপাইয়া দিতে চাহেন নাই। একটি পত্রে তিনি লিখিয়াছেন, আমি বক্তৃতা দ্বারা অথবা জোর করিয়া সহকর্মীদের বাধ্য করায় বিশ্বাসী নই; কারণ স্বাধীনতা হইতেই সমস্ত স্বাধীন ভাব আপনা আপনি কাজ করে[৭]। দর্শন তত্ত্বের এক বিশেষ মত এই যে আত্মার স্বাধীনতাই নৈতিক জীবনের ভিত্তি[৮]। আত্মা স্বাধীনভাবে কাজ করিতে অক্ষম হইলে নীতি কথাটির অর্থই থাকিত না। এই স্বাধীনতায় একান্ত বিশ্বাস তাঁহার নাটকগুলির নানা স্থানে ছড়াইয়া আছে। ঠাকুর্দা ও বালকের দলকে লইয়া তিনি যে মাতামাতি করিয়াছেন তাহাতে এই স্বাধীনতার কথাটাই প্রধান।

৭। Dr. S. N. Dasgupta : Rabindranath : Poet and Philosopher : P-164

৮। Indeterminist or Self-Determinist দের মত

ব্যক্তিত্বকে জাগানই তো সমস্যা এবং একবার তাহাকে জাগাইতে পারিলে সমস্ত সমস্যারই সমাধান হইয়া যায়। তিনি বিশ্বাস করিতেন যে সত্য প্রতিষ্ঠায় শাস্ত্রগুরু বর্জন করিয়া মানুষের নিজের স্বজ্ঞাকেই কষ্টিপাথররূপে গ্রহণ করা উচিত। সেইজন্যই 'ডাকঘর'-এর অমল সুদূরের পিয়াসী ঃ 'অচলায়তন'-এ পঞ্চক বার বার অচলায়তন ছাড়িয়া গিয়াছে, তাহার মন শাস্ত্রের সমস্ত বাধাকে অস্বীকার করিয়াছে। এইরূপ মানুষই সত্যকে পায়।

মানুষ একদিকে সীমিত, অন্যদিকে অসীম। সে পৃথিবীর সন্তান, কিন্তু স্বর্গের উত্তরাধিকারী—অমৃতস্য পুত্রাঃ[১]। মানুষের ভিতরকার অসীম তাহাকে আদর্শের দিকে আকর্ষণ করে—তাহাকে সকলের মধ্যে পরিব্যাপ্ত করে। এইখানেই তাহার 'বড়ো আমি'র প্রকাশ। তাহার সীমিত দিকটা তাহাকে ভোগের দিকে প্রলুব্ধ করে। যে ইহাতে বাঁধা পড়ে সে 'ছোট আমি'র দাসত্ব করে। তাহার আত্মোপলব্ধি হয় না। বস্তু বিশ্বের সত্যকার মর্যাদাও সে দিতে পারে না—বহির্জগৎ তাহার নিকট নিছকই জড় থাকিয়া যায়; তাহার ভিতরে যে অনন্ত হাতছানি দিতেছে তাহা তাহার ধারণার অতীত হইয়া থাকে। তখনই মানুষ ছোট সুখের কল্পনায় বিভোর হয়। 'মুক্তধারা'র অভিজিৎ অসীমের আহ্বান শুনিয়া রাজপ্রাসাদ ছাড়িয়া পথে আসিয়া দাঁড়ায় আর বিভূতি মুক্তধারার বাঁধ বাঁধিয়া 'ছোট আমি'র পূজা করে। নিদ্রা যেমন সময়ে সময়ে কর্তব্যের বাধাস্বরূপ হইয়া মানুষকে আচ্ছন্ন করে সেইরূপ কামনা তাহার মহত্তর উপলব্ধির বাধা হইয়া দাঁড়ায়, তাহাকে পাকে পাকে জড়াইয়া রাখে—"আসক্তি যাকে মাকড়সার মতো জালে জড়ায় তাকে জীর্ণ করে দেয়; তাতে গ্লানি আসে, ক্লান্তি আনে। কেননা আসক্তি তাকে সমগ্র থেকে উৎপাটন করে নিজের সীমার মধ্যে বাঁধে; তার পরে তোলা ফুলের মতো অল্পক্ষণেই সে ম্লান হয়" (আত্মপরিচয় ঃ পৃ-৮৭)। তাহার অহং তখন মাথা তুলিয়া দাঁড়ায়, বস্তুকে তখন সে আমার বলিয়া আঁকড়াইয়া ধরে—চারিপাশে বস্তুর পুঞ্জ সঞ্চিত করে। 'রক্তকরবী'র রাজার তাল তাল সোনা তুলিয়াও আর নিষ্কৃতি নাই, সোনা তোলার মত্ততা তাহাকে পাইয়া বসে—"একবার সঞ্চয় করতে আরম্ভ করলে ক্রমে আমরা সঞ্চয়ের কল হয়ে উঠি, তখন আমাদের সঞ্চয়

১। শ্বেতাশ্বতরোপনিষৎ ঃ ২য় অধ্যায়।

প্রয়োজনকেই বহু দূরে ছাড়িয়ে চলে যায়, এমনকি, প্রয়োজনকেই বঞ্চিত ও পীড়িত করতে থাকে" (শান্তিনিকেতন : ১ম খণ্ড : সঞ্চয়তৃষ্ণা : পৃ-৮৫)। সঞ্চয়ের প্রবৃত্তি মানুষকে কখনও ঐক্য উপলব্ধি করিতে দেয় না। পৃথিবীর সব কিছুই যে ঈশ্বর দ্বারা আবৃত—'ঈশাবাস্যমিদম্ সর্বম্ যৎ কিঞ্চ জগত্যাম্ জগৎ'[১০]। সুতরাং কোন কিছু একান্ত আপনার করিবার চেষ্টার অর্থই সকলের সহিত বিরোধ সৃষ্টি করা। 'রক্তকরবী'তে এই কথাটা আছে। রাজা যখন সঞ্চয়ের প্রবৃত্তিকে আঁকড়াইয়া ছিলেন তখন তিনি ধ্বংস শক্তি, যখন মানুষের মধ্যে বাহির হইয়া আসিলেন, যখন সত্যের জগতে নামিয়া প্রবৃত্তির সঙ্গে সংগ্রাম করিতে আসিলেন তখনই তাঁহার ভিতরকার অসীমটির, তাঁহার 'বড়ো আমি'র জাগরণ হইল। তখনই তিনি মুক্ত।

সত্যং জ্ঞানমনন্তম্[১১]। তিনি ধারণার অতীত। কিন্তু অতীত হইয়া থাকিলে যে তাঁহার নিজেরও চলে না। এই সীমিত মানুষকেও তাঁহার চাই। তিনি আমাদের প্রেমভিখারী—'আমার মধ্যে তোমার প্রকাশ তাই এত মধুর'[১২]। তিনি টানেন বলিযাই মানুষ আসে : বাঁশী ডাকিযা ডাকিযা যায়—"সে যে তোমারও আগে এসেছিল, নইলে তোমাকে বার করে কার সাধ্য"[১৩]। এইজন্য তিনি অনন্ত হইযাও নিজেকে দশদিকে ধরা দিযা বসিয়া আছেন। তিনি লুকাইয়া নাই : আকাশে বাতাসে প্রকৃতিতে তিনি সর্বত্রই প্রকাশিত। লক্ষ লক্ষ যুগ যদি শত সহস্র চক্ষু মেলিয়াও চাহিয়া থাকা যায় তথাপি তৃপ্তি হইবে না। সুতরাং বহির্বিশ্ব কেবল জড় পদার্থই নয়—ইহা অসীমেরই সঙ্কেত—"আমি, কি আত্মার মধ্যে, কি বিশ্বের মধ্যে বিস্ময়ের অন্ত দেখি না। আমি জড় নাম দিয়া, সসীম নাম দিয়া কোনো জিনিসকে এক পাশে ঠেলিযা রাখিতে পারি নাই। এই সীমার মধ্যেই, এই প্রত্যক্ষের মধ্যেই অনন্তের যে প্রকাশ, তাহাই আমার কাছে অসীম্ বিস্ময়াবহ। আমি এই জলস্থল তরুলতা পশুপক্ষী চন্দ্রসূর্য দিনরাত্রির মাঝখান দিয়া চোখ মেলিয়া চলিয়াছি, ইহা আশ্চর্য। এ জগৎ তাহার অণুতে পরমাণুতে, তাহার প্রত্যেক ধূলিকণায় আশ্চর্য" (আত্মপরিচয় : পৃ-১৫)। এই সৌন্দর্য আমাদের চক্ষুকে

১০। ঈশ
১১। তৈত্তিরীয়
১২। গীতাঞ্জলি : ১২০ সংখ্যক কবিতা
১৩। রাজা : পৃ-১২৫।

আকর্ষণ করিবার জন্যই—এই অনির্বচনীয়তা আমাদের অন্তরকে পাইবার জন্য। আমাদের না হইলে তাঁহারও যে চলে না। 'রাজা' নাটকে সেইজন্য সুদর্শনা মুখ ফিরাইয়া থাকিতে পারিল না—বংশীধ্বনি করিয়া অদৃশ্য রাজা রানীকে আহ্বান করিলেন। 'ডাকঘর'-এ দইওয়ালা, প্রহরী সকলেই অনির্বচনীয় হইয়া উঠিল অমলের চোখে। তারপর প্রতিষ্ঠিত হইল রাজার ডাকঘর, তাঁহার চিঠি আসিল অমলের নামে—সাদা কাগজে অপূর্ব-অদৃশ্য ভাষায় তিনি অমলকে আহ্বান করিলেন। প্রকৃতির ঘরে ঘরেই আমাদের নিমন্ত্রণ—"জগতের সৌন্দর্যের মধ্য দিয়া, প্রিয়জনের মাধুর্যের মধ্য দিয়া ভগবানই আমাদিগকে টানিতেছেন—আর-কাহারও টানিবার ক্ষমতাই নাই। পৃথিবীর প্রেমের মধ্য দিয়াই সেই ভূমানন্দের পরিচয় পাওয়া, জগতের এই রূপের মধ্যেই সেই অপরূপকে সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষ করা, ইহাকেই তো আমি মুক্তির সাধনাবলি। জগতের মধ্যে আমি মুগ্ধ, সেই মোহেই আমার মুক্তিরসের আস্বাদন" (আত্মপরিচয় : পৃ-১৯)।

মানুষ যন্ত্র মাত্র নহে। রবীন্দ্রনাথ বিশ্বাস করিতেন যে মানুষ একটি আত্মিক সত্তা। ইহা শাস্ত্রীয় বচন বা বস্তুবিশ্বের কোন কিছুর দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত হইবার নয়। তাহাকে নিজের অন্তর নির্দেশের উপর নির্ভর করিয়া স্বাধীন ভাবে কাজ করিয়া যাইতে হইবে। মোচার খোলাকে তরঙ্গ যে রূপে পরিচালিত করে সেরূপে পরিচালিত হইবার জন্য মানুষের জন্ম নয় ; তাহাকে পাকা মাঝির ন্যায় তরঙ্গের সঙ্গে লড়াই করিতে হইবে। প্রকৃতির দিকে চাহিলে বুঝিতে বিলম্ব হয় না যে মানুষকে মহিমা মণ্ডিত করিবার জন্যই সে নানা বাধার সৃষ্টি করিয়া রাখিয়াছে। পথ তো সহজ নয়—'দুর্গং পথস্তৎ কবয়ো বদন্তি'[১৪]। অবিদ্যায় আচ্ছন্ন থাকা পর্যন্ত সে ভুল ভ্রান্তি করিতে পারে কিন্তু যে অন্তর বাণী শুনিবার জন্য আগ্রহশীল, যে অন্তর নির্দেশ মানিয়া চলে সে সত্য দৃষ্টি লাভ করে, বাহিরের কোন বাধা তাহার পথরোধ করিতে পারে না। কবির বিশ্বাসের মূলমন্ত্র ঈশ্বরকে নিজের মধ্যে দেখা : মানুষকে তিনি স্বাধীন করিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন, নিজের শক্তি তাহাকে দিয়াছেন কিন্তু তাহাকে আবৃত করিয়া রাখেন নাই। নিজের ভিতরে চেতনা জাগ্রত হইলেই, অবিদ্যার ঘোর কাটিয়া গেলেই সে আত্মাকে জানিতে পারে। উপনিষদ বলিয়াছেন, আত্মানাং বিদ্ধি : সক্রেতীস (**Socrates :**

১৪। কঠ : ১ অধ্যায়

খ্রী পূর্ব ৪৭০-৩৯৯) বলিয়াছেন 'know thyself', একমাত্র তখনই উপলব্ধি হইবে—'তোরই ভিতর অতল সাগর', সুতরাং 'মনের মধ্যে মনের মানুষ করো অন্বেষণ'।

সৃষ্টির বিস্ময়ের মধ্যে মানুষ এক অমর কাব্য। মানুষের মধ্যে যে অপরিমেয়তা আছে তাহা কেবলই সীমার বন্ধন অতিক্রম করিয়া যাইতে চায়। বিশ্বসঙ্গীত শুনিবার কান একমাত্র মানুষেরই আছে: "সকল জীবের মধ্যে মানুষই কেবল অমিতাচারী। তাকে পেতে হবে অমিত, তাকে দিতে হবে অমিত, কেননা তার মধ্যে আছে অমিতমানব। সেই অমিত মানব সুখের কাঙাল নয়, দুঃখভীরু নয়। সেই অমিতমানব আরামের দ্বার ভেঙে কেবলই মানুষকে বের করে নিয়ে চলেছে কঠোর অধ্যবসায়ে" (মানুষের ধর্মঃ পৃ-১৭)।

ভিতরের মানুষটাকে উদ্ধারের চেষ্টা অর্থাৎ আত্মার উদ্বোধনের চেষ্টা রবীন্দ্রনাথের প্রতীক নাটকগুলিতে বিশেষভাবে দেখিতে পাই। পরিবেশের চাপ হইতে আত্মার মুক্তির কথা তিনি অনেকগুলি নাটকেই বলিযাছেন। ইহাকেই তিনি নিজ নাটকের ধুযা বলিযা উল্লেখ করিযাছেন, " 'শারদোৎসব' থেকে আরম্ভ করে 'ফাল্গুনী' পর্যন্ত যতগুলি নাটক লিখেছি, যখন বিশেষ করে মন দিয়ে দেখি তখন দেখতে পাই প্রত্যেকের ভিতরকার ধুয়োটা ঐ একই" (আত্মপরিচয: পৃঃ ৫৫-৫৬)। ১৩২৪ সালে আত্মপরিচযের এই অংশটুকু রবীন্দ্রনাথ লেখেন। সুতরাং তাহার পরবর্তী কালে রচিত নাটকগুলিরধুয়া সম্বন্ধে তিনি নিজে কিছু বলিযা যান নাই। কিন্তু পরবর্তী-কালের 'মুক্তধারা' 'রক্তকরবী'র ধুযাও যে একই তাহাতে কোন সন্দেহ নাই।

সমাজব্যবস্থার পরিবর্তন হইলেই অর্থাৎ যন্ত্র সভ্যতার পরিবর্তে গ্রামীন সভ্যতার পত্তন হইলেই মানুষের জগৎ সুন্দর হইযা উঠিবে বলিয়া রবীন্দ্রনাথ কখনও মনে করেন নাই। মানুষটা ভাল না হইলে কোন সমাজব্যবস্থাতেই মঙ্গল আসিবে না। অবিদ্যার অন্ধকার হইতে মানুষটাকে, আত্মাকে উদ্ধার করিতে হইবে। তখনই মানুষ ক্ষুদ্রতার গণ্ডী অতিক্রম করিয়া বিশ্বের সহিত অন্তরের যোগ সাধন করিতে পারে। নাটকগুলির মধ্যে একটি করিয়া রাজা চরিত্র তিনি সৃষ্টি করিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথের দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে আত্মা স্বাধীন, বাহিরের পরিবেশ যাহাই হউক না কেন আত্মার স্বাধীনতা তাহা নষ্ট করিয়া ফেলিতে পারে না। 'শারদোৎসব'-এ চক্রবর্তী সম্রাট

বিজয়াদিত্যের আত্মা মুক্ত, নিজেকে পরীক্ষা করিতেই তিনি বাহির হইয়াছেন। তাঁহার আদর্শ সম্মুখে দেখিয়া সামন্ত রাজ সোমপাল সহজেই পরিবর্তিত হইলেন। তাঁহারও আত্মার জাগরণ হইল। 'রাজা' নাটকে অদৃশ্যরাজা স্বয়ং অসীম অনন্ত সত্তা। কাঞ্চী রাজের কামনা এবং সুদর্শনার রূপ-তৃষ্ণাকে নষ্ট করিয়া তাহাদের আত্মার জাগরণ ঘটাইলেন অদৃশ্যরাজা। 'অচলায়তন'-এ শাস্ত্রীয় আচারঅনুষ্ঠান এবং তথাকথিত ধর্ম সাধনের মিথ্যা অহমিকা চূর্ণ করিলেন গুরু। এই নাটকে রাজার স্থান কিছুই নয়। মহাপঞ্চকের আত্মার মুক্তির কথাই এখানে বলা হইয়াছে। 'ডাকঘর'-এও সেই আত্মার মুক্তির কথাই আছে। তারপর প্রথম বিশ্বযুদ্ধ চলাকালে তিনি জাপান আমেরিকা ঘুরিয়া আসেন। এই সময়ে তিনি বিশেষভাবে লক্ষ্য করেন যে মানুষের আত্মাকে মেঘাচ্ছন্ন করিবার জন্য কেবল ইন্দ্রিয়গুলিই বিভ্রান্তি সৃষ্টি করে তাহাই নহে, পুরাতন ধর্মীয় শাসনের কুসংস্কারই কেবল আত্মার পথ রোধ করে তাহাও নহে—তাহার পথরোধ করিবার জন্য নূতন যুগের মানুষও দুইটি মারাত্মক অস্ত্র আবিষ্কার করিয়াছে, সাম্রাজ্যবাদ এবং যন্ত্র সভ্যতার আওতায় গড়িয়া ওঠা পুঁজিবাদ। সাম্রাজ্যবাদী শক্তি এবং পুঁজিবাদ লোভের পথে চলিয়া কেবল নিজের আত্মাকে মোহাচ্ছন্ন করিয়া রাখে তাহাই নয় উহারা অন্য মানুষের আত্মার স্বাধীনতা পর্যন্ত অপহরণ করিতে চায়। এই বাধা অতিক্রম করিয়া মানুষটাকে বাহির করিয়া আনা বড় সহজ সাধ্য নহে। তাহার জন্য অনেক মূল্য দিতে হয়। 'শারদোৎসব', 'রাজা', 'অচলায়তন' প্রভৃতিতেও মূল্য দিতে হইয়াছে; 'অচলায়তন'-এ স্থবিরকের রক্তের সঙ্গে শোণপাংশুর রক্ত মিলিয়াছে, কিন্তু 'মুক্তধারা' এবং 'রক্তকরবীর ন্যায় মহতের আত্মবলিদানের প্রয়োজন হয় নাই। 'শারদোৎসব' প্রভৃতিতে মহত্ত্বের আদর্শ যে কার্য সমাধা করিতে পারিয়াছে, 'মুক্তধারা, 'রক্তকরবী'তে সেই কার্য সাধন করিতে ধনঞ্জয় বৈরাগী-নন্দিনীদের তো প্রয়োজন হইয়াছেই, তাহার উপরেও প্রয়োজন হইয়াছে অভিজিৎ-রঞ্জনের মৃত্যুবরণ। বাহিরের কঠিন পেষণ সত্ত্বেও আশাবাদী রবীন্দ্রনাথ আত্মার স্বাধীনতায় কখনও আস্থা হারান নাই—পেষণ যতই শক্ত হইবে ততই অধিক মূল্য দিতে হইবে এই পর্যন্ত।

প্রেম দৃষ্টি জাগরণেই আত্মার মুক্তি। ত্যাগের ভিতর দিয়াই মানুষ অনন্ত জীবনের পথে অগ্রসর হয়—ইহাই আত্মোপলব্ধির পথ। আত্মার ব্যাপ্তি

অধিকার বাড়াইয়া হয় না, সাম্রাজ্য প্রসারিত করিয়া হয় না। প্রেম জাগ্রত হইলেই মানুষ সার্থক হয়। অবিদ্যার জগৎ হইতে আত্মা যখন উদ্ধার পায় তখনই তাহার প্রেম জাগ্রত হয়। অসংযত ইন্দ্রিয় মানুষকে ক্ষুদ্রতার পথে লইয়া যায়; তাহাদের সংযত করিতে পারিলে তাহাদেরই সাহায্যে বিশ্বপ্রকৃতিতে অনন্তকে আভাসিত হইতে দেখা সম্ভব হয়। প্রেম মানুষের সমস্ত সঙ্কীর্ণতা দূর করিয়া দেয়, সমস্ত ভেদ জ্ঞান অপসারণ করে। এই অবস্থায় মনে কোন্ ভাব জাগ্রত হয় রবীন্দ্রনাথ তাহা 'সোনারতরী' কাব্যগ্রন্থের 'বসুন্ধরা' কবিতায় বলিয়াছেন—

হে সুন্দরী বসুন্ধরে, তোমা-পানে চেয়ে
কতবার প্রাণ মোর উঠিয়াছে গেয়ে
প্রকাণ্ড উল্লাসভরে। ইচ্ছা করিয়াছে,
সবলে আঁকড়ি ধরি এ বক্ষের কাছে
সমুদ্রমেখলা-পরা তব কটিদেশ;
প্রভাতরৌদ্রের মতো অনন্ত অশেষ
ব্যাপ্ত হয়ে দিকে দিকে, অরণ্যে ভূধরে
কম্পমান পল্লবের হিল্লোলের 'পরে
করি নৃত্য সারাবেলা করিয়া চুম্বন
প্রত্যেক কুসুমকলি, করি' আলিঙ্গন
সঘন কোমল শ্যাম তৃণক্ষেত্রগুলি,
প্রত্যেক তরঙ্গ-'পরে সারাদিন দুলি'
আনন্দদোলায়; রজনীতে চুপে চুপে
নিঃশব্দচরণে বিশ্বব্যাপী নিদ্রারূপে
তোমার সমস্ত পশু-পক্ষীর নয়নে
অঙ্গুলী বুলায়ে দিই, শযনে শয়নে
নীড়ে নীড়ে গৃহে গৃহে গুহায় গুহায়
করিয়া প্রবেশ, বৃহৎ অঞ্চল-প্রায়
আপনারে বিস্তারিয়া ঢাকি বিশ্বভূমি
সুস্নিগ্ধ আঁধারে॥

এই বিশ্ববোধের ভিত্তিতেই তাঁহার কাব্য রচিত। তাঁহার প্রতীক নাটকগুলিরও মূল কথা আত্মার উদ্বোধন এবং বিশ্ববোধের জাগরণ।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

নাট্যকলা ও রবীন্দ্রনাট্য

প্রাচীন ভারতীযদের শিল্পের প্রতি ছিল গভীর শ্রদ্ধা। জাতীয় জীবনে নাটকের প্রভাবও ছিল অসামান্য। নাট্যবেদ[1] কথাটিতে নাটককে বেদ কল্প বলিয়া ধরা হইযাছে। নাট্যের কথা উল্লেখ করিযা উল্লসিত নাট্যশাস্ত্র প্রণেতা ভরতমুনি বলিয়াছেন—

ন তজ্ জ্ঞানং ন তচ্ছিল্পং ন সা বিদ্যা ন সা কলা।
ন স যোগো ন তৎ কর্ম নাট্যেঽস্মিন্ যন্ন দৃশ্যতে ॥

এমন জ্ঞান, শিল্প, বিদ্যা বা কলাকৌশল নাই, এমন যোগ, কর্ম নাই যাহা এই নাটকে দেখা যায না।

প্রাচীন ভারতীযরা নাটককে দৃশ্য কাব্যও বলিতেন। তাঁহারা এই সহজ সত্যটুকু জানিতেন যে অন্যান্য ইন্দ্রিয অপেক্ষা চক্ষুকেই সহজে এবং বিশেষভাবে আকৃষ্ট করা যায়। অভিনেতাও মঞ্চে উপস্থিত হইযা শত সহস্র তীক্ষ্ণ চক্ষুর অস্তিত্ব অনুভব করেন। অভিনেতা কি বলেন তাহা শোনা অপেক্ষা কি করেন তাহা দেখিবার আগ্রহই দর্শকদের অনেক বেশী। আসরে বসিযা গান শুনিবার সময, এমন কি সাধারণ কথা শুনিবার কালেও মুখটি দেখিতে না পারিলে সম্পূর্ণ রসগ্রহণ করা গেল না বলিয়া একটা ক্ষোভ থাকিযা যায। মানবাত্মার জীবন দেখিবার জন্যই নরনারী নাটক দেখিতে যায; সুতরাং অভিনেতার কোন আবেগের প্রকাশ, কোন ভঙ্গীই, তাহা যত সামান্যই হউক না কেন, কাহারও দৃষ্টির বাহিরে থাকিলে চলে না। ওযাগনার (Wagner Wilhelm Richard : ১৮১৩-৮৩) সেইজন্যই দাবী করিয়াছিলেন যে দর্শকদের বসিবার আসন এমন ভাবে নির্দিষ্ট করিতে হইবে যাহাতে তাহাদের মুখ সোজাসুজি মঞ্চের দিকে থাকে এবং সমস্ত মঞ্চটি তাহাদের দৃষ্টিগোচর হয়[2]। দৃশ্য কাব্য নামটি, এমন কি ওয়াগনারের দাবীও এই কথাই স্মরণ করাইযা দেয় যে

১। ভরতের নাট্যশাস্ত্র
২। Encyclopaedia Britanica : Vol 22 : p-35.

নাটক কেবল পাঠ করিবার জন্যই রচিত হয় নাই। 'ড্রামা' কথাটিরও মূল অর্থ সংঘাত।[৩] 'নাট্য' কথাটির নৃত্যের সহিত ঘনিষ্ঠ যোগ আছে। গর্ডন ক্রেইগ (Gordon Craig বলিয়াছেন—

'A drama is not to be read, but to be seen upon the stage'. (On the Art of the Theatre : p-140).

শেহভ অনেকটা ভিন্ন মত পোষণ করিতেন বলিয়া মনে হইতে পারে। এক সাহিত্যিক বন্ধুকে লেখা একটি চিঠিতে তিনি জানাইয়াছিলেন—"I implore you not to fall in love with the stage, please. True, there is a great deal that is good in it. The Good is exaggerated to the skies......the theatre is a serpent that seeks your blood. Until the writer has conquered the playwright in you I shall harass you and curse your plays." (Letter written to I. L. Scheglov on Dec. 20. 1888 : The Life & Letters of Anton Tchekhov : Koteliansky).

শেহভের এই পত্রের মর্ম হইতে কিছুতেই প্রতিপাদন করা যায় না যে তিনি অভিনয় অপেক্ষা পাঠের জন্যই রচনার পক্ষপাতী ছিলেন। তিনি কেবল এই কথাই বলিতে চাহিয়াছিলেন যে মঞ্চনাট্যকারের দৃষ্টিভঙ্গী যেন শিল্পী-মনকে আচ্ছন্ন না করে। কারণ মঞ্চনাট্যকার শিল্পীর ন্যায় স্বচ্ছন্দ ও স্বাধীন হইতে পারেন না—তাঁহাকে বিশেষ করিয়া মঞ্চের কথা মনে রাখিতে হয়। মঞ্চের বিভিন্ন ধরণের অভিনেতা-অভিনেত্রীদের যোগ্যতার দিকে লক্ষ্য রাখিয়া এবং দর্শকদের রুচি ও প্রেক্ষাগৃহের অধিকারীর অর্থ উপার্জনের সম্ভাবনার কথা স্মরণ করিয়া তবে মঞ্চনাট্যকারকে নাটক লিখিতে হয়। শেহভের অভিযোগ ছিল এইখানেই। তাহা যদি না হইত তাহা হইলে বিভিন্ন দেশে, ইউরোপে-ভারতবর্ষে বড় বড় কবিদের নাট্যমঞ্চের সহিত ঘনিষ্ঠ যোগ স্থাপন করিতে দেখা যাইত না। গ্যেটে-হাউপট্‌ম্যান, ইবসেন-মেটারলিঙ্ক, মলার্মে-ভেরলেন্‌-ভেরহারেন, ইয়েট্‌স্‌-রবীন্দ্রনাথ নাট্যমঞ্চ ও অভিনয়ের সহিত বিশেষভাবে যুক্ত ছিলেন। 'স্বয়ং শেহভ দিনের পর দিন স্টানিস্লাভ্‌স্কি (Constantine Stanislavsky : ১৮৬৩-১৯৩৮) এবং নেমিরোভিচ্‌ ডান্‌শেন্‌কোর (Viadimir Nemirovich Danchenko : ১৮৫৮-১৯৪৩) অভিনয় প্রস্তুতি দেখিয়াছেন এবং সময়ে সময়ে তাঁহাদের

৩। Encyclopedia Americana : Vol. IX.

উপদেশও দিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথ পেশাদারী মঞ্চের আওতায় না গিয়া নিজ পরিবারের স্ত্রী-পুরুষদের লইয়া এবং পরবর্তীকালে শান্তিনিকেতনের ছাত্র-ছাত্রীদের দ্বারা বহুবার নিজ নাটকের অভিনয় প্রদর্শন করিয়াছেন। সুতরাং শেহভের প্রকৃত বক্তব্য যে কি ছিল তাহা বুঝিতে বিলম্ব হয় না। তিনি বলিতে চাহিয়াছিলেন প্রকৃত শিল্পীর ন্যায়ই নাটক রচনা করিতে : প্রকৃত নাট্য পরিচালক এবং অভিনেতা-অভিনেত্রীরা তাহাদের প্রতিভা দ্বারা সেই নাটকের যথার্থ ব্যাখ্যাই করিবেন। মঞ্চের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া যাঁহারা নাটক রচনা করেন তাঁহারা নিজেদের প্রতিভা নষ্ট করেন এবং নাট্য পরিচালক এবং অভিনেতা-অভিনেত্রীদের প্রতিভা বিকাশের সুযোগ দেন না। শেহভের অভিযোগের মূল কারণ এইখানেই।

পেশাদারী মঞ্চের জন্য হিসাব করিয়া লেখায় শিল্পীর মন নিশ্চয়ই সাড়া দিবে না। শেহভ বা রবীন্দ্রনাথ তাঁহাদের শিল্পী মনকে সম্পূর্ণ রূপেই বজায় রাখিয়াছিলেন সত্য, আবার ইহাও ঠিক সেইরূপই সত্য যে নাটক মঞ্চের উপযুক্ত হইয়া ওঠে যে সংঘাত-সৃষ্টির গুণে. সেই সংঘাত বাহিরেরই হউক অথবা অন্তর্জগতেরই হউক, তাহা তাঁহারা এড়াইয়া যান নাই। তাঁহাদের নাটকেও সংঘাত সৃষ্টির কৌশল অপূর্ব সুন্দর রূপেই দেখা দিয়াছে। বাহিরের সংঘাতকে তাঁহারা বিশেষ মর্যাদা দেন নাই—তাঁহাদের নাটকে অন্তর্জগতের দ্বন্দ্বেরই প্রাধান্য। শিল্পী মনকে এই দ্বন্দ্ব আকর্ষণই করে।

যদি কেবল পাঠ করিবার জন্যই রচিত হইবে তবে তাহাদের নাটক রূপই বা কবিরা দিলেন কেন? 'বউঠাকুরাণীর হাট' (১৮৮৩) বা 'রাজর্ষি' (১৮৮৭) উপন্যাস রূপেই প্রথমে লিখিত হইয়াছিল, পরবর্তীকালে উহাদের নাটকরূপ—'প্রায়শ্চিত্ত' (১৯০৯) এবং 'বিসর্জন' (১৮৯০)—দিবার কারণ কি হইতে পারে? কেবল তাহাই নহে, নিজের অনেকগুলি নাটকের রূপও তিনি পরিবর্তন করিয়াছেন: 'রাজা ও রাণী' (১৮৮৯) পরিবর্তিত হইয়াছে 'তপতী'তে (১৯২৯), 'রাজা' (১৯১০) নবরূপে হইল 'অরূপরতন' (১৯২০), 'শারদোৎসব' (১৯০৮) দেখা দিল 'ঋণশোধ' (১৯২১) রূপে এবং 'অচলায়তন' (১৯১২) 'গুরু'র রূপ গ্রহণ করিল ১৯১৮ খ্রীষ্টাব্দে। এই সূত্রে 'তপতী'র ভূমিকার দিকে দৃষ্টি দেওয়া যাইতে পারে—"সুমিত্রা এবং বিক্রমের সম্বন্ধের মধ্যে একটি বিরোধ আছে—সুমিত্রার মৃত্যুতে সেই বিরোধের সমাধান হয়। বিক্রমের যে প্রচণ্ড আসক্তি পূর্ণভাবে সুমিত্রাকে

গ্রহণ করবার অন্তরায় ছিল সুমিত্রার মৃত্যুতে সেই আসক্তির অবসান হওয়াতে, সেই শান্তির মধ্যেই সুমিত্রার সত্য উপলব্ধি বিক্রমের পক্ষে সম্ভব হল, এইটেই 'রাজা ও রাণী'র মূল কথা।

"রচনার দোষে এই ভাবটি পরিস্ফুট হয় নি। কুমার ও ইলার প্রেমের বৃত্তান্ত অপ্রাসঙ্গিকতার দ্বারা নাটককে বাধা দিয়েছে এবং নাটকের শেষ অংশে কুমার যে অসংগত প্রাধান্য লাভ করেছে তাতে নাট্যের বিষয়টি হয়েছে ভারগ্রস্ত ও দ্বিধাবিভক্ত। এই নাটকের অন্তিমে কুমারের মৃত্যু দ্বারা চমৎকার উৎপাদনের চেষ্টা প্রকাশ পেয়েছে—এই মৃত্যু আখ্যানধারার অনিবার্য পরিণাম নয়"। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে শিল্প হিসাবে 'রাজা ও রাণী'কে রবীন্দ্রনাথ সার্থক মনে করেন নাই, মঞ্চে অভিনয়ের দিক দিয়াও উপযুক্ত মনে করেন নাই। কেবল নাটকের রূপ পরিবর্তন করিয়াই তিনি শান্তি পান নাই: তাঁহার অনেকগুলি নাটকই অভিনয় করা পেশাদারী মঞ্চের পরিচালকদের পক্ষে অসম্ভব বুঝিয়া নিজে শিক্ষিত ছাত্র-ছাত্রীদের সাহায্যে অভিনয় করাইয়াছেন। সুতরাং এ কথা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে নাটক কেবল পড়িবার উদ্দেশ্যেই রচিত এ কথা শেহভও মনে করিতেন না—রবীন্দ্রনাথও কখন তাহা মনে করেন নাই। প্রকৃত শিল্পীরা নাটক রচনায় হাত দেওয়াও মঞ্চশিল্পে প্রচুব পরিবর্তন সাধিত হইয়াছে। মঞ্চনাট্যকারদের নাটক মঞ্চশিল্পকে এক অচলায়তনের বাঁধা ঘাটে আবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিল—অভিনেতা-অভিনেত্রীদেরও নাট্য ব্যাখ্যায় গতানুগতিক ধারার বাহিরে যাইবার অবকাশ ছিল না। প্রকৃত শিল্পীদের আগমনে প্রেক্ষাগৃহে নূতন বাতাস বহিল।

নাটকের রূপ, মঞ্চ-সজ্জা, দৃশ্যপট, অভিনয় কৌশল বর্তমান কালে নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষায় পরিবর্তিত হইয়া চলিয়াছে। প্রতি যুগেই বড় বড় নাট্যকার এবং নাট্যপরিচালক আসিয়া কিছু-না-কিছু পরিবর্তন সাধন অবশ্যই করিয়াছেন; এমন কি বৈজ্ঞানিক উন্নতির ফলেও অনেক পরিবর্তন সাধিত হইয়াছে। এই যুগের বৈজ্ঞানিক উন্নতি এবং বাস্তববাদী ও রহস্যবাদীদের মত-সংঘাত পরীক্ষা-নিরীক্ষায় অনেকখানি গতি সঞ্চার করিয়াছে।

প্রাচীন ভারতীয় নাট্যে দৃশ্যপটের কোন স্থান ছিল কি না সে বিষয়ে মতবিরোধ আছে। ভারতীয় দৃশ্য কাব্যগুলির মধ্যে নানাস্থানে যে ভাবে

দেশকালের বর্ণনা দেওয়া হইয়াছে তাহাতে মনে হয় যে দৃশ্যপটের ব্যবহার ব্যতীতও দর্শকদের কল্পনা করিয়া লইতে কোন অসুবিধা হইত না। প্রাচীন ভারতীয় নাট্যমঞ্চে দৃশ্যপটের ব্যবহার হইত না এই বিশ্বাসই যে রবীন্দ্রনাথের ছিল তাহা মনে করিবার কারণ আছে—"আধুনিক য়ুরোপীয় নাট্যমঞ্চের প্রসাধনে দৃশ্যপট একটা উপদ্রবরূপে প্রবেশ করেছে। ওটা ছেলেমানুষি। লোকের চোখ ভোলাবার চেষ্টা। সাহিত্য ও নাট্যকলার মাঝখানে ওটা গায়ের জোরে প্রক্ষিপ্ত।.........

"শকুন্তলার তপোবনের একটি ভাব কাব্যকলার আভাসেই আছে। সেই পর্যাপ্ত। আঁকা ছবির দ্বারা অত্যন্ত বেশি নির্দিষ্ট না হওয়াতেই দর্শকের মনে অবাধে সে আপন কাজ করতে পারে। নাট্যকাব্য দর্শকের কল্পনার উপরে দাবি রাখে, চিত্র সেই দাবিকে খাটো করে, তাতে ক্ষতি হয় দর্শকেরই। অভিনয় ব্যাপারটা বেগবান, প্রাণবান, গতিশীল। দৃশ্যপটটা তার বিপরীত: অনধিকার প্রবেশ ক'রে সচলতার মধ্যে থাকে সে মূক, মূঢ, স্থাণু; দর্শকের চিত্তদৃষ্টিকে নিশ্চল বেড়া দিয়ে সে একান্ত সঙ্কীর্ণ করে রাখে। মন যে জায়গায় আপন আসন নেবে সেখানে একটা পটকে বসিয়ে মনকে বিদায় দেওয়ার নিয়ম যান্ত্রিক যুগে প্রচলিত হয়েছে, পূর্বে ছিল না। আমাদের দেশে চিরপ্রচলিত যাত্রার পালাগানে লোকের ভিড়ে স্থান সংকীর্ণ হয় বটে; কিন্তু পটের ঔদ্ধত্যে মন সংকীর্ণ হয় না (তপতী: ভূমিকা)। এই মত রবীন্দ্রনাথের পরবর্তীকালে হইয়াছিল মনে করিবার কারণ নাই. দৃশ্যপটের বিরুদ্ধে তাঁহার অভিযোগ বরাবরই ছিল। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর একবার স্টেজের পশ্চাৎ পটকে বনের উপযোগী করিয়া সাজাইবার জন্য বাঁশের জাফরির উপর শুখনো 'মস' গুঁজিয়া তার মধ্যে জায়গায় জায়গায় ডিমের খোলাতে সলিতা জ্বালাইয়া জোনাকির ভাব আনিতে চাহিয়াছিলেন[৪]। তাঁহার প্রভাব সত্ত্বেও ১৯০২ খ্রীস্টাব্দে রবীন্দ্রনাথ লিখিয়াছিলেন, "ছবিটা কেন? তাহা অভিনেতার পশ্চাতে ঝুলিতে থাকে—অভিনেতা তাহাকে সৃষ্টি করিয়া তোলে না; তাহা আঁকামাত্র; আমার মতে তাহাতে অভিনেতার অক্ষমতা কাপুরুষতা প্রকাশ পায়" (বঙ্গদর্শন নব পর্যায়: রঙ্গমঞ্চ)। রোমের নাট্যমঞ্চেও কোন

। ইন্দিরা দেবী চৌরাণী: রবীন্দ্র স্মৃতি: পৃ-২৮।

অঙ্কিত দৃশ্যপট ছিল না বলিয়া মনে হয়[৫]। ইংলণ্ডেও বহুদিন পর্যন্ত দৃশ্যপট লইয়া কেহ মাথা ঘামান নাই। দর্শকরা নিজেরাই দৃশ্যপট কল্পনা করিয়া লইত; তাহাতে রসবোধে বড় একটা বাধা জন্মাইত না। যাত্রার আসরে ঠিক এইরূপেই আজও দর্শকরা দৃশ্যপট কল্পনা করিয়া লয়—"যাত্রা চক্ষুর সম্মুখে অল্প দেখাইত; কিন্তু চক্ষু হইতে দূরে ঢের বেশী দেখাইত; যে সব দৃশ্য যাত্রাওয়ালারা আঁকিয়া দেখাইত না, দর্শকের কল্পনা তাহা সুন্দর করিয়া আঁকিতে প্রবুদ্ধ হইত। কল্পনা ও ভাবের রাজ্যে সকল কথা ব্যক্ত করিয়া ফেলিলে দর্শক কি শ্রোতার মনের চক্ষু ও মনের কর্ণের জন্য আর কি রাখা হইল। সহস্র চেষ্টায় বৈকুণ্ঠধামকে দৃশ্যপটে আঁকিতে চেষ্টা করিলেও দর্শকের চক্ষে আদর্শ খর্ব হইয়া যাইবে, কিন্তু দর্শককে কথার ইঙ্গিত দিয়া যদি তাঁহার কল্পনাকে সজাগ করিয়া দেওয়া হয়, তবে কল্পনা দেবী যাহা আঁকিবেন ইটালীর চিত্রকরও তাহা পারিবে না" (দীনেশচন্দ্র সেন ঃ বঙ্গদর্শন নব পর্যায় ঃ ১৯০৪ ঃ যাত্রা ও থিয়েটার)।

পরবর্তীকালে অত্যধিক বাস্তবতাবোধ ইউরোপের নাটকে দৃশ্যপটের আমদানি করে; এবং সেই সূত্রেই এই দেশেও দৃশ্যপটের প্রয়োগও আরম্ভ হয়। অভিনয়ের পরোক্ষ সাহায্যের জন্যই দৃশ্যপটের প্রয়োগ হয় কিন্তু যাত্রার আসরই প্রমাণ করিয়া দেয় যে দৃশ্যপট ব্যতীতও কল্পনা করা সম্ভব। সুতরাং দৃশ্যপট ব্যবহারের খুব একটা সার্থকতা নাই। বিশেষ, প্রতীকধর্মী নাটকের ক্ষেত্রে দৃশ্যপটের প্রয়োগ করিবার সময় সাঙ্কেতিকতার দিকে বিশেষ লক্ষ্য রাখা প্রয়োজন। দৃশ্যপট কেবল ইঙ্গিত করিয়াই ক্ষান্ত হইবে এবং সেই ইঙ্গিত যেন কেবল একটি মাত্র ব্যাখ্যার দিকেই দৃষ্টি আকর্ষণ না করায়। কেবল একটি দিককে দেখাইবার চেষ্টা থাকিলে প্রতীকের সার্থকতাই ব্যাহত হয়।

দৃশ্যপট বা নাটকীয় নির্দেশ নাট্যকারদের দেওয়া বাঞ্ছনীয় নয় এইরূপ অভিমতও অনেক বিখ্যাত মঞ্চশিল্পী পোষণ করেন। গর্ডন ক্রেইগ বলেন, "Whatever picture the dramatist may wish us to know of, he will describe his scene during the progress of the conversation between the characters" (On the Art of the Theatre : p-149).

৫। Encyclopaedia Britanica : Vol. 22.

তিনি আরও বলিয়াছেন "If to gag or cut the poet's lines is an offence, so is it an offence to tamper with the art of the stage director". (তদেব : পৃ-১৫১)। হ্যামলেট, রোমিও জুলিয়েট, কিং লিয়ার, ওথেলো, প্রভৃতি বিখ্যাত নাটকে খুব কমই মঞ্চ নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে৺। শেহভের নাটক 'দি সি গাল'-এ নারীপ্রিয় যুবক লেখক ট্রিগোরিন-এর ভূমিকায় স্টানিস্লাভ্স্কি যখন প্রথম অভিনয় করেন তখন সেই অভিনয় দেখিয়া শেহভ স্টানিস্লাভ্স্কির প্রশংসা করিয়া বলেন, "Wonderful! Listen, it was wonderful! only you need torn shoes and checked trousers" (Stanislavsky : My life in Art, p-270)। নাটকে কিন্তু এইরূপ কোন নির্দেশ বা ইঙ্গিত তিনি করেন নাই। মঞ্চশিল্পীকে, পরিচালককে নাটকটি পাঠ করিয়া নাট্যকারের উদ্দেশ্য বুঝিয়া লইতে হয়। প্রতীকধর্মী নাটকে মঞ্চ নির্দেশ না দেওয়া যে কেবল বাঞ্ছনীয় তাহাই নহে, অপরিহার্য বলাই বিধেয়। রবীন্দ্রনাথ সাধারণতঃই মঞ্চ নির্দেশের পক্ষপাতী ছিলেন না: তাঁহার প্রতীকধর্মী নাটকে নির্দেশনা প্রায় নাই বলিলেও চলে। তাঁহার অন্যতম শ্রেষ্ঠ প্রতীকী নাটক 'ডাকঘর'-এ কোন পটপরিবর্তনের প্রয়োজন নাই, মঞ্চ নির্দেশও নাই—'চোখ ঠারিয়া', 'চমকিয়া উঠিয়া' প্রভৃতি দুই চারিটি নির্দেশ অভিনেতাদের দিয়াছেন মাত্র। প্রথম হইতেই এই দিকে তাঁহার বিশেষ দৃষ্টি ছিল। তাঁহার প্রথম প্রতীকী নাটক শারদোৎসব (১৯০৮); এই নাটকে একটি মাত্র দৃশ্য বিভাগ করিয়াছেন। স্থান পরিবর্তনের তাগিদেই তাঁহাকে এই কাজ করিতে হইয়াছে, কিন্তু অভিনেতাদের দুই চারিটি নির্দেশ দান ব্যতীত অন্য কোন প্রকার নির্দেশনা ইহাতেও নাই। প্রথম হইতেই নিশ্চয়ই পূর্ণতা আসে না: তথাপি এই নাটকেও একটি দৃশ্য বিভাগের ত্রুটি ব্যতীত অন্য কোন ত্রুটি নাই। এই ত্রুটিটুকুও তিনি সংশোধন করিয়াছেন ঋণশোধ-এ (১৯২১)। সেখানে 'ভূমিকা'টুকু অভিনয়ের প্রয়োজন হয় না, এবং অভিনয় না করাই নাটকের কৌশলের দিক দিয়া বাঞ্ছনীয়।

এই বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টি যে কত তীক্ষ্ণ ছিল তাহা তাঁহার বক্তব্যেই প্রমাণিত হয়—"যে নাট্যাভিনয়ে আমার কোনো হাত থাকে সেখানে ক্ষণে

৬। Gordon Craig : On the Art of the Theatre : p-152.

ক্ষণে দৃশ্যপট ওঠানো-নামানোর ছেলেমানুষিকে আমি প্রশ্রয় দিই নে। কারণ, বাস্তব সত্যকেও এ বিদ্রূপ করে, ভাব সত্যকেও বাধা দেয়" (তপতী : ভূমিকা)। কেবল বক্তব্যই নয় কার্যক্ষেত্রেও তিনি ইহার কিরূপ প্রয়োগ করিয়াছেন তাহা তাঁহার 'রাজা' (১৯১০) এবং 'অরূপরতন' (১৯২০)-এর দিকে লক্ষ্য করিলেই স্পষ্ট হইবে। প্রথমত 'অরূপরতন' আকারে অনেক ছোট—উচ্চস্তরের ভাবরাজ্যে মানুষকে অধিকক্ষণ ধরিয়া রাখা যায় না : প্রতীক নাটক বড় হইলে সেইদিক দিয়া সমূহ ক্ষতি। বড় বলিয়া 'রাজা'য় অনেকগুলি ভাগও করিতে হইয়াছে—সুকৌশলে দৃশ্যপট ও আলোকের প্রয়োগ করিলেও কয়েকবার পটপরিবর্তন করিতেই হইবে। 'অরূপরতন'-এ সেই বিপদ নাই—দক্ষ পরিচালক পট পরিবর্তন না করিয়াও কার্য সমাধা করিতে পারিবেন—বিভাগগুলির দিকে দৃষ্টি দিলেই তাহা বুঝিতে পারা যায়। অন্ততঃ 'রাজা' অপেক্ষা 'অরূপরতন'-এ সেই সুযোগ অনেক বেশী। নাট্যকৌশলের দিক দিয়া তিনি পরিণতি লাভ করিয়াছেন 'মুক্তধারা' (১৯২২) এবং 'রক্তকরবী'তেই (১৯২৬)। এই দুইটিতেই যে সামান্য নির্দেশ দেওয়া আছে তাহার অধিকাংশই প্রতীকিতার অনুরোধেই। উদাহরণস্বরূপ বলা যাইতে পারে—'দূরে আকাশে একটা অভ্রভেদী লৌহযন্ত্রের মাথাটা দেখা যাইতেছে এবং তাহার অপরদিকে ভৈরবমন্দির চূড়ার ত্রিশূল'[৭], 'কাঁধের উপর লাঠি সাজাইয়া তাহার উপর বিভূতিকে তুলিয়া লইল'[৮], 'রণজিতের খুড়া মোহনগড়ের রাজা বিশ্বজিৎ প্রবেশ করিলেন তাঁর শুভ্র কেশ, শুভ্র বস্ত্র, শুভ্র উষ্ণীষ'[৯], অথবা 'এই নাট্য-ব্যাপার যে নগরকে আশ্রয় করিয়া আছে তাহার নাম যক্ষপুরী। এখানকার শ্রমিকদল মাটির তলা হইতে সোনা তুলিবার কাজে নিযুক্ত। এখানকার রাজা একটা অত্যন্ত জটিল আবরণের আড়ালে বাস করে। প্রাসাদের সেই জালের আবরণ এই নাটকের একটিমাত্র দৃশ্য'[১০]। কিন্তু এই সামান্য নির্দেশ দানেরও কোন প্রয়োজন যে ছিল না তাহাও স্বীকার করিতেই হইবে। পাত্র-পাত্রীদের কথার ভিতর দিয়াই এই নির্দেশনার অনেকখানি প্রকাশ পাইয়াছে—

৭। মুক্তধারা : পৃ-৯ ৮। তদেব : পৃ-১৫
৯। তদেব : পৃ-১৯ ১০। রক্তকরবী : পৃ-১

পথিক। ……ওটাকে অসুরের মাথার মতো দেখাচ্ছে, মাংস নেই, চোয়াল ঝোলা। তোমাদের উত্তরকূটের শিয়রের কাছে অমন হাঁ করে দাঁড়িয়ে; দিনরাত্তির দেখতে দেখতে তোমাদের প্রাণ-পুরুষ যে শুকিয়ে কাঠ হয়ে যাবে।

… … …

পথিক। …মন্দিরের উপরের আকাশে কখনও এমনতরো বাধা দেখি নি। হঠাৎ ওইটের দিকে তাকিয়ে আজ আমার গা শিউরে উঠল—ও যে অমন করে মন্দিরের মাথা ছাড়িয়ে গেল এটা যেন স্পর্ধার মতো দেখাচ্ছে। (মুক্তধারা : পৃ-৮)

অথবা

নন্দিনী

…সেই খুশি নিয়ে তোমার ঘরের মধ্যে যেতে চাই।

নেপথ্যে

না, ঘরের মধ্যে না, যা বলতে হয় বাইরে থেকে বলো।

… … …

নন্দিনী

…জাল খুলে দাও, ভিতরে যাব। (রক্তকরবী : পৃঃ ১১-১২)

নন্দিনী

সেই অচেনার ধার থেকে এখানে যক্ষপুরীর সুড়ঙ্গ খোদার কাজে কে তোমাকে আবার টেনে আনলে?

(তদেব : পৃ-৪১)

পাঠকের কল্পনার সুবিধার জন্য মঞ্চনির্দেশনার কিছুটা সার্থকতা থাকিতে পারে, কিন্তু নাট্যকারকে ব্যাখ্যা করিবার জন্য যে মঞ্চশিল্পী পরিচালক এবং অভিনেতা-অভিনেত্রীরা রহিয়াছেন তাঁহাদের নিকট এইরূপ নির্দেশ অনেক সময়েই বন্ধনস্বরূপ হইয়া পড়ে। যে কোন নাটক, বিশেষ করিয়া প্রতীক-ধর্মী নাটক রূপায়ণের পূর্বে মঞ্চশিল্পী-পরিচালক এবং অভিনেতা-অভিনেত্রীদের উহা বার বার পড়িয়া দেখা কর্তব্য। লেখকের উদ্দেশ্য, লেখকের ইঙ্গিত যদি ধরিতে না পারেন তবে তাঁহার নাটক কি করিয়া ব্যাখ্যা করা সম্ভব হইবে? শুধু বার বার করিয়া পড়াই নয়, সকলের নিকট পরিবেশনের পূর্বে

বহুবার বইখানি অভিনয় করিয়া দেখাও প্রয়োজন। পরিচালককে সেই জন্য কেবল মঞ্চকুশলী হইলেই চলে না, তাঁহাকে সমালোচক এবং তাত্ত্বিক ও দার্শনিক হইতেও হয়। অন্যথায় নাট্যকারকে যথাযথ ব্যাখ্যা করা সম্ভব নয়। এই জন্যই বোধ হয় রাশিয়ার বিখ্যাত নট-পরিচালক স্টানিস্লাভ্স্কি ও চিন্তাশীল নাট্যকার সাহিত্যিক নেমিরোভিচ্ ডান্শেন্কোর মিলনে অসম্ভবও সম্ভব হইয়াছিল।

সুতরাং প্রতীকী নাটক রচয়িতাদের স্মরণ রাখিতেই হইবে যে, অঙ্ক-বিভাগ সম্পূর্ণরূপেই বর্জনীয়। একটি দৃশ্যেই সমস্ত নাটকটি অভিনীত হওয়াই বাঞ্ছনীয়ঃ দৃশ্যপটের প্রয়োগেও অত্যন্ত সংযম একান্তই প্রয়োজন। 'দৃশ্যপটের পরিবর্তন' অর্থ-ই ভাব-কল্পনাকে বিচ্ছিন্ন করিয়া রস হানি করা। সাধারণ নাটকে যে ভ্রান্তি বা মায়া সৃষ্টি করিতে হয় তাহা বাস্তব জগৎ হইতে মনকে সরাইয়া আনিয়া আর এক বাহ্যজগৎকে সত্য বলিয়া প্রতীয়মান করায়। কিন্তু প্রতীক নাট্যে ভ্রান্তি সৃষ্টির উদ্দেশ্য বাহ্য জগৎ হইতে মনকে অন্তর্জগতে লইয়া যাওয়া। সে ক্ষেত্রে দৃশ্যপট পরিবর্তনের দ্বারা মনকে বিক্ষিপ্ত করা চলে না। এই দিক দিয়া রবীন্দ্রনাথের 'রাজা' নাটকের অসুবিধার দিকে আমাদের দৃষ্টি পূর্বেই আকৃষ্ট হইয়াছে। 'অরূপরতন'-এ পূর্বের অসুবিধা কবি প্রায় সম্পূর্ণরূপেই দূর করিয়া দিয়াছেন। এইরূপ করাই বাঞ্ছনীয়—দর্শক মনকে ভাব হইতে বিরতি দিলে নাটকের তাৎপর্য নষ্ট হইয়া যাইবার সম্ভাবনা আছে। 'রাজা'র পরবর্তী রচনা 'ডাকঘর' (১৯১২) নাট্যকলার দিক দিয়া চমৎকার হইয়াছে তাহা পূর্বেই আলোচনা করা গেছে। ৩ সংখ্যক বিভাগে অমলকে শয্যাগত দেখা গিয়াছে এই মাত্র (পৃ-৪০)। কৌশলে দর্শকদের ভাব-কল্পনায় বিরতি না দিয়াও বসিয়া থাকা অমলকে শয্যাগত দেখান কিছুমাত্র কঠিন নয়। পরিণত রচনা 'মুক্তধারা' এবং 'রক্তকরবী' অনবদ্য, একটি দৃশ্যেই নাটক দুইটি অভিনয়ের সুযোগ রবীন্দ্রনাথ নিজেই করিয়া দিয়াছেন। প্রতীকী নাটকের শিল্প কৌশলের দিক দিয়া রবীন্দ্রনাথ শ্রেষ্ঠ শিল্পীর দক্ষতাই দেখাইয়াছেন।

প্রতীকী নাটক মঞ্চে রূপায়ণের কাজে কিছু জটিলতা আছে। সাধারণ নাটকে লেখকের উদ্দেশ্য নিজের সাহিত্যিক দৃষ্টি দিয়া বিশ্লেষণ করিয়া অভিনয় করা দুঃসাধ্য না হইলেও প্রতীকধর্মী নাটক নিজের বিশেষ ব্যাখ্যার ভিত্তিতে অভিনয় করান উচিত নহে। লেখকের নাটক নানারূপ সঙ্কেত

করিতে পারে ; পরিচালকের নিজস্ব ব্যাখ্যা অর্থকে সীমাবদ্ধ করিবে, সুতরাং সেই সীমিত অর্থে অভিনয় হইলে লেখকের উদ্দেশ্য ব্যাহত হইবার সম্ভাবনা আছে। সুতরাং প্রতীকী নাটকের মঞ্চে ব্যাখ্যাকালেও তাহাকে নানা ভাবের দ্যোতক রূপেই উপস্থাপিত করা কর্তব্য। 'মুক্তধারা'র 'সুমন' যদি একান্তই একটি বাহিরের ছেলে হইয়াই থাকে, তাহার নামের ভিতর যদি আর কোন সঙ্কেতের সন্ধান না পাওয়া যায়, তবে মঞ্চে পুত্রের মৃত্যুতে বিক্ষুব্ধ মাতার বিক্ষুব্ধ উচ্চরোল কর্ণপট বিদীর্ণই করিবে, শোভন মনের জাগরণের সঙ্কেত আর তাহাতে থাকিবে না। অথবা 'রক্তকরবী'র সর্দাররা যদি কেবল সৈন্য বা পাহারাওয়ালার রূপ ধরিয়া দর্শকদের সম্মুখে দেখা দেয় তবে 'রক্তকরবী'র সঙ্কেত বড় বেশী একমুখী হইয়া ওঠে এবং উহার প্রতীক ধর্মই লোপ পাইয়া যায়। সেই জন্যই এই সব নাটক অভিনয় কালে একটা রূপকথার অনির্দেশময়তা রক্ষা করিতে হয়। স্টানিস্লাভ্স্কি বলিয়াছেন, "To stage symbolical plays successfully, it is necessary to know the role and the play perfectly, to understand its spiritual contents, to crystalize its essence, to polish the crystal, to find a clear, bright and artistic form for it, synthesizing all the multiform and complex contents of the play....

"Symbolism, impressionism and all the other subtle ism in art belongs to super consciousness and begin where the ultranatural ends". (Stanislavsky : My life in Art : p.-258-259)

প্রতীকী নাটকে রূপকথার অনির্দেশমযতা রক্ষা করিতে বিশেষ সাহায্য পাওযা যাইতে পারে আলোক সজ্জার দ্বারা। বৈদ্যুতিক আলো আবিষ্কারের পূর্বে যে অসুবিধা ছিল আজ আর তাহা নাই। মোমবাতির যুগে হয ঝালর ঝুলাইযা রাখা হইত না হয পাদপ্রদীপ সাজাইয়া রাখা হইত। হযত এইভাবে মঞ্চের উপর বাতি সাজাইয়া রাখার রীতিই আজ পাদপ্রদীপের রীতির জন্ম দিযাছে। বৈদ্যুতিক আলো আবিষ্কারের পর আর পাদপ্রদীপেরও প্রযোজনীযতা অনুভূত হয় না—বরং পাদপ্রদীপ বর্জন করিবার প্রযোজনীয়তাই দেখা দিয়াছে, অন্যথায অভিনেতাদের ছায়াগুলির ভয়ঙ্করতা সৃষ্টির সম্ভাবনা আছে। বৈদ্যুতিক আলোককে নানা রং-এর কাঁচ বা কাগজের সাহায্যে এবং নানাভাবে নিয়ন্ত্রণ করিয়া রহস্যময় রূপ কথার রাজ্যের পরিবেশ সৃষ্টি করা আজ খুবই সহজ সাধ্য। রবীন্দ্রনাথ

তাঁহার নাটক লইয়া যে পরীক্ষা নিরীক্ষা করিয়াছেন তাহাতেও আলো লইয়া অনেক পরীক্ষা হইয়াছে। অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর মঞ্চের এই পরীক্ষাগুলি করিতেন। 'ঘরোয়া'তে সেই সংবাদটি পাওয়া যায়—"কোন্ সিনে কোন্ লাইট হবে, কোন্ লাইট আস্তে আস্তে মিলিয়ে যাবে, কোন্ লাইট আবার ধীরে ধীরে ফুটে উঠবে রথী আর কনক সব লিখে নিলে। সেবার অভিনয়ে লাইটের উপর বিশেষ ভাবে নজর দেওয়া হয়েছিল" (ঘরোয়া : পৃঃ ১৫৮-১৫৯)। সঙ্গীত যেমন মনকে মুক্তি দেয় এবং সহজেই গূঢ়তত্ত্বের ইঙ্গিত করিতে পারে সেইরূপ আলোকের প্রয়োগেও মনকে স্পর্শ করা যায় এবং গূঢ় তত্ত্ব ব্যঞ্জিত করা যায়। এইজন্য আলোককেও সঙ্গীতধর্মী বলা যাইতে পারে। নাটকের ভাব ব্যঞ্জনায় উভয়েরই কার্য প্রায় একই প্রকার। কালো পর্দার সাহায্যেও অনেক কিছু গোপন করা এবং মৃত্যুর রাজ্য সৃষ্টি করা সহজ সাধ্য। এই সব কারণে প্রতীকধর্মী নাটক নানা কৌশলের সাহায্যে মঞ্চে রূপায়িত করা আজ অপেক্ষাকৃত সহজ হইয়া উঠিয়াছে।

প্রতীকধর্মী নাটকে রূপকথার রস থাকা চাই। মেটারলিঙ্কের 'ব্লুবার্ড', হাউপ্টম্যানের 'দি সান্‌কেন বেল' একরকম রূপকথার রাজ্যেরই কাহিনী। ইবসেনের 'পিয়ার গিণ্ট'-এও অতিচারী কল্পনা স্থান পাইয়াছে। রবীন্দ্রনাথের প্রতীকধর্মী নাটকের অনেকগুলিতেই পটভূমিকায় সেই ধরণের রূপকথা নাই। এই নাটকগুলি পাঠ করার পর অভিনয় করার বড় একটা উৎসাহ থাকে না : মনেও হয় না যে দর্শকদের আকৃষ্ট বা আনন্দ দিবার শক্তি নাটকগুলির আছে। কাহিনী এবং বিষয়বস্তু দুই চারিটা কথাতেই শেষ করিয়া দেওয়া যায়। ভূমিকাগুলির মধ্যেও বড় রকম কিছু আকর্ষণ দেখা যায় না—সেগুলি অনেকখানি স্থান দখল করিয়াও থাকে না। অনেক ভূমিকার অভিনেয় অংশ মাত্র এক পৃষ্ঠায় লিখিয়া শেষ করা যায়। তথাপি একটু গভীর ভাবে লক্ষ্য করিলে দেখা যাইবে যে ছোট ছোট ভূমিকা এবং সামান্য কাহিনী সত্ত্বেও নাটকগুলি এক অনির্দেশ রাজ্য হইতে যেন আহ্বান করিতেছে। আমাদের জীবনের সাধারণ কথা থাকিলেও নাটকগুলি যেন বহুদূরে টানিয়া লইয়া যায়। সুদূরের ব্যাকুল বাঁশরীর ধ্বনি এইগুলির মধ্যে শ্রুত হয়। নাটকগুলিতে 'রাজা'রা আসিয়াও একটু রহস্যময়তা সৃষ্টি করিয়াছে। রাজার রাজ্যে আমাদের পরিচিত রাজ্যের অতিরিক্ত যেন কিছু আছে। রাজার চিঠি মুহূর্তে মনকে চঞ্চল করিয়া তোলে। সাধারণ

চিঠি পাইতেই মানুষের কত না আনন্দ : ইহা যে একেবারে রাজার চিঠি! 'ডাকঘর'-এর কাহিনী সকলের অপেক্ষা সাধারণ কিন্তু তাহার আকর্ষণটি সেরূপ সাধারণ নহে। দইওয়ালা, প্রহরী আসিয়া সামান্য কয়েকটা কথা মাত্র বলিয়া যায় কিন্তু দর্শক ও পাঠক চিত্তে বার বার ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হয় সেই সব 'দই, দই, দই, ভালো দই। সেই পাঁচমুড়া পাহাড়ের তলায় শামলী নদীর ধারে গয়লাদের বাড়ির দই। তারা ভোরের বেলায় গাছের তলায় গোরু দাঁড় করিয়ে দুধ দোয়, সন্ধ্যাবেলায় মেয়েরা দই পাতে, সেই দই। 'দই, দই, দই-ই —ভালো দই' (ডাকঘর: পৃ-১৯)। অথবা, দুপুর বেলা যখন রোদ্দুর ঝাঁ ঝাঁ করে, তখন ঘণ্টা বাজে 'ঢং ঢং ঢং —আবার এক এক দিন রাত্রে হঠাৎ বিছানায় জেগে উঠে দেখি, ঘরের প্রদীপ নিবে গেছে, বাইরের কোন্ অন্ধকারের ভিতর দিয়ে ঘণ্টা বাজছে ঢং ঢং ঢং' (তদেব: পৃ-২৬)। তখন এই সামান্য কাহিনীই যাদু স্পর্শে অসামান্য হইয়া ওঠে। সুতরাং এই কথা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে রবীন্দ্রনাথের প্রতীকী নাটকের কাহিনীতে সহজ কথা থাকিলেও সেগুলিতে যে সুর ধ্বনিত হইয়াছে তাহাতে আছে ইন্দ্রজাল : তাহা পাঠক ও দর্শক চিত্তে মায়াকাজল পরাইয়া দেয়। রবীন্দ্রনাথের প্রতীকী নাটকগুলির প্রভাব বিস্তারের ইহাই কৌশল। বাহিরের সংঘাতের ফলে যে এই প্রভাব বিস্তার হয় তাহা নহে —অন্তর্লোকের সংঘাতের জন্যই নাটকগুলির প্রভাব পড়ে। চরিত্রগুলি বিশেষ কর্মচঞ্চল নয়, তাহাদের মধ্যে কোথাও অস্থিরতা নাই—এক পরম প্রশান্তিতে পরিপূর্ণ : আত্মবিসর্জনের পূর্বেও 'মুক্তধারা'র অভিজিৎ-এর মনে কোনো চাঞ্চল্য দেখা যায় না—

অভিজিৎ। আমাকে আজ কিছুতেই বন্দী করতে পারবে না—না ক্রোধে, না স্নেহে। তোমরা ভাবছ তোমরাই আগুন লাগিয়েছ? না, এ আগুন যেমন করেই হোক লাগত। আজ আমার বন্দী থাকবার অবকাশ নেই।

বিশ্বজিৎ। কেন ভাই, কী তোমার কাজ?

অভিজিৎ। জন্মকালের ঋণশোধ করতে হবে। স্রোতের পথ আমার ধাত্রী, তার বন্ধন মোচন করব।

... ...

বিশ্বজিৎ। ভাই, অন্ধকার হয়ে এসেছে যে।

অভিজিৎ। যেখান থেকে ডাক এসেছে সেইখান থেকে আলোও আসবে।

বিশ্বজিৎ। তোমাকে বাধা দিতে পারি এমন শক্তি আমার নেই। অন্ধকারের মধ্যে একলা চলেছ, তবুও তোমাকে বিদায় দিয়ে ফিরতে হবে। কেবল একটি আশ্বাসের কথা বলে যাও যে, আবার মিলন ঘটবে।

অভিজিৎ। তোমার সঙ্গে আমার বিচ্ছেদ হবার নয়, এই কথাটি মনে রেখো। (মুক্তধারা : পৃ : ৬০-৬১)।

কোন উচ্ছ্বাস নাই, অতিনাটকীয়তা সৃষ্টির বিশেষ অবসর থাকিলেও সেদিকে নাট্যকার যান নাই, যাইতেও পারেন না। অথচ দর্শক ও পাঠক মন উদ্বুদ্ধ হইয়া ওঠে। নাটকও সাহিত্য—সুতরাং মানবচিত্ত উদ্বুদ্ধ করাই তাহার কাজ। নাটকীয় চমক এবং আকস্মিকতার বর্তমান কালের নাটকে বিশেষ স্থান নাই। প্রতীকী নাটক বিবিধ ও বিচিত্র উপায়ে নানা ছন্দলীলা সৃষ্টির দ্বারা দর্শক চিত্তকে সরস করিয়া তুলিবার প্রয়াসী। নাটকীয়ত্বহীন নাটকও সুনাটক হইতে পারে বলিয়া স্বীকৃতি পাইয়াছে। যে নাটকে বাহিরের সংঘাতই বেশী সেখানে দর্শকরা এত বেশী চোখ দিয়া দেখেন এবং কান দিয়া শোনেন যে মনের দৃষ্টি মেলিয়া ধরিবার অবকাশ থাকে কম। প্রতীকবাদীরা বাহিরের দেখা শোনা কমাইয়া দেওয়াতেই মনের চোখ-কান স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। অত্যন্ত বেশী উচ্চরোল এবং আড়ম্বর যেখানে সেখানে মন ধ্যান করিবার সুযোগ পায় না।

নাটকীয় সংঘাতে অভ্যন্তরীণ তাৎপর্যই যে প্রধান এবং নাটকীয়তা যে বর্জনীয় তাহা রবীন্দ্রনাথ দেখাইয়াছেন।

"Every play involves action and even conflict, though it need not be physical action or physical conflict—which will, indeed, not take us dramatically very far···the more mature a play's art the less is its action likely to depend upon either physical conflict or accident.

(Granville-Barker : The use of Drama : p-31)

বাহিরের ঘাত প্রতিঘাত হয়ত রোমাঞ্চিত করে, যাহাদের মন সূক্ষ্মতার সন্ধান রাখে না তাহাদের ইহাই একমাত্র আকর্ষণীয় বলিয়া হয়ত মনে হয়

কিন্তু রসলিপ্সু পাঠক ও দর্শক আত্মার উপর অভ্যন্তরীণ সংঘাতের প্রভাব অনুভব করেন। রবীন্দ্রনাটকে এইটাই প্রধান কথা। সুতরাং এই সব নাটকের চরিত্রগুলির আত্মিকসত্তা উদ্‌ঘাটিত না করিয়া অভিনয় করার কোন মূল্য নাই। অভিনেতা-অভিনেত্রীদের অভিনয় কৌশল দেখাইবার জন্যই চরিত্রগুলি নয়ঃ এইসব ভূমিকায় তাহাদের লুপ্ত হইয়া যাওয়া চাই এবং একমাত্র তাহাই এই সব ভূমিকার অভিনয় কৌশল। তাহাদের শিল্প-রসজ্ঞ এবং শিল্প-প্রাণ হইতে হইবে। স্বজ্ঞার সাহায্য ব্যতীত প্রতীক ধর্মী নাটকের রূপ দান অসম্ভব।

অভিনয় শিল্পের সহিত অন্য শিল্পের একটা বড় রকমের পার্থক্য আছে। কবি-চিত্রকর প্রভৃতি রূপদক্ষরা সৃষ্টি করেন তখনই যখন তাঁহারা মনের মধ্যে বিশেষ প্রেরণা অনুভব করেন। কবি-চিত্রকরকে সেই বিশেষ প্রেরণা লাভের জন্য কোন নির্দিষ্ট সময়ের অপেক্ষা করিয়া থাকিতে হয় না—সৃষ্টির ক্ষেত্রে তাঁহারা সম্পূর্ণ স্বাধীন। কিন্তু অভিনেতাদের সেই স্বাধীনতা নাইঃ মনের মধ্যে প্রেরণা লাভের জন্য তাঁহাদের অপেক্ষা করিয়া থাকিলে চলে না। ঠিক অভিনয়ের সময়টিতেই তাঁহাদের মনে আবেগ সঞ্চারিত হওয়া চাইঃ নির্দিষ্ট সময়টিতেই তাঁহাদের মনে প্রেরণা জাগ্রত করিয়া তুলিতে হইবে। সুতরাং প্রেরণার সৃষ্টি-কৌশলটি তাঁহাদের জানা চাই। প্রতীকী নাটক অভিনয়ের ক্ষেত্রে বিষয়টি আরও অধিক স্মরণীয়। দৈহিক উত্তেজনা সৃষ্টির মোটা কাজে অঙ্গভঙ্গী অনেকখানি সাহায্য করে। কিন্তু প্রতীকী নাটক রূপায়ণের কালে তাহার ভাব-গভীরতা এত সহজে প্রকাশ করা যায় না; 'রক্তকরবী'র নন্দিনীর ভূমিকা অভিনয়ের সময়ে উচ্চকণ্ঠে দর্শকদের সচকিত করিয়া তুলিয়া অথবা মঞ্চের উপর দ্রুত পদক্ষেপ করিয়া অভিনয় করিলে রবীন্দ্রনাথের নন্দিনীকে খুঁজিয়া পাওয়া যাইবে না। এই সব নাটকে অভিনয় করিবার জন্য মঞ্চে আরোহণের বহু পূর্ব হইতেই আত্মিক প্রস্তুতির প্রয়োজন। কেবল বাহিরের রূপসজ্জাই যথেষ্ট নয় আত্মার রূপসজ্জাও না করিলে চলে না। এই সব ক্ষেত্রে স্বজ্ঞাই মাত্র সাহায্য করিতে পারে—একমাত্র উহার সাহায্যেই মনে উদ্দীপনা জাগ্রত করিয়া সৃষ্টির আবেগে চঞ্চল হওয়া সম্ভব।

প্রতীকী নাটক অভিনয়ে অঙ্গভঙ্গীর প্রায় কোনই স্থান নাই। এখানে কণ্ঠস্বরই প্রধান। একমাত্র ইহারই সাহায্যে বিভিন্ন ভাবকে ব্যঞ্জিত করা

যায়। এই ধরণের নাটকে যে স্বপ্নালু ভাব আছে তাহা সৃষ্টি করিতে গেলেও কণ্ঠস্বরের সাহায্য অবশ্যম্ভাবী। মহান ভাব ফুটাইতে হইলে মিষ্টি কণ্ঠস্বর চাই। মন গভীর ভাবে অভিনেয় চরিত্রের মধ্যে অবগাহন করিলে আপনা হইতেই সাধারণ কণ্ঠস্বরও যন্ত্রের ন্যায় বাজিয়া ওঠে। সুতরাং এই জাতীয় নাটকের অভিনেতাদের উচ্চ আদর্শ সম্পন্ন হইতে হয়। শিল্পের জন্য সাধনা চাই, প্রয়োজন হইলে অনেক স্বার্থবলি দিতে হয়। অভিনেতা-অভিনেত্রীদের ব্যক্তিগত চরিত্রও মহান থাকা দরকার। নাটকে যে ভ্রান্তি সৃষ্টি করিতে হয় তাহা অনেকটাই ব্যাহত হইবে যদি দর্শকেরা কোন অভিনেতা-অভিনেত্রীকে অত্যন্ত নিন্দার্হ চরিত্রের বলিয়া জানে। ভ্যাকৃটাংগভ (Yevgeny Vakhtangov : মৃত্যু—১৯২২) বলিয়াছেন, "You can't imagine how interested the spectator is in an actor's private life : Don't blame him for his curiosity. He likes you and he wants to know everything about the person he likes. That's why its important to be not only a hero on the stage, but also an honest citizen in real life" (Gorchakov : The Vakhtangov School of Stage Art. : p-115).

অপরদিকে নাটকের রসোপলব্ধির জন্য দর্শকদেরও প্রস্তুতির প্রয়োজন। তাঁহারাও এমন কিছু মহান ব্যক্তি নহেন যে ইচ্ছা মাত্র নিজেদের মন বাহিরের জগৎ হইতে সরাইয়া আনিয়া গভীর ভাবে ভাবজগতে নিমজ্জিত হইতে পারেন—অথবা প্রতীক নাট্যের রস গ্রহণ করিতে পারেন। প্রাচীন ভারতের নাট্যকলায় সেই জন্য 'পূর্ব রঙ্গের' ব্যবস্থা ছিল। গায়কদল এবং সূত্রধার দর্শকদের বাস্তব জগৎ হইতে রসের জগতে টানিয়া আনিতেন। যাত্রায়ও একতান বাদনের প্রয়োজন ছিল বিপুল জনসমাগমের স্বাভাবিক গণ্ডগোল দূর করিয়া আসর জমাইয়া লইবার জন্য। প্রতীক নাটকের ক্ষেত্রে এই ব্যবস্থাটি কঠিনতর। ভ্যাকৃটাংগভ মনে করেন যে ধীরে ধীরে আলোক নিভাইয়া, কোন প্রকার শব্দ না করিয়া পর্দা সরাইয়া অভিনয় আরম্ভ করা উচিত : তাহাতে দর্শক-চিত্তে প্রভাব পড়ে এবং তাহাদের মনে হয় যে চক্ষুর সম্মুখে জীবনের পৃষ্ঠা একটির পর একটি পরিবর্তিত হইয়া যাইতেছে। চমৎকার সৃষ্টির চেষ্টায় এবং কর্কশ শব্দে মনের অভিভূত ভাব ছিন্ন হইয়া যায়। প্রতীক নাটক রূপায়ণের কালে এই দিকে আরও যত্ন লওয়া প্রয়োজন। প্রেক্ষাগৃহটি যেন আলোকে উদ্ভাসিত না থাকে—আলোকসজ্জা

এমন থাকা চাই যাহাতে সমস্ত প্রেক্ষাগৃহটি অভিনয় আরম্ভের পূর্ব হইতেই এক স্বপ্নময় জগতের সৃষ্টি করে। অত্যন্ত অস্পষ্ট ভাবে যন্ত্রসঙ্গীত সৃষ্টির প্রয়োজন যাহা দর্শকদের মন এক অনির্দেশ লোকের দিকে আকর্ষণ করিবে। দর্শকদের ভাব সমাহিত ভাবটি যেন কোন কারণে ছিন্ন হইয়া না যায়—প্রেক্ষাগৃহে সেই ধরণের এক পবিত্র আবহাওয়া সৃষ্টি করাও একান্ত কর্তব্য।

মঞ্চের গঠনের উপরও নাটকের প্রভাব নির্ভর করে। দর্শকদের বসিবার আসন মঞ্চ হইতে ক্রমোন্নত হইলে একটা বড় রকমের সুবিধা হয়ঃ দর্শকরা সেই অবস্থায় নিজেদের অভিনেতাদের হইতে দূরে বলিয়া মনে করিতে পারেন না; তাঁহারা অভিনয় দর্শক না হইয়া অভিনয়ে অংশ গ্রহণকারী হইয়া ওঠেন। যে সকল নাটকে বহির্জগতের সংঘাতকেই প্রধানরূপে দেখান হয় সেখানে দর্শকদের পক্ষে অভিনয়ে অংশগ্রহণকারীর মনোভাব না জন্মিলেও কোন ক্ষতি হয় না। কিন্তু যেখানে নাটক ভাবসমাহিত করে, যেখানে ধ্যানেই সার্থকতা সেখানে দর্শকদের মনে এইরূপ ভ্রান্তি জন্মান প্রয়োজন। রবীন্দ্রনাথের প্রতীক নাটকগুলি প্রযোজনা কালে এই কথা স্মরণ রাখা প্রয়োজন।

নানা বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার এবং দার্শনিক চিন্তার প্রসারের ফলে জগৎ নানা দিক দিয়া সমৃদ্ধিশালী হইয়া উঠিতেছে। সাহিত্যে তাহার প্রতিফলন হইবেই। নাটকেও বর্তমানকালের সমস্ত শিক্ষা ও সংস্কৃতি প্রতিফলিত হইতেছে। কোথাও কবিরা সরাসরি নাটক রচনায় হাত দিয়াছেন—উদাহরণস্বরূপ, গ্যেটে, ইয়েট্স্, ইলিয়ট, রবীন্দ্রনাথের নাম করা যাইতে পারে; আবার কোথাও বা নাটকে কাব্যের পরোক্ষ প্রভাব পড়িয়াছে—প্রতীক নাটকগুলি তাহার জ্বলন্ত উদাহরণ। সেই জন্যই কেহ কেহ শ্রেষ্ঠ নাটককে শ্রেষ্ঠ কাব্য বলেন।[১১] অনেক নাটকে কাব্যের অংশও প্রচুর পরিমাণে দেখা যায়, 'গৈরিশ ছন্দ' তাহার প্রমাণ। ইহাকে কথাবার্তার ক্ষেত্রে অবাস্তব বলিয়া মনে হইতে পারে—কারণ অস্বীকার করিবার উপায় নাই যে কাব্যের ছন্দে কেহ কথা বলে না। তথাপি যেহেতু শ্রেষ্ঠ নাটক শ্রেষ্ঠ কাব্য তাই নাটক রচনায় কাব্যের অনুরোধেই বাস্তবকে অতিক্রম করায়

১১। John Gassner : A Treasury of the Theatre Vol. II ; Modern English Drama : p. xiv.

অনেকে কোন দোষের সন্ধান পান না। এই সূত্রে ইলিয়টের (Eliot, Thomas Stearms) মতটি বিশেষরূপে প্রণিধান যোগ্য—

"In those prose plays which survive, which are read and produced on the stage by later generations, the prose in which the characters speak is as remote, for the best part, from the vocabulary, syntax and rhythm of our ordinary speech. So if you look at it in this way, it will appear that prose, on the stage, is as artificial as verse : or alternatively, that verse can be as natural as prose" (Poetry and Drama : p : 12-13). তিনি আরও বলিয়াছেন, "Verse is not merely a formalization, or an added decoration, but that it intensifies the drama. It should indicate also the importance of the unconscious effect of the verse upon us. And lastly, I donot think that this effect is felt only by those members of an audience who "like poetry" but also by those who go for the play alone." (Ibid : p-19).

মেটারলিঙ্ক বা রবীন্দ্রনাথের নাটকগুলি গদ্যে লিখিত হইলেও সেইগুলি একান্তই কাব্যগুণযুক্ত। কাব্যের প্রধান উপকরণ যে চিত্র এবং সঙ্গীত তাহাতে ভর করিয়া ইঁহাদের অধিকাংশ নাটকের ভাবকল্পনাই যেন শূন্যে পাখা মেলিয়া দিযাছে। গদ্যের ভাষা হইলেও তাহা মনকে সুদূরচারী করে —রহস্যময় জগতের ব্যাকুল বাঁশরির ধ্বনি শোনায়। সঙ্গীতেরও সেইজন্য নাটকে একটা বিশেষ স্থান আছে।

আমাদের নাট্যশাস্ত্রকারও বলিয়াছেন—

বাদ্যেঽপি গীতেঽপি সংপ্রযুক্তে।
নাট্যস্য যোগো ন বিপত্তিমেতি॥

অর্থাৎ বাদ্য এবং গীত যুক্ত হইলেও নাট্যের কোন বিপদ দেখা দেয় না।

সুললিত আবৃত্তি মনে দোলা দেয়, সঙ্গীতও মনকে আচ্ছন্ন করিয়া মনকে সুদূরচারী করে। প্রতীক নাটকে সেইজন্যই সুরেলা ভাষা, কাব্যের অনুরণন এমন কি সঙ্গীতের প্রয়োগ একান্তরূপেই প্রয়োজন। কমিশরঁঝেভস্কি (K. Komissarzhevsky) বলেন যে, বাদ্য ও নৃত্যাভিনয় বা ছন্দময় অঙ্গচালনা গীতিনাট্য ও নৃত্যনাট্যের ন্যায় সাধারণ নাটকেও অপরিহার্য[১২]—

১২। মনোমোহন ঘোষ : প্রাচীন ভারতের নাট্যকলা : গীত ও বাদ্য।

"ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমদিকের রহস্যবাদীরা সঙ্গীতকেই সমস্ত শিল্পের আদর্শ বলিয়া ভাবিতেন এবং নাটক সঙ্গীতের সাহায্যেই উচ্চতম স্তরে উঠিতে পারে বলিয়া মনে করিতেন। ওয়াগনার মনে করিতেন সঙ্গীত নাটকের আত্মা এবং নাটক সঙ্গীতের দেহ স্বরূপ" (Gassner : A Treasury of the Theatre : Vol. II)। সঙ্গীতের একটি পরোক্ষ প্রভাবও অভিনেতা-অভিনেত্রীদের উপর পড়ে। যিনি নিজে সঙ্গীত জানেন অথবা যাঁহার কানে সুর ধরা পড়ে তিনি স্বাভাবিক ভাবে এবং সুন্দর ভাবে কথা বলিতে শেখেন।

আমাদের দেশীয় যাত্রায়ও গান থাকে প্রচুর। কালী কীর্তন বা কৃষ্ণ যাত্রায় কবিতা এবং গানের স্থানই অধিক। ঐক্য রচনার প্রধান ও সুন্দর উপায় হইল নৃত্য, গীত, বাদ্য। আসর এবং অভিনেতাদের মধ্যে প্রধানতঃ ইহারই সাহায্যে যোগ রচিত হয়। আমাদের দেশের সাধারণ মানুষদের উপর যাত্রার প্রভাব যে কতখানি তাহা রবীন্দ্রনাথ ভাল করিয়াই লক্ষ্য করিয়াছিলেন। তাই তাঁহার নাটকেও যাত্রার প্রভাব যথেষ্ট পড়িয়াছে। সাধারণ মানুষকে তিনি কোনদিনও তুচ্ছ করেন নাই। তথাকথিত শিক্ষিতরাই যে কেবল নাটকের গূঢ়তত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম করিতে পারে এমন কথা তিনি কখনও মনে করিতেন না। অশিক্ষিত কীর্তনীয়াগণ, কবিওয়ালারা, বাউলরা তাঁহাকে সেই শিক্ষা দিয়াছিল। বাউলদের প্রভাব তাঁহার উপর অত্যধিক পরিমাণে পড়িয়াছিল। ধনঞ্জয় বৈরাগী, দাদাঠাকুর বা ঠাকুরদা চরিত্র তাহার প্রমাণ। যাত্রায় 'বিবেক' নামে একটি চরিত্র মাঝে মাঝে আসিয়া গান করিয়া যায়—এই গানের কথার সহিত নাটকের বিষয়ের ঘনিষ্ঠ যোগ থাকে; 'বিবেক' যেন কোন এক বিশেষ দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করায়। যাত্রার 'বিবেক'-এর গান ব্যতীত অন্য কোন কাজ নাই—কাহিনীর সহিত তাহার গানের অর্থের তাৎপর্যপূর্ণ যোগ থাকিলেও চরিত্রটি নাটক বা যাত্রার পক্ষে প্রক্ষিপ্ত। রবীন্দ্রনাথ সেই বাউলরূপী বিবেককেই ধনঞ্জয় বৈরাগী, দাদাঠাকুর, অথবা ঠাকুরদার নব কলেবর দান করিয়াছেন। যেখানে কথায় বলা শেষ হইতেছে না সেখানে তাহাকে গানের দ্বারা প্রকাশ করা হইতেছে। জীবনে যে আঘাতের প্রয়োজন আছে তাহা বুঝাইবার ভাষা ফুরাইয়া যাওয়াতেই ধনঞ্জয় বৈরাগী গান ধরেন—

আরো আরো প্রভু, আরো আরো
এমনি করে আমায় মারো।
(প্রায়শ্চিত্ত : পৃ-২৬ অথবা মুক্তধারা : পৃ-৩৭)

অথবা ওগো আমার নিত্যনূতন, দাঁড়াও হেসে—
চলা তোমার নিমন্ত্রণে নবীন বেশে।
দিনের শেষে নিবল যখন পথের আলো,
সাগর-তীরে যাত্রা আমার যেই ফুরালো,
তোমার বাঁশি বাজে সাঁঝের অন্ধকারে—
শূন্যে আমার উঠল তারা সারে সারে॥
(অরূপরতন : পৃ-২৩)

গানগুলি যেন কথারই জের। যাহা অশেষ শুধু কথায় বলিলে যে তাহা শেষ হইয়া যায়। সেইজন্যই উহার যথাযথ প্রকাশের জন্য সঙ্গীতের প্রয়োজন। যাত্রার বিবেকের কাজ সবটাই ধনঞ্জয় বৈরাগী, দাদাঠাকুর বা ঠাকুরদা করিয়াছেন কিন্তু ইঁহারা কেহই নাটকে বিবেকের ন্যায় প্রক্ষিপ্ত নহেন। ইঁহারা নাটকের একটা বড় অংশ জুড়িয়া আছেন। নাটকগুলির মধ্যে যে রহস্যময়তা বা মরমী অনুভূতির স্পর্শ আছে তাহাকে তীব্রতর অথচ আভাসে সঙ্কেত করিবার জন্যই ইঁহাদের সৃষ্টি। ইঁহারা সেই অসীমের সহিত যুক্ত, যেন তাঁহারই দূত। ইঁহাদের মাধ্যমেই তাঁহাকে উপলব্ধির সুযোগ ঘটে। তাঁহার বার্তা ইঁহারাই বহিয়া আনেন। যখন অবিশ্বাসের আব-হাওয়ায় কক্ষ পরিপূর্ণ তখন সহজ বিশ্বাসে উদ্বুদ্ধ হইয়া ইঁহারাই বলেন, "হাঁ, আমি খেপেছি। তাই আজ এই সাদা কাগজে অক্ষর দেখতে পাচ্ছি। রাজা লিখছেন, তিনি স্বয়ং অমলকে দেখতে আসছেন, তিনি তাঁর রাজ-কবিরাজকেও সঙ্গে করে আসছেন (ডাকঘর : পৃ-৫৯)। একদল যখন ভৈরবের উপর অহংকে প্রতিষ্ঠিত করিতে চাহে এবং অপরদল ভৈরবের জাগরণের সম্ভাবনার সম্বন্ধে সংশয় প্রকাশ করে তখন ধনঞ্জয় বৈরাগী অটল বিশ্বাসেই বলেন, "ভৈরবের নৃত্য যখন সবে আরম্ভ হয় তখন চোখে পড়ে না। যখন শেষ হবার পালা আসে তখন প্রকাশ হয়ে পড়ে" (মুক্তধারা : পৃ-৬২)। 'রক্তকরবী' নাটকে এই চরিত্র সৃষ্টির প্রয়োজন হয় নাই। সেখানে রঞ্জন ও নন্দিনী, বিশু ও কিশোরে মিলিয়া ঠাকুরদার কাজটি সম্পন্ন করিয়াছে।

ধনঞ্জয়-দাদাঠাকুর-ঠাকুরদা নাটকের আর একটি উদ্দেশ্যও সাধন করিয়াছেন। নাটকের পরিণতির ইঙ্গিতও এই চরিত্রগুলিতে আছে। সেই দিক দিয়া সংস্কৃত নাটকের স্থত্রধার-এর কাজও ইঁহারা করিয়াছেন। অন্যদিকে গ্রীক্ নাটকের কোরাসের ছায়াও ইঁহাদের উপর পড়িয়াছে। কোরাস রাজার বিরুদ্ধ মতও কখনও কখনও ব্যক্ত করে। ধনঞ্জয়-ঠাকুরদা অত্যন্ত বিশ্বাসীর ন্যায় আরও দৃঢ়তার সহিত নিজেদের ব্যক্তিত্বের পরিচয় দেন, প্রয়োজন হইলে রাজার সহিতও শান্ত দৃঢ়তার সহিত সংঘাতেও তাঁহারা পশ্চাৎপদ হন না। গ্রীক্ নাটকে কোরাসের বিশেষ স্থান আছে, রবীন্দ্রনাথের প্রতীক নাটক-গুলিতে ধনঞ্জয়-দাদাঠাকুর-ঠাকুরদাদের বিশেষ মর্যাদা—এই চরিত্রগুলি না থাকিলে নাটকের সঙ্কেতগুলি পাঠকচিত্তে স্থান লাভ করিত না। অসীমের অভিব্যক্তির মাধ্যম স্বরূপ এই চরিত্রগুলি না থাকিলে অসীমের অভিব্যক্তি অতিনাটকীয় না হইয়াও পারিত না। সেই দিক দিয়াও ওই চরিত্র গুলির তাৎপর্য বড কম নহে। এই সব কারণে নিঃসন্দেহে এই কথা বলা যায় যে ধনঞ্জয়-দাদাঠাকুর-ঠাকুরদারা গ্রীক্ নাটকের কোরাস, সংস্কৃত নাটকের স্থত্রধার, যাত্রার বিবেক প্রভৃতির কাজ করিয়াও অধিকতর তাৎপর্যমণ্ডিত হইয়া উঠিয়াছে।

গ্রন্থপঞ্জী

১। অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, রাণী চন্দ : ঘরোয়া

২। ইন্দিরাদেবী চৌধুরাণী : রবীন্দ্র স্মৃতি—১৩৬৭

৩। ঈশানচন্দ্র ঘোষ : জাতক : পঞ্চম খণ্ড

৪। উপনিষদ : ঈশ
বৃহদারণ্যক
ছান্দগ্য
কঠ
এবং অন্যান্য

৫। গিরিশচন্দ্র ঘোষ : স্বপ্নের ফুল
বিল্বমঙ্গল
দেলদার

৬। গিরীন্দ্রশেখর বসু : পুরাণ প্রবেশ : ২য় সং—১৩৫৮
স্বপ্ন : ২য় সং—১৩৫১

৭। গীতা : গান্ধীজীর ভাষ্য সমেত

৮। চর্যাপদ

৯। দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর : স্বপ্নপ্রয়াণ

১০। নাট্যশাস্ত্রম্ : অভিনবগুপ্তাচার্য বিরচিত বিবৃতি সমেতম্ : Vol I
Second Revised Edition : General Editor
G. H. Bhatt.

১১। পুরাণ : গরুড়
মার্কণ্ডেয়
বিষ্ণুধর্মোত্তর
নারদ এবং অন্যান্য

১২। প্রভাত কুমার মুখোপাধ্যায় : রবীন্দ্রজীবনী : ১ম, ২য়, ৩য় খণ্ড

১৩। প্রমথনাথ বিশী : রবীন্দ্রনাট্য প্রবাহ : ২য় খণ্ড

১৪। বিপিনচন্দ্র পাল : নবযুগের বাংলা—১৩৬২

১৫। ব্রহ্ম সঙ্গীত

১৬। ভূদেব মুখোপাধ্যায় : সামাজিক প্রবন্ধ

১৭। মনোমোহন ঘোষ : প্রাচীন ভারতের নাট্যকলা : বিশ্ববিদ্যা সংগ্রহ—১৩৫২

১৮। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর : আত্মজীবনী

১৯। মৈত্রেয়ী দেবী : বিশ্বসভায় রবীন্দ্রনাথ—১৩৬৭

*২০। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : আত্মপরিচয়

আলোচনা : ১৮৮৫

ঔপনিষদ ধর্ম

চিঠিপত্র : ৬ষ্ঠ খণ্ড : ১৯৫৭

৭ম খণ্ড : ১৩৬৭

ছিন্নপত্র : সং (পুঃ মুঃ) ১৩৬৭

জীবনস্মৃতি

ধর্ম : ৩য়—১৩৫৫

প্রাচীন সাহিত্য

মানুষের ধর্ম

শান্তিনিকেতন : ১ম খণ্ড : ১৩৬৫

২য় খণ্ড

সঞ্চয় : ১৯১৬

সাহিত্য

এবং অন্যান্য গ্রন্থ

২১। শান্তিদেব ঘোষ : রবীন্দ্র সঙ্গীত : আশ্বিন, ১৩৫৬

গ্রামীন নৃত্য ও নাট্য

২২। সুকুমার সেন : বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস : ৩য় খণ্ড

২৩। স্বামী বিবেকানন্দ : কর্মযোগ

ভক্তিযোগ

জ্ঞানযোগ

বর্তমান ভারত

২৪। হেমেন্দ্র কুমার রায় : সৌখীন নাট্যকলায় রবীন্দ্রনাথ

২৫। কবিতা : মাসিক পত্র, সম্পাদক বুদ্ধদেব বসু : ১৩৬৫, ১৩৬৬

২৬। বঙ্গদর্শন নবপর্যায় : মাসিক পত্র : ৪র্থ বর্ষ, ১৩১১

* রবীন্দ্রনাথের যে পুস্তকগুলি হইতে উদ্ধৃতি দেওয়া হইয়াছে কেবল সেইগুলির নামই করা হইল।

1. ALAN REYNOLDS THOMPSON : The Anatomy of Drama, 1946.
2. ALLARDYCE NICOLL : The Theory of Drama : World Drama : Reprinted, 1959.
3. ALIGHIERI DANTE : The Divine Comedy.
4. ANANDA K. COOMARESWAMY : History of Indian and Indonesian Art : 1927.
5. ANTON PAVLOVICH CHEHOV : The Sea-Gull : The Cherry Orchard.
6. APURVA PRAKASH : The Foundation of Indian Art & Archaeology : 1942.
7. ARISTOTLE : Aristotle's Psychology : A treatise on the Principle of Life (Dr. W. A. Hammond) : 1902. Aristotle's Theory of poetry and fine art (tr. S. H. Butcher) : 4th ed. 1932.
8. ARNOLD HAUSEUR : The Social History of Art : 1951.
9. ARTHUR RIMBAUND : A season in hell (tr. Louise Verere) : 1952. Prose Poems from the Illuminations (tr. Louise Verere) : 1946 : The Drunken Boat (tr. Brian Hill) : 1953.
10. ARTHUR SCHOPENHAUER : The Art of Literature : 1891.
11. ARTHUR SYMONS : The Symbolist Movement in Literature Second Ed. Revised : 1908.
12. AUGUST STRINDBERG : Easter.
13. AUROBINDO GHOSE : The Renaissance in India : 3rd Ed., 1946.
14. BENEDETTO CROCE : Aesthetic : 1953.
15. BERTRAND RUSSEL : The Impact of Science in Society.
16. B. L. DHAMA & S. C. CHANDRA : Khajuraho (Department of Archaeology, India).
17. CASSIRER, ERNST : An Essay on Man.
18. C. G. JUNG : The Collected works : Vol. 5 : Symbols of Transformation : Psychology of the Unconscious.
19. CHARLES BAUDELAIRE : Baudelaire : a self portrait : selected lectures (tr. Lois Boc Hyslop & Francis E. Hyslop) : 1957 : The Flowers of evil : Selected & Edited by Marthiel & Mathews, J : 1955.

20. C. M. Bowra : The Heritage of Symbolism : 1951.

21. Coleridge, S. T. : Coleridge's Works. Biographia Literaria: Aids to Reflection: Miscellaneous: Theory of Life.

22. Donald Keene : Japanese Literature.

23. Dorothea Chaplain : Matter, Myth and Spirit
or
Keltic and Hindu Links
Preface by Sir Grafton Elliot Smith, M.A., Litt. D., D. Sc, M. D., Ch. M, F.R.C.P., F.R.S.

24. Edward Thompson : Rabindranath Tagore : Poet & Dramatist : 1948.

25. E. Bevan : Holy Images : 1910.

26. E. B. Havell : Indian Sculpture and Painting : 1908.

27. Emery Neff : A Revolution in European Poetry : 1940.

28. E'mile Verhaeren : The Plays : 1916.

29. Ernest Jones : Papers on Psychoanalysis : 5th ed. (Reprinted), 1950.

30. Erwin, Christensen : Primitive Art : 1955.

31. Evelyn Underhill : Mysticism : 1948.

32. Ge'rard De Nerval : Selected Writings (tr. Goffrey Wagner) : 1958.

33. Gordon Craig : On the Art of the Theatre : 1957.

34. H. Bergson : Creative Evolution.

35. H. Zimmer : Myths and Symbols in Indian Art & Civilization : Second Printing : 1947.

36. H. Granville-Barker : The use of the Drama : 1947.

37. Henric Ibsen : The Wild Duck : Rosmersholm : Peer Gynt etc.

38. Hugo Munsterberg : The Arts of Japan : 1957.

39. Janko Lavrin : Ibsen and his creation. (A Psycho-critical study) : 1921.

40. Jethro Bithell : Modern German Literature : 1959.

41. Joanny Grosset : Bhāratiya-Nātya Cāstram : Vol. I.

42. Johann Wolfgang Goethe : Faust.

43. J. M. Cohen : A History of Western Literature : 1956.

44. Kenneth Cornell : The Symbolist Movtment : 1952.

45. KONSTANTIN STANISLAVSKY : My life in Art: (tr. G. Ivanov Mumjiev).

46. KOTELIANSKY : The Life & Letters of Anton Tcehekhov : 1925.

47. KROPOTKIN : Mutual Aid.

48. L. A. WILLOUGHBY, D. LIT : Romantic Movement in Germany : 1930.

49. LANGER, SUSANNE : Philosophy in a New Key.

50. MARC STONIM : Modern Russian Literature (from Chekhov to the Present) : 1953.

51. MARTIN TURNELL : Baudelaire : A study of his Poetry : 1953.

52 MAURICE MAETERLINCK : The Intruder : The Blue Bird : The Buried Temple : The Great Beyond : The Blind. etc.

53. NIKOLAI GORCHAKOV : The Vakhtangov School of stage Art.

54. PADMA AGRAWAL. M.A.,PH.D : Symbolism (Banaras Hindu University : A Psychological study) : 1955.

55. PAUL VERLAINE : Confessions of a Poet (tr. Jranka Richardson) : 1950. : Selected Poems (tr. C. F. MacIntyre) : 1918.

56 PERVIZ N. PEEROZSHAW DUBASH : Hindoo Art in its Social Setting (Forward by S. Radhakrishnan) : 1936.

57. PLOTINUS : The Philosophy of Plotinus : 1918.

58. RABINDRANATH TAGORE : Sādhanā : Personality . Creative Unity.

59. RALPH WALDO TRINE : In Tune with the Infinite (Revised Edition) : 1949.

60. RAMASWAMI SASTRI : Hindu Culture and the Modern Age : 1956. : The Evolution of Indian Mysticism (International Book House Ltd : Bombay).

61. R. C. MAJUMDER & H. C. ROY CHOUDHURY & KALIKINKAR DUTTA : An Advanced History of India : 1953.

62. R. P. KNIGHT : The Symbolical Language of Ancient Art and Mythology : 1891.

63. SHELDON CHENEY : World History of Art : 1938.
64. SIGMUND FREUD : Interpretation of Dreams. : Collected Papers : Vol IV.
65. S. N. DASGUPTA : Rabindranath : The Poet and the Philosopher : 1948.
66. S. RADHAKRISHNAN : The Philosophy of Rabindranath Tagore, 1918 : An Idealist View of Life, 1932.
67. STEPHANE MALLARME : Selected Prose, Poems, Essays & Letters (tr. Bradford Cook) : 1956.
68. STUART, D. C. : The Development of Dramatic Art.
69. THOMAS CARLYLE : Sartor Resartus : 1948.
70. T. M. GREENE : The Arts and the Art of Criticism, 2nd ed : 1947.
71. T. S. ELIOT : Poetry and Drama : 1950.
72. VISHWANATH S. NARAVANE : Rabindranath Tagore (A Philosophical study).
73. WALT WHITMAN : Poetry and Prose Edited by ABE CAPEK.
74. WHITEHEAD : Symbolism : its meaning and effect : 1928.
75. WILBURN MARSHALL URBAN : Language and Reality : The Philosophy of language and the Principles of Symbolism : 1939.
76. WILLIAM WORDSWORTH : Works.
77. THE HISTORIANS' HISTORY OF THE WORLD : Edited by Henry Smith Williams : Vols XII & XIII, 1908.
78. A HISTORY OF MODERN DRAMA : Edited by Barreth H. Clark & George Freedley.
79. A TREASURY OF THE THEATRE, VOL. 2 : Revised Ed. : Edited by John Gassner : 1951 (Modern European Drama from H. Ibsen to Jean-Paul Sartre).
80. CHIEF PATTERNS OF WORLD DRAMA : With Introductions on the History of the Drama & the stage by William Smith Clark : 1946. (Aeschylus to Anderson).
81. THE ENCYCLOPEDIA AMERICANA : (Symbolism).
82. THE ENCYCLOPAEDIA BRITANNICA : Vol. 22 (Symbolism, Symbolist).
83. HASTINGS' ENCYCLOPAEDIA OF RELIGION AND ETHICS Vol. vii.
84. THE OXFORD COMPANION TO ENGLISH LITERATURE.
85. THE OXFORD COMPANION TO FRENCH LITERATURE

— নির্ঘণ্ট —